এই বিশ্বের কথাসাহিত্য

এই বিশ্বের কথাসাহিত্য

প্রথম খণ্ড

অসিত গুপ্ত

কথাকলি
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন · কলিকাতা ৯

প্রকাশকাল : রবীন্দ্র জন্মদিবস ১৩৬৯

প্রকাশক :
প্রকাশচন্দ্র সিংহ
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

এস. স্কোয়ার

বর্ণলিপি :
সমর গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

দাম : ১৪·০০ টাকা

উৎসর্গ

নব্য বাংলার অভিজাত সমালোচক ও নিবন্ধকার

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের

স্মৃতির উদ্দেশে ভীরু প্রণাম।

ভূমিকা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের স্থান আজ আমাদের কালে যদি আর কোনও সাহিত্যরূপ অধিকার করে থাকে তবে তা উপন্যাস একথা বোধ হয় প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে। বস্তুঘনিষ্ঠ মানব সংসারের বিচিত্র তরঙ্গপর্যায়, তার সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব সমস্যা, উত্থান পতন, আনন্দ বেদনার মধ্যে বিচিত্র নর নারীর বিচিত্রতর রূপ প্রত্যক্ষগোচর করা আজকের দিনে একমাত্র উপন্যাসেই সম্ভব।

সেইজন্যই সাম্প্রতিক কালে উপন্যাসের এত প্রসার ও প্রভাব। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ থেকেই এই প্রসার ও প্রভাবের সূচনা; আর, আজ গত একশ' সোয়াশ' বছরে উপন্যাসের মর্যাদা কাব্য ও নাটকের মর্যাদাকে কিছুটা ম্লান করেছে, একথা বললে খুব অন্যায় বোধ হয় বলা হয় না। কেন এবং কি উপায়ে এই পরিবর্তন সম্ভব হ'লো তা একই সঙ্গে সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীর আলোচনা ও গবেষণার বিষয়।

এই একশ' সোয়াশ' বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে উপন্যাসের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি ধরা পড়েছে; আমাদের কালেও নতুন নতুন রূপ ও প্রকৃতি দেখা দিচ্ছে। সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে, মানুষের জ্ঞান, শক্তি, স্বপ্ন ও কল্পনার পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব রূপ ও প্রকৃতির আরও বৈচিত্র্য আমরা দেখবো, এ-আশা করা অন্যায় নয়।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলিতে সার্থক উপন্যাস কি কি রচিত হয়েছে, কারা কারা রচনা করেছেন, তাদের রূপ কি, প্রকৃতি কি, ধর্ম কি, জীবনদর্শন কি, কলাকৌশল কি, তার একটা মোটামুটি হিসেব নেবার চেষ্টা নানা দেশে নানা ভাষায় নানা ভাবে চলেছে। বিভিন্ন সাহিত্যে উপন্যাসের ইতিহাস কিছু কিছু লেখা হয়েছে, বিশেষভাবে পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত উপন্যাস সম্বন্ধে। তা ছাড়া, সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন জাতীয়-সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসের আলোচনা অনেকখানি জায়গা দখল করে থাকে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও এই লক্ষণ ধরা পড়েছে, এবং কিছু কিছু সার্থক রচনাও হয়েছে উপন্যাস সম্বন্ধে। শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নেই।

কালের নিঃস্বতম এবং নিপুণতম লেখকদের কালানুক্রমিক পরিচয় দিয়েছি, তাঁদের রচনাকর্মের যথাসম্ভব ধারাবাহিক আলোচনা করেছি। ছোট বড় কোন ঔপন্যাসিক ও গল্পকারকে প্রায় বাদ দিই নি। দেশের বিশেষ সামাজিক প্রতিবেশকে প্রয়োজনানুযায়ী পরিপ্রেক্ষিত দিতে ভুলি নি, সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আন্দোলন, জোলা, জয়েস, সার্ত্র-এর বিশেষ তত্ত্ব ও দর্শনকে ব্যাখ্যাত করেছি, তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীদের সৃষ্টিকে সেই আলোকে বিচার করবার চেষ্টা পেয়েছি।

কাব্য, নাটক, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের প্রাধান্যকে কিছু ম্লান ক'রে উপন্যাস এবং গল্প উনবিংশ শতাব্দী থেকে প্রখর হ'তে আরম্ভ করেছে, অমোঘ প্রভাবে মানুষের মনে পেতেছে আসন। কারণ, মানুষ সকল সময় নিজেকে, নিজের পরিবেষ্টনকে দেখতে চায়, যাচাই করতে চায়। সর্বোপরি, মানুষের গল্প শোনার আগ্রহ অসীম। তাই, জীবনের এবং সমাজের সর্বতোসঞ্চারী রূপ ও প্রকৃতি, মনুষ্যমনের জটিলাতিজটিল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি উপন্যাসে যত ফলপ্রসূভাবে সন্নিবিষ্ট হয়, ততটা আর কিছুতে নয়।

বিশ্বের উপন্যাস ও গল্প সম্পর্কে বাঙালী পাঠকদের আগ্রহ ও অনুরাগ বিস্ময়করভাবে বেশি, একথা সর্ববাদীসম্মত। সুবেদী বাঙালী পাঠকদের সচেতন মন বিশ্ব কথাসাহিত্যের সর্বাধুনিক চিন্তাপ্রণালী এবং সাহিত্যব্যবস্থা থেকে স'রে থাকে না, আশ্চর্য তন্ময়তায় ঘিরে থকে। তাই আজ বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে, নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার ভাবনার পরিগমে বৈচিত্র্যের রং লেগেছে। আমি বাঙালী পাঠকদের শ্রদ্ধা করি।

বেশ কিছুকাল ধ'রে আমার মনে হচ্ছিল যে, বিশ্ব কথাসাহিত্য সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নেই, অথচ তার প্রয়োজন আছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সরোজ আচার্য এবং দু'একজন তরুণ কবি ও লেখক বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যশিল্পী সম্পর্কে আধুনিককালে খণ্ড খণ্ডভাবে আলোচনা করেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টাকে আমি গ্রাহ্য করেছি, মান্য করেছি। বাকী সকলের প্রয়াস আমার কাছে হতাশাজনক ব'লে মনে হয়েছে। বাংলা ভাষায়, ইংরাজী, ফরাসী, রুশ ও আমেরিকার কথাসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং কথাশিল্পীদের কালানুক্রমিক পর্যালোচনা বোধ হয় এই প্রথম হলো, আমার এই গ্রন্থে। এটুকু কৃতিত্ব দাবী করলে হয়ত অন্যায় হবে না।

ইংরাজী কথাসাহিত্যের আলোচনায় সাধারণত সমারসেট মম পর্যন্ত এসেই থেমে যান অনেকে, কেউ কেউ লরেন্স, ফর্স্টার, গ্রাহাম গ্রীন, বেট্সকে মম-এর সংগে একাসনে বসিয়ে, এঁরাও মম-এর মতো ভাল গল্প লিখেছেন ব'লে দায় সেরে দেন। আমি আধুনিক কালের প্রত্যেককে (প্রিস্টলে, ক্রোনিন, ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্ড, জয়েস কেরী, গ্রাহাম গ্রীন, এইচ. ই. বেট্স, রেবেকা ওয়েস্ট, জন ব্রেইন, কিংসলি এমিস, নিগেল ডেনিস ইত্যাদি) স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছি, তাঁদের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনের পরিচয় দিয়েছি এবং একথা বলতে চেষ্টা করেছি যে, এইসব আধুনিক, স্বল্প-নাম মশালচীদের ক্ষমতা লরেন্স ইত্যাদির মতো উচ্চাশ্রয়ী না হলেও, তাঁদের কালোপযোগী গুরুত্ব আছে, যে গুরুত্ব সংক্ষিপ্ত হলেও সংগত।

ক্রান্স চিরকালই মহৎ ভাবনার পৃষ্ঠভূমি। আমি ফরাসী কথাসাহিত্য আরম্ভ করেছি ক্রেতিয়ঁ্যা দ্য ত্রোয়া থেকে, তারপর ফ্রাঁসোয়াঁ রাবেলের কথা বলেছি, ইতালীয় রেনেসাঁস-এর রূপ যাঁর একক প্রত্যভিজ্ঞায় ফরাসী সমাজ ও সাহিত্যকে উজ্জীবিত করেছিল। স্তাঁদাল, ব্যালজাক, ভিক্তর উগো (গোড়ায় গোড়ায় অজ্ঞানতাবশত 'হুগো' লিখেছি) ফ্লবের, মোপাসাঁ, জোলা প্রভৃতি বহু পরিচিতদের আলোচনা তো হয়েছেই, উপরন্তু ভারতীয় ভাষায় অদ্যাবধি যে-সকল স্বল্পখ্যাত ফরাসী কথাশিল্পীদের নাম কোনরকমেই উচ্চারিত হয় নি, তাঁদের কথাও যথাসম্ভব শ্রদ্ধার সংগে আলোচনা করেছি। ছলনার আশ্রয় না নিয়ে পরিষ্কার বলা ভাল যে, এঁদের অনেকের রচনাকর্মের সংগেই হয়ত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, তবু একটি বৃহৎ দেশের ঐতিহ্যময় সাহিত্যের সম্পূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করতে গেলে, এ ধরনের তথ্যাহরণেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে আমার মনে হয়েছিল। আর, বর্তমান কালের রমঁ্যা গারি, আঁরি ত্রয়া, আঁদ্রে শোয়ার্জ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ব'লে আমি শুনি নি।

রুশ কথাসাহিত্যের পর্যালোচনায় সাধারণত আমরা তলস্তয়, তুর্গেনিভ দস্তয়ভ্‌স্কি এবং আধুনিককালের ইলিয়া এরেনবুর্গ ও পাস্টেরনাক পর্যন্ত অগ্রসর হয়েই ক্ষান্ত থাকি। এই গ্রন্থে রুশ কথাসাহিত্যের ও কথাশিল্পীদের মোটামুটি সম্পূর্ণ একটি চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। হয়ত এই সব সাহিত্যশিল্পীরা স্বদেশের সীমানায় থেকেই পরিতৃপ্ত হতে চান, কিন্তু আজকের রাশিয়াকে বিশদভাবে জানতে গেলে এঁদের সংগে পরিচিত না হ'য়ে উপায় নেই। কেননা এঁরা

কেউ কেউ দেশের শক্তি, কেউবা সচল বিদ্রোহ। রুশ কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পেলেও ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর বিংশ শতাব্দীতে তার ক্রমিক বিবর্তন ও পরিবর্তন কৌতূহলের সংগে লক্ষ্যণীয় হওয়া উচিত।

আর, আমার ধারণা আমেরিকার কথাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আধুনিককালে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ফেনীমোর কুপার বলেছিলেন, The Americans have been placed, as respects moral and intellectual advancement, different from all other infant nations. They have never been without the wants of civilization, nor have they ever been without the means of a supply. এই সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমিক উদ্‌বর্তন বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যে কয়েকটি ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিক এবং বহু ছোটগল্পকারের প্রতিভাকে সংযোজিত করতে পেরেছে। আমি বলতে চাই, অপরাপর দেশের মতো আমেরিকার কথাসাহিত্যে পরাক্রান্ত একক শক্তির স্ফুরণ হয়ত খুব বেশি হয়নি, কিন্তু অনেক সৎ, ক্ষমতাসম্পন্ন ও জীবন-সন্ধানী কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের মিলিত শক্তির সৃষ্টির গুরুত্বকে আজ আর অবহেলা করা চলে না। তাই, আমেরিকার দিকে আগ্রহের দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতে হয়ই, যেখানে ষ্টিফেন ক্রেন, ফ্র্যাঙ্ক নরিস, ডীন হাওয়েল্‌স, ড্রেজার, ডস পাসজ, এডিথ হোআর্টন, উইলা ক্যাথার, শরুড অ্যাণ্ডার্সন, রিং লার্ডনার, ক্যাথারিন অ্যান পোর্টার, স্কট ফিট্‌জেরাল্ড, টমাস উল্‌ফ, হাওয়ার্ড ফাস্ট, আলেকজাণ্ডার স্যাক্সটন, ডরোথী পার্কার, আলবার্ট ম্যাল্‌ৎজ-এর মতো বিচিত্র প্রতিভার মিছিলকে দেখতে পাব, যাঁদের ক্ষমতা সর্বত্রগামী না হলেও, যাঁদের উপস্থিতি ও সৃষ্টির সংগতিকে কোন অছিলায় অস্বীকার করা যাবে না। আধুনিক কালের নির্বেদ্যতা, জটিল মানসিকতা, জৈবনিক সংকট তাঁদের রচনায় আন্তরিকতার সংগে ধৃত হয়েছে। বোধ হয় বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থে প্রথম তাঁদের সম্পর্কে সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক আলোকপাত ঘটল।

আমার অযোগ্যতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সজাগ। তাই, আমারই অনবধানতায় এবং অমনোযোগিতায় এই বইয়ে প্রচুর ত্রুটি, বিচ্যুতি (প্রথমারম্ভেই 'রস বৈ সঃ' আছে ওটা পড়তে হবে 'রসো বৈ সঃ' তা ছাড়া ৮৭ পৃষ্ঠায় কল্ডওয়েলের বদলে কডওয়েল হবে, এমনি আছে আরো।) বানান ভুল, উচ্চারণ-দোষ, মুদ্রণ-প্রমাদ ইত্যাদি থেকে গেল, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

পাঠ্যবস্তুতেও কিছু কিছু তত্ত্ব ও তথ্যের বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নয়। তবে, ভবিষ্যতে আরো কোন যোগ্য ব্যক্তি আমার চেয়েও যোগ্যতর কৌশলে এর উন্নতিসাধন করবেন, এই যা ভরসার কথা! পাঠকরা যদি আমার এই বই পড়ে মুল গ্রন্থগুলি ও লেখকবর্গ সম্পর্কে আগ্রহপ্রকাশ করেন, তবে জানব, পাঠকমনের 'অন্ধকার মহলে এই অস্থায়ী প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে'ও আমার কিছু ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে। বইয়ের পরিশিষ্টাংশে চারটি দেশের জগদ্বিখ্যাত কথাশিল্পীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও একটি ক'রে কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রয়োজন-মত নিজে কিছু শব্দ চয়ন করেছি; পরিভাষা রচনা করেছি। বইটির এই খণ্ড যদি বাংলাদেশের সামান্যতম উপকারে লেগেছে বুঝি, তবেই দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যান্য দেশ ও ভারতবর্ষের কথাসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার পরিকল্পনাকে বিস্তৃত করব।

বইটিকে প্রকাশের আলোকে আনার জন্য অনেকের শ্রম ও সাহচর্য প্রয়োজন হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণস্বীকারের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি।

শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপুর্ণ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন এবং যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। শ্রীপিয়ের ফালোঁ এস. জে. তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে ফরাসী কথাসাহিত্যের বানান-বিধিতে যাথার্থ্য আনার চেষ্টায় যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছেন। তবু যা ভুল থেকে গেছে, তা আমারই অজ্ঞতাজনিত। শ্রীইন্দ্রানী রায়ও ফরাসী উচ্চারণ-প্রথা সম্পর্কে আমাকে সজাগ হতে সাহায্য করেছেন। শ্রীফালোঁ ফরাসী কথাসাহিত্যের ওপর একটি স্বতন্ত্র, ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা ক'রে দিয়েছেন। যদিও সেটি শুনিয়েছে প্রায় প্রশস্তির মতো। আমি তার যোগ্য অধিকারী কিনা জানি না, তবে এতে তাঁর মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, বাগীশ্বর ঝা আমাকে অনেকগুলি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই দিয়ে সহায়তা করেছেন। প্রসাদ সিংহ এ-বই সম্পর্কে উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন এবং রবি বসু যত্ন ও শ্রম সহকারে প্রুফ দেখে দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গিরীন্দ্র সিংহ বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে না চাইলে অনেকদিন আগেই আমার ইচ্ছার অপমৃত্যু ঘটত।

বিনীত

অসিত গুপ্ত

বিষয়-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনুবন্ধ

'রস বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি'

—উপনিষদ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টন বাছাই করে নেয় নি। সে তার পড়ে-পাওয়া ধন। কিন্তু সংগে আছে মানুষের মন; সে এতে খুশি হয় না। সে চায় মনের-মতোকে। মানুষ আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের মতোকে অনেক সাধনায় বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের মতোর ধারাকে দেশে দেশে মানুষ নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদত্ত পাওনার চেয়ে এর মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। সে সম্পূর্ণরূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি; তাই আপনার সৃষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বরাবর সে অর্জন করে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই-যে তার মনের মতো রূপ, এরই মূর্তি নিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়, আপনাকে চেনে। বড়ো বড়ো মহাকাব্যে মহানাটকে মানুষ আপনার পরিচয় সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে, আপনাকে অতিক্রম করে আপনার তৃপ্তির বিষয় খুঁজেছে। সেই তার শিল্প, তার সাহিত্য'।

এই তো গেল একদিক। সাহিত্য কী—এই বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতর দিক। কিন্তু যদি ঈষৎ স্থূলাকারে বিবেচনা করা হয়, যদি সাহিত্যের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করা যায়, তাহলে বলতে হবে আমরা প্রতিদিনই কোন না কোন ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছি; হয়ত তেমন কুশলী শিল্পীর মত নয়, তবু আমাদের প্রাত্যহিক কথায়, নানাবিধ লেখায় অহরহ যে-মনের ভাব ব্যক্ত হয়, তাকেও একরকমের 'সাহিত্য' বলা যায়।

ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের সাহিত্যের এই বিস্তৃততর সংজ্ঞাটি তাঁর 'Le Bourgeous Gentilhomme' নাটকে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সংগে পরিস্ফুট করেছেন। তাতে দেখান হয়েছে মসিয়েঁ জোয়ারদেঁ এক মধ্যবিত্ত সচ্চরিত্র ও সদাশয় মানুষ। তিনি নিজেকে এবং নিজের গোটা পরিবারকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার মহান চেষ্টায় ব্যাপৃত। একদিন তাঁর একজন শিক্ষক হেঁকে বললেন, ওহে বলতো, গদ্য ও পদ্যের মধ্যে তফাৎ কি? মসিয়েঁ জোয়ারদেঁ অত্যন্ত বিস্ময় মানলেন। কারণ, তিনি যে যাবজ্জীবন গদ্য বলে এসেছেন এই বিচিত্র সত্যটি তিনি জানতেন না।

ভাবলে এমনতর বিস্ময় আমাদেরও ঘটে। আমাদের দৈনন্দিন বাক্যালাপের আড়ালে আড়ালে কত যে গদ্যের খেলা আর পদ্যের লীলা অবিরাম ধ্বনিত, ছন্দিত হয়ে চলেছে তার হিসেব হয়ত আমরা রাখি না, তবু সেই অমনোযোগী মুহূর্তের ভাবনার ক্ষণ-বিদ্যুৎগুলির এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক-মূল্য আছে। কারণ যে-ভাবনা ভাষায় অনূদিত হয়ে বাক্য হয়েছে, তার পেছনে আছে অনুভব। আর এই অনুভবই সাহিত্যের প্রধান কথা।

এই অনুভবের ঐশ্বর্য মানুষের সহজাত; কেবল কারো পুঁজি কম, কারো বেশি। এ এমন একটা আয়ত্তাতীত বস্তু যা শুধুমাত্র ঘর্মাক্ত পরিশ্রমে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করে তোলা যায় না, এমন কি এর লভ্য রাস্তা 'ন মেধয়া, ন বহু শ্রুতেন'। অনুভূতির সংগে বুদ্ধির যথার্থ দেহ-বিনিময় হওয়া দরকার, কারণ শুধু অনুভূতির একক কোন ভূমিকা নেই; বুদ্ধির মধ্যে তরল হওয়াতেই তার সার্থকতা। আর তাতেই জ্ঞানের জন্ম।

সভ্যতার অভ্যুত্থানে মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শকে নিজের অনুভূতি আর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে আস্বাদন করতে পেরেছে, যেদিন প্রকৃতির আকাশ আর ধরিত্রীর সৌন্দর্য তার প্রাণে প্রাণে নানা রঙীন কল্পনার বাঁশী বাজিয়েছে, সেদিনই মানুষ প্রথম সৃষ্টির উল্লাস বোধ করেছে। ভাবনার পাখীরা সজোরে ডানা ঝাপটে হৃদয়রাজ্যের বাইরে প্রকাশের পথ খুঁজেছে। আর তখুনি শিল্পজ্ঞানের উন্মেষ মানুষের চেতনাকে এক অনির্বচনীয় আনন্দের অমৃত রসধারায় স্নান করিয়েছে।

বোধহয়, নিওলিথিক যুগেরও আগে থেকে মানুষ লেখার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। তখন লেখার তো কোন অন্য উপায় ছিল না; এক আঁকা ছাড়া!

আঁকার মধ্যে দিয়েই মনের ভাব প্রকাশ করত মানুষ। তাই, প্রথম সাহিত্যের জন্ম মানুষের মনে; কোন বিশেষ সাহিত্যিকের সহায়তায় বা কৃতিত্বে নয়। মনুষ্য সম্প্রদায়েই তার উদ্ভব।

এই আঁকার মধ্যে দিয়ে লেখা-লেখা-খেলার প্রথম প্রচেষ্টা খোদিত হয়েছিল আজিলীয় পাথরের বুকে। সেদিনকার মানুষ আঁকা বা লেখার উপাদান সংগ্রহ করত তাদের জীবনের দৈনন্দিন দৃশ্য থেকে। অনাড়ম্বর আয়োজনে তারা শিকার করা কিংবা প্রাত্যহিক কোন বিশেষ ঘটনার চিত্রবর্ণনা দিত।

তারপর উৎক্রান্তির কাল এল এবং সুমেরীয় দেশে চিত্রবর্ণনার রূপবদল হলো। সেখানকার মানুষ মাটির গায়ে ছড়ি দিয়ে দাগ কেটে কেটে রচনাকার্য চালাত। কিন্তু তাতে অভিলষিত ফল পাওয়া যেত না, যে-সব চরিত্রের চিত্র তারা ছড়ির খোঁচায় আঁকতে চাইত, তাদের অত্যন্ত হতাশ করে সেগুলি ভিন্ন চেহারা নিত। মিশর এদিক থেকে খানিকটা উন্নত অবস্থার নতুন ঢেউ তুলল। মিশরবাসীরা দেওয়ালের গায়ে এবং পাপিরাসের পাতায় লিখে অনেকাংশে সফল হলো তাদের মনের যথাযথ ভাবপ্রকাশে। আর কে না জানে, ওই পাপিরাসের শরীর থেকে একদিন কাগজের সৃষ্টি হলো, যে-কাগজ প্রশস্ত সভ্যতায় উত্তীর্ণ করে মানুষের চোখের সামনে জ্ঞানের এক নতুন সূর্যতোরণ উন্মোচিত করল।

কিন্তু সুমেরীয় রচনাপদ্ধতিকে বাতিলযোগ্য অবহেলা করার ক্ষমতা কারো নেই। কেননা সুমেরীয় 'cuneiform' আর মিশরীয় 'hieroglyphic'কে ঢালা-ওপর করে, মিলিয়ে-মিশিয়ে সৃষ্টির কর্মশালায় উত্তরকালে যে নতুন রসের ভিয়েন চড়েছিল তার থেকেই জগতের সব অক্ষরের জন্ম। কিন্তু চৈনিকরা কোনদিনই আক্ষরিক পর্যায়ে পৌছতে পারল না, 'চিত্রিত লেখা'র প্রভাব আজও তাদের অভিভূত করে রেখেছে।

ইউরোপের কোথাও কুত্রাপি এক ফোঁটা কাগজ ছিল না। কাগজ আবিষ্কারের দুর্লভ কৃতিত্ব চীনাদের। আর আরবরা চীনাদের কাছ থেকে পাঠগ্রহণান্তে সেই প্রস্তুত-পদ্ধতিটি চালু করে পাশ্চাত্যজগতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে।

কাগজ সাধারণ্যে প্রচলিত হবার আগে চামড়ার ব্যবহার ছিল, যার উন্নত ও সুসংস্কৃত রূপ 'পার্চমেণ্ট' নামটি আমরা সকলে জ্ঞাত আছি। চামড়ার গায়ে ইহুদীরা তাদের গোটা ধর্মপুস্তক এমন কি 'Old Testament' পর্যন্ত মুদ্রিত,

করেছে। আর গ্রীক, লাতিনের যাবতীয় রচনাবশেষ এবং চৌদ্দ শতকের খৃষ্টীয় রচনাদিকে সুরক্ষিত রেখেছে ওই পার্চমেণ্ট।

১৪৫০ অব্দে মুদ্রণের প্রথম প্রচলন হলো। মানুষী চিন্তা অক্ষয় স্থায়িত্বে কালের আসরে আপন স্থান করে নেবার দুর্লভ সুযোগ পেল। মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাস জোহান গুটেনবার্গ নামে এক জর্মন ব্যক্তির কাছে চিরকালের দাসখত লিখে দিল, কেননা জর্মন দেশের কোন এক টিমটিমে নগরের নড়বড়ে ছাপাখানায় উদ্গীরিত ধোঁয়া কালির কুয়াসা ভেদ করে সেদিন যে ম্লান আলোর শিখাটি দপদপিয়ে উঠেছিল, কালক্রমে, প্রায় অর্ধশতাব্দীর স্বল্প সময়েই সেই আলো দ্বিগুণ প্রাখর্যে ইতালী থেকে হল্যাণ্ডের প্রত্যন্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর প্রথম ইংরাজ মুদ্রকরূপে দেখা দিলেন উইলিয়াম ক্যাক্সটন, ১৪৭৬ অব্দে ওয়েস্ট মিনিস্টারে তাঁর ছাপাখানার পত্তন হলো।

মুদ্রণ শিল্প প্রবর্তনের পর থেকে ভাবনার প্রসার যত বৃদ্ধি পেয়েছে, বইয়ের সংখ্যা যত বেড়েছে, মানুষ তত পৃথিবীর প্রতি গভীর মমতায় ঝুঁকে পড়েছে। অসম্ভব দ্রুত গতিতে যুগের চেহারা পাল্টে গেছে। কেননা, যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপর্যাসে যখন শহরের পর শহর পতিত হয়েছে, গোলা-বারুদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে দিকবিদিক ; যখন যুদ্ধের সমারোহময় রাজকীয় রঙটি ফিকে মেরে কেবলমাত্র এক উলঙ্গ বণিকী প্রতীতিতে প্রতিভাত হয়েছে, তখন সেই ধ্বংস-স্তূপের ওপর নতুন জীবন-অন্বেষায় দাঁড়িয়ে প্রাক-রেনেসাঁস যুগের মানুষরা হৃত-সময় ও সমারোহকে খুঁজতে চেয়েছে বইয়ের পাতায়, তলোয়ারের চমৎকারকে বর্ণনার রোমাঞ্চে নিজের মধ্যে অনুভব করে শিহরিত হতে চেয়েছে। এবং কলম্বাসের নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের পর থেকে যেই জগতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কাঠামোটির পরিবর্তন ঘটল, অমনি তার সুস্পষ্ট প্রভাব এসে পড়ল লেখকদের ওপর। তাঁরা দেখলেন তাঁদের কল্পনার পৃথিবীটি আর ছোট নয়। কত বিস্ময়কর কৌতূহলে জগৎটা হঠাৎ যেন বিস্তৃত হয়ে গেছে। অনেক প্রশ্ন জমা হয়েছিল তাঁদের মনে। সেই সপ্রশ্ন অনুসন্ধিৎসা তাঁদের রচনাকে বাস্তবনিষ্ঠ করল। জীবনকে চিরে চিরে তার রহস্য উদ্ঘাটন করে তাঁদের সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করতে চাইলেন তাঁরা। মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। পার্থিব ক্লেদ, কলহ, গ্লানি হানাহানির মধ্যেও এক সুন্দর সজ্ঞান নিখিল সাহিত্যরূপে, শিল্পরূপে মানুষের চিদ্বৃত্তিকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করতে লাগল। মানুষ উপলব্ধি করল সকল জাগতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা

মহাশূন্যতা খাঁ খাঁ করছে। সে শূন্যতা তাদের মনে, তাদের আত্মিক অনুৎকর্ষতায়। বাঁচতে গেলে মূঢ়তার অবলোপ চাই, চাই একটা বিশ্বস্ত অবলম্বন। সে অবলম্বন কিসে আসে? জ্ঞানের আলোয়। চিন্তার বিনিময়ে। অনেক, অনেক পরে পৃথিবীর এক তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি বলেছিলেন, 'For me not to understand means to perish.'

নতুন আলোকবর্তিকাটি প্রথম জ্বালল ইতালী। রোমক সভ্যতার অবশেষ ইতালী অঙ্গে ধারণ করে ছিল। নগরে, প্রাসাদে প্রায়-জাগরণের একটা দ্যুতি ছড়িয়ে ছিল, তার ওপর পলাতক গ্রীক শিক্ষাগুরুরা ইতালীতে এসে অনেক আগেই অধ্যাপনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। যদিও আমরা জানি জগতের সবচেয়ে প্রাচীন এবং মহান সভ্যতা একদা এসিয়াকে আশ্রয় করেই জীবিত হয়েছিল—চীন, জাপান, ভারত এবং মিশর। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে চীনের মহাজ্ঞানী তাপস কনফুসিয়স এই পৃথিবীতে বাস করে গেছেন এবং অজ্ঞানের সেই তমিস্রকালে তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, 'when you know to know that you know, and when you do not know, to know you do not know—that is true knowledge.'

গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসের মতো চীনায় যেমন কনফুসিয়স, তেমনি ভারতে গৌতম বুদ্ধ চিন্তায়, চেতনায় মানুষের আত্মাকে অন্যতর, উন্নততর পথ দেখিয়েছেন। তিনি হয়ত লেখক ছিলেন না, ছিলেন প্রচারক ও সংস্কারক। কিন্তু সমগ্র এসিয়ায় তাঁর জীবন ও বাণী লেখার ও লেখকের আধেয় হয়েছে। ভারতের প্রাচীন ও চিরায়ত সাহিত্যকর্ম যেমন 'ঋগ্বেদ-সংহিতা', 'উপনিষদ' (এতদ্ব্যতীত পঞ্চতন্ত্র ও দশকুমার চরিত প্রাচীন ভারতীয় গদ্য রোমান্স-এর আশ্চর্য নিদর্শন)। জাপানেও তেমনি ধ্রুব সাহিত্য ছিল, যদিও তা চীন রচনা থেকে আহৃত কিন্তু অষ্টম শতকে জাপানী গীতিকাব্য চরমোৎকর্ষে উন্নীত হতে পেরেছিল এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা জাপানী সাহিত্যে কখনো ইওরোপের ছোঁয়াচ তার জাত মেরে দিতে পারে নি।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম। চৌদ্দ ও পনের শতকে পশ্চিমের জানলায় যে নতুন কচি রোদ এসে পড়েছিল তার উৎস ছিল ইতালী। এক অসাধারণ সর্বতোমুখী পারঙ্গমতা ইতালীর সেই নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সাধ্যে, শক্তিতে, সৌকর্যে প্রাতিস্বিক প্রতিভার প্রকাশে এমন নৈপুণ্য আর কোথাও কদাচ ঘটেছে কি না সন্দেহ।

কাব্যের গগনে উদয় হলেন পেত্রার্ক এবং কথাসাহিত্যে বোকাসিও। ইতালীর গদ্যের প্রথম মহাশিল্পী। পেত্রার্ক ছিলেন দান্তের যুগকনিষ্ঠ। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই তিনি যে প্রচণ্ড জনস্বীকৃতি পেয়েছিলেন তা দান্তেকে ছাপিয়ে গিয়েছিল এবং রোমে তাঁকে পোয়েট লরিয়েটের দুর্লভ সম্মান দেওয়া হয়েছিল।

মানবতার সর্বগুণবিভূতিসম্পন্ন বোকাসিও ছিলেন অধ্যয়নে উৎসাহী। কালের হিসেব নিকেশে তাঁর 'ডেকামেরন'কে আজ হয়ত আমরা তেমনি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচায়ক রূপে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি দিতে পারব না। হয়ত মনে হবে তার অনেকটা শুধুই Elective affinity কিন্তু কৌতুক থেকে শুরু করে স্নিগ্ধ হৃদয়াবেগের সেই সুললিত বর্ণনাভংগী সেদিনকার ইওরোপে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এমন কি পরে ইংরাজ কবি চসার ও কীটস সেই রচনা থেকে বহুল পরিমাণে অনুপ্রাণিত হবার দুর্বলতাকে এড়াতে পারেন নি। 'The Decameron is the intelligent mans caricature of things and people of lower intellectual level than himself.'

তা ছাড়া বোকাসিওর পাণ্ডিত্য এবং সমাজ সচেতনতা তাঁকে গ্রীক ভাষা শিক্ষায় এবং বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির ঐশ্বর্য সন্ধানে ব্যাপৃত রেখেছিল। তিনি দান্তের জীবন নিয়ে এক সুবিন্যস্ত রচনাও ফাঁদতে ভোলেন নি।

১৫৭২-এর গ্রীষ্মের একদিন ইতালীতে রাজনৈতিক ঝড় উঠল। সম্রাট পঞ্চম চার্লসের একদল সৈন্য পেটের জ্বালায় বিদ্রোহ করে রোমে হানা দিয়ে শহরের অবাধ ধ্বংস লীলায় উন্মত্ত হলো। তারা হৃদয়ের অনুশাসন মানল না, বিচার-বিবেচনাকে পাশব প্রবৃত্তিতে পরিবর্তিত করে অবাধে লুঠপাট চালাল, অক্লেশে অত্যাচার করল নারীদের ওপর, তারপর সব কিছুকে ছাপিয়ে দেবতার অভিশাপ প্লেগের মূর্তি নিয়ে চড়াও হলো সেই বিক্ষিপ্ত, অত্যাচারিত শহরে। জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে অর্ধেকে দাঁড়াল। কিন্তু মেডিসি, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং মাইকেল অ্যাঞ্জেলো প্রবর্তিত রেনেসাঁস-এর রূপ সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল অটল সত্যে। অ্যাঞ্জেলোর প্রতিভা শুধু রেখাকে ছুঁয়ে ফিরে আসে নি, লেখার কৌশলকেও তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন অসাধারণ শৈল্পিক চেতনায়। কিন্তু ইতালীয় রেনেসাঁস-এর কথা বলতে গিয়ে যুগের প্রবক্তা, প্রথম সত্যকার রাজনীতিসচেতন রচনাকার নিক্কালো মাকিয়াভেলীর কথা বিস্মৃত হবার উপায় নেই। কারণ ভণ্ডামীকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানবিক কারণে সৎ-রাজনীতিকে তিনিই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সেই অধ্যয়ন-অধ্যুষিত

সচ্চিন্তা তিনি রচনায় রূপ দিয়ে কল্যাণকর সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি কোন ইউটোপিয়ার সন্ধানে ফেরেন নি। তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তানায়ক পিকো ডেলা মিরানদোলা যেমন Dignity of man সম্পর্কে যুগমানসকে সজাগ করতে চেয়েছিলেন, মাকিয়াভেলীও তেমনি শান্তি ও সংহতি ছাড়া আর কিছু প্রচার করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর দীর্ঘকালের চতুর রাজনীতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে ভিতরের বহু অজানিত তথ্যকে নিজের তত্ত্বের সংগে মিলিত করে 'দি প্রিন্স' নামে যে বিখ্যাত বইটি তিনি সাহিত্যের ভোজে পরিবেষণ করেছিলেন তাতে তাঁর সুচিন্তিত অধ্যয়ন, সুগভীর মনন এবং জীবনবীক্ষা মানুষের কানে দৈববাণীর মতো উচ্চারিত হয়েছে।

'Beauty is truth' এ তত্ত্বটি আমরা বারংবার শোনার অবকাশ পেয়েছি। আমাদের উপনিষদেও একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি'। অর্থাৎ কিনা এই প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু প্রকাশমান, বিরাজমান তারই ভিতর আছে আনন্দের রূপামৃত। আর আনন্দের সংগে সৌন্দর্যের তফাৎ করা শক্ত। কারণ, সৌন্দর্য হচ্ছে সেই আয়াসলভ্য সোনার সুতো, যার দ্বারা জাগতিক বস্তুনিচয়ের সংগে অনবরত একটা নিগূঢ় বুনুনির কাজ চলেছে। মানুষ যখন তার ইন্দ্রিয় সজাগ ক'রে, বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে সেই পদার্থপুঞ্জের অন্বেষণ করে তখনই প্রহেলিকা অতিবর্তিত হয়ে সৌন্দর্য প্রযতভাবে বেরিয়ে আসে। তখন এই বিপুলা পৃথ্বীতে আমরা আনন্দরূপামৃতের স্পর্শ পেয়ে তৃপ্ত হই, পুলকিত হই। কিন্তু সৌন্দর্যবোধের মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট ভাগাভাগি আছে। লোচনগ্রাহী ক্ষণিক যে সৌন্দর্য তাকে আমরা ইদানীং বিশেষ আমল দিচ্ছি না, কারণ বিবেচনার সহায়তায় এটুকু বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, চূড়ান্ত এবং সর্বশেষ সৌন্দর্যটির দিকে ঘা মেরে মেরে আমাদের রুচিকে ধাবিত করতে গেলে অত পল্‌কা সুন্দরে আকৃষ্ট হওয়া চলবে না। আমাদের চোখ, কান এবং মনকে আরো তীক্ষ্ণ করতে হবে। আর এই-যে সর্বশেষ সৌন্দর্যের জন্যে অভিযানের প্রস্তুতি তা-ই মানুষকে ক্রমাগত সত্যের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। শিল্পের ধর্মটিও তাই। শিল্পের চূড়ান্ত কাম্য সত্য। সত্যকার শিল্পী তার সচেতন মনের অনুমান ও অনুভব দ্বারা অবচেতন এক আনন্দলোকের সদর দরজাটি খুলে দেবে বিভ্রান্তিকর রকমারীর মধ্যে মাত্র একটি বস্তুকে বেছে নিয়ে। তার জন্য প্রয়োজন বিচ্ছিন্নতা আর নির্লিপ্তি, টি. এস. এলিয়ট যাকে বলেছেন

de-personalization। সত্য বলে যদি কোন নিরেট বস্তুরূপকে আমরা আমাদের আয়ত্তে না পাই, তাহলেও ওই চিন্তার ঘর্ষণে ঘর্ষণে রকমারী জিনিসের ভীড় থেকে একটির সহযোগে আরেকটি আলাদা করে বেছে নেবার যে প্রয়াস তা-ই একদিন শিল্পীর কাছে, সাহিত্যিকের কাছে সৌন্দর্যের সত্য বলে প্রতিভাত হয়। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সম্পূর্ণ অন্য কারণে নিম্নোধৃত উক্তিটি করেছিলেন তবু এতে একটির সহযোগে আরেকটি এবং সর্বশেষে চূড়ান্ত জিনিসটি পাবার বিশ্বাসের ছবি চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে :

"নবা অরে পুত্রণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়ো ভবন্তি
আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়ো ভবন্তি
নবা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি"

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ : দ্বিতীয় অধ্যায় : চতুর্থ ব্রাহ্মণ ॥

অর্থাৎ আমরা পুত্র কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয় নয়, আসলে, আত্মাকে চাই, তাই পুত্র প্রিয় মনে হয় আমাদের কাছে। বিত্তকে প্রার্থনা করি বলেই বিত্ত প্রিয় নয়, আত্মাকে প্রার্থনা করি বলেই বিত্ত প্রিয় ঠেকে।

সত্য ও সৌন্দর্যকে উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যাত করার জন্য আমাদের কাছে জগতের মহা মহা ব্যক্তিদের বাছাই করা বহু উক্তি আছে কিন্তু তার সাহায্য না-নিয়েও শুধু রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারি, 'সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি—জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে। তাকেই বলি বাস্তব। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব, রামচন্দ্র যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন তাঁর চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব —যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে অগ্নিশর্মা হয়ে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত'।

কিন্তু আজকের এই ভয়ংকর উত্তপ্ত যুগে ঘন ঘন পরিবর্তমান রীতিনীতি আর তন্ত্রের সংঘাতে বহু সনাতন বিশ্বাস যেমন হারিয়ে যাচ্ছে তেমনি সাহিত্য-শিল্পের আসরে সেই সনাতনী বিশ্বাসের আলোটিও নিভু নিভু হয়ে আসছে। ফ্যাসিজম, কম্যুনিজম, ক্যাপিটালিজম-এর লড়াই বিশ্বের তাবৎ শক্তিধরদের যুদ্ধং দেহী ভাব আর বাক্যের ধোঁয়া ও অস্ত্রের হুমকী—এই সার্বিক অস্থিরতা মানুষকে শ্বাসরোধকর সন্ত্রাসে আজ প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করছে। বিচলিত চিন্তানায়ক ও সাহিত্যশিল্পীরা সবিশ্বাসে যতটুকু অগ্রসর হতে

পারছেন, মনুষ্যত্বের বন্দনা গান গাইছেন, ততটুকুতে আজ আনন্দের ও আলোকের ভোজ হয়ত সম্পূর্ণ নয়, তবু যথালাভ বলে আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকছে না। কেননা অতিতর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং যুগবিবর্তনের চেহারা সাহিত্যে প্রবর্তনা সত্ত্বেও 'ধ্রুব সাহিত্যের জীবন্মুক্তি' আমরা আর তেমন করে শুনতে পাচ্ছি না। তাই, 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' হওয়া সত্ত্বেও 'অ্যানা কারেনিনা' হচ্ছে না।

দেশ ও সমাজের উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে সাহিত্যরুচিরও পরিবর্তন ঘটা উচিত। যদিও সাহিত্য কালের ছায়ানুসারী হলে যথার্থ ধর্মরক্ষা হয় বটে কিন্তু তদবস্থায় পাঠককে ততখানি সচেতন ও ওয়াকিবহাল হবার যোগ্যতা পেতে হয়। ধরুন, আজকের আধুনিক কথাসাহিত্যে stream of consciousness বা 'চেতনাপ্রবাহ' যে ভূমিকা নিচ্ছে তার সম্পর্কে পাঠকমহল অতিমাত্রায় সজাগ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন না হলে একালীন কথাসাহিত্যের আসল রসটুকু মাঠে মারা যায়। প্রুস্ত, মান, জয়েস, সার্ত্র, উল্‌ফ কি কাফকার ভিন্নতর চিন্তা-চৈতন্যকে অনুধাবন করার mental competence বা মানসিক উপযুক্ততা যদি পাঠকের না থাকে তাহলে বেনা বনে মুক্তো ছড়ানোর সামিল হবে এই বিশ্বের কথা-সাহিত্য।

কথাসাহিত্যের একালীন যে জগৎব্যাপী বিপুল জনপ্রিয়তা তার সূচনা বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে। সাধারণত, উপন্যাস এবং কাহিনীর দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতা আছে। এক মানুষকে সে আনন্দ দেয়, আরেক শিক্ষা দেয় ;—তাকে চালনা করে। 'There is first the literature of knowledge and secondly, the literature of power. The function of the first is—to teach ; the function of the second is—to move ; the first is a rudder, the second an oar or a sail (De. Quiensy). সাহিত্য এবং শিল্পে এই 'পাওয়ার' ও 'নলেজ'-এর দ্বন্দ্ব চিরকালীন। স্রষ্টা তার সৃষ্টির সংগে আপসে রফা করবে, দাতা গ্রহীতার চাহিদায় অবতরণ করবে অথবা গ্রহীতা দাতাকে অভ্যর্থনা করতে আরোহিত হবে—এই মতদ্বৈধতা শিল্প-সাহিত্যের সনাতন ঠাণ্ডা লড়াই। যুগ ও জীবনের রঙ যত বদলাচ্ছে, শিল্প ও সাহিত্য তত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, জটিলাতিজটিল রূপ পরিগ্রহ করছে। ফলে রুচির ঠাণ্ডা লড়াই ধীরে ধীরে উত্তপ্ত আকার নিচ্ছে। আধুনিক কথাসাহিত্যের যাঁরা উজ্জ্বলতম ভাস্কর, তাঁদের লেখা কেবলমাত্র অবসর

বিনোদনের জন্য, আরামকেদারায় হেলান দিয়ে কিংবা ঘটনায় গা ভাসিয়ে উপভোগ করার অবকাশ আর নেই। এখন পাঠককেও লেখকের সংগে সংগে পরিশ্রম করতে হয়—বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে অন্তর্নিহিত রসকে খুঁজে বার করে তবে তাতে অবগাহন করার সুযোগ মেলে। কিন্তু তাই বলে এমন উন্নাসিক অহংকারিতাও কারো হৃদয়ে পোষিত হওয়া উচিত নয় যে, 'বরং আমি একজন ভালো লোককে খুশি করব কিন্তু অনেক খারাপ লোককে নয়' : 'Bono Probari malo quam multis malis'। কারণ তাতে সাহিত্য বা শিল্পের মূল উদ্দেশ্যটিই অক্ষুণ্ণ থাকে না। বহুর মধ্যে এক হওয়াতেই সাহিত্য এবং শিল্পের চরম সার্থকতা ; স্বার্থপরতায় শ্রেষ্ঠ আর্টেরও মুক্তি নেই। ইদানীংকালের সাহিত্য যে বহুকে তার আসরে তেমন করে নিমন্ত্রণ পাঠাতে পারছে না, তার হেতু দর্শিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, 'জীবনে চিন্তার বিষয় সর্বদা উদ্গত হয়ে উঠবেই। অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা হোক, তবু সাহিত্যের মূল নীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রসসম্ভোগের যে নিয়ম আছে তা মানুষের নিত্যস্বভাবের অন্তর্গত'।…'কিন্তু তাতে (আধুনিক সাহিত্যে) শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ, এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়'।

কাব্য ও কথাসাহিত্যে এই দানবিক ও মানবিক ভার ও ভাবসংঘাতের পালা শেষ হয়নি আজো ; বরং উত্তরোত্তর তা জটিলতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে আরো। ফলে, পাঠ এবং পাঠকের মাঝে রুচির সেতুটি ঘোরতর অনিশ্চয়তায় দুলে দুলে উঠছে ; প্রতি মুহূর্তে একটি চরমাবস্থার সংকটকে প্রকট ক'রে।

ইদানীন্তন পৃথিবীতে কথাসাহিত্যের তাৎপর্য অনেক। তাকে কোনমতেই অলস কল্পনাবিলাসে খাটো করে রাখা চলে না। এ সম্পর্কে Burghum-এর অবলোকিত অভিমত হচ্ছে, 'It is not only the single literary form to compete for popularity with the film and the radio ; it is the only one in which, by consensus of critical opinion, a great deal of distinguished work is being produced. The number of good novelists today is certainly larger than that of good dramatists or poets. The publication of novel by Thomas Mann or John Steinbeck arouses the same sort of

response as was awakned as the Restorations by a new comedy of Dryden or Congreve or in the Victorian period|by a new volume of Tennyson's poems. It is an important cultural event. Poetry, which had been for over twenty five centuries the most significant literary form is of negligible public interest today. The present century may be in error in rejecting so august a tradition, but the facts are clear. Fiction has obviously superseded poetry as the literary form of greatest prestige'.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইংরাজী কথাসাহিত্য

Wherever God erects a house of prayer
The Devil always builds a chapel there
And 'twill be found, upon examination,
The latter has the largest congregation.

—DANIEL DEFOE. The True-Born Englishman

ইংরাজী সাহিত্যের আদ্যপর্বে আছে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস (৬৫০-১৬৬০)। তারপর আধুনিক কাল (১৬৬০-১৯৫০) আরম্ভ। নর্ম্যান অভিযানের আগেই জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল এই সত্যকে ইদানীং প্রতিষ্ঠা দেবার আয়োজন হয়েছে। আগে অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্যের সংগে ইংরাজী সাহিত্যের পার্থক্যকে স্পষ্ট করার প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু আধুনিক সমালোচকরা তথাকথিত আদিমতাকে আর আলাদা অংশাবরণ দিতে চাইছেন না, এখন ইংরাজী সাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস অবিভাজ্য-রূপই উন্মোচিত করে। 'কবে ইংরাজী সাহিত্যের সূচনা ?' এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক মনীষিরা নির্দ্বিধায় বলে থাকেন: it begins with the first verse sung, the first line written in Germanic tongue in the country now called England (Legouis and Cazamian).

আর, ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের শুরু বেয়ডার (৬৭৩-৭৩৫) আগমনে। তখনকার প্রায়াজ্ঞানাচ্ছন্ন পৃথিবীতে বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ের যে-স্বল্প উপকরণ সুলভ ছিল তাই দিয়ে তিনি এক বৃহৎ রচনাকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর সেই Ecclesiastical History ব্যতীত সেদিনকার নাবালক ইংলণ্ডের পক্ষে পাঠের আরাম পাওয়ার আর কোন ভাল উপাদান ছিল না।

ড্যানিয়েল ডেফো (১৬৬০-১৭৩১) ইংরাজী ধ্রুব সাহিত্যের অন্যতম উদ্গাতা, মধ্যবিত্ত সমাজের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। ইংরাজী কথাসাহিত্যের নির্জন অরণ্যভূমিতে প্রথম দুঃসাহসী অভিযাত্রী। তাঁর পদসঞ্চারে একটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের বিস্ময় সূচিত হয়েছে—কথাসাহিত্যের মহাদেশ। তিনিই প্রথম সফল রচয়িতা যাঁর মধ্যে একটি পরিশীলিত শিল্পী-মানসের সন্ধান পাওয়া যায়। চসারের আগে (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চসারকে ভাবী ঔপন্যাসিকের জ্ঞাতি ও পূর্বপুরুষ মনে করেছেন—বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা [২য় সং]) কাব্য যেমন অনুদ্দিষ্ট অবস্থার অনুল্লেখযোগ্যতা জ্ঞাপন করে, কথাসাহিত্যেও তেমনি ডেফোর আগে যে-সব প্রচেষ্টা চলেছে, তা অনায়াসেই হিসাবের মধ্যে না-আনা চলে। তাঁর আবির্ভাবের সংগে সংগেই বোধহয় ইংলণ্ডের ক্লাসিক্যাল যুগ আরম্ভ হয়েছে। মধ্যবিত্তরা সমাজে সসম্মানে উদিত হচ্ছেন। বুর্জোয়া পরিবারের আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলীন না হলেও অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে! মধ্যবিত্তরা আর ধার-করা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির গ্লানিকে বহন করতে পারছিলেন না। নিজেদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে চাইছিলেন তাঁরা। সেই যুগসন্ধিক্ষণে ডেফোর আবির্ভাব এবং ওই মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিই, প্রত্যক্ষভাবে না-হোক পরোক্ষভাবে উত্তরকালের রোমান্টিকতাকে রোমাঞ্চিত করেছিল। ডেফো ব্যক্তিগত জীবনে যে-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, সেই মধ্যবিত্ত সমাজের নবীন ক্ষমতা ও সজীবতা তাঁর মধ্যে ছিল, ছিল বিভিন্ন পেশায় চংক্রমনের বিপুল অভিজ্ঞতা—কিন্তু স্বকীয়তাকে তিনি তেমন করে আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর মধ্যে একটি ক্ষমতার অকস্মাৎ-নিঃশেষ-সীমা টানা ছিল। কিন্তু তিনিই প্রথম বাস্তব-শিল্পী। তাঁর অধিকাংশ রচনার পশ্চাৎপট সত্যাশ্রিত। আপন জীবনের চংক্রমিত অভিজ্ঞতার আন্তরিকতাকে উপকরণ করে তিনি লণ্ডনের শহরতলীতে বসে একদিন কাগজের বুকে কালি দিয়ে অক্ষর সাজাতে লাগলেন—যাতে শ্রম রইল, শিল্পও ছিল। তিনি যেমন শত শত পাণ্ডুলিপিতে সাংবাদিকতা করেছেন, কবিতা লিখেছেন, ইতিহাস রচনা করেছেন, রচনা করেছেন নিবন্ধ ও প্যামফ্লেট, তেমনি ঘন ঘন রাজনৈতিক মতবাদের অদলবদলে বারংবার বিভ্রান্ত করেছেন হুইগ ও টোরীদের, শেষ পর্যন্ত নিজেও কারাবাসের শাস্তি পেয়েছেন।

আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক-এর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা অবলম্বিত ডেফোর রবিনসন ক্রুশো (১৭১৯) সর্বকালের সর্বমানসিকতার আশ্চর্য উপভোগ্য রসবস্তু। রবিনসন ক্রুশোর বীরত্ব, সাহসিকতা, তার রোমাঞ্চময় একাকীত্ব উৎসাহী পাঠকদের এক

সবিশ্বাস কল্পজগতের সন্নিকৃষ্ট করে। লেখকের স্মৃতি রোমন্থনের পিছু পিছু পাঠকও প্রবিষ্ট হয় রবিনসন ক্রুশোর সেই অদ্ভুত পৃথিবীতে—তার চারপাশের বিস্ময়কর ঘটনা ও প্রতিবেশে আস্থাস্থাপন না-করে আর উপায় থাকে না। শিল্পী হিসাবে ডেফোর প্রতিভা এখানেই সাফল্যকে স্পর্শ করে। যদিচ: 'His very limitations as a man and a writer—his narrow outlook, lack of poetry and humour prosy moralising' (J. B. Priestley) ইত্যাদি দুর্বলতা আছে। 'রবিনসন ক্রুশো'র পরে ডেফো এ 'জার্নাল অফ দি প্লেগ ইয়ার' (১৭২২) এবং 'মল ফ্ল্যাণ্ডার্স' (১৭২২) নামে দুটি রচনা লিখেছিলেন। কোনটিই রবিনসন ক্রুশোর জনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করতে পারে নি। তবে ওই রচনা দুটিতেও তাঁর কল্পনাকৌলিন্য এবং বর্ণনা বৈচিত্র্যের অনটন নেই। ডেফোর কল্পনা কোনদিন বাস্তবতার সত্যকে লঙ্ঘন করে নি। বাস্তবতা তাঁর সাহিত্যের যন্ত্র, তাঁর মন্ত্র। প্লেগের সময় তিনি নেহাৎ-ই ছোট ছিলেন, কিন্তু 'জার্নাল অফ দি প্লেগ ইয়ার'-এ তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মন কোন সময় অসতর্ক শৈথিল্যে সরে যায় নি। আশ্চর্য বিশদতায় একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে প্রকট করেছে। 'There is a writer in Defoe since there is a vigorous mind that sees and knows to picture up its visions by means of words'.

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য কাব্যের চেয়ে কথাসাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়েছিল বেশি। কারণ, এই সময় চারজন কথাসাহিত্যিক ডেফো, সুইফট, এডিসন, বার্কলে একসংগে উদয় হয়েছিলেন। বিশেষ করে প্রথম দুজনের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাঁদেরই রচনার সেতু বেয়ে এলিজাবেথীয় যুগের অল্প অল্প গল্প একদিন রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং-এর সম্পূর্ণ উপন্যাসের পরিণতিতে পৌঁছতে পারল।

জোনাথন সুইফট (১৬৬৭-১৭৪৫) কলাকৈবল্যের সাধনায় ধ্রুপদী শিল্পীর মতো ক্ল্যাসিক্যাল যুগের ইংরাজী সাহিত্যকে একটি নিশ্চিত প্রভা দিয়েছেন। তিরিশ বছর বয়স থেকে তিনি সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন যদিচ 'গালিভার্স ট্রাভেলস' (১৭২৬) রচনা করার আগে পর্যন্ত তেমন কৌতূহলে পঠিত বা পরিচিত হন নি তিনি। ব্যক্তিগত জীবনের অরুন্তুদ ক্ষোভ ও সন্তাপ তাঁকে অত্যন্ত অস্থিরমতি করে তুলেছিল। লেখা পড়লেও বোঝা যায় যে, সুইফট

আপন চিত্তে ও চরিত্রে পরিপূর্ণভাবে ধরা দিয়েছেন। বোঝা যায়, এক অন্তর্মুখী, অভিমানী, যন্ত্রণাকাতর মানুষ পৃথিবীর প্রতি ভীষণ নির্মমতায়, প্রচণ্ড উষ্মা ও অসন্তোষের আড়ালে নিজের সস্নেহ ও সহৃদয় প্রকৃতিকে দিয়েছেন চিরতরে নির্বাসন। কিন্তু প্রতিটি দুঃখ, যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা বিন্দুতে বিন্দুতে তাঁর চরিত্রে বলিষ্ঠতা জমা করেছে। সুইফট্-এর প্রতিভা নিঃসন্দেহে স্ফীত ছিল, এত স্ফীত যে রোমান্টিকতার প্রসাদকণিকাও তাঁর রচনায় আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়। মনকে তিনি তীক্ষ্ণ করেছিলেন এবং চিন্তার গোপনতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশপ্রার্থনা করার উপরিকতাও ছিল তাঁর। নিরন্তর ঝড়ের সংগে বাস করেও একটি সংহত ও সংযত অভিনিবেশ তিনি পেয়েছিলেন—প্রক্ষোভ তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলেও তাঁকে অবশ করতে পারে নি সহজে ; এবং তা সবসময়েই বুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে। মানুষকে তিনি তার কার্যকলাপে বিচার করেছেন, তার চতুস্পার্শ্বস্থ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে—আর জীবন সম্বন্ধে তাঁর রায় প্রায়ই নীতি ও মনস্তত্ত্বের ধারা আশ্রয় করেছে। আধুনিকতায় তিনি বিশেষ আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি, তাই তাঁকে অস্তাচলের পানে তাকিয়েই পূর্বাচলের গান গাইতে হয়েছে—আধুনিক যুগ, তাঁর মতে এমন ঐশ্বর্য কিছু সংযোজিত করেনি যা প্রাচীন মহিমময়তাকে তুচ্ছ করতে পারে। আর তাঁর জ্ঞানবাদ প্রকৃতপক্ষে সন্দেহবাদেরই নামান্তর ('The moderns according to him, have added nothing which really matters to the sound reasoning of the concients. His rational criticism of knowledge has no positive counterpart ; it tends to scepticims')। 'গালিভার্স ট্রাভেলস' যেন মানুষের বোধ ও অনুভূতিতে একটি প্রবল প্রভঞ্জন। শ্লেষাত্মক বাস্তবতায়, হয়ত তেমন পরিপুষ্ট নয় এমন এক অস্পষ্ট দর্শনে, সজীব প্রযত্নে তিনি মানুষকে একটি রোমাঞ্চকর শক্তির মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। লিলিপুট ও ব্রবডিগনাগের ঘটনা-সংস্থাপন ইংলণ্ড ও ইওরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। ডেফোর রচনাপ্রকৃতির কিছু প্রভাব হয়ত পড়েছিল সুইফট-এর এই লেখায় কিন্তু 'গালিভার্স ট্রাভেলস' এমনিতেই মহৎ রচনার লক্ষণযুক্ত। সুইফট নিজেই বৃদ্ধবয়সে তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'what a genius I had when I wrote that book' 'দি জার্নাল অফ স্টেলা' (১৭২৮) পত্রাকার ঘটনাবিবরণ—সুইফট-এর উল্লেখযোগ্য রচনা। বইটিতে তাঁর বহুতর মনোভাবনা স্নিগ্ধভাবে ও সুবিন্যস্তাকারে বিবৃত

হয়েছে। তিনি যে-মহিলাকে ভালবেসেছিলেন, বিয়েও করেছিলেন, অথচ যাঁর সংগে জীবনযাপন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি, বইটি তাঁরই উদ্দেশ্যে সম্বোধিত। সুইফট-এর মৃত্যু আসে অত্যন্ত করুণ পথ ধরে, করুণাধারায় নয়। নিঃসঙ্গ নির্যাতিত বদ্ধোন্মাদ সুইফট নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মারা যান। লেখক হিসাবে সুইফটকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর উদয় ও অস্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে তাঁর পরিক্রমার বৈচিত্র্যটুকু। 'If one remembers the extent of Swift's work, the ease with which it passes from the most naive exposition to the pseudo-epic style, from the weightiest discussion to the freest pleasantry, the fact that the parts of his correspondence which were the most hastily dashed off are still astonishingly spirited and immediately, inevitably clear, one will the better gauge the greatness of the writer.'

সামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১) ইংরাজী কথাসাহিত্যে প্রথম যৌবন নিয়ে এলেন। একটি উন্মুখর মেলায় তারুণ্যের রঙে অনেক রমনীয় ছবির ভীড় জমালেন তিনি। তাঁর আবির্ভাব সমসাময়িক ইওরোপীয় সাহিত্যে একটা স্পষ্ট ছাপ রেখে দিল। উপন্যাসে সেন্টিমেণ্ট-এর তখন প্রথম উদ্‌বোধ হচ্ছে—জর্মনী, ফ্রান্স সেই অনাস্বাদিত নতুন রসের অপেক্ষায় বসে। রিচার্ডসন এলেন,—তাঁর অব্যক্তিক বিষয়বস্তুর বাস্তবতা নিয়ে তিনি প্রথমেই মহিলা-মহলে প্রবেশ করলেন, তারপর আস্তে আস্তে তাঁর অনতিক্রম্য মোহ বিস্তার করলেন দেশ থেকে দেশান্তরে—সবার মনে। রিচার্ডসন-এর প্রায় সংগে সংগেই ইংরাজী কথা-সাহিত্যের আসরে আর দু'জন শিল্পী প্রবেশ করেছিলেন, ফিল্ডিং ও স্টার্নি। এর মধ্যে বয়োগরিষ্ঠ রিচার্ডসনকে ইংরাজী কথাসাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে নিসংশয়ে। তাঁর 'ক্লারিসা' (১৭৪৮) এক নারী-মনের নিগূঢ় বেদনার আবেগাভিভূত কাহিনী। একটি সরল মেয়েকে অভিযুক্ত করার এই পত্রাকার ঘটনা-বিবরণ ইংরেজী কথাসাহিত্যের প্রথম নিবিষ্ট মনোহরণ—মনোহরণ অথচ প্রথম বয়স্ক-চিন্তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তখন আস্তে আস্তে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ছিল, পাঠকরা উপন্যাসে ডুবে গিয়ে নতুনতর বিচিত্র আনন্দ-আহরণে ব্যস্ত হবার মানসিক-উপযোগ্যতা পেয়েছিলেন। তাই 'ক্লারিসা' প্রকাশিত

হবার সংগে সংগেই ইউরোপের তাবৎ নারীদের চোখ দিয়ে দরদর ধারায় কান্না বিগলিত হতে লাগল। 'ক্লারিসা'র যন্ত্রণা সবাই নিজজ্ঞানে আপন অন্তরে স্থান দিয়েছিল। রিচার্ডসনের প্রথম উপন্যাস 'পামেলা' বেরিয়েছিল ১৭৪১ সালে; পোপ তখন বেঁচে। 'পামেলা'র মূল বিষয়বস্তু তিনি এক পরিচারিকার মুখে শুনেছিলেন। পরিচারিকাটি যে বাড়িতে চাকরী করত, সে-বাড়ির প্রভু তাকে প্রলুব্ধ করতে চাওয়ায় সে কীভাবে নিজেকে সেই প্রভুরূপী শয়তানের কবলমুক্ত করতে পেরেছিল, তারই কাহিনী তিনি নিপুণভাবে আবেগের আবরণে ঢেকে পরিবেশন করেছিলেন। মহিলাদের আসরে 'পামেলা'র সক্রন্দন স্বীকৃতি রিচার্ডসনকে প্রথম কথাসাহিত্যিক হবার অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস হচ্ছে 'চার্লস গ্র্যাণ্ডিসন' (১৭৫৩-৫৪)। রিচার্ডসনের লেখার অনুরক্ত হয়েছিলেন ফরাসী কথাসাহিত্যিকরাও। তাঁরা রিচার্ডসনকে শুধু অনুবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, দিদেরো তো মহাসমাদরে তাঁর রচনাকে আপন গ্রন্থাগারে তাকে হোমার এবং ইউরিপাইডিসের পাশে স্থান দিতে প্রস্তুত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'Take care not to open these enchanting books, if you have any duties to fulfil', আর স্যু মুসসে 'ক্লারিসা' পড়ে বলেছিলেন 'le premier du monde'. এই যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা রিচার্ডসন আয়ত্ত করেছিলেন, বিশেষ করে মহিলাদের স্তুতি, তার পেছনে কি কৌশল লীলায়িত হয়েছিল! আসলে তখনকার যে যুগ তাতে উপন্যাসে বুদ্ধি বা মনন প্রত্যাশিত ছিল না, যদিও তখন সমাজের চেহারা পাল্টাচ্ছিল, নিও ক্লাসিসিজ্‌ম-এর আবির্ভাবকে বরণ করতে সাজ সাজ রব পড়েছিল সাহিত্যে, হুইগ ও টোরী দলের উদ্ভবে মানুষের রাজনৈতিক চেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু পড়ুয়ারা তখনো কেবলমাত্র ঘটনার ঘনঘটায় হতবাক হওয়া ছাড়া আর কোন অবস্থায় উন্নীত হতে পারতেন না; শয়তানের শাস্তি এবং প্রেমিকের জয়ে উল্লাসবোধ করা ছাড়া সূক্ষ্ম ও যুক্তিলব্ধ রসবোধকে পৃষ্ঠপোষকতা করার মন ও রুচিকে তখনো তাঁরা অর্জন করতে পারেন নি। আর রিচার্ডসন ছিলেন ওই গল্প বলার এবং গল্প বাছার এক ধুরন্ধর কারিগর। তাই সাফল্য তাঁকে সহজেই ধরা দিয়েছিল। ডেফোর মতো রিচার্ডসনকেও মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি বলতে পারা যায় আর তিনিই ইংলণ্ডে ও অন্য মহাদেশে 'Novel of sentiment'এর প্রথম প্রবক্তা।

কথাসাহিত্যের জগতে রিচার্ডসন উদ্ধত হবার সময় সময়েই হেনরি ফিল্ডিং

(১৭০৭-৫৪) আরো ব্যাপক ক্ষমতায় উদ্ভত হচ্ছিলেন। চরিত্রে, এবং রচনাভংগীতে রিচার্ডসনের সংগে তাঁর কোনই মিল ছিল না, একমাত্র মিল জাতে দু'জনেই কথাসাহিত্যিক। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর মতো শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত মানুষ (যিনি ব্যবহারিক জীবনে দক্ষ আইনজীবি ছিলেন) খুব বেশি সুলভ ছিল না। তিনিই প্রথম কথাশিল্পী যাঁকে বোধহয় কোন এক বিশেষ কালের বলে চিহ্নিত করে সরিয়ে রাখা যায় না, সময়ের পরিমাপকে তিনি অপনীত করতে পেরেছিলেন। ফিল্ডিং তাঁর স্বল্প জীবনকালের মধ্যে বহুতর পেশায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এমন কি আইন পড়ার পরও তাঁকে মঞ্চে উদ্যমী হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি সেই নেশায় এবং পেশায় তাঁর টিঁকে থাকা হয়নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জোসেফ এণ্ড্রুজ' ১৭৪২ সালে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৭৪৮-এ ম্যাজিস্ট্রেট হবার পর 'হিস্ট্রি অফ টম জোন্স' (১৭৪৯) ও 'অ্যামেলিয়া' (১৭৫২) বেরোবার ঠিক মুখে-মুখেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। ফিল্ডিং-ই ইংরাজী উপন্যাসকে একটা সুবিন্যস্ত রূপ ও আকার দিতে পেরেছিলেন, তাছাড়া তাঁর রচনায় পৌরুষদীপ্ত প্রজ্ঞা পরিস্ফুট হয়েছিল, যা রিচার্ডসনে ছিল না। রিচার্ডসন তাঁর লেখায় রমনীমোহন ভাবালুতা আমদানি করেছিলেন, কিন্তু ফিল্ডিং অত্যন্ত দার্ঢ্য ভাষায় সহৃদয়ে ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীতে তদানীন্তন জীবনকে অক্ষরে অক্ষরে সাজাতে চেয়েছিলেন। বায়রণ তাঁকে 'the Prose Homer of human nature' বলে সাধুবাদ জানান। 'টম জোন্স' পড়ে থ্যাকারে বলেছিলেন, 'Since the author of 'Tom Jones' was buried, no writer of fiction among us has been permitted to depict to his utmost power a 'MAN'. পরে কবি কোলরিজ নিদ্বিধায় ঘোষণা করেন যে, 'টম জোন্স' হচ্ছে 'one of the three most perfect plots ever planned'.

১৭৪৯ সালে ফিল্ডিং-এর সমকালীন কথাসাহিত্যিক টোবিয়াম জর্জ স্মলেট (১৭২১-৭১) 'রডেরিক র‍্যাণ্ডম' নামে যে উপন্যাস লিখলেন তা অবশ্য অবশ্যই ফিল্ডিং-এর সমকক্ষতা দাবী করতে পারল না, কেননা স্মলেট স্রষ্টা হিসেবে এবং স্রষ্টা হিসেবে ফিল্ডিং অপেক্ষা বহুলাংশে নিকৃষ্ট ছিলেন। স্মলেট জীবনের সত্যকে তাঁর লেখায় কোনদিন স্পর্শ করতে পারেন নি, প্রকৃতির উদাত্ততাকে তিনি নিছক পরিহাসে পর্যবসিত করেছিলেন। তিনি ফরাসী 'Gil Blas'-এর উদ্যমী অনুবাদক।

ডেফো, সুইফট, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং-এর উত্তরসূরী লরেন্স স্টার্নে ১৭১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ইংরেজ সেনাদলের পদস্থ কর্মচারী। হ্যালিফ্যাক্স ও কেমব্রিজ-এ শিক্ষা শেষ করে স্টার্নে কিছুদিন ধর্মযাজকের জীবন যাপন করেছিলেন, সেইসময় (১৭৬০-৬৭) তিনি ন'টি খণ্ডে 'ট্রিস্টাম শ্যাণ্ডি' লেখেন। বইটিতে বাহ্যতঃ কোন গল্প ছিল না—সমস্ত কাহিনীটি যেন মানুষের মতো এক বিরাট গোলকধাঁধায় পরিক্রমিত হয়েছে এবং তার কৌতুক ক্রমশঃ আরো জটিলাকারে, কুয়াশায়, ধাঁধায় বিলীন হয়ে গেছে। তবু চরিত্র-রচনায়, নির্মল হাস্যরসসৃষ্টিতে এবং সংযত সংবেগে তিনি এমন পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন যা একটি যুগের অবক্ষয়ে নতুন প্রাণপ্রবাহ আনায় প্রচেষ্টিত হয়েছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে আত্মমুখ উদ্‌গতি, নিজস্বতা এবং ঋজু বর্ণনা পরবর্তী কালের 'পরেও এক গভীর গুরুত্বময় প্রভাব ফেলেছিল। স্টার্নের অপর রচনা 'সেন্টিমেণ্টাল জার্নি' ১৭৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। ঠিক সেই বছরেই লণ্ডনে তিনি মারা যান। মৃত্যুটি তাঁর বন্ধুবিহীন এবং বন্ধুর। দরিদ্র, হৃতশ্রী এক আবাসে প্রায় কপর্দকশূন্য স্টার্নে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর শবানুগামী কেউ ছিল না, তাঁর এক পুস্তক বিক্রেতা (তখন প্রকাশককেই পুস্তক বিক্রেতা বলা হত) ছাড়া।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বুদ্ধিদীপ্তির কিরণে উদ্‌ভাসিত ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের (১৭০৯-৮৪) আবির্ভাব চিন্তার জগতে এক স্মরণীয় পদচিহ্ন। তিনি তাঁর উচ্চমনীষা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দিয়ে যুগের ভাবনাকে লেখায় প্রসারিত ও প্রভাবিত করতে পারতেন কিন্তু রচনার শিল্প তেমন করে আয়ত্ত করতে পারেন নি তিনি। তাই তাঁর একটিমাত্র উপন্যাস এবং প্রথম ডিডাকটিক রচনার লক্ষণযুক্ত 'রাসেলাজ' (১৭৫৯) সেকালের অনতিসজাগ সাহিত্যসমাজে খ্যাতি পেলেও একালের দর্পণে কোন উল্লেখযোগ্য ছায়া ফেলে না। আসলে তিনি ছিলেন সমালোচক।

১৭৬৬ সালে গোল্ডস্মিথ (১৭২৭-১৭৭৪) সার্থক কথাসাহিত্যশিল্পীর বহুতর সম্ভাবনা নিয়ে 'দি ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড' রচনা করেছিলেন। দেশজ মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম, জীবনকে তিনি জীবিত করতে চেয়েছিলেন মৃদু, শান্ত ও idyllic বর্ণনাভংগীতে এবং তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু পঠিত ও বহু আলোচিত

কথাসাহিত্যকার। সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার এমন উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা 'রবিনসন ক্রুশো'র পর আর নজরে আসে নি। গ্যোতে তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উচ্চারণে বলেছিলেন, 'lofty and benevolent irony, that fair and indulgent view of all infirmities and faults.'

১৭৮৯ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লব (French revolution) যে ঝড় তুলেছিল তার ফলাফল পৃথিবীর চেহারায় পরিবর্তন এনেছিল অনেক। কথা-সাহিত্যও সেই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পায়নি। উপন্যাস, গল্পের নিস্তরঙ্গ নদীতে হঠাৎ বৈচিত্র্যের ঢেউ উঠল। ফিল্ডিং স্টার্নের পরে আস্তে আস্তে বিশীর্ণ হচ্ছিল উপন্যাসের যে ধারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণচাঞ্চল্যে চিন্তাচেতনা ও বহুমুখী জীবনস্রোতে সেই উপন্যাস, কথাসাহিত্য দ্বিগুণ ব্যস্ততায় ও সজীবতায় আবার নতুন মন্ত্রে ও তন্ত্রে উজ্জীবিত হলো। কথাসাহিত্যের আকাশে নতুন নতুন 'তারা'রা মেঘমুক্তি ঘটিয়ে, অপ্রকাশের তিমির ঘুচিয়ে আলোকে উদ্‌ভাসিত হলেন। কিন্তু অপরদিকে ১৭৫০-এর অনতিপর থেকেই উপন্যাসের আরেকটি ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। যে ধারা পরে গিয়ে মিশেছিল স্কটের সমুদ্রে। মধ্যবিত্ত যুগের ধ্বংসাবশেষ নানারকম রোমহর্ষক বিবরণে, অলৌকিক আবরণে স্থান পেত এইসব উপন্যাসে। তার নাম গথিক উপন্যাস। হোরেস ওয়ালপোলের 'দি কাস্‌ল অফ ওত্রাণ্টো'-ই বোধহয় এই জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১৮১৪ সালে ওয়াল্টার স্কট-এর 'ওয়েভারলে' নতুন আলোকপাতের প্রথম দুর্লভ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। তার আগে একজন মহিলার আইরিশ গল্প লেখা কিংবা আরেক মহিলা মিসেস র‍্যাডক্লিফের রোমান্টিক উপন্যাস লেখা ইত্যাদির বিক্ষিপ্ত প্রয়াস বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

ফরাসী বিপ্লবের সংগে সংগে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্র ও যুগ-অবক্ষয়কে স্যার ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) সোৎসাহে লক্ষ্য করেছিলেন এবং ১৮১৫ সালের ইংলণ্ডে রাজনীতি ও বুদ্ধির জগতে যা পরিবর্তন সাধিত হলো তা-ও তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত হয়নি। কিন্তু তিনি নিজের কাব্যচিন্তায় সেই পুরনো দিনে অনড় রইলেন, যুগের নতুন আয়োজনেও তাঁর ব্যক্তিত্ব এতটুকু নমিত হলো না। কিন্তু কথাসাহিত্যের আসরে তিনি সম্রাট বিশেষ। স্কট ক্রমশঃই বুঝতে পারছিলেন যে, কবিতার রাজ্যে তাঁর দিন শেষ হয়েছে, (যদিও তাঁকে পোএট লরিএটে

ভূষিত করার আয়োজন হয়েছিল এবং তিনি সেটি কবি সাউদের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করেন।) এবার পেশা-বদল করার প্রয়োজন। তাই, বেশ কয়েকবছর আগে যে-গল্পরচনাটির কাজ শুরু করেছিলেন অথচ তারপর কবিতার স্রোতে সেটি হয়েছিল পরিত্যক্ত—সেই অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসটিকে শেষ করার বাসনায় তিনি আবার নতুন করে উদ্যমী হলেন। যাবজ্জীবনে স্কট তিরিশটি উপন্যাস (গ্রন্থগুলি ওয়েভারলে উপন্যাস নামে পরিচিত) লেখার অমানুষিক পরিশ্রমকে স্বীকার করেছিলেন অক্লেশে। বস্তুতঃ অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত দ্রুত লিখিয়ে ছিলেন তিনি। 'গাই ম্যানারিং' (১৮১৫) নামে একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি স্কট মাত্র ছ' সপ্তাহে সেরে ফেলেছিলেন আর রোমিও জুলিয়েট সদৃশ একটি করুণ কাহিনী শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র একপক্ষ। চরিত্রে, জাতে এবং সাহিত্যিক-মূল্যে স্কটের রচনা নানাদিকে বিধৃত, রিফরমেশন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সিভিল স্ট্রাগল পর্যন্ত যে যে অধ্যায়ে তাঁর উপন্যাসগুলি বিচরণের পথ পেয়েছে তাতে তিনি আশ্চর্য বর্ণাঢ্যতা আবিষ্কার করেছেন। মধ্যযুগীয় স্কটল্যাণ্ড তাঁকে অগাধ ঐশ্বর্যে আকর্ষণ করেছে বারংবার। স্কটল্যাণ্ডের বনভূমি, তার প্রকৃতি তাঁর হৃদয়ের প্রসাদে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। যে সময়, যে পরিবেশ কালের অনন্ত আকাশ থেকে নক্ষত্রের মতো খসে গেছে, তাকে তিনি পরম ঔদার্যে আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রসারিত করে আমাদের বিস্মৃতির আবরণ সরিয়ে বিস্ময়কে উদ্রিক্ত করেছেন। উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা তাঁরই হাতে তৈরি, বিগত কাল ও মানুষের পরিসংখ্যানে পরিবৃত হয়ে নয়, অন্তরের স্বাভাবিক মাধুর্য স্ফুটিত হয়েছে তাঁর রচনায়। গ্যোতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে স্কটের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'All is great'.

স্কটের গোড়ার দিককার উপন্যাস 'দি ব্রাইড্ অফ ল্যামারমুর' (১৮১৯) আজ থেকে প্রায় আড়াই শ' বছর আগেকার উইলিয়াম ও মেরীর সময়কালীন পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাসটির উপজীব্য একটি করুণ প্রেম। তরুণী লুসীর প্রথম ভালবাসার অভিজ্ঞতাকে নিদারুণ জেদে ও রোষে বিফল করেছিল তার বাবা-মা। লুসী ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর নির্দেশকে শান্ত চিত্তে মেনে নিতে পারল না। তার নতুন প্রভুর এতটুকু অস্তিত্ব ছিল না তার মনে, ক্ষুব্ধ বিচলিত লুসী তাই একদিন তার স্বামীকে হত্যা করল এবং নিজেকেও এ পৃথিবী থেকে নিঃশেষে সরিয়ে দিয়ে তার প্রেম-ব্যর্থ জীবনের যবনিকা টেনে দিল। প্রথম দিকে স্কটের আরো দুখানি উপন্যাস অতীতের বিলীন দিন ও নানা

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বর্ণনাকে বহন করেছে, রচনা দুটি হলো: 'গাই ম্যানারিং' (১৮১৫) এবং 'ওল্ড মর‍্যালিটি' (১৮১৬)। দ্বিতীয় দিককার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'আইভান হো'র (১৮২০) নাম সর্বাগ্রে স্মর্তব্য। বইটি স্কটকে আজো সারা বিশ্বে জীবিত করে রেখেছে। 'আইভান হো' দ্বাদশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে, প্রথম রিচার্ডের রাজত্বকালের বিচিত্র বর্ণময়তাকে প্রতিফলিত করেছে। ইংরাজী মধ্যযুগের ব্যবহারিক জীবন প্রেম ও রোমাঞ্চে এবং অকৃত্রিম কৌশলে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে যা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট মর্যাদার স্থান অধিকার করে। স্কটের তৃতীয়াংশের উপন্যাস 'কোয়েন্টিন ডারোআর্ড' (১৮২৩) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। একাদশ লুইয়ের ফরাসী সভায় এক স্কচ-তীরন্দাজকে নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। 'দি ট্যালিস্‌মান' (১৮২৫) আবার স্কটের বহুবিধ অভিজ্ঞতার ভিন্ন কাহিনী—অন্য রসাস্বাদের পরিচয় বহন করছে। তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্স পরবর্তীকালের নতুন ক্ষমতা ও সজীবতা সত্ত্বেও উদ্‌বায়িত হয়ে যায়নি বরং তাঁর ধারণাই ধারয়িষ্ণু হয়েছে কথাসাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলনে 'The novel of Scott represents the triumph of Romanticism in the imaginative re-creation of the past, associated with all the diverse emotions which the tragic or comic drama of life can awaken. স্কটের মৃত্যু হলো ১৮৩২ সালে ; আর সেই বছরেই গ্যোতের তিরোভাবের বেদনাকে বহন করল পৃথিবী। স্কটের শেষ দিনগুলো দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে কালো হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তিনি জীবনের সেই সংবর্তকে অসীম সংযমে সহ্য করে প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁর সাহিত্যকর্মের মতো জীবনধর্মও একটা সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত রীতিতে পরিচালিত।

স্কট এবং জেন অস্টেন হচ্ছেন সমকালীন ব্যক্তিত্ব। অস্টেন (১৭৭৫-১৮১৭) ছ'খানি উপন্যাস লেখার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস' (১৮১৩), 'পারসুয়েসন' (১৮১৭) 'সেন্স অ্যাণ্ড সেনসিবিলিটি' (১৮১১), 'ম্যান্সফিল্ড পার্ক' (১৮১৪) তাঁর অন্যতম রচনা। কিন্তু অস্টেন মারা যাবার আগে পর্যন্ত তাঁর লেখা প্রাপ্য সম্মান ও পরিচিতি লাভে বঞ্চিত হয়েছিল। তিনি শহর থেকে দূরে একান্ত নিরিবিলিতে বাস করতেন, তাই তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত বেশি ; তাদের সুখ, দুঃখ, প্রেমের সাবলীলতা আর প্রশান্তি স্নিগ্ধ কৌতুকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্কট এই মহিলা লেখকের সাহিত্যিক-

ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় বলতে পেরেছিলেন, 'That young lady had a talent for describing the involvements, feelings and characters of ordinary life which is to me the most wonderful I have ever met with. The big bow-wow I can do myself like any one going; but the exquisite touch which renders commonplace things and characters interesting from the truth of the description and the sentiment is denied me.'

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাগ্রসরের সংগে সংগে সমাজ-ব্যবস্থা দ্রুত বদলাচ্ছিল, দেশ মার্জিত হচ্ছিল ক্রমে, জনসংখ্যা গতিশীলতা পাচ্ছিল। নীচু তলার মানুষরা উপরতলার সৌভাগ্যের প্রসাদে ছিটে ফোঁটা অংশের স্বাদ পেতে লাগল, জীবনযাত্রায় প্রভূত পরিবর্তন এলো। তাছাড়া ১৮৭৬ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্‌ঘোষণা সারা হলো ভারতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভীষণ তেজে উদ্রিক্ত হলো। এই সর্বগ্রাসী ব্রিটিশ শাসকক্ষমতায় জীবন-ভাষ্যকার সাহিত্যিকরা অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। তবু ভিক্টোরিয়ান যুগ এবং উনবিংশ শতাব্দীই ইংরাজী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

জনপ্রিয়তার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০) ইংরাজী কথাসাহিত্যে অভিনব প্রতিশ্রুতি নিয়ে উদিত হয়েছিলেন। দারিদ্র্য তাঁর জীবনের সংগে নির্মম ভাবে জড়িত ছিল, দুর্ভাগ্যের অভিশাপকে তিনি কোনদিন এড়াতে পারেন নি। বারো বছর বয়সে এক কারখানায় চাকরী করার নিঃসঙ্গ নির্যাতিত দিনগুলোকে তিনি কোনদিন ভুলতে পারেন নি। দারিদ্র্যের ক্রুর মূর্তিকে প্রতিনিয়ত আলিঙ্গন করতে হয়েছে তাঁকে। আর, তাঁর সেই নির্যাতিত অভিজ্ঞতা এবং গোপন বেদনা তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন সাহিত্যে। ডিকেন্স-এর সমস্ত উপন্যাসের ব্যাপ্তি ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত। এবং তাতে তিনি ইংলণ্ডের অন্তঃকরণকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন— কেননা ইঙ্গ-সমাজের বহু চেনা চরিত্ররা, সেই অপরাধীর দল, সেই উকিল আর তথাকথিত ভদ্রলোকরা, সেই ভৃত্য আর শিশুদের মুখ তাঁর রচনায় একান্ত বাস্তব অনুভূতিতে ধৃত হয়েছিল, তাদের এক একটি বিচিত্র পৃথিবী সাধারণের মনে বিস্ময়ের দ্বার খুলে দিয়েছিল। যুগ ও সমাজের যে-চিত্রাংকন তাঁর রচনা-

শৈলীতে সুস্পষ্ট হয়েছে তা যে-কোন সাহিত্যের পক্ষে ঐশ্বর্য-বিশেষ। বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর সচেতন অনুভাব, চরিত্রের সহজ ও সুদৃঢ় বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি লেখকের নিজস্ব অপ্রতিরোধ্য দুর্বার ব্যক্তিত্ব ডিকেন্সের রচনাকে সজীব ও সচল রেখেছে। তিনি নিজের উপন্যাসে তরুণ তরুণীদের জীবন আরম্ভ করেছিলেন শৈশব থেকে—'অলিভার টুইস্ট', 'ডেভিড কপারফিল্ড' তার অন্যতম নিদর্শন। এবং রোমান্টিক আন্দোলনে এই শিশুরাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ত্রুটি এবং সমাজ-ব্যবস্থার গলদের দিকে আঙুল তুলে ডিকেন্স মানবতার প্রবক্তা হতে চেয়েছেন। দীন-দরিদ্র বঞ্চিতের প্রতি কখনো তাঁর সহানুভূতির অভাব হয়নি ; লণ্ডনের আবর্জনাময় নরকের প্রকোষ্ঠে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মানুষ নামক জীবরা চিরকাল বসবাস করেছে। 'No novelist before Dickens had treated the lower middle classes on such broad lines or in so frank a way. He studies them not as a detached superior kind of observer but as one of their own level ; a sympathy, an immediate community of impressions and, as if it were an instinctive fraternity thus impergnate his study.' এতৎসত্ত্বে এবং স্কটের পরে ডিকেন্স জনপ্রিয়তার পদে অভিষিক্ত হলেও বহুক্ষেত্রেই তাঁর শৈল্পিক ক্ষমতা সাংবাদিক প্রবণতায় ব্যাহত হয়েছে। শেক্সপীয়রের মতো তিনি যেমন অনেক কিছু ভাল লিখেছিলেন তেমনি অপকৃষ্টতাও ভারাক্রান্ত করেছে তাঁর সাহিত্যকে। তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি হয়ত শেক্সপীয়রের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে কিন্তু তবু অত্যন্ত সবিনয়ে বলতে হবে, ডিকেন্স ঠিক জীবনের মতো হতে পারেন নি ; বরং জীবন-ই সর্বদা ডিকেন্সের মতো হবার অভ্যাস করেছে। সংবাদপত্রের স্কেচ থেকে চার্লস ডিকেন্স সর্বপ্রথম উপন্যাসে মুক্তি পেয়েছিলেন 'পিকউইক পের্পাস'-এ, উপন্যাসটি ১৮৩৭ সালে প্রকাশ পায়। 'পিকউইক পেপার্স' এক নিরন্ত কৌতুকের নির্ঝর। নিরীহ স্যামুয়েল পিকউইক,—ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা, মহা ফাঁপরে পড়লেন যখন তাঁর গৃহকর্ত্রী মহিলা তাঁর নামে আদালতে নালিশ রুজু করেন। ক্লাবে বিচিত্র সব চরিত্রের সমাবেশে একটানা হাসির ঘটনায় তরঙ্গিত এই উপন্যাসটি উনবিংশ শতাব্দীর এক অনাস্বাদিত পরিমণ্ডল। 'অলিভার টুইস্ট' (১৮৩৭) থেকে ডিকেন্সের সমাজ-সচেতন মন উদ্যমী হতে আরম্ভ করেছে। সমাজের ও

জীবনের উন্নতি বিধান কল্পে তখন থেকেই তাঁর দায়িত্বপুর্ণ ভূমিকায় অবতরণ। এতে তিনি একটি দুর্ভাগ্যপীড়িত শিশুর ভয়ংকর জীবনযাত্রার মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন। আর 'নিকোলাস নিকলেবাই' (১৮৩৯) ইংরাজী স্কুলের দুর্নীতিকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। ডিকেন্সের আরেক শ্রেণীর রচনায় অনন্য সব চরিত্রের শোভাযাত্রা,—একদিকে সমাজের গলদ আরেকদিকে সেই সমাজের জীব মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতাকে তিনি তুলে ধরেছেন নির্দ্বিধায়। 'দি ওল্ড কিউরিওসিটি শপ' (১৮৪০) জুয়াখেলার অভিশাপকে কেন্দ্র করে রচিত অত্যন্ত মনোরম এক কাহিনীর স্বাদ দেয় পাঠককে। তাছাড়া এই উপন্যাসে ছোট্ট মেয়ে নেলের চরিত্রাংকন বিশ্বসাহিত্যের চরিত্রচিত্রশালায় স্থায়ী স্থানলাভ করার যোগ্যতা পেয়েছে। 'গ্রেট এক্সপেকটেসন্স' (১৮৬১) সম্পর্কে অনেকের অভিমত যে, বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় ডিকেন্স এই রচনাতেই নাকি সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন…'Great Expectations is a novel of a strong and sober texture, which takes a place apart from all the rest'. 'ডেভিড কপারফিল্ড' (১৮৫০) ডিকেন্সের সাহিত্যকীর্তির উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর, যদিও চেস্টারটন বলেছেন ডিকেন্সের শেষ জীবনের রচনা 'ব্লিক হাউস'ই (১৮৫২) সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতা পাবার যোগ্য। 'ডেভিড কপারফিল্ড' শুধু যে অগণিত পাঠকের মনোরঞ্জন করার দুর্মর শক্তি অর্জন করেছিল তাই নয়—ইতিপুর্বে ইংরাজী উপন্যাসে এত চরিত্রের ভীড় এবং সমাজ ও পরিবারের এত সুনিপুণ ও বাস্তবসম্মত চিত্রকল্প রচিত হয়নি। ডিকেন্স তাঁর জীবনদ্দশায় পনেরটি পুর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখে গেছেন—বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন ছাঁদের। তাঁর চিন্তা-ঐশ্বর্যের কথা ভাবলে আজো বিস্মিত হতে হয়, বিস্মিত হতে হয় অভিজ্ঞতার কথা ভাবলে এবং তাঁর শ্রান্তিহীন পরিশ্রম সকলের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু। ডিকেন্সের 'এ ক্রিসমাস ক্যারল' (১৮৪০) বিশ্বের সব ইংরাজী জানা মানুষকে যেমন অপার আনন্দ দিয়েছে তেমনি তার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিও ভীষণভাবে পীড়িত করে, কিন্তু লেখকের দুর্নিবার ক্ষমতাকে এড়িয়ে রচনাটি সম্পর্কে উদাসীন থাকাও পাঠকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; ডিকেন্সের মজাই এই। ইতিহাসের ছায়াপথেও পরিভ্রমণ করতে ভোলেন নি ডিকেন্স। 'এ টেল অফ টু সিটিজ' (১৮৫৯) তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ফরাসী বিপ্লবকে মূল পৃষ্ঠভূমি করে এই উপন্যাসটি লিখিত হয়েছিল এবং উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তালাভেও বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু ডিকেন্সের স্বভাব বিচ্যুতি থেকে

অব্যাহতিও পায় নি রচনাটি। ডিকেন্স কার্লাইলের সত্যকে আপনজ্ঞানে প্রতিপালিত করেছিলেন তাই কার্লাইলের ত্রুটিও খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর বহুবিধ ব্যর্থতা ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক ও কাহিনীকার হিসাবে তিনি যা দান করে গিয়েছিলেন, ভিক্টোরিয়ান যুগের কথাসাহিত্য তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে, বিশিষ্টতায় ভূষিত হয়েছে। গাঙ্গ. ই. স্মিথ বলছেন, 'His faults of exaggerated sentimentality an often grotesque humor, and his victorian sense of conventional morality are diminished in favor of his racy clarity of style, his genuine syampathy with the poor underdogs of society, his kindliness and understanding of a common humanity, his depth of imagination, his attention to and appreciation of the simple joys and the common sorrows of his fellow —beings these qualities will cause Dickens to live in the hearts of readers for a long time to come'.

ওই সময়ের আরেকটি সাহিত্য প্রতিভা হলেন থ্যাকারে (১৮১১-৬৩)। যদিও ডিকেন্স এবং থ্যাকারে সমকালের এবং সমধর্মের কিন্তু তবু দুজনের চিন্তাধারা এবং রচনা-পদ্ধতি কি আশ্চর্যরকমের আলাদা! অবশ্য একালের এক মনস্বী সমালোচক সান্তায়ানা বলেছেন, 'It is usual to compare Dickens with Thackeray'. থ্যাকারের বাবা ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী, তাই তাঁর জন্ম হয় এই কলকাতা শহরে ১৮১১ সালে। পিতার মৃত্যু ঘটলে থ্যাকারে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। কেমব্রিজে টেনিসন, ফিটজেরাল্ড-এর সহপাঠী হিসেবে পড়াশোনা করার পর আইন পড়তে যান কিন্তু তাতে সফলতা না-পাওয়ায় কিছুদিন আর্ট পড়েন প্যারিসে এবং সেখানে এক আইরিশ মেয়েকে বিবাহ করেন। বছর চারেকের মধ্যেই স্ত্রীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। থ্যাকারে নিজেও নানা পেশায় পদচারণা করে ব্যর্থ হয়ে ১৮৩৭ সালে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন এবং 'ফ্রেজারস ম্যাগাজিন' ও 'পাঞ্চ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শুরু করে কিছু প্রতিষ্ঠা পাবার পর তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস 'ভ্যানিটি ফেয়ার' (১৮৪৮-৪৯) রচনা করেন। অতীতের নাটকীয় বর্ণময় রোমান্স তাঁর লেখায় নিপুণভাবে ধৃত হত। এবং কালের প্রভাবকেও অস্বীকার করতে

পারেন নি তিনি। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে এবং মাঝামাঝি ইংলণ্ডে যে আর্থিক বিস্তৃতি ঘটছিল তার ফলাফল তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন; মানুষের মানসিকতার দৈন্য, আত্যন্তিক নিষ্ঠুরতা, স্বাধিকার প্রমত্ততা, ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি যুগ-বৈগুণ্য তাঁর ভর্ৎসনা পেয়েছিল তীব্র। কিন্তু জগৎজুড়ে তখন যে Industrial Capitalism এবং labour মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তাকে তিনি তাঁর চিন্তার অঙ্গীভূত করতে ভুলেছিলেন, ভুলেছিলেন সেই শতকের শিল্পবাদ ও উপযোগিতাবাদের (Industrialism ও utilitarianism) স্বরূপ। তাছাড়া, একালের আলোয় তাঁর রচনা এখন ম্লান মনে হয়; মনে হয় যৌন বিষয়ে তাঁর পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও ভিক্টোরিয়ান যুগের নানা সামাজিক বাধা-নিষেধ এবং 'সু' ও 'কু' ইত্যাদির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মকে শুধুই রমণীয় পাঠের তৃপ্তি ছাড়া আর কোন মহত্ত্বে উৎক্রান্ত করতে পারেনি।

মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের কথাসাহিত্যিক লর্ড লিটন জন্মগ্রহণ করেন ১৮০৩ সালে। তিনি ছিলেন একাধারে কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। 'লাস্ট ডেজ অফ পম্পিয়াই' (১৮৩৪) তাঁর সুপরিচিত রচনা যদিও তাঁর ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে 'দি ক্যাক্সটন্স' (১৮৪৯) উপন্যাসে। তিনি মোটেই উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন না। লেখায় না ছিল তাঁর সজীবতা, না গতিশীলতা। কখনো অতিমাত্রায় নাটকীয়, কখনো ইতিহাসাশ্রিত দৃশ্যময়তায় তাঁর দ্বারা যে কাহিনী, উপন্যাস ইত্যাদি সৃষ্ট হয়েছে তার আবেদন সেকালেই নিঃশেষিত, এখনকার পাঠকের তা তিলমাত্র আগ্রহ জাগায় না। লিটনের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ সালে।

লিটনের সমসাময়িক হয়েও ডিজরেলী, বেঞ্জামিন ডিজরেলী (১৮০৪-৮১) ছিলেন অনেক বেশি শক্তিধর। তিনি লিটনের একবছর পরে পৃথিবীতে আসেন এবং রাজনীতির পুরোভাগে থেকে যে-সকল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন হন তা-ই সাহিত্যের উপযোগী করে পরিবেষণে প্রচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর জীবনবীক্ষা ছিল তীক্ষ্ণ, ধারাল গোছের চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন তিনি, আর সবচেয়ে বড় কথা রাজনীতিকে সাহিত্যের উপকরণ করে তোলার এমন ক্ষমতাবান শিল্পী তখনকার কালে আর দেখা যায় নি। তাই তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যকর্ম 'ভিভিয়ান গ্রে'তেও (১৮২৬) কিছু ভাল চরিত্রচিত্র,

আত্ম-সচেতন শ্লেষ (যা পরে অস্কার ওয়াইল্ডে সঞ্চারিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল) ইত্যাদির সদ্‌গুণ পাওয়া যায়। 'ইয়ং ইংল্যাণ্ড'-তত্ত্ব ডিজরেলীর সর্বোত্তম রচনার সার্থক প্রকাশ। তিনি সেই তত্ত্ব তিনটি উপন্যাসে (কনিংসবি ১৮৪৪ ; সিবিল ১৮৪৫; ট্যাংকরেড ১৮৪৭) পরিপূর্ণভাবে সঞ্চারিত করেছিলেন। ১৮৭৩ সালে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

থ্যাকারে যেমন তাঁর লেখায় বিবাহ, প্রেম, এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে বুর্জোয়া সেন্টিমেণ্ট পোষণ করতেন অ্যান্থনী ট্রলপীও (১৮১৫-৫১) তেমনি তাঁর রচনাকে শুদ্ধাচার ও জিতেন্দ্রিয়তা দিয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন। থ্যাকারের মতো তাঁর চরিত্ররাও বেশীর ভাগ সময় লণ্ডনের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়েছে। তিনিও Industrial Capitalism ও শ্রমিক-জীবন সম্পর্কে তেমন করে অবহিত থাকেন নি এবং সেকালীন ইংলণ্ডের যে সম্ভ্রান্ততাপ্রিয়তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুর্জোয়া এথিকস-এ মিশছিল, তাকে তিনি নজর করেছিলেন। ১৮১৫ সালে জন্মগ্রহণ করে ট্রলপীর সারা জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে ষাটখানি বইয়ের কথা জ্ঞাত আছি আমরা। তার মধ্যে বারসেটশায়ারের কাহিনীগুলিতেই সম্ভবতঃ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নিদর্শন মিলবে।

উপন্যাসের বিবর্তন ও বিবর্ধনে কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিকের আগমন ও প্রস্থান বিশ্বের কথাসাহিত্যের আসরকে ঐশ্বর্যময় ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। জেন অস্টেন ছিলেন তার পুবোধা আর তা দীপ্তিতে ব্যাপ্ত হয়েছে দুটি বোনের আবির্ভাবে—এমিলি (১৮১৮-৪৮) ও শার্লট ব্রণ্টি (১৮১৬-৫৫)। বুদ্ধিজীবি সমাজের জাগরণ হয়েছিল তখন গোটা ইওরোপে, সেই বুদ্ধির প্রভা মহিলাদেরও আর ঘরে নিরস্ত রাখতে পারে নি, পরন্তু স্ত্রী-জাতির সহজাত নমনীয় চরিত্র এবং স্বভাব-সুকুমার-বৃত্তি তাঁদের সহজেই উপন্যাস-গল্পের সভায় আকর্ষণ করেছে। তাঁরা স্নিগ্ধ হৃদয়ে মুগ্ধ গল্প বলেছেন। এমিলি ও শার্লট নিঃসন্দেহে প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের অপরিসর প্রজ্ঞা এবং নির্বাসিত জীবনযাত্রা সত্ত্বেও দুটি চমকপ্রদ উপন্যাসে তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় ও কালজয়ী হতে পেরেছেন। অন্ততঃ এমিলির পক্ষে কথাটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃপক্ষে, 'উদারিং হাইটস' (১৮৪৭) এবং 'জেন আয়ার'ই (:৮৪৭) প্রথম আধুনিক উপন্যাস, প্রথম 'ফেমিনিস্ট'

উপন্যাস এবং প্রথম উপন্যাস যাতে মেয়েদের নিরস, বর্ণহীন জীবনের নির্বোধ ক্রন্দন ছাড়া সার্থক সতীক্ষ্ণ-সজীবতা সঞ্চিত হয়েছে। এমিলি ও শার্লটকে গত শতকের সব মহা কথাসাহিত্যকারদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার কারণ গভীর হৃদয়াবেগ, অপরিহার্য প্যাসন, মানবিক চিদ্‌বৃত্তির উলঙ্গ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ তাঁদের রচনায় অপরিসীম নৈপুণ্যে উদ্‌-ঘাটিত হয়েছিল। 'উদারিং হাইটস'-এ ক্যাথারিন আরন্‌শ'র প্রতি অনাথ হিথক্লিফের ভালবাসা এবং পরিশেষে ইসাবেলা লিন্‌টনের সংগে বিবাহে তার প্রতিশোধ-প্রাপ্তির সহজ অথচ জান্তব কাহিনী যা মিঃ লকউডের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত এবং বর্ণিত হয়েছে, তা 'রোমান্টিক মেলোড্রামার' সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবহার। 'জেন আয়ার'-এর বিষয়বস্তু ও পরিবেশেও যে অভিনবত্ব পাওয়া গিয়েছিল, পুর্ববর্তী আর কোন উপন্যাসে তেমন আবেগ-নিগূঢ়তা, তেমন আন্তরিক লিপিকুশলতার সন্ধান মেলে নি। জেনের শরীরে তথাকথিত সৌন্দর্য ছিল না। নিতান্ত সাধারণ এক মেয়ে—তার আশা আশংকা, প্রেম আনন্দর অনুভূতিকে বুকে নিয়ে অবাধে সে বহির্জগতে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাকে সাগ্রহে লক্ষ্য করার ধৈর্য পর্যন্ত কারো ছিল না। রচেস্টারই তার জীবনের প্রথম পুরুষ। তদানীন্তন উপন্যাসের নায়িকামাত্রই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা—এই যে দুর্বল বিশ্বাস সংঘটিত করেছিলেন সেকালের লেখকরা, 'জেন আয়ার' সেই জীর্ণ ধারা ও ধারণার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করল। কিন্তু এমিলির প্রসিদ্ধি তাঁর বোন শার্লট-এর প্রতিভাকে নিঃসন্দেহে আড়াল করেছে। মাত্র কুড়ির কোঠায় পদার্পিতা একটি মেয়ে তাঁর একটিমাত্র রচনায় যে চাঞ্চল্যকর পারদর্শিতা প্রকাশ করেছিলেন, তা আজ কালের বিবেচনায় ঘোষিত হয়েছে যে, 'উদারিং হাইটস'এর আবেদন সার্বজনীন ও সর্বকালীন। শার্লট অবশ্য অবশ্যই তাঁর বোনের সমতুল্য ক্ষমতার অংশীদার হতে পারেন না। এমিলির সাহিত্য অবদানের প্রাক্‌কলন করতে গিয়ে Legouis Cazamian বলেছেন, 'We came upon a talent of stranger and perhaps rare quality whose first works are all we have before her premature death. There is no one after 1830 who so completely and boldly realizes the ideal of independence in thought and freedom in spiritual life which the emancipation of romanticism had set forth'. ১৮১৬ সালে শার্লট ও ১৮১৮ সালে এমিলি জন্মগ্রহণ করেন এবং

তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনের করুণ দিনগুলি জনারণ্যের বাইরে ইয়র্কশায়ারে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ক্লান্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়। তারপর একান্ত দ্রুত ও নাটকীয়ভাবে অকালে তাঁদের জীবনের ওপর যবনিকাপাত ঘটে।

ইংরাজী কথাসাহিত্যে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারিণী হয়ে এসেছিলেন বোধহয় জর্জ এলিয়ট। মহিলা এমিলির চেয়ে এক বছরের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। প্রচুর অধ্যয়ন ছিল তাঁর, ইওরোপীয় ধ্রুপদী ভাষাগুলির শিক্ষায় তিনি প্রচুর শ্রম স্বীকার করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অ্যাডাম বীড' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। চারখণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত উপন্যাস 'মিড্‌ল মার্চ' (১৮৭১-৭২) বোধহয় এলিয়টের সর্বাপেক্ষা বিদগ্ধ রচনা। ইংরাজী কথাসাহিত্যে নিশ্চিত অবদান। জর্জ এলিয়ট তাঁর সময়ে হার্বার্ট স্পেন্সার-এর মতো দার্শনিকের সঙ্গ পেয়েছিলেন, তাই স্বভাবতই তাঁর চিন্তাধারায় তীক্ষ্ণতা এবং মননে পরিপুষ্টি এসেছিল। ডিকেন্স, থ্যাকারে, ট্রলপীর দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় যে সব গুণ অনুপস্থিত ছিল একান্তই, এলিয়ট তা অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, একটা নির্দিষ্ট জীবনদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন, যা টলস্টয়ে অধিকতর নৈপুণ্যে ও বৈদগ্ধে পরীক্ষিত ও সার্থকতর হয়েছে। এলিয়ট নিজের প্রাক্‌কলনে পরিষ্কার বলেছিলেন, 'আমি সাহিত্যে কোনদিন আফিমের সেবা করি নি'। জর্জ এলিয়ট না পড়া এক সময়ে ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আজ, বিংশ শতকে, জর্জ এলিয়ট সম্পর্কে সমালোচক ও পাঠকরা নতুন করে আগ্রহান্বিত হয়েছেন।

১৮১০ সালে জন্মেছিলেন আরেক মহিলা যিনি পরবর্তীকালে শার্লট-এর জীবনকাহিনী লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা আমাদের আলোচনার অঙ্গীভূত না করলেও চলবে, কেননা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি শুধুই একটি নামমাত্র— মিসেস গ্যাস্‌কেল। নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক চার্লস রীড 'দি ক্লয়স্টার অ্যাণ্ড দি হার্থ'এর (১৮৬১) রচয়িতা হিসেবেই প্রধানত স্মরণযোগ্য। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি যে কোন ভাষার শোভা বর্ধন করার উপযুক্ত। এই শতকের আর কয়েকজন কথাশিল্পী হলেন কলিন্স, জোসেফ শেরিডান, চার্লস কিংসলে, তাঁর ভাই হেনরী কিংসলে, উইলিয়াম এন্সওয়ার্থ, জর্জ ম্যাকার্থার রেনল্ডস এবং 'লর্নাডুন'এর (১৮৬৯) লেখক রিচার্ড ব্ল্যাকমোর ইত্যাদি।

ভিক্টোরীয় যুগের ওপর যখন দিনান্তের শেষ রশ্মিপাত ঘটছে, সৌভাগ্যের আলো হয়ে আসছে ক্ষীণ, তখন, সেই গৌরবময় যুগ-নিঃশেষের ক্ষণে মেরিডিথ এসে দাঁড়ালেন বুদ্ধিগর্বে সচকিত হয়ে। প্রথম দিকে অনেকগুলি বিফল রচনার পর কবি ঔপন্যাসিক জর্ড মেরিডিথ (১৮২৮-১৯০৯) তাঁর 'ইগোয়িস্ট' (১৮৭৭) উপন্যাসে শ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারলেন। মেরিডিথ-এর তৃতীয় উপন্যাস 'অর্ডিল অফ্ রিচার্ড ফেভারেল' বেরোয় ১৮৫৯ সালে, সেই বছরেই ডিকেন্সের 'টেল অফ টু সিটিজ্' এবং জর্জ এলিয়টের 'অ্যাডাম বীড্' আত্মপ্রকাশ করেছিল। মেরিডিথ হয়ত কোনদিন বহুল পরিমাণে পাঠক আকর্ষণ করতে পারেন নি, কেননা তাঁর লেখায় বিয়োগ ব্যথা এত সকরুণ সুরে বেজেছে যে, কৌতুকের কৃশ আবরণ তা ঢাকতে অপারগ হয়েছে। তবে, একালের সজাগ পাঠকরা মেরিডিথের নতুন মূল্যায়ন করতে চাইছেন। যদিও ই. এম. ফর্স্টার তাঁকে 'Suburban roarer' বলে এককথায় বাতিল করেছেন, কিন্তু অপরপক্ষে হেনরী জেম্‌স বলেছিলেন, 'Still it abides, I think, that Meredith was an admirable spirit even if not an entire mind......The fantastic and the mannered in him were as nothing, I think, to the intimately sane and straight ; just as the artist was nothing to the good citizen and the liberalized bourgeouis'.

মেরিডিথএর মৃত্যু হলো ১৯০৯ সালে ; তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে মহান ভিক্টোরিয়ান যুগের ওপর যবনিকা পড়বে ভেবে যাঁরা আশংকিত হয়েছিলেন তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন একটি কবি-ঔপন্যাসিক তাঁর প্রতিভার ছটা নিয়ে ইংরাজী সাহিত্যের ভাঙা আসরে আবার নতুন করে সুর বাঁধছেন। টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮) নিজের সময়কাল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তখনকার বুদ্ধিজীবি সমাজের বিবর্তনবাদে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি উপন্যাস রচনার formকে উন্নত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এডমণ্ড ব্লানডেন তাঁর 'Englishmen of letters' প্রবন্ধমালায় বলেছেন, 'There is a kind of friendly contention for the ownership of Hardy's true greatness as a writer and hitherto it has swayed one way and another with the hours and the incidents of opinion', হার্ডির অশিক্ষিতপটুতা তাঁর পক্ষে আশীর্বাদের কারণ হয়েছিল, তাতে লেখার

মধ্যে একটা অনাড়ম্বর, সরল ঐশ্বর্য আমাদের মুগ্ধ করেছে, একটা অমসৃণ প্রাচীনত্বের ছাপ পরিস্ফুট হয়েছে। 'ফার ফ্রম্ দি ম্যাডিং ক্রাউড' (১৮৭৪); 'দি রিটার্ন অফ্ দি নেটিভ' (১৮৭৮); 'দি উড্ল্যাণ্ডার্স' (১৮৮৭) ইত্যাদি তাঁর অতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে সেই প্রাচীন অমসৃণ মহিম-ময়তার রূপকে তিনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া পৃথিবী এবং জীবন মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে ভীষণ নিষ্ঠুর এবং ভীষণ বেদরদী মনে হয়েছে, ফলে শোপেনহাওয়ারের বিষণ্ণতাবাদকে তিনি যেন অজ্ঞাতসারে বন্দনা করেছেন। একমাত্র 'দি হ্যাণ্ড অফ এথেলবার্টা' (১৮৭৬) ব্যতীত তাঁর কোন উপন্যাসই নগরকেন্দ্রিক নয়। লণ্ডন এবং ডরসেটের দ্বন্দ্ব তাঁর মনকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করেছে। হার্ডি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময়কালেই একটা গৌরবময় যুগের ধীর অবসান ঘটছে এবং 'meliorist' হিসেবে তাঁর পবিত্র কর্তব্য যথাসাধ্য উপযুক্ত রসদ জুগিয়ে সেই বিলয়কে বিলম্বিত করা। হার্ডি তাঁর উপন্যাস-রচনার প্রভাত থেকেই নৈসর্গিক শোভাকে বিভিন্ন রঙে ও মেজাজে প্রাণবন্ত করেছিলেন; তখনো পর্যন্ত তাঁর বিষয়বস্তুতে এত ঐশ্বর্য স্পর্শ করেনি। 'ফার ফ্রম্ দি ম্যাডিং ক্রাউড্'-এ দেশ ও প্রকৃতির লীলামাহাত্ম্য এত সজীবতায়, এত আন্তরিক বর্ণময়তায় পরিস্ফুট হয়েছে যে, এই শ্রেণীর রচনা ইংরাজী কথাসাহিত্যে খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত রচনা 'দি রিটার্ন অফ দি নেটিভ' দুটি ব্যক্তিত্বের সংগ্রাম-বিপর্যস্ত জীবনের করুণ কাহিনী, হার্ডির জীবনদর্শন ও মনোজগৎকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে কিন্তু কাহিনীর উপসংহারে আছে সেই কঠিন নিয়তির খেলা, যা হার্ডি তাঁর লেখায় কোনদিন অতিক্রম করতে পারেন নি। 'জুড্ দি অবস্কিওর' (১৮৯৪) উপন্যাসে তিনি বিবাহ ও যৌনজীবন সম্পর্কে অত্যন্ত নির্মমভাবে খোলামেলা আলোচনা করেছিলেন। হার্ডি যে বিষয়কে স্পর্শ করতেন তাতে তাঁর পক্ষপাতবিহীন অনুধাবন থাকত, অবলোকন যা অনুত্তেজিত মনের স্নিগ্ধ পল্লব-প্রচ্ছায়ে আশ্রিত হতো। মেরিডিথ ও টমাস হার্ডির জীবন-দর্শনের পার্থক্য হচ্ছে, 'Meredith insists that inspite of the sorry state of society, man can by his natural ability, rise to individual happiness. Hardy follows a philosophy that shows man's nature twisted in the toils of the society which he has created, a set of realities

from which he cannot escape or hope to change for betterment'.

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন (১৮৫০-৯৪) অত্যন্ত শিক্ষিত ও সুসংস্কৃত মন নিয়ে ইংরাজী উপন্যাসের সেবা করতে এসেছিলেন। স্কচ ও ফরাসী স্বভাবের এত সুন্দর সমন্বয় হয়েছিল তাঁর চরিত্রে, এত শান্ত ও এত বিনয়ী অথচ তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তার আভাস—যা মানুষ হিসাবে তাঁকে প্রায় অবিস্মরনীয় করে রেখেছে ইংরাজী কথাসাহিত্যে। ষ্টিভেনসন যখন উপন্যাস সাধনা করতে নেমেছিলেন তখন ফ্রান্সের সাহিত্যে হাওয়া বদলের পালা চলেছে, 'ন্যাচারালিজম' কথাশিল্পের আসর থেকে যাই-যাই করছে এবং 'সিম্বলিজম' কাব্যের পৃথিবী থেকে উপন্যাসের পৃথিবীতে নতুন অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। আর ষ্টিভেনসন, ফরাসীর হৃদয়ানুগ ষ্টিভেনসন সেই পালা-বদলের হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে ইংরাজী কথাসাহিত্যের বৈচিত্র্য-বিস্তার করলেন। তিনিই বস্তুত ইংরাজী কথাসাহিত্যে ছোটগল্পের প্রবর্তনা করেছেন। মপাসাঁর তুলনায় বহুলাংশে নিকৃষ্ট এবং পো'র প্রভাবপুষ্ট ষ্টিভেনসন-এর আগে ইংরাজী কথা-সাহিত্যে কোন ছোটগল্প সৃষ্টি হয়নি বলাই ঠিক। তাঁর অবিশ্বাস্য ঘটনার অভাবনীয় বর্ণনাভংগী নতুন রসাস্বাদনের সমাদর নিয়ে এল। রক্তে শিহরণ আনা লড়াই, ঝড়ের মাঝে জাহাজডুবি কিংবা গুপ্তধনের সন্ধানে অভিযান তিনি এমন শ্বাসরোধকর রোমাঞ্চে ইংরাজী কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত করেছিলেন, এমন দুর্দমনীয় কৌশলে যে অবিলম্বে সারা বিশ্বে তাঁর ভক্ত পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে অসুবিধা হয়নি। ওয়াল্টার স্কটের পরে এমন আবিষ্টকর রোমাঞ্চে আর কেউ গল্প বলতে পারেন নি বোধ হয়। তাঁর এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' (১৮৮৩) হচ্ছে প্রথম এবং 'কিড্‌ন্যাপ্‌ড' (১৮৮৬) শ্রেষ্ঠ। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'-এর আবেদন কিশোর মনে আজও কল্পনার রঙে রঙে অদ্ভুত ছবি এঁকে যায়, কে না স্মরণে রাখে সেই আশ্চর্য সমুদ্রের গানটি :

'Fifteen men on a dead man's chest
Yo-ho-ho and a bottle of rum'.

আর, 'দি স্ট্রেঞ্জ্ কেস্ অফ ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড' (১৮৮৬) তাঁর ক্ষমতার সম্যক দৃষ্টান্ত না হলেও একই মানুষের দুটি পরস্পর বিরোধী ভয়ংকর রূপের এই রোমহর্ষক কাহিনী জগৎব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে প্রচণ্ড। যক্ষ্মা রোগের দুর্জয় শক্তির সংগে যুদ্ধ করতে করতে ষ্টিভেনসনের জীবন একদিন অপব্যয়িত হয়ে যায়।

ডিকেন্সের মতো জর্জ গিসিং (১৮৫৭-১৯০৩) জীবনে দারিদ্র্যের কঠিন উত্তাপ, দুঃসহ জ্বালা ভোগ করেছিলেন। বেঁচে থাকার জন্য অনেক পরীক্ষার নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই তিনি ডিকেন্সের আত্মিক উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন কিন্তু তবু তিনি ডিকেন্স হয়ে উঠতে পারেন নি কোনদিন। কেননা শিল্পী হিসাবে তিনি তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষটি অপেক্ষা অনেকাংশে দুর্বল ছিলেন এবং ডিকেন্সের জীবন দুঃখ-দৈন্যে ভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিগত সংক্ষোভ, সেই হাহাকারকেই তিনি সাহিত্যে মুখ্যতঃ আশ্রয় করে থাকেন নি। বেদনাকে উৎফুল্ল আনন্দের আড়ালে ঢেকে অসীম মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে গিসিং যন্ত্রণাক্ত হৃদয়ে উপন্যাস লিখতে বসে নিজের মর্মবেদনা ছড়িয়ে দিয়েছেন রচনায়, তাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর আর পাংশু করে তুলেছেন অকারণ। শোপেন-হাওয়ার ছিলেন তাঁর পরম পুজনীয়। তিনি সমাজের ব্যাধিকে প্রকট করে তুলেছেন, লিখতে গিয়ে ছত্রে ছত্রে তাঁর ঘৃণা আর ক্রোধ পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র সমাধানের হদিশ দেন নি। 'He believes neither in the philanthrophy of the rich nor in the revolt of the poor'. তবু নিকৃষ্টের দুর্বলতা গিসিংকে খর্ব করলেও এ-ও ঠিক যে, লণ্ডনের অসংখ্য নিপীড়িত জনতা-অধ্যুষিত বস্তী-অঞ্চলকে তাঁর মত এমন আপসহীন মন নিয়ে, এমন নির্মমভাবে আর কেউ উদ্‌ঘাটন করেন নি। আর, সেই সত্যকে দ্বিধাহীনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি ন্যাচারালিজমের মন্ত্রকে উচ্চারণ করেছেন যদিও জোলার ক্ষমতার অতি তুচ্ছ অংশও তাঁর আয়ত্তে আসে নি। গিসিং-এর শ্রেষ্ঠ রচনাকর্মগুলির মধ্যে 'ডেমোজ্' (১৮৮৬), 'দি নেদার ওয়ার্লড্' (১৮৮৯), 'দি নিউ গ্র্যার স্ট্রীট' (১৮৯১) এবং 'দি প্রাইভেট পেপার্স অফ্ হেনরী রাইক্রফ্ট'-এর (১৯০৩) নামোল্লেখ করা যেতে পারে। শেষোক্ত উপন্যাসটি গিসিং-এর অন্তিম রচনা এবং হয়ত শ্রেষ্ঠ রচনাও। এই কাহিনীতে জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত এক সাহিত্যিকের মর্মবেদনা লিপিবদ্ধ করেছেন গিসিং। এবং বলা বাহুল্য তাঁর নিজের বিশেষ দর্শন ও মনন, তাঁর ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। গিসিং-এর অকালমৃত্যু তাঁর সকল দুর্বলতাকে অপনোদন করে সবল সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত হতে সময় দেয় নি।

জর্জ মুর (১৮৫২-১৯৩৩) প্রধানতঃ ফরাসী কথাশিল্পীদের প্রভাবে স্বচ্ছন্দ

অনুভব করেছেন। জাতিতে আইরিশম্যান এবং পার্লামেন্ট সদস্য পিতার সন্তান জর্জ মুর বেশ কিছুকাল প্যারিসে অতিবাহিত করেছিলেন এবং ফরাসী শিল্প ও সাহিত্যধারায় প্ররোচিত হয়েছিলেন। ১৮৪০ সাল থেকে যে আইরিশ সাহিত্য রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হয় তার দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি ইয়েটসের অধিনায়কত্বে পুনর্জাগরণের নতুনতর প্রচেষ্টায় মুর সক্রিয় অংশ নেন। তাঁর সাহিত্য-সত্তাকে ফরাসীর ন্যাচারালিজম-তত্ত্ব আন্দোলিত করেছিল হয়ত এবং পরে প্রতীকতাবাদকেও তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁর রচনায়। মুরের জীবনবীক্ষায় উৎকট নৃশংসতার সংগে উত্তুঙ্গ হৃদয়াবেগ মিশেছিল। তাঁর উপন্যাসগুলির নাম হলো 'এ মডার্ন লাভার' (১৮৮৩), 'এ মামার্স্ ওয়াইফ' (১৮৮৪), 'এস্থার ওয়াটার্স' (১৮৯৪) এবং 'দি লেক' (১৯০৫)। শেষ দিকে তিনি ন্যাচারলিজমের পন্থাকে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি ধারাবলম্বী হন—নন্দন তত্ত্বকে কেন্দ্র করে কল্পনার সীমানাকে দেন বাড়িয়ে। তাঁর 'এস্থার ওয়াটার্স'-এর কাহিনীটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক। এতে তিনি এক ভৃত্য-কন্যা এবং পাচক-পুত্রকে তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা খাড়া করেছিলেন এবং অদ্ভুত এক যৌক্তিকতায় উপন্যাসটি শেষ হয়।

স্যামুয়েল বাটলার (১৮৩৫-১৯০২) দুটি মাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'দি ওয়ে অফ অল ফ্লেশ' (যা বার্নাড শ'কে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল।) এই বিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে এক বিশেষ জনপ্রিয়তার স্থান অধিকার করে আছে। উপন্যাসটি তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশ পায়। নিজের উপর অদ্ভুত আস্থাবোধ এবং একক সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃতি বাটলারকে এক অনমনীয় দৃঢ়তায় উদ্গত করেছে, আর তাতে তাঁকে কিঞ্চিৎ উদ্ধত মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তিনি ভিক্টোরিয় যুগের ভণ্ডামিকে নির্দ্বিধায় আক্রমণ করেছেন (Ere whon; ১৮৭২) এবং কেতাদুরস্ত আত্মতৃপ্তির শ্লাঘাকে কঠিন ধিক্কারে ভর্ৎসনা করতেও ছাড়েন নি। কিন্তু তাঁর শ্লেষ, বক্রোক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি সুইফটের মতো তিক্ততা সৃষ্টি করে নি কখনো। বাটলার একান্তভাবে মানসিক উদ্‌বোধ চেয়েছেন, চেয়েছেন চিত্তের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। এবং তাঁর ধারণায় এই ক্রমিক উদ্‌বুদ্ধির তাড়না, এই স্বাধীনতাভিলাষ মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসা (সন্দেহ বলাই শ্রেয়ঃ) সৃষ্টি করবে, তা-ই একদিন সত্যের জ্যোতির্ময় দীপটিকে করবে প্রজ্জ্বলিত। কিন্তু এই বিদ্রোহীর মনোভাব, আপন

বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার এই অনমনীয় দৃঢ়তা, ধর্মকে, মানুষকে তীক্ষ্ণ সমালোচনায় বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করার এই দুঃসাহস জীবনের সায়াহ্নে বাটলারকে বোধহয় নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। সাধারণে তাঁকে অবিচার করার অবকাশ পেয়েছে, তাঁর হৃদয়ের একনিষ্ঠ সন্তাপ, গভীর ক্ষোভ ও জ্বালাকে অনেকেই লক্ষ্য করে নি ; লক্ষ্য করলেও ভ্রান্ত ধারণায় এড়িয়ে গেছে। ...'inspite of his fertile inventiveness he remained a solitary figure, unknown to or misunderstood by the general public, anxious only to keep unhampered the sincerity of his mind, which was ever, freely expressed.' বাটলার 'দি ওয়ে অফ অল ফ্লেশ' (১৯০৩) লিখতে বসে প্রধানতঃ তাঁর নিজের কথা, বাবার কথা এবং পরিবারের কথা ভেবেছিলেন—এমন কি পিতা-পুত্রের প্রচণ্ড মতান্তরের পর পুত্র আর্নেস্টকে তিনি ঔপন্যাসিক করতেও ভোলেন নি। পিতা থিওবোল্ডকে শিখণ্ডীর মতো সামনে রেখে বাটলার মানবিক দুর্বলতা, সামাজিক ব্যভিচার, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আপন প্রত্যাবেক্ষায় ক্ষমাহীন আক্রমণ চালিয়েছেন। উপন্যাসের সমস্ত পরিকল্পনাটিতে গভীর বৈদগ্ধ্য ও প্রজ্ঞা বিজড়িত আছে, আছে বিশদ বিবরণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, প্রত্যেকটি অনুভূতি, প্রত্যেকটি ইচ্ছার ব্যবচ্ছেদ। কিন্তু তবু উপন্যাসটি যেন প্রাণহীন, বিশুষ্ক। একটা ধু-ধু প্রান্তরের উদাস স্মৃতির মতো। বাটলার অবহিত ছিলেন যে, হয়ত তিনি তাঁর সমকালে তেমন যোগ্য সাড়া পাবেন না, তবে ভাবীকাল এবং ভবিষ্যতপুরুষদের সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি নিজের বাসনাকে পরিষ্কার ব্যাখ্যাত করে নিবেদন করেছিলেন যে: 'Posterity will give a man a fair hearing; his own times will not do so if he is attacking vested interests, and I have attacked two powerful sets of vested interest at once (The Church and Science). What is the good of addressing people who will not listen? I have addressed the next generation and have therefore said many things which want time before they become palatable. Any man who wishes his work to stand will sacrifice a good deal of his immediate audience for the sake of being attractive to a much larger number of people later on. He cannot gain

this later audience unless he has been fearless and thorough-going, and if he is this, he is sure to have to tread on the corns of a great many of those who live at the same time with him, however little he may wish to do so. He must not expect these people to help him on, ncr wonder if, for a time, they succeed in snuffing him out. It is part of the swim that it should be so. Only, as one who believes himself to have practised what he preaches, fearlessly for posterity and not get paid for it is much better fun those I can imagine its being to write like, we will say, George Eliot and make a lot of money by it'.

এই সময়ের দু'জন অল্প-ক্ষমতার লেখক 'She'-এর রচয়িতা রাইডার হ্যাগার্ড (১৮৫৬-১৯২৫) এবং 'The prisoner of Zenda'র লেখক অ্যাণ্টনি হোপ-কে (১৮৬৩-১৯৩৩) আজও স্মর্তব্য। কারণ প্রণয়, রহস্য, রোমাঞ্চকে সকৌশলে ঘনীভূত করার কৃতিত্ব ছিল তাঁদের এবং প্রায় একক রচনার দৌত্যেই এখনও তাঁরা পাঠক-মনে জীবিত আছেন।

কিন্তু হার্ডির মৃত্যুর পর যিনি ইংরাজী কথাসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিতে বিরাজ করেছেন তিনি হলেন জোসেফ কোনরাড (১৮৫৭-১৯২৪)। জাতিতে পোল, কোনরাড জীবনের দীর্ঘ বিশ বছর সমুদ্রে নাবিকের পেশায় অতিবাহিত করেছিলেন। সারা বিশ্বের মাঝেই তাঁর নাগরিকত্বের পরিচয় অটুট ছিল; এবং দেশে দেশে করেছিলেন তিনি ঘর। কুড়ি বছরের ভেসে বেড়ান, অনিশ্চিত এবং কঠোর জীবনযাত্রা কোনরাডকে মানুষ চিনতে শিখিয়েছিল, অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল যার দ্বারা তিনি জীবনের দৃশ্য ও অদৃশ্য গ্রন্থিকে আপন মনের মতো করে উন্মুক্ত করতে পেরেছিলেন। রোমান্টিকতাকে উচ্চতর রূপে, সবাস্তব অনুভূতিতে উদ্‌গত করে এবং মানুষের মনের গহনকে উৎসারিত করে কোনরাড ইংরাজী কথাসাহিত্যে সজীবতা আনতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ততখানি কৌলীন্য, ততখানি মানসিক উপযোগ্যতা তাঁর ছিলনা যদ্দ্বারা তিনি স্বরাজ্যে স্বরাট হয়ে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারেন।

'But unlike Henry James, Flaubert or Turgenev, he had neither the experience nor the opportunity to examine them as social types or psychological puzzles'.

কোনরাড বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কথাসাহিত্যে নতুন গদ্যরীতির ভিন্নতর স্বর শুনিয়েছিলেন এবং জাতবিচারে তাঁর রচনাভংগী কিপলিং-এর সংগে তুলনীয়। আধার এবং আধেয়র অভিনবত্ব এবং সহজাত শিল্পবোধ ও বিন্যাস-বৈদগ্ধ্য তাঁকে স্বতন্ত্র-চিহ্নিত করে রেখেছে। 'Only Milton and very rarely De Quiency can make us see the unseen as this author can. He never wrote down to his public, in fact he assumed that it was living up to his ideal of the English temparament—its impartiality, practical wisdom, sense of fitness and freedom from sentimentality. To admire Conrad is to live up to his standard. So his place is assured'. (Routh : English Literature and ideas in the twentieth Century). কোনরাডের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দি মিরর অফ দি সী'তে (১৯০৬) জলজীবনের কাহিনী অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যদিও তাতে তাঁর ক্ষমতাকে চেনবার কোন উপায় ছিল না। 'আলমেয়ারস ফলি' (১৮৯৫) থেকে 'দি নিগার অফ দি নার্সিসাস'-এর (১৮৯৮) আগে পর্যন্ত কোনরাড যে-যে উপন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন তা অনেকাংশে অভিনবত্ব-বর্জিত। তদানীন্তন বহু বাস্তববাদী লেখকই সেই সুরকে আপন আপন রচনায় নিমগ্ন করেছিলেন। শুধু তাঁর রোমাঞ্চকর নিসর্গকে এমন গভীর পিপাসায় কেউ প্রত্যক্ষ করেন নি। 'দি নিগার অফ দি নার্সিসাস', 'লর্ড জিম্' (১৯০০), 'টাইফুন' (১৯০২), 'নস্ট্রোমো' (১৯০৪) কোনরাডের সত্যকার ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করছে। এসব রচনায় তিনি স্বকীয় দর্শনভংগীর বৈশিষ্ট্যে মানুষের প্রচণ্ড প্যাসনকে, জীবন-বৈচিত্র্যকে, শিল্প-জ্ঞানে সংস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের ধর্ম, যা'র প্রতি তিনি আমাদের সহানুভূতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, তা যেন ঠিকমতো বলা হলো না, কোথায় ফাঁক থেকে গেল এই দুশ্চিন্তায় যতই প্রাঞ্জল হয়েছেন কোনরাড, ততই যেন তাঁর রচনার গুরুভার আমাদের অবসন্ন করেছে; করেছে পরিশ্রান্ত। অন্তত একটি দৃষ্টান্ত (দি সিক্রেট এজেন্ট ; ১৯০৭) আছে যাতে তিনি নিজেকে কিঞ্চিৎ আল্‌গা করতে

পেরেছিলেন ; হতে পেরেছিলেন কিঞ্চিৎ হাল্‌কা। সহজ বিষয়বস্তুতে, সরল বর্ণনামাধুর্যে এই উপন্যাসে যে বিশেষ রচনারীতি পরিস্ফুট হয়েছিল তা অনেকটা ফরাসী পদ্ধতির অনুষঙ্গী। বস্তুতপক্ষে কোনরাড সম্পর্কে এই অনুযোগ প্রায়শ ধ্বনিত হয়ে থাকে যে, বহুক্ষেত্রে এমন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে, তিনি সরাসরি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে সেরেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) আগে তাঁর রচনা মনোযোগী পাঠক ও মননশীল সমালোচকদের আগ্রহ উৎপাদন করলেও তেমন প্রয়োজনীয় উদ্দীপনায় অভ্যর্থিত হয়নি। কিন্তু যখন আমরা জ্ঞাত হই যে, 'The Post-war criticism excited about Joyce, Proust, Kafka forgot about Conrad ; but there are signs now, when symbolism in fiction is being so much praised and it is being belatedly discoverd in Conrad' তখন কোনরাড সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ ভাবনার উদয় হয়। ভাবি, একালীন সাহিত্য-বাসর থেকে প্রায় নির্বাসিত এই কথাশিল্পীটিকে আবার কোনদিন স্বতন্ত্র-মূল্যে যাচাই করা হবে কি? তৈরি হবে তাঁর জন্য একটি ন্যায্য, সম্মানিত আসন ?

অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০) প্রথম পঠনেই এই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি প্রতীকতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং বিশুদ্ধ স্বরে নন্দনতত্ত্বের সমর্থন করেছেন। কবি, নাট্যকার এবং পরিশেষে ঔপন্যাসিক ওয়াইল্ড স্বোপার্জিত চিন্তা ও নীতির ঐকান্তিকতায় এবং এককত্বে স্বতন্ত্র সাহিত্যপুরুষ-রূপে অপেক্ষাকৃত তরুণ গোষ্ঠীর কাছে সসম্মান অনুসরণ লাভ করেছেন। তাঁর ব্যঙ্গোল্লাস, আপসহীন স্বচ্ছন্দ বর্ণনা-বিস্তার, ফরাসী অবক্ষয়িক ভংগী এবং মনের অন্তর্প্রদেশে অবাধ বিচরণ তাঁকে একটি নিজস্ব শিল্প-জগৎ রচনা করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। মুষ্টিমেয় গল্প-উপন্যাসের মধ্যে 'দি পিক্‌চার অফ ডোরিয়ান গ্রে'-তেই (১৮৯১) ওয়াইল্ডকে সবিশেষ শক্তিতে আবিষ্কার করা গেছে, এবং এতে তাঁর নন্দনতত্ত্বের 'শিল্পার্থেই শিল্প'র বাণী পরিপূর্ণ সুরে ও স্বরে স্বরিত হয়েছে। যত্নে আয়ত্ত লিপিকৌশল, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ এবং সূক্ষ্ম প্রতীকতা (বহুক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফল না দিলেও) এই উপন্যাসটির প্রধান গুণ, বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়েছে। ওয়াইল্ডের গল্পগুচ্ছ (দি হ্যাপী প্রিন্স ; ১৮৮৮ ইত্যাদি) অবাধ কল্পনাবিলাসের প্রশ্রয় সত্ত্বেও, বর্ণাঢ্য বর্ণনা এবং অতুলন

কথকতার জাদুর গুণে সববয়সের পাঠকদের মনোহরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু সেই অনমুকরণীয় শার্লক হোমস আর তার বিশ্বস্ত সঙ্গী ডাঃ ওয়াটসনকে কে বিস্মৃত হতে পেরেছে? স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০) নিঃসন্দেহে নিতান্ত সাধারণ রুচির বিনোদন করেছেন এবং তাঁর সাহিত্য-ক্ষমতা কোনদিনই বদ্ধ সীমানার বাইরে পৌছতে পারে নি, কিন্তু স্কটের পর এমন জগদ্ব্যাপী জনপ্রিয়তায় আর কেউ পঠিত হন নি বোধহয়—এ বিষয়ে একমাত্র তাঁর সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন আরেক কুশলী গল্পকার রবার্ট লুই স্টিভেনসন। ডয়েল প্রধানত গল্পের আমেজে পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করার আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন। ঐতিহাসিক রোমান্টিকতাও তাঁর হাতে অত্যন্ত যত্নে লালিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের আবহাওয়া 'মিকাহ্ ক্লার্ক' (১৮৮৮) উপন্যাসে তিনি সুবিন্যাসে বর্ণিত করেছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সিংহাসনের লোভ তখনকার ইংলণ্ডে কি প্রবল-প্রতাপে বিরাজ করছিল, প্রোটেস্ট্যাণ্ট আর ক্যাথলিকদের মদমত্ততা কি ভীষণ আকার নিয়েছিল,—ডয়েল তা স্বীয় ক্ষমতায় পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য বিশ্বের তাবৎ পাঠকমণ্ডলীর কাছে তাঁর পরিচয় সেই রোমহর্ষক, সেই শিহরণ আর উত্তেজনার আদি ও অকৃত্রিম রসবস্তু 'দি হাউণ্ড অফ্ দি বাস্কারভিল্‌স'-এর (১৯০২) কারণে আর অদ্বিতীয় গোয়েন্দা শার্লক হোমস এবং তার বিচক্ষণ তদন্তের বিস্ময়কর কাহিনীর আবেদনে।

অবশেষে ভিক্টোরীয় যুগের অবসান ঘটল। ১৮৯৭ সালে যখন মহারানীর 'হীরক জয়ন্তী' সম্পন্ন হলো তখন ইংলণ্ড ক্ষমতার শীর্ষে। বিশ্বময় তার প্রভাবের প্রভা ছড়ান। শেষের দিকে অবক্ষয়ের অবলেপ পড়ছিল ইংরাজী কথাসাহিত্যে এবং কাব্যে। সেকালের কবি, কথাসাহিত্যকরা সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় এক একটি 'ঈশ্বরের প্রতিভূ' প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা গভীর অন্তর্দৃষ্টি চালনা করে, নিজেদের সাহিত্যকর্মের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে সাহিত্যকে প্রাণস্পন্দনে সতত স্ফূরিত রাখতে পারেন নি ; পারলে যুগসন্ধির সাহিত্য বা শিল্প বহুল পরিমাণে সচল ও জীবন্ত থাকত। তাছাড়া, এইসময় রুষ ও ফরাসী সাহিত্য এত প্রকর্ষে প্রকীর্তিত হচ্ছিল যে, তার কঠিন ছায়াপাতকে এড়ান সম্ভব ছিল

না। যাঁরা ইউটোপিয়ার সন্ধানী, তলগুয়কে তাঁদের নিবিড় করে আপন রচনায় আসন দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কাব্যে বোদলেয়ারের বজ্রকঠিন প্রভাবকে ইচ্ছা করলেই অতিক্রম করার উপায় ছিল না।

ইংরাজী কথাসাহিত্যে তেমনি ইউটোপিয়ার সন্ধানী লেখক রুডিয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর রচনা এবং রচয়িতা হিসাবে তাঁর পরিচিতি এই বিংশ শতাব্দীতেই প্রসারিত হয়ে আছে তবু তিনি ঊনবিংশ শতকের প্রান্তভাগ থেকেই ভাস্বর হতে থাকেন। কিপলিং-এর মতো এমন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের লেখক কোন কালেই খুব বেশি আসেন নি ; তাঁর সাহিত্যিক-ক্ষমতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই, তাঁর নিজস্বতা তাঁর মধ্যেই সম্পূর্ণ। দৃঢ়সন্নদ্ধ চিন্তা-চেতনা কিপলিং-এর মধ্যে এক দুরন্ত শক্তিকে প্রমূর্ত করেছিল। 'Cavalcade of the English Novel'-এ Wagenknecht তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, 'In his time Kipling was a phenomenon as inescapable as the Boer war, the skyscraper and the motor car'. চরিত্রের এই অনমনীয়তা তাঁকে পরিষ্কার কতকগুলি ধারণার বশবর্তী করেছিল। তিনি সাম্যবাদ বুঝতেন না, সমাজ-ব্যবস্থার গলদ কিংবা তার বহুবিধ সমস্যা জীবনের গায়ে দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে সে-সম্পর্কে তাঁর তিলমাত্র-ই হুঁস ছিল। তিনি মানুষের দুটি চেহারার কথাই ভাল অনুধাবন করেছিলেন—শাসক ও শাসিত। যারা শাসন করে তাদের অযুত ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং সেই শাসকগোষ্ঠীর নিরাপত্তার জন্য তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। ইংলণ্ডের রাজকীয় নীতিকে সুরক্ষিত করতে তিনি যে-কোন সাক্রোশ মন্তব্য করতে পারতেন এবং তাঁর জীবন ও সাহিত্য সেই রাজনীতি ও শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যয়িত হয়েছে বলাই শ্রেয়। এবং কিপলিং-এর সেই পৃষ্ঠপোষক মন-ই ভারতে ব্রিটিশ-ক্ষমতার উগ্র পরিপোষকতা করেছে। তিনি অজ্ঞাতসারে হয়ত একদা এদেশের প্রতি নিবিষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই অসতর্ক অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে তাঁর সহজাত অনুভব ও শিল্পবোধকে আশ্রয় করে, কল্পনায় প্রতিভাত হয়ে কাব্যে ও কথাসাহিত্যে প্রতিকৃত হয়েছে। কিন্তু কিপলিং-এর মধ্যে যে সহজাত প্রতিভার প্রসাদ ছিল, তাকে তিনি যোগ্য সমাদরে লালন করেন নি ; বরং শোচনীয় অবহেলায় বারংবার নাকচ করেছেন। শিল্পী-মানস তাঁর নিজের

দ্বারাই লাঞ্ছিত হয়েছে। ১৯০৭ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও তার প্রাক্কাল থেকেই তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে। তবু কিপলিং-এর ঔপন্যাসিক অবদান বোধহয় অনেকাংশে অকিঞ্চিৎকর—ছোটগল্পেই তাঁর অধিকতর দক্ষতা ও পারদর্শিতা—একথা মনে করার বিশেষ কারণ আছে। তাঁর অনেক ছোট-গল্পের মধ্যে 'দি ম্যান হু উড্ বি কিং'-কে উচ্চ-শিল্পচর্যার স্থলাভিষিক্ত করা যায়। তাতে কিপলিং শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত কারণে দ্বন্দ্বের অবতারণা করে যে-ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন তা সহজে বিস্মৃত হবার নয়। দুই শ্বেতকায় মানুষ এসিয়াবাসীদের এক জায়গায় নিজেদের সাক্ষাৎ দেবতার অবতাররূপে ভজাবার চেষ্টা করে কিন্তু যখন তাদের প্রতারণার আবরণটি খসে গেল তখন সেই স্বদেশীয়রা ভীমবেগে নিজেদের প্রতারিত অবস্থার প্রতিশোধ নিতে ছুটে এল আর তার ফলে নৃশংসতা হলো তরলিত। কিপলিং-এর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কিম্' (১৯০১) সর্বশ্রেষ্ঠ একথা বহু সুধীজনের রায় হলেও লেখক নিজে রচনাটিকে 'সত্যকার উপন্যাস' বলে স্বীকার করতে চান নি। এ বইটি সম্পর্কে তাঁর নিজের অসংকোচ ধারণা হচ্ছে, 'Nakedly Picaresque and plotless—a thing imposed from without'। অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দি লাইট দ্যাট ফেইলড্' (১৮০০) এক শিল্পীর ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী এবং কিপলিং-এরও পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা। 'দি নওলখা' (১৮৯২) ততোধিক অনুল্লেখযোগ্য এক উপন্যাস। কিপলিং-এর গল্প-উপন্যাসে সাংবাদিকতার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে—এমন অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া প্রিস্ট্লে বলেছেন, 'If he could have returned to the fountain-head, India, accepting all that he had accepted as a child, he might have gone forward from the early chapters of 'Kim' to write master-pieces. In what is probably the best-known quotation from his verse, he declares that East and West can never meet. They could have met in him'.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও পরে এবং তার মধ্যবর্তীকালে ইংরাজী কথা-সাহিত্যে পরাক্রান্ত নৃপতির মতো যিনি বিরাজ করেছেন, নিপীড়িত মানবাত্মার মুখপাত্র হয়ে জীবনের রূপকে আপন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী শক্তিতে নগ্ন করেছেন,

সেই হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস-এর (১৮৬৬-১৯৪৬) প্রতিভা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিক্রমিত হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং যন্ত্রজীবন তাঁর রচনার স্পষ্টতায় ভাষা পেয়েছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, উপন্যাস এবং ছোটগল্প তিনি তাঁর রচনার অঙ্গীভূত করেছেন। বায়োলজি, অ্যাপ্লায়েড মেকানিকস্ থেকে শুরু করে মানুষের মন, জীবনোদ্ভূত সমস্যা, সামাজিক পশ্বাচার তাঁকে প্রতি-নিয়ত ভাবিত করেছে। প্রায় এই সময়েই ফরাসীদেশে এমিল জোলার উপন্যাসে বিজ্ঞানের ধারায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন ধারণার প্রবর্তন-প্রচেষ্টা ইওরোপে প্রচণ্ড বাগবিতণ্ডার ঝড় তুলেছিল। আর, এই সময়ে সোবিয়েৎ ঔপন্যাসিকরাও ইংলণ্ডের জনচিত্তে ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছিলেন। ওয়েলস তাঁর উপস্থিতিতে শুধু যে একটি যুগকে প্রভাবিত করেছিলেন তা-ই নয়, সমকালীন অপরাপর সাহিত্য-শিল্পীদের চিন্তাকেও অনেকাংশে আচ্ছন্ন করতে পেরেছিলেন। 'Of the many brilliant writers, whose work appeared in the intellectual ferment of the nineties none enjoyed more popular esteem as a novelist or exercised a greater influence on the ideas of his age than Herbert George Wells, perhaps the first modern in English Literature'.—(A short History of the English Novel : Neill). কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়েলস-এর সংগে বার্নাড শ-এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া স্বাভাবিক। কেননা তাঁরা উভয়েই ইংলণ্ডীয় সমাজকে এবং জীবনকে সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করেছেন, বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্য উভয়কেই এক বিশেষ দর্শন-পারদর্শিতা দিয়েছে, সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাছাড়া শ' ও ওয়েলস দু-জনেই ফেবিয়ান সোস্যালিজম-এর একই মঞ্চে আরোহণ করেছেন (Legouis & Cazamians)। ওয়েলস-এর উপন্যাসকে অনেক জাত ও শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, তবে বৈজ্ঞানিক রোমান্সে তাঁর তুলনা মেলা ভার ইংরাজী কথাসাহিত্যে। 'দি টাইম মেসিন' (১৮৯৫) ওয়েলস-এর ওই জাতীয় লেখার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাতে তিনি সকৌশল কল্পনায় পৃথিবীকে দু'ফাঁক করে ফেলে পরিষ্কার দুটি জাত সৃষ্টি করেছেন। একটি উত্তম, একটি অধম। একজন থাকে পৃথিবীর উপরিভাগে, উচ্চক্ষমতায়—আরেকজন তলদেশের শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে, নিম্নক্ষমতায়। তারাই সভ্যতার সিঁড়ি গড়ার কাজে লেগে আছে। আর, উপরওয়ালারা পরম নিশ্চিন্তে ও আরামে সেই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলাফলটুকু

গ্রহণ করে। সমস্ত ঘটনাটির গোড়াপত্তন একটি সময়-যন্ত্র বা টাইম মেসিন আবিষ্কারের ক্রমিক পরিণতি। কল্পনার আড়ালে তীব্র সমাজবোধের আরেক দৃষ্টান্ত রেখেছেন ওয়েলস তাঁর 'দি ওয়ার অফ্ দি ওয়ার্লডস্' (১৮৯৮) উপন্যাসে। এবার ওয়েলস-এর ঘটনাস্থল মঙ্গলগ্রহ, পাত্রবর্গ মানুষের চেয়ে বয়োঃপ্রবীণ। এই মঙ্গলগ্রহবাসীরা একদিন পৃথিবী আক্রমণ করে বসল। আর, 'দি ইনভিজিবল্ ম্যান' (১৮৯৭) বা অদৃশ্য মানুষের কাহিনীর শিহরিত স্বাদ কে না পেয়েছে! ওয়েলস এই উপন্যাসে জগদ্ব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কিন্তু অতঃপর তিনি আর বিজ্ঞানের কল্পজগতেই নিজেকে বন্দী রাখতে চাইলেন না, তীব্র সমাজ-চেতনা তাঁর শিল্পীমানসকে বারম্বার অস্থির করে তুলল। তিনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের বাণে তাঁর রচনাকে শাণিত করলেন। লণ্ডনের যে দীন-হীন শহরতলীর জীবন তাঁর ধারণাভুক্ত ছিল, তাকে তিনি প্রতিফলিত করলেন 'কিপ্স' (১৯০৫) উপন্যাসে। কিন্তু ওয়েলস-এর সর্বশ্রেষ্ঠ, সুগঠিত উপন্যাস বোধ হয় 'টোনো বাঙ্গে' (১৯০৯)। এখানে তিনি দেখিয়েছেন, জনতার নির্বুদ্ধিতায় একদল ব্যবসায়ী-ধনতান্ত্রিকের ভাগ্যের অবাধ প্রসাদ-লাভ কেমন করে সুগম হয়েছে। 'These books ('কিপ্স' ও 'টোনো বাঙ্গে') are instinct with a single central impulse which carries them to their conclusions ; the action in them without being condensed beyond the probabilities of life, has a substantial unity. They were conceived and realized by an intellectual ardour and by a verve not unfit to be matched'. 'দি আনডাইং ফায়ার' (১৯১৯) কাহিনীতে ওয়েলস ধর্মকে তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রবস্তু হিসাবে বেছেছেন এবং ব্যঙ্গময় ফ্যাণ্টাসি পরিবৃত হয়েছে সমগ্র রচনাটিতে। ওয়েলস-এর সৃষ্টির কর্মশালায় হরেকরকম উৎপাদনে কখনো অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় নি। চিন্তা সব সময় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন পন্থায় পদচারণা করেছে। 'দি আউটলাইন অফ হিস্ট্রি' (১৯২০) সেই কারণেই লিখিত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, ওয়েলস-এর আশ্চর্য সৃজনীক্ষমতা, সাহিত্যের বিচিত্র সরণীতে অবাধ পরিক্রমা এবং অননুকরণীয় গদ্যভংগী সত্ত্বেও তিনি হয়ত মাত্র কয়েকখানি গ্রন্থেই কিয়ৎকাল জীবিত থাকবেন দেশ ও মানুষের মনে। কারণ, ওয়েলস অধিকমাত্রায় লিখেছেন এবং অতিমাত্রায় নিজেকে অপব্যয়িত করেছেন।

রচনার মাত্রাধিক্য ঘটিয়েছেন আরেক লেখক। আর্নল্ড বেনেট-এর (১৮৬৭-১৯৩১) সিদ্ধি প্রধানত কয়েকটি উপন্যাস ও ছোট গল্পে, যদিচ তাঁর নিরলস সাধনার অভাব ছিল না। ভূরি ভূরি রচনায়,—নাটক, সমালোচনায়, নিবন্ধে তিনি আপনাকে প্রসারিত করে সাহিত্যের স্থায়ী-মূল্যের একটি আসন নিজের জন্য সংরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন হয়ত কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মোটা অংশটুকুকেই অনায়াসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেওয়া যায়। বেনেট তাঁর প্রাদেশিক জীবনযাত্রার মায়া ('আনা অফ দি ফাইভ টাউনস্'; ১৯০২) ইংরাজী কথাসাহিত্যে সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর এক পা সর্বদাই ফ্রান্সের পৃষ্ঠভূমিতে অবস্থিত থেকেছে, কেননা তাঁর রচনায় ফ্লবেরের গুরুতর প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তেমনি পরিশ্রমে এবং তেমনি প্যাসনে তাঁর লেখাও উপাসিত হয়েছে। কিন্তু তেমনি শিল্পসূক্ষ্মতায় হয়ত নয়। তবু, আর্নল্ড বেনেট শতাব্দীর এক নিশ্চিত সাহিত্য-প্রতিভা। তিনি জীবনকে গভীর নিষ্ঠায়, সাধ্যমত অনুকরণ করতে চেয়েছেন, কোন রকম প্রচারের প্রশ্রয় না নিয়েও তাঁর রচনা মানুষের সুখ-দুঃখ, কান্না, সামাজিক অবিচারে বিগলিত হয়েছে; তিনি বাস্তবতার শরণার্থী হতে চেষ্টা করেছেন। তদুপরি আছে মনের বিচ্ছিন্নতা এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা—পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহকে নিরুত্তেজনায় দেখার ক্ষমতা। 'Arnold Benett's method was frequently described as 'naturalistic', though it was only partially so. It is true that as he looked upon the world he was not obsessed by lifes injustices; nor was he a tormented soul driven to attempt to build a new world or to evolve a new race of creatures to inhabit it. He stood in the Age of interrogation as, apparently, a detached figure; but his detachment was not that of an 'unconcerned spectator' of life. He was merely detached, as an artist, from the current habit of protest and the current passion for utilizing creative literature as an instrument of moral and social reform'. বেনেট-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার বিকাশ বোধহয় 'দি ওল্ড ওয়াইভস টেল'-এ (১৯০৯),—শুধু তাই নয় উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর বাস্তবানুগ ইংরাজী কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সংযোজনও বটে। ফ্রান্সে

প্রায় আটবছর অবস্থানের পর বেনেট এই উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাই এই গ্রন্থে বহুবিধ ফরাসী লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়েছে। কনস্ট্যান্স আর সোফিয়া—দুই বোন উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র, তাদের শৈশব-যৌবন, আশা-নিরাশার মর্মোদ্ঘাটন হয়েছে এই কাহিনীতে আর তা ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখক কখনো কৌতুকে-আনন্দে প্রসন্ন হয়েছেন, কখনো বেদনায়-অপমানে সংকুচিত হয়েছেন আবার কখনো জীবনের মালিন্য, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব তাঁর চিন্তাপথে উদয় হয়েছে নিরাসক্ত প্রত্যয়ে। বেনেটের আরেক রচনা 'ক্লেহ্যাঙ্গার' (১৯১০) স্বভাবমাধুর্যোজ্জ্বল কিছু সাধারণ মানুষের কথা—তার মধ্যে এডুইন ক্লেহ্যাঙ্গার আপন ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন না-দিয়েও এযুগের নানা মানসিক অভিজ্ঞতায় ঐশ্বর্যবান পুরুষ। তার সেই অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও মানসিক গতিপ্রকৃতি ইংলণ্ডের অনেক তরুণের পক্ষেই নিজেদের হৃদয়ে আবিষ্কার করা আশ্চর্যের নয়। আর, জীবনের এই সব অন্তরঙ্গ অনুভব, এই অতন্দ্র চিদ্‌বৃত্তির অসংকোচ পরিভ্রমণকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি চলচ্চিত্রের ক্যামেরার মতো প্রায় সর্বত্রগামী হয়েছেন, বিশদ বিবরণে নিজের সজাগ দৃষ্টির ও সদাজাগ্রত মনের পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু বিশ্লেষকের ভূমিকা নেন নি। 'Benett, then unlike our other examples of realistic novelists, Wells and Galsworthy, is not a propagandist ; he is simply an acute observer of life and a lively recorder of his observations'. তাঁর অন্যান্য বহুধরনের রচনার মধ্যে 'রাইসিম্যান স্টেপস' (১৯২৩), 'দি কার্ড' (১৯১১), 'দি গ্র্যাণ্ড ব্যাবিলন হোটেল' (১৯০২) বেনেটকে ইংলণ্ডের পরিশ্রমী সাহিত্যক্ষমতা রূপে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিল বটে, কিন্তু তাঁর ক্ষমতার সীমানা স্পষ্টতই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় শেষ হয়েছে। 'Arnold Benett's work has limits, and these obvious enough'.

জন গলসওয়ার্দি-কে (১৮৬৭-১৯৩৩) কোন্ শ্রেণীর শংসাপত্র দেওয়া যায়? তাঁর একনিষ্ঠ সমাজচেতনা, সুদক্ষ চরিত্রঅধ্যয়ন, অসীম মনোসংযোগ এবং অভিজ্ঞ স্থপতির কলাকৌশল সত্ত্বেও? তিনি জীবনসন্ধ্যায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছেন একথা ঠিক, নোবেল পুরস্কারের অসাধারণ সম্মানলাভও তাঁর ঘটেছে এবং তিনি মোটামুটিভাবে নিজস্ব এক

পরিমণ্ডল রচনা করতে পেরেছেন। তিনি হয়ত ভিক্টোরীয় যুগের ছিটে-ফোঁটা দুর্বলতাও এড়াতে পেরেছিলেন, হয়ত উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের স্বরূপকে আশানুরূপ সৌন্দর্যে ব্যক্ত করেছেন কিন্তু তবু একটি সর্বার্থসার্থক শিল্পীর সম্পূর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। শিল্পের পায়ে নিঃশেষিত সমর্পণে চেতনার যে আশ্চর্য আলোকবর্তিকা সৃষ্টির সরণিকে জ্যোতির্ময়তা দেয়, তা তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর উপন্যাসের ধীর-মন্থর ছন্দোময়তা এবং স্বপ্নিল মেজাজ, দর্শন ও অতীন্দ্রিয়তার তন্দ্রাভাস জানালেও বহুক্ষেত্রে তা সম্ভাবিত পরিণতিকে নিষ্ক্রিয় করেছে। আপাতদৃষ্টিতে বেনেট-এর সংগে গলসওয়ার্দির বহুবাহ্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও অন্তরের গূঢ় সম্পর্কে তাঁরা ভিন্নগোত্রীয়। গলসওয়ার্দি নিজে উচ্চবংশোদ্ভূত, পরিপূর্ণ ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ-সমাজের অদূর ভবিষ্যতে এইসব তথাকথিত ভদ্রলোকরা বিশৃঙ্খলিত ব্যতিক্রম সৃষ্টি করছেন ('He came to the conclusion that well-bred gentleman was somewhat of an anomalous type in the future of British Society'.) তাই ওয়েলস অপেক্ষা অধিকতর অভিজাত ধারায় ও বনেদী ধারণায় এবং শ'-এর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি ব্রিটিশ সমাজের বিধিব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। শ'-এর মতোই তিনি এই আভাস দিতে চেয়েছিলেন যে, ধনতন্ত্র মানুষের সমাজে এমন এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, আভিজাত্যের ফাঁকি এবং ভণিতা তা আর ঢাকতে পারবে না। এই অবক্ষয়ের রূপকে গলসওয়ার্দি তাঁর সুন্দর গদ্যভংগীতে, অসীম মমতা ও করুণায় ব্যক্ত করেছেন। স্বোপার্জিত বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্য ছাড়া রুষ ও ফ্রান্সের পরিশীলিত চিন্তা ও দৃষ্টিতে তিনি নিজেকে অভ্যস্ত ও সজ্জিত করেছিলেন। গলসওয়ার্দি তাঁর লিখিত অনেক উপন্যাসের কারণে প্রশংসিত হন না, পক্ষান্তরে 'দি ফরসাইট সাগা'র আনুকূল্যেই তাঁর ক্ষমতার খ্যাতি ও পরিচয়ের প্রধান উত্তরাধিকার। 'দি ফরসাইট (foresight !) সাগা' গলসওয়ার্দির তিনটি উপন্যাসের ('দি ম্যান অফ প্রপার্টি' ১৯০৬; 'ইন চ্যান্সারি' ১৯২০; 'টু লেট' ১৯২১) একত্রীকরণ। ফরসাইটরা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর এক ডাকসাইটে বনেদী ইংরাজ পরিবার। এইসব বুর্জোয়া গৃহপতিদের পতন-অভ্যুত্থানের বন্ধুর পন্থায়, সম্পত্তি-সংরক্ষণের সুতীব্র নেশায় কি মোহান্ধতা থাকে, কাহিনীতে তার হদিশ দিয়েছেন গলস-ওয়ার্দি। জুলিয়ন পরিবারের প্রথম বিদ্রোহী,—'এ্যাংগ্রি ইয়ং ম্যান'। সে বলছে,

'As a Forsyte myself I have no business to talk. But I'm a kind of thoroughbred mongrel ; now, there's no mistaking you. You've as different from me as I am from my uncle James, who is the perfect specimen of a Forsyte. His sense of property is extreme, while you have practically none. Without me in between you would seem like a different species. I'm the missing link' ; এই যে 'সম্পত্তিজ্ঞানের' কথা বলেছেন গলসওয়ার্দি, এটা ফরসাইট পরিবারের বহুক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ, বাড়ি-গাড়ি থেকে স্ত্রী-রা পর্যন্ত সেই সম্পত্তির আওতায় পড়ে। তদ্দ্বারাই তাদের জীবনের সর্ব ধর্ম পালন করা চলে। কিন্তু গভীর সৌন্দর্যবোধ আর্থিক সাফল্যের পথকেও সুপ্রশস্ত করতে পারে,—লেখকের এবম্বিধ প্রচ্ছন্ন ধারণার স্থান বর্তমান পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেওয়া যায়না বোধহয়। তিনি যে তাঁর দ্বিতীয় ত্রয়ী উপন্যাস 'এ মডার্ন কমেডী'র মুখবন্ধে বলেছেন 'To render the forms and colours, of an epoch is beyond the powers of any novelist'—কথাটি বোধহয় সত্য। কারণ 'দি ফরসাইট সাগা' গলসওয়ার্দির নিঃসন্দেহ প্রতিভার স্বাক্ষর হলেও এবং বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কথাসাহিত্যে সর্ববাদীসম্মত উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলেও জর্মন পারিবারিক উপন্যাস 'বুডেনব্রুকস'-এর উপরিকতা অস্বীকার করা যায় না। বর্ণাকারের বিবরণে মান-কে সেখানে যেন বেশি সফল মনে হয়। গলসওয়াদির দ্বিতীয় ত্রয়ী গ্রন্থে 'দি হোয়াইট মঙ্কী' (১৯২৪) ; 'দি সিলভার স্পুন' (১৯২৬) ও 'সোয়ান সঙ্' (১৯২৮) উপন্যাসগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। এই পর্বে গলসওয়ার্দি পরিবারের অধস্তন পুরুষদের অধঃপতন দেখিয়েছেন। যুগের হাওয়া পাল্টে গেছে, পুরনো নীতি ও ঐতিহ্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেও তারা অবক্ষয় থেকে বাঁচতে পারছে না—ধীরে ধীরে তাদের অস্তিত্ব সংকুচিত হয়ে আসছে। তাঁর তৃতীয় ও শেষ পর্ব 'য়েণ্ড অফ এ চ্যাপ্টার' ('মেড ইন ওয়েটিং' ১৯৩১ ; 'ফ্লাওয়ারিং উইল্ডারনেস' ১৯৩২ ; এবং 'ওভার দি রিভার' ১৯৩৩) অশেষ দুর্বলতায় খর্ব। গলসওয়ার্দি বৃহৎ সম্ভাবনার ক্ষমতা-প্রযুক্ত কথাশিল্পী হলেও তিনি প্রথম শ্রেণীর শংসাপত্র পাবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তাঁর অন্য বিশিষ্ট উপন্যাস : 'ফ্রেটারনিটি' (১৯০৯), 'দি ডার্ক ফ্লাওয়ার' (১৯১৩) তাঁকে সাফল্যের পথে প্রতিষ্ঠ হতে অধিকতর সাহায্য করেছে।

এডওয়ার্ড মরগ্যান ফর্স্টার (১৮৭৯—) আজও জীবিত আছেন। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রবীণ ইংরাজ কথাশিল্পীদের একজন, স্বাতন্ত্র্যে অন্যতম। ফর্স্টার উনবিংশ শতাব্দীর সমুন্নত চিন্তা-চৈতন্যকে আলাদা করে বেছে নতুন যুগের ধারণায় সম্মিলিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য, পরিচ্ছন্ন মানসিকতা সত্ত্বেও তিনি অতিমাত্রায় ভদ্রলোক। আর, এই সজ্জনোচিত ভদ্রতা তাঁকে সাহিত্যের সভায় শ্রদ্ধার আসন দিয়েছে। যুদ্ধের পর যখন জীবনের নতুন মূল্যবোধ জেগেছে মানুষের মনে, সাহিত্যচিন্তা বিবক্ষিত হয়েছে অস্থিরতার তরঙ্গে,—তখনও ফর্স্টার সসম্মানে পঠিত হয়েছেন। তার কারণ বোধহয়, 'He neither assaults the reader with a new creed as does Lawrence, nor stalks forth clad aggressively in technical novelties. His methods, it is true, are new, but they are immediately intelligible'—(Literature between the wars—prof. Evans) ফর্স্টারের রচনা-কৃতিত্ব অথবা তাঁর সৃষ্ট-চরিত্রের জগৎ অপেক্ষা তাঁর উচ্চাসীন ব্যক্তিত্বই তাঁকে জনসাধারণের স্মরণে অম্লান রেখেছে, যদিও তিনি প্রায় পঁচিশ বছর নীরব থেকেছেন, তবু পাঠক তাঁকে ভোলে নি, একাধিক বার পড়ে তাঁর উক্তির চমৎকারকে আস্বাদ করেছে। 'He is one of our assets and is likely to become one of our glories'. ফর্স্টারের 'হোয়্যার এঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড' (১৯০৫) যখন প্রকাশ পেয়েছিল তখন তাঁর বয়স বোধহয় ছাব্বিশের কোঠা ছুঁয়েছে। কিন্তু সেই বয়সেই অসাধারণ ক্ষমতায় গল্প বলার শিল্পকে তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। উপন্যাসটিতে ফর্স্টার বিচক্ষণ চরিত্র-অধ্যয়ন করেছিলেন, অত্যন্ত নাটকীয় পরিস্থিতিতে ইতালী ও ইংলণ্ড এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক-বৈপরীত্য পরিস্ফুট করেছিলেন। ইতালীয় মানুষ, ইতালীয় জীবনযাত্রা প্রতিভাসিত হয়েছিল অবিচল নিষ্ঠায়। ইংলণ্ডের খেয়ালী মেজাজও তাঁর সমালোচনায় উদাসীন ছিল না। ফর্স্টার যদিও এতে স্থানে স্থানে অত্যন্ত ক্রুর ও নিষ্ঠুর হয়েছেন কিন্তু মৃত্যুর অমোঘতা তাঁর হাতে এক বিশেষ রূপ পেয়েছে। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে হয়ত বলেছেন যে, মানুষের শেষ বৈনাশিক পরিণতি তার মৃত্যু কিন্তু সেই মৃত্যু সম্পর্কে মানুষকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে, তার চেতনায় সর্বমোহ-মুক্ত হতে হবে। কারণ মৃত্যু আসে অকস্মাৎ, অজ্ঞাতসারে এবং অপ্রত্যাশায়। আর এই মৃত্যু-চেতনার পুর্বাবহিতিতে মানুষের মঙ্গল আছে। তা তাকে মোক্ষ দেয়, মোহমুক্ত করে। নইলে হয়ত

জিনোর দশা হওয়া স্বাভাবিক, যে-জিনো সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ায় নিজের সব স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে, উন্মত্ত প্রক্ষোভে এমন এক কাণ্ড করে বসতেও দ্বিধান্বিত হয় না যাতে একটি খুনের প্রচেষ্টায় পর্যন্ত অগ্রসরিত হওয়া যায়। 'দি লংগেস্ট জার্নি' (১৯০৭) প্রকাশিত হবার পর ফর্স্টার আরেকটি উপন্যাসে তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে শৈল্পিক-ক্ষমতায় কায়েম করলেন। 'হাওয়ার্ডস য়েণ্ড' (১৯১০) রচনায় ফর্স্টার অনেকাংশে সম্পূর্ণ হতে পেরেছেন, তাতে জীবনের সূক্ষ্ম জটিলতা এবং সৌন্দর্য পিপাসার নিবিড় ছবি উত্তোলিত হয়েছে। কিন্তু 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' (১৯২০) তাঁর শিল্পসৌকর্যের শ্রেষ্ঠ নিরিখরূপে বিরাজ করছে এ যাবৎ এবং জগৎব্যাপী বিপুলসংখ্যক পাঠকের চিত্তভৃপ্তি ঘটাচ্ছে। যদিও অনেকের মত ফর্স্টার এই উপন্যাসে কলাকৌশলের সাধনায় 'হাওয়ার্ডস য়েণ্ড' অপেক্ষা বেশি উন্নত হতে পারেন নি। 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'র পটভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। স্থান চন্দ্রপুর। কাল ১৯২০। মূল ঘটনাবস্তু মিস্ কোয়েস্টেড নামে এক ইংরাজ ললনা এলেন এদেশে তাঁর হবু স্বামীর সংগে সাক্ষাৎ করতে। এসে তিনি নতুন দেশ দেখলেন, মানুষ দেখলেন, দেখলেন ব্রিটিশ প্রভু আর ভারতীয়দের রাজনৈতিক সংঘর্ষ, হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতা। কিন্তু তাঁর এই দর্শন শুধু রাজনীতির বিশ্লেষণে আচ্ছন্ন নেই, তাতে মানবতার রঙ লেগেছে, প্রকৃতি ও পরিবেশ উদ্গত হয়েছে তদ্গত রূপবৈচিত্র্যে। উপন্যাসটি সম্পর্কে Lowes Dickinson বলেছেন, 'a classic on the strange and tragic fact of history and life called India'. ঔপন্যাসিক ফর্স্টার ১৯২৭ সালে কেমব্রিজে 'অ্যাসপেক্টস অফ নভেল' নামে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তা তাঁর ধীরোদাত্ত ভাবনাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে পরিচায়িত করেছে এবং এই রচনাকর্মটি তৎকালের ইংরাজী সাহিত্যে অবদান রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। 'The Perceptive and critical intelligence implied in his survey 'Aspects of the Novel', puts finishing touch on his highly scrupulous figure'.

যুদ্ধ সব ছত্রাকার করে দিল। প্রচলিত ভিক্টোরীয় ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্বর হলো উদ্ধত। মহাকাব্য, রোমান্স, পুরাতন ছড়া-গান ধীরে ধীরে চিরতরে স্মরণের ওপারে নির্বাসন পেল। সাহিত্যের সত্য হলো জীবনের সত্য। কোন্ জীবন? যুদ্ধের বিধ্বংস যে-জীবনের শান্তি হরণ করে একটা অস্থির ক্ষয়িষ্ণুতার

রন্ধ্রহীন অন্ধকার গহ্বরে মানুষকে ধীরে ধীরে ঠেলে দিচ্ছে। চিরাচরিত অভ্যস্ত পথের গমনাগমন শেষ হলো, ঐতিহ্যবোধ শুকনো মালার মতো কোনক্রমে লেগে রইল গলায়। মনুষ্যসমাজের ভাল-মন্দের ব্যাকরণ আর পুরাতন মতে কাজ করল না —বহুদিনের ব্যবহৃত বিশ্বাস পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং নতুন মূল্যে ও মানে প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু টি. এস. এলিয়ট, জেমস জয়েস কিংবা আমেরিকার এজরা পাউণ্ড কাব্যে বা উপন্যাসে যে নব্য-আন্দোলনের জিগির তুলেছিলেন তার সঙ্গে যুদ্ধের ঠিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। ('The war was not in itself the cause of the new movements'—The modern writer and his world.) যুদ্ধের আগে থেকেই সেই আন্দোলনের প্রস্তুতি চলে এসেছে। তার আগে, লিটন স্ট্রেচির সাহিত্য-সাধনার স্বতন্ত্র পদ্ধতি, তাঁর মনীষা, শিল্পসূক্ষ্মতা বহুজনের শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তিনি বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে নিশ্চিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। স্ট্রেচি তাঁর নামমাত্র কয়েকটি রচনার কলারীতির ঔৎকর্ষের জন্যই আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং সেই কারণেই ভবিষ্যৎকালের সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সম্পর্কে এই বলে মন্তব্য করেছেন যে, 'কিন্তু স্ট্রেচির মনীষা অলোকসামান্য, তাঁর অবদান অনতুল এবং অতীতের পুনরুজ্জীবনে তিনি যে-প্রকরণ খাটিয়েছেন, তার উপযোগিতা এতই স্বতঃপ্রমাণ যে জ্ঞানত বিপরীতগামী হলেও তরুণেরা এখনও স্ট্রেচিরই অনুকারী'। স্ট্রেচির অবশ্যপাঠ্য বইগুলির নাম 'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ানস্' (১৯১৮); 'কুইন ভিক্টোরিয়া' (১৯২১); 'বুকস্ অ্যাণ্ড ক্যারেকটার্স' (১৯২২) এবং 'এলিজাবেথ অ্যাণ্ড য়েসেক্স' (১৯২৮)।

•

জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯২৪) সাহিত্যের গতানুগতিক ভাববিলাসকে বর্জন করে অন্যতর অভিব্যক্তির আশ্রয় নিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতাকে চেতনার আলোয় সমৃদ্ধ করলেন। উপন্যাসের প্রাচীন কাঠামো এতদিন পরে খসে পড়ল এবং জয়েস নিজের ভাববিশ্বে তা নতুন করে নির্মাণ করলেন। অনেকেই এবম্বিধ ধারণার বশবর্তী যে, জয়েস-প্রবর্তিত নতুন উপন্যাস-ধারার অনুসারী হচ্ছেন তরুণতর ঔপন্যাসিকগোষ্ঠী এবং জয়েসই আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসের জনক কিন্তু তাতে বিতর্কের অবকাশ আছে। জয়েস তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভ থেকেই চারপাশের অবস্থায় বিদ্রোহের মনোভাব পোষণ করে এসেছেন। তখন থেকেই তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্বাসন দিয়েছেন, ইওরোপে বসবাস করেছেন, ফরাসী

মেজাজে নিজের মানসকে গঠিত করে অভিনব শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন : 'Nature made him an artist, but mixed her gifts. He was acutely responsive to observed details—a gesture, tone, phrase or outline—but he could not make the best of them unless they gave sudden meaning to the thoughts he had acquired elsewhere through intellectual contacts. He must and could detect the whole in the otherwise negligible part'. জয়েস যৌবনকালে যে-দুটি বই লিখেছিলেন ('দি ডাবলিনার্স' ১৯১৪; 'এ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান' ১৯১৬) সে বই দুটি ছিল তাঁর পরবর্তী কর্মধারার প্রস্তুতিমাত্র। তাঁর মানসিক উচ্চয়ের খসড়া। প্রথম প্রথম ইবসেনের রচনা-কৌলিন্যও মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। 'এক্সাইলস্' (১৯১৮) উপন্যাসে সেই মুগ্ধাবস্থার প্রভাব তিনি গোপন করতে পারেন নি। কিন্তু এসবই সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্য—জয়েস যেদিন থেকে 'য়ুলিসিস'-এর বৃহৎ কর্মারম্ভ করেছেন সেদিন থেকে তিনি অন্য প্রত্যয়ে স্বতন্ত্র জগতের মানুষ। হোমরের 'ওডিসি' মহাকাব্যের মতো আধুনিক কালের জীবন-সংবর্ত ও মানসিক বিবর্তনকে কেন্দ্র করে তিনি কালের এপিক সংরচনায় নেমেছেন। সেই সময় ফ্রান্সেও আরেক বিপুলাকার গ্রন্থ-নির্মানের কাজ চলছিল—মার্সেল প্রুস্ত ছিলেন তার মহাশিল্পী। 'য়ুলিসিস' সম্পর্কে মতান্তরের শেষ নেই। কোন কোন সমালোচক বইটিকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি রূপে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কেউ আবার এককথায় ধোঁকা আর ধাপ্পা বলে নাকচ করেছেন সব গুরুত্ব। কিন্তু লেখার অসাধারণ প্রসাদগুণকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি। সেই কারণে বইটির এক স্বতন্ত্র মূল্য আছে বিশ্বসাহিত্যে। শুধু আকারেই যে উপন্যাসটির যাবতীয় ঐশ্বর্য নিহিত আছে, তা নয়; প্রকারেও বহুতর বৈশিষ্ট্য আছে। 'Stream of consciousness' বা 'চেতনাপ্রবাহ' নামে যে-বিশেষ রচনাভংগীটি আধুনিক কালের কথাসাহিত্যে জটিল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, জয়েস তাঁর এই রচনায় সেই তত্ত্বকে সুন্দরভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। উপন্যাসে সাধারণ অর্থে ঘটনার ঘনঘটা থাকে, থাকে একটি সুনিপুন কাহিনী। কিন্তু 'য়ুলিসিস' তথাকথিত ঘটনামুক্ত, কাহিনীবর্জিত এক অভিজ্ঞতার শিল্পসম্মত বর্ণনামাত্র। ১৬ই জুন ১৯০৪ সালে জনৈক লিওপোল্ড ব্লুম জীবনের চরম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল মাত্র ষোল ঘণ্টায়। তার ডাবলিনের পারিপার্শ্বিকতা

এবং জীবনের সেই অভিজ্ঞতার বিশদ ও বুদ্ধিদীপ্ত বর্ণনা ঘটেছিল জয়েসের হাতে। (সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'য়ুলিসিস' সিদ্ধির সন্নিকর্ষে পৌঁছেও কেবল ঔৎসুক্যময় পরীক্ষাতে আবদ্ধ থেকে গেছে'।) তিনি ব্লুমের সেই অনাস্বাদিত হঠাৎ-প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে ওডিসির ইউলিসিসের সমাবস্থায় সাজিয়েছিলেন। আসলে উপন্যাসটি এক সংবেদন মনের সচেতন অভিযান ব্যতীত আর কিছু নয়—জীবনের একটি নিয়ম-ছুট্ দিনের আশ্চর্য সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা। ব্লুমের মনোভংগী, মেজাজ, প্রক্ষোভ এবং তার চতুঃস্পার্শে সমবেত কয়েকটি মানুষের ছোট ছোট ভীড়—সবটুকুই যেন জীবনের অনন্ত বারিধি থেকে খসে পড়া একফোঁটা জল। জয়েস এই উপন্যাসে শুধু যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং রচনার পদ্ধতি, আধার বা আকারে বৈশিষ্ট্য-সৃষ্টির অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন তা নয়, ভাষা নিয়েও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর সুবিন্যস্ত ভাব গানের মতো ভাষা পেয়েছিল্ স্থানে স্থানে। আশ্চর্য সেই ভাব ও ভাষার খেলায় জয়েসকে ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়েছে তিনি যেন সব কিছু বশ করার মন্ত্র জানেন—বাঁশী বাজিয়ে এখন তাই খেলা দেখাচ্ছেন। যেখানে ব্লুম আর স্টিফেন পরস্পরকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে সেখানে হঠাৎ শোনা গেল, 'Sound of the peal of the hour of the night by chime of the bells in the church St. George'. এখানে একই সংগে যেন ছন্দ বাজছে, বাজছে গীর্জার ঘণ্টা। এমনি আরো আছে। বইটি সম্পর্কে প্রচণ্ড অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল একদিন ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। সেন্সরের কঠিন বাধা-বন্ধ নেমে এসেছিল উপন্যাসটির উপর। এখন অনেকেরই ধারণা যে, আধুনিককালের এই সর্বশক্তিময় ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-বিস্ফোরকটিকে আমেরিকার কলেজে কলেজে পাঠ্য করা প্রয়োজন। কারণ, এযুগে 'য়ুলিসিস'-এর বিস্ময়কর গুরুত্ব সম্পূর্ণ অনস্বীকার্য। কারণ, 'Joyce was sent to put the fear of God in our hearts'.

'ফিনিগ্যানস ওয়েক' (১৯৩৯) সেই চেতনা-প্রবাহের কলাকৌশলকে আরো আশ্চর্য গভীরতায় ও সূক্ষ্মতায় সিদ্ধ করেছে। জয়েস সতের বছরের পরিশ্রমে ও যত্নে বইটি লিখেছিলেন। অবচেতন মনের গতিপ্রকৃতি এই উপন্যাসে এক নতুন ভাষা পেয়েছে এবং জয়েস উপন্যাস-রচনার আরেক নতুন উপায় ও উপচয়কে আবিষ্কার করার দুর্লভ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'য়ুলিসিস'-এ জয়েস জাগ্রত চেতনার বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছিলেন, 'ফিনিগ্যানস ওয়েক' নিদ্রিত স্বপ্ন-চেতনার মাঝে মনের নিঃশব্দ চলা-ফেরাকে অভিভাবিত করেছে।

'Where 'Ulysses' deals for the most part with the waking consciousness 'Finnegan's wake' deals with the dream consciousness and to expresss the confused, blurred, condensed and irrational quality of the dream world, Joyce felt he required a new and much more free use of language'. টিম ফিনিগ্যান মই থেকে পড়ে যাবার পর কাহিনীর শুরু হয়েছে। জয়েস বলতে চেয়েছেন ফিনিগ্যান কেবলমাত্র একটি চরিত্র নয়, সে আধুনিক মানুষের প্রতীক, প্রতিনিধি। জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুজ্জীবনের পথচক্রে সে সকল মানুষের জীবনসত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, প্রাণ দিয়ে ব্যক্ত করেছে। তার পতনও কোন সাধারণ পতন নয়। এ-পতনে প্রথম মানুষের (আদম) পতনের ইঙ্গিত আছে, এ-পতন মানুষের শোভনতা থেকে, শালীনতা থেকে, উদারতা থেকে পতন। 'ফিনিগ্যানস ওয়েক'কে কোন কোন সমালোচক গদ্যকবিতায় অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন উপন্যাসটিতে প্রচুর সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও 'য়ুলিসিস'কে নিয়ে এত মাতামাতি করার কোন যৌক্তিকতা নেই এবং জয়েসকে যে-স্থান দেবার আয়োজন চলেছে কথাসাহিত্যে তাও একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরমাত্র। কারণ, তাঁর সন্দেহাতীত প্রতিভা এবং সুগভীর বর্ণনায় চেতনা-প্রবাহের অনুশীলন সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে উপন্যাসের নতুন দিগন্ত-বিস্তারের যে কৃতিত্ব আরোপ করা হয় তাকে স্বীকার করা যায় না। 'We are not about to attack Joyce himself, nor even the Joyce cult, which gives some people pleasure and does the rest of us no harm , but the development of fiction between the wars cannot be honestly dealt with, nor indeed Joyce and his work clearly seen, unless we are prepared to be reasonably realistic about him. It is simply not true that he is the great influence in modern fiction. Not one younger novelist of any importance derives from him. He did not invent though he certainly enriched, the various subjective-narrative techniques known as stream-of-consciousness, free association, interior monologue, all of which had been used before. Moreover if the truth must be told, these techniques, unless used sparingly

and very selectively or as a sheer tour-de-force, like Mrs. Bloom's famous free-association-interior-monologue at the end in 'Ulysses', tend to be clumsy, fatiguing and downright boring. And Joyce did not open new avenues for the novel, but created his own magnificent cul-de-Sac. He was not himself intensely concerned with modern literature and thought and, apart from his astonishingly linguistic researches, preferred to think about and enjoy music. He can be called a great novelist—anybody can be called anything ; and greatness cannot be denied him—but there might have been far less confusion if he had been hailed and praised, as he well deserves to be, in some other style'. (Literature And Western Man : J. B. Priestley). কিন্তু জয়েস সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত অভিমত বলে বিবেচিত হতে পারে না, কারণ তাঁর বিশেষ রচনার নীতি, যার সমর্থনে এখন অনেকেই মনের ঐক্য খুঁজে পাচ্ছেন না, তার স্থায়িত্ব, তার সমৃদ্ধি যদি কালের বিচারে সুরক্ষিত হয়, প্রসার পায়, তবে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে জয়েস যুগান্তর-রচয়িতার সম্মানিত স্থান অধিকার করে থাকবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁকে একটি বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত শিল্পীর গৌরব থেকে নাকচ করা যাবে না।

'চেতনাপ্রবাহ' বস্তুটির যথার্থ সংজ্ঞা কি ? জয়েসের পরে যে-তত্ত্ব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (১৮৮২-১৯৪১) দ্বারাও অনুসৃত ও পরীক্ষিত হয়েছিল ? 'In literature a 20th century technique derived from the vocabulary of psychology in which character and events in narrative are presented through the mental images, emotional reactions and thoughts of the main characters. The author attempts to follow the uninterrupted flow of conscious reactions and associations which pass through the minds of his characters as they act externally during a period of their lives'. ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর 'মিসেস ডালোয়ে' রচনাটির আলোচনা করতে গিয়ে জে. ডব্লু. ক্রুচ চেতনাপ্রবাহের সুন্দর এক বর্ণনা দিয়েছিলেন : Miscellaneous, vague,

chaotic, composed of memories, moods sensations and desires mingled helterskelter with things tragic and comic, trivial and important, treading upon the heels of one another, the stream goes continuously on from the moment we wake, till it trails off fainter and fainter into slumber or death'. সুপণ্ডিত মনীষি স্যার লেসলি ষ্টিফেনের মেয়ে ভার্জিনিয়া অত্যন্ত শৈশব থেকে শিক্ষা, রুচি ও শিল্পের প্রতিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে তাঁর উপজ্ঞা শনৈঃ শনৈঃ তীক্ষ্ণ হতে পেরেছে। মার্সেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস, বের্গসঁ থেকে শুরু করে যাবতীয় ফরাসী ও ইংরাজী ধ্রুব-সাহিত্য তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল। জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতার সব কিছু তিনি নিজে পরখ করে দেখেন নি, গ্রহণ করেন নি তার আস্বাদ কিন্তু অসীম পাঠতৃষ্ণায়, গভীর অভিনিবেশে বইয়ের পাতায় পাতায় তিনি জীবনের মর্মবাণী অধ্যয়ন করেছিলেন। তাই তাঁর পরিস্রুত চিন্তা সহজাত শিল্পীমানসের সংগে মিশ্রিত হয়ে এক স্বচ্ছ সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিল, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এবং কবিতার মতো ছন্দোময়। জয়েসের হাতে ভাষার যেমন লীলাখেলা চলেছে উল্‌ফ হয়ত তেমন পারদর্শিতায় ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারেন নি, কিন্তু চেতনা-প্রবাহের কলাকৌশল তাঁর হাতে যেন অধিকতর সার্থকতা পেয়েছে, তিনি চিত্ররচনায় যত কৃতবিদ্য হয়েছেন চরিত্ররচনায় তত সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। জীবনের সকল বৃত্তান্ত—সকল ভাবনা, অনুভূতির ছোট-বড় ক্ষণবিদ্যুৎ, নানা কল্পনা এবং নানা চিত্রকল্পর বর্ণালী তিনি তড়িৎগতিতে ও বিস্ময়কর বিশদতায় আঁকতে অভ্যস্ত—সর্বোপরি তিনি ছিলেন কবি, তাঁর রচনায় গীতি-কবিতার রসটি ছিল প্রস্ফুট কিন্তু জয়েসের মতো ফলপ্রসূ গদ্যসৃষ্টির বুদ্ধি ও ঋদ্ধি তাঁর ছিল না। কবি ছাড়া এমন করে কে আর লিখতে পারত! 'দি ওয়েভ' এর একটি বিশেষ স্থলের বর্ণনায় আছে: 'Their quivering mackerel sparkling was darkened; they massed themselves; their green hollows deepened and darkened and might be traversed by shoals of wandering fish. As they splashed and drew back they left a black rim of twigs and cork on the shore and straws and sticks of wood, as if some light shallop had foundered and burst its sides and the sailor had swim to the land and bounded up the cluff and left his frail cargo to be

washed ashore'. উল্‌ফ-এর প্রথম রচনা 'দি ভয়েজ আউট' (১৯১৫) দুটি তরুণ তরুণীর জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, তাদের যৌন-জিজ্ঞাসা, জীবনকে পরিপূর্ণ জানবার ও ভালবাসার এবং পরিশেষে মৃত্যুর ব্যর্থতা দিয়ে পরিসমাপ্ত হবার গল্প সচেতন ও স্বতন্ত্র অনুভবের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'নাইট অ্যাণ্ড ডে'-তেও (১৯১৯) তিনি নিজের বৃত্ত রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন নি, অনেকাংশে জেন অস্টেনী ধারায় মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি শিক্ষিতা মেয়ের জীবন-অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু 'জেকবস্‌ রুম' (১৯২২) উপন্যাসে নতুন সুর ও স্বর ধ্বনিত ও ঝংকৃত হয়েছিল। জেকবকে যারা জানত তাদের স্মৃতিপথে টুকরো টুকরো ছোট-ছোট ছবি ভেসে উঠল, সেই স্মরণের রঙে রঞ্জিত ছবির দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর ঘটল মনুষ্য-মন থেকে মনুষ্য-মনান্তরে। এক বিচিত্র পন্থায় লেখিকা খণ্ডে খণ্ডে একটি অখণ্ড মণ্ডলাকারকে ব্যক্ত করলেন, স্মৃতির মধুখ গলে গলে একটি রূপ পরিণদ্ধ হলো। অতঃপর যে-দুটি উপন্যাস ('মিসেস ডালোয়ে', 'টু দি লাইট হাউস') লিখলেন উল্‌ফ সে দুটিই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কৃতিত্ব বহন করে আছে। বই দুটিতে তিনি শুধু যে জীবনের বর্ণমূলকে সচেতনে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন তাই নয়, সেই সংবাদকে যথার্থ কৌশলে নিবেদন করায় ফলপ্রসূও হয়েছিলেন। 'মিসেস ডালোয়ে' (১৯২৫) উপন্যাসে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার (জয়েসের অনুসরণে আয়োজিত) ঘটনায় একটি মধ্যবয়সী নারীর সজীব ও সচল মানসলোক উদ্‌ঘাটিত হলো বিস্ময়কর আবর্তনে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিগম একান্ত বিশুদ্ধতায় পরিস্ফুট করতে প্রচেষ্টিত হলেন লেখিকা। কিন্তু তিনি সর্বাংশে বোধহয় সাফল্যলাভ করতে পারলেন না, কেননা, 'But Mrs. Dalloways world seems to lack the substance and solidity that we are accustomed to associate with life, and one feels a thinness of character drawing, and a disappointment that such remarkable facility with language of great beauty should have been spent for gains not quite worth the effort'. যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'মিসেস ডালোয়ে পড়ে একটা এমনই পরিতৃপ্তি পেয়েছিলুম; এবং নায়িকা আপনা থেকে সমাপ্তির সীমায় না দাঁড়ালে, তাকে ধরতে-ছুঁতে পারিনি বটে, কিন্তু বই বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আমাতে যে-নিবিড় সৌহৃদ্য গড়ে উঠেছিল, তা কেবল তাদের মধ্যেই সম্ভব, যারা জন্মাবধি পাশাপাশি বেড়ে, শেষে একদিন বার্ধক্যের আরামকেদারায় গা ছড়িয়ে বসে।'

'টু দি লাইট হাউস' (১৯২৭) উল্‌ফ-এর রূপকার-মনের সার্থকতর বিকাশ ও বিস্মৃতি। জীবনের পরিবর্তমান চক্রের সুখ-দুঃখ, মোহ, মোহভংগ, স্মৃতি-বিস্মৃতি এখানে গভীর অর্থবোধ্যতায় প্রতীয়মান হয়েছে। র‍্যামজে পরিবার, শিল্পী লিলি এবং লাইটহাউস—এই তিন উপকরণকে সামনে উপস্থাপিত করে তিনি প্রতীকাশ্রয়ে জীবনের দর্শনকে রচনার অন্তরালে সূক্ষ্মতানে মন্দ্রিত করেছিলেন। উলফ্-এর পরবর্তী উপন্যাস 'অরল্যাণ্ডো' (১৯২৮) নৈর্ব্যক্তিক আত্মজীবনী বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ যদি চ তাতে ঘটনার ঘনঘটা কম নেই এবং নানাবিধ নিপুণ মানসিক নিদানে, কৌতুক-নির্ঝরে রচনাটি পরিপ্লুত। 'দি ওয়েভস্' (১৯৩১) সম্পর্কে সর্ববাদীসম্মত মতামত গ্রাহ্য নেই। উপন্যাসটিকে কেউ বলেছেন, 'Virginia Woolf's masterpiece' এবং 'This work would be an outstanding achievement for the surpassing excellence of its style in any literature'. অপরপক্ষে বাঙালী সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন,..... 'দি ওয়েভস্' আমার শ্রদ্ধা জাগাতে পারে নি।......হয়তো ছয়টি প্রাণীর সম্বন্ধসূত্রের গ্রন্থি-মোচন 'দি ওয়েভস্'-এর উদ্দেশ্যই নয়, তার লক্ষ্য ছয়টি বিভিন্ন চৈতন্যের অন্তর্গূঢ় ঐক্য নির্দেশ। তাহলেও বইখানিকে অবশ্যম্ভাবী বলা শক্ত, এবং যিনি নিছক পরস্মৈপদের সাহায্যে 'দি ওয়েভস'-এর একমাত্র জীবন্ত চরিত্র পার্সিভ্যাল্-এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন, চৈতন্যরূপ সূক্ষ্ম ব্যাপারে এইরকম অফুরন্ত বক্তৃতা তাঁর মুখে কেমন যেন বিসদৃশ শোনায়। আসলে শ্রীমতী উল্‌ফ্-এর কাছ থেকে কেবল সৌখিন শিল্প পেয়ে আমরা খুশি নই।' 'বিটুইন দি অ্যাক্টস' (১৯৪১) উলফ্-এর শেষ উপন্যাস-গ্রন্থ। উলফ্ কোনদিনই জমাট গল্প বলার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারেন নি, তথাকথিত ঔপন্যাসিকের স্বভাবকে তিনি আপন রচনায় সিদ্ধ করতে সক্ষম হন নি কদাচ। তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সংগে পরিশীলিত শিল্পবোধের সাযুজ্য ঘটেছিল, তাই জীবনকে সরাসরি স্পর্শ না করেও মানুষের মনকে তিনি স্পর্শ করতে পারতেন সুরের মূর্ছনার মতো। তাঁর রচনার পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করতে হলে সর্বাগ্রে পাঠককে প্রস্তুত হতে হবে, প্রশস্ত করতে হবে তার বুদ্ধি ও অনুভূতির সীমানা। 'Measure indeed, a judgement fine and just as much as penetrating, an intelligence as sharp as steel and yet not needlessly cruel, the clear analysis of slender and almost immaterial data—such classical merits enriched by the most

modern intuition are displayed by Mrs. Woolf in her literary or social essays'.

ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০) সম্পর্কে জগতের সাধারণ পলায়নী-আনন্দ-সন্ধানী পাঠকের নিশ্চিত ধারণা যে, তিনি যৌনবিষয়ক কাহিনীতে অত্যন্ত উদ্যমী এক কৃতবিদ্য পুরুষ। উপরন্তু, 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' শ্লীল অথবা অশ্লীল এই আলোচনা নিয়ে জগদ্ব্যাপী যে আলোড়ন হলো সম্প্রতি, তাতে সাধারণের সেই ধারণাকে আরো দৃঢ়ীভূত করাই স্বাভাবিক। যদিচ তাঁর মতো প্রগাঢ় প্রজ্ঞালব্ধ কুশলী শিল্পী কোন দেশের সাহিত্যে খুব বেশি জন্মলাভ করেন না। লরেন্সের সমগ্র সাহিত্যকর্মে অত্যন্ত অভিনিবেশ-বিচরণে এই প্রশ্ন মনে উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি কি সত্যই সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন অথবা তাঁর অন্তর্লব্ধ এক সজ্ঞান-নিখিল বিশেষ তথ্য ও দর্শনরূপেই স্বপ্রকাশের পথ খুঁজেছিল? নটিংহ্যামশায়ারের সেই কয়লাখনির মত্তপ শ্রমিক-পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি জীবনের যে করুণ এবং বীভৎস চেহারা দেখেছিলেন, তা তাঁকে জননীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণের গ্রন্থি রচনায় সাহায্য করেছিল এবং তখন থেকেই তিনি সর্বমোহমুক্ত অপক্ষপাত দৃষ্টিতে আপন অনুভব ও অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনধর্মের উদ্ধত, উলঙ্গ উন্মোচন চেয়ে আসছেন। আর, এই উন্মোচন-মার্গে তাঁকে সবসময় পরিচালিত করেছে যুক্তি ও চিত্ত-চৈতন্য। ক্রমে তিনি হৃদয়ংগম করলেন একটা অতীন্দ্রিয় ভাব তাঁর সেই যুক্তি ও চিত্ত-চৈতন্যের সংগে ওতপ্রোত হচ্ছে এবং তিনি বুঝতে পারছেন যে, আমরা হয়ত স্বতই ভুল করি মনে মনে, কিন্তু বিবেক, বিবেচনা ও জ্ঞানের সহায়তায় তার পুনরুদ্ধার চাই, চাই একটা ধর্মের অবলম্বন যাকে তিনি আখ্যা দিলেন: 'new germ of God-knowledge'. তিনি আরো প্রত্যয়িত হয়েছিলেন যে, যে-প্রাচীন গোঁড়া ও সংস্কারযুক্ত সমাজে তাঁরা বসবাস করছেন তার শরীরে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ বোধহয় যৌনকামিতা। আর, এই যৌনকাম জীবনের একটা প্রচণ্ড, দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি, যা অতিবর্তিত করে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে রোধ করার চেষ্টা একটা নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র, তাতে সমাজের দুর্নীতি ব্যাপকতর হয়। 'I always labour at the same thing to make the sex relation valid and precious, instead of shameful'. ছোট গল্পের অসাধারণ শিল্পী লরেন্সের প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাসে ('দি হোয়াইট পীকক্' ১৯১১; 'দি ট্রেস্‌পাসার' ১৯১২) ক্ষমতার উদ্‌গীরণ যথাযথভাবে স্বয়ম্ভরিত

হয় নি কিন্তু 'সন্স্ অ্যাণ্ড লাভার্স' (১৯১৩) প্রকাশ পাবার পর থেকেই তাঁর যথার্থ 'পৌছান সংবাদ' পাওয়া গেল। মুখ্যত ওই সৃষ্টিতেই তিনি আপন কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছেন ভিক্টোরীয় কথাসাহিত্যের সংকীর্ণ সংস্কারজাত সরণিতে। লরেন্সের ব্যক্তিগত জীবনে আলোকপাত করার ফলে যতদূর জানা গেছে তাতে এই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই উপন্যাসটির মূল আখ্যানবস্তু লেখকের আপন জীবনের ভাবসংঘাত থেকেই প্রস্তুত। লরেন্স যে-সমস্যায় কণ্টকিত হয়েছেন, হয়েছেন ক্ষতবিক্ষত, বইটি যেন তারই সুতীব্র জ্বালাকে বহন করে আছে। উপন্যাসটির প্রথমাংশ অর্থাৎ মত্তপ কয়লাকাটা পিতার দৈনন্দিন উৎপীড়ন এবং মায়ের সংগে তার অদ্ভুত সম্বন্ধের গ্রন্থিবন্ধন, প্রাত্যহিক পরিবার-জীবনের নিখুঁত বৃত্তান্ত ইংরাজী কথাসাহিত্যের সংগ্রহশালায় এক স্থায়ী সম্পদ-রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে কিন্তু পল মোরেল-এর সংগে ক্লারা ও মিরিয়মের সম্পর্ক তেমন শিল্পনৈপুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, পারেনি তেমন ভাবৈশ্বর্যের সন্ধান দিতে তাই গলসওয়ার্দি পর্যন্ত আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, 'that kind of revelling in the shades of sex-emotion seems to me anaemic'. লরেন্স যৌনতত্ত্বের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাকে তাঁর প্রায় সকল রচনায় সর্বান্তঃকরণে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, তাই 'সন্স অ্যাণ্ড লাভার্স'-এ ফ্রয়েড প্রচারিত 'ঈডিপাস কমপ্লেকস' শোচনীয় অথচ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। 'দি রেইনবো' (১৯১৫) তিনটি পরিবারের সম্পর্কসূত্র এবং বিবাহের নানা উপাদান ও নিদানকে করেছিল নিষ্ক্রমিত। উপন্যাসটির ভাষালালিত্য, স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের অবাধ পরিদৃশ্য লরেন্সকে এত পরোৎকর্ষতা দিয়েছিল যার তুলনা তাঁর সমগ্রজীবনের সাহিত্যকর্মে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না। 'আরনস্ রড্' (১৯২২) সম্বন্ধে মিডলটন. মারী (যিনি লরেন্সকে খ্রীষ্টের সংগে তুলনা করতে চেয়েছিলেন) উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং অস্মিতার প্রক্ষিপ্ত রূপ—একটি মনুষ্যমনের আড়ালে আরেকটি সচেতন সত্তার কঠিন উপস্থিতি, লরেন্স এই উপন্যাসে তাঁর সুবিন্যস্ত চিন্তানুভূতির হেত্বাভাসে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন 'আরনস্ রড্' পড়ে মাঝে মাঝে দস্তয়ভস্কীর স্বাদ পাওয়া যায় এবং ফ্রয়েডকে তিনি একান্ত অনুরাগে ব্যাখ্যা করেছেন। 'উইমেন ইন্ লাভ' (১৯২১) দু'জোড়া দাম্পত্যজীবনের সম্বন্ধাভাস আর 'দি প্ল্যুমড্ সার্পেন্ট' (১৯২৬) লরেন্স-এর মেক্সিকো সফরকালের প্রত্যক্ষ ফল—ফাসিস্ত স্বৈরাচারের

রক্তোন্মাদ বিভীষিকাময় পরিকল্পনায় পরিব্যাপ্ত। তাতে তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, যীশু ও মেরী সেই অভিশাপদুষ্ট বসতি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং প্রাচীন আজটেক দেবতারা অধিষ্ঠিত হচ্ছেন স্বীয় ক্ষমতাবলে আর তার ফলে রক্তনদীর ধারা বয়ে যায় এবং এক ইওরোপীয় ললনা সেই ভয়ংকর দেবতাদের পায়ে বিয়ের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করল। (এই প্রসঙ্গে তাঁর 'দি উওম্যান হু রোড্ অ্যাওয়ে' গল্পটি পাঠকের মনে পড়বে)। আসলে লরেন্স তাঁর এই ভিন্নতর রসাস্বাদের উপন্যাসটিতে মেক্সিকোর স্পেনীয়-ভারতীয় মিশ্র জাতির মধ্যে প্রচলিত আধুনিক ক্যাথলিকতাবাদের বিরুদ্ধে উচ্চণ্ড প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন। 'লেডি চ্যাটালিজ লাভার' (১৯২৯) লরেন্সকে যত নিন্দা দিয়েছে, প্রশস্তিও গেয়েছে তত। বিশ্বের সাধারণ রুচির মানুষ যারা কামনা-বাসনার আশু তৃপ্তি খুঁজতে উপন্যাসের পাতায় পাতায় লোলুপ দৃষ্টি চালনা করে বেড়ায়, তারা এই বইতে উল্লসিত হবার মতো রসবস্তু আবিষ্কার করে থাকে। তাদের অনেকের কাছেই লরেন্স-এর পরিচয় এই একটি উপন্যাসে আটকা পড়ে। লরেন্স উপন্যাসটিতে সেই তত্ত্ব উচ্চৈঃস্বরে পুনরাবৃত্তি করেছেন, সেই দেহবাদ, যা তিনি জীবনের প্রত্যূষ থেকে মনুষ্যপ্রকৃতির ধ্রুব অঙ্গ বলে জেনে এসেছেন, জ্ঞান করেছেন চরম ও অমোঘ সত্য বলে। আনা অবশ্য এখানে কোন স্বাভাবিক নারী নয়, সে মূর্তিমতী ব্যভিচার মাত্র, রতির আরতিতে রত সে এক চিরন্তন নারী-বিভীষিকা। বহুজনের ধারণা লরেন্স এই উপন্যাসে তাঁর চরম পরোৎকর্ষতা স্থাপন করেছেন, এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ। লরেন্স-এর শেষ বই দুখানি ('দি ভাজিন অ্যাণ্ড দি জিপসী' ১৯৩০; ও 'দি ম্যান হু ডায়েড') সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'লরেন্স-এর শেষ বই-দুখানি রূপসৃষ্টি হিসাবে তাঁর অন্যান্য বইয়ের উপরে স্থান পাক বা না পাক, এ-দুটি কেবল গল্প, এমন বিশ্বাস ভুল। গল্প বাস্তব-পন্থী হওয়া দরকার কিনা, সে প্রসঙ্গ এখনও তর্কাধীন; কিন্তু রূপসৃষ্টি আর রূপকথা যে এক নয়, তা বোধহয় নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো বিশুদ্ধ চৈতন্যের মতোই দুর্লভ। অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক প্রকৃত আর্টিস্ট চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টিতে একটা শিল্পোত্তর অর্থ, একটা রূপাতীত সংগতি, একটা অনির্বচনীয় সত্য ফুটে ওঠে; এবং কেবল মোনালিজার মুখভঙ্গিই রহস্যময় নয়, অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর হাসিও সমস্যামূলক। 'দি ভার্জিন অ্যাণ্ড দি জিপসী' ও 'দি ম্যান হু ডায়েড' বই দু-খানিতেও কথকতাই লরেন্স-এর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাঁর আসল অভিপ্রায় সমস্যার সমাধান; এবং এ-মত

যে আমার কপোল কল্পিত নয় তার প্রমাণ মিলবে কাহিনী দুটির বিশ্লেষণে।…
এখানেও লরেন্স পূর্বোক্ত অভিমতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন যে বিদেহ জীবন নিরর্থ বিড়ম্বনা। কিন্তু সম্পূর্ণ বই দু'খানির শিল্পকৌশল এমনই চতুর, আখ্যানভাগ এমনই মর্মস্পর্শী, চরিত্রচিত্রণ এত সজীব, এত অসন্দিগ্ধ, আবেগ এরূপ গভীর, এরূপ অথল যে প্রচারপ্রবৃত্তি অনায়াসেই কাব্যে পর্যবসিত হয়েছে। কথকতার স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা তর্কের আলোড়নে কোথাও আবিল নয়, লেখার মধ্যে পাঠককে ধর্মান্তরে টানার কোনও চেষ্টাই নেই; এবং সেই জন্যে বোধহয় বই দুখানি উপসংহারে পৌঁছবার অনেক আগেই বুঝতে পারি যে লেখক আমাদের কায়মনোবাক্যে জুড়ে বসেছেন। একটি লাইনেও গুরুগিরির চোখরাঙানি ধরা পড়ে না; প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ অনুকম্পীয় আবেদনে মুখর। তাই আমাদের বুদ্ধি লরেন্সকে মানুক বা না মানুক, আমাদের নিষ্ঠা নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। এমনই করে অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে অন্তরের তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে এক কাব্য; এবং এই মন্ত্রসিদ্ধির পরিচয় লরেন্স-এর রচনায় আমরা বারবার পাই।' লরেন্স দেহকে দেবালয় করতে চেয়েছেন, যৌনকামকে চেয়েছেন সৌন্দর্যরূপে উপাসনা করতে (All I want is to answer to my blood, direct, without forbidding intervention of mind or moral or what not. I conceive a man's body as a kind of flame like a candle, forever upright and yet flowing ; and the intellect is just that is shed on the things around). কিন্তু তাঁর চলা ক্ষুরস্য ধারায়, তাই হাক্সলে পাঠকদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, লরেন্স অধ্যয়নে এতটুকু মনোযোগের অভাব ঘটলে তাঁকে ভুল বুঝবার অবকাশ থেকে যাবে আর সেই ভ্রান্তিবিলাসের অন্ধকার থেকে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম ও জীবনধর্মের উদ্দেশ নিতে গেলে তাঁর স্থষ্টি চিরকাল আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়েই থাকবে, আমরা তার তন্ময় রসাস্বাদ করতে পারব না। আসলে, লরেন্সকে এই বিংশ শতাব্দীর 'অর্ধেক মানব এবং অর্ধেক ভবিষ্যদ্বক্তা'র আসন দেওয়া যায় কিনা তা ভাবা উচিত।

অল্ডাস হাক্সলে (১৮৯৪—) উচ্চ কল্পনাশক্তিতে লরেন্সকে কিংবা কাব্যিক সংবেদ্যতায় ভার্জিনিয়া উল্ফকে পরাস্ত করতে পেরেছেন কিনা, এ প্রশ্ন যেমন অবান্তর, তেমনি তাঁর চরিত্ররা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের নমুনা জানালেও তলস্তয়ের মতো মহদাভাব প্রকাশ করে না একথা বলাও বাতুলতা। হাক্সলে

সর্বতোরূপে আধুনিক যুগের প্রবক্তা এবং প্রতিনিধি। পৃথিবীকে পর্যালোচনা করার তাঁর একটি বিশেষ দর্শনভংগী আছে এবং সেই দৃষ্টিতে আজ যদি ভারতীয়-দর্শনের জ্ঞানাঞ্জন লেগেও থাকে তাহলে তাকে শিল্পীর দায়িত্ব থেকে 'পলায়ন' আখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি আর কিছু না হোক এই জগৎ-কালের নির্ভর-যোগ্য প্রতিনিধি, তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ বহু বিশিষ্ট ধারণার কাছে এখনকার মানুষের ঋণ কিছু অকিঞ্চিৎকর নয়। তিনি সাহিত্য 'সৃষ্টি' করেছন অথবা 'প্রস্তুত' করেছেন, আঁদ্রে মোরোয়ার কথানুযায়ী তিনি বায়ুবিদ্ যন্ত্রের মতো হাওয়ার পরিবর্তনে ডিগবাজী খেয়েছেন কিনা—এ সকল প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়েও তাঁকে পরিষ্কার চেনা যায়, আজকের এই ভীষণ ক্লান্তিকর অশেষ নির্বেদ্যতায় তাঁর বক্তব্যের মুখোমুখী বসে নিজেদের অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেছেন একালের মানুষের আত্মা সুলভে বিক্রীত এবং মানুষের এই উদ্‌ভ্রান্ত প্রগতি একদিন সাবিক ব্যর্থতার ভয়ংকর অবস্থাকে নিকটবর্তী করবে। 'ফলত নিত্য পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁকে এখন একনিষ্ঠ লাগে, বোঝা যায় যে তিনি নিজেকে অন্যদের চেয়ে বিজ্ঞ ভেবে তাদের উপরে বিদ্রূপবাণ হানছেন না, বা আশু বিলুপ্তির ভয় দেখাচ্ছেন না—মানব-সভ্যতার অবস্থা মুমূর্ষু জেনেই উজ্জীবনের উপায় খুঁজছেন, তথা সতর্ক থাকতে প্রয়াস পাচ্ছেন। অর্থাৎ আজ আর তিনি বিদূষকের বেশভূষা পরতে চান না: বরঞ্চ যেখানে সত্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে, সেখানে তিনি ভারতবর্ষীয় যোগীদের মতো দিগম্বর, এবং স্বকীয় নাভির রহস্যোদ্ঘাটনে যুগ-যুগান্তর কাটিয়ে দিতে তিনি এখনও প্রস্তুত নন বটে তথাচ চক্‌চকে জুতোর দিকে তাকাতে তাকাতে তিনি ইতিপূর্বেই সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েছেন। অবশ্য মানুষী মূঢ়তার দৃশ্য তাঁকে চিরদিনই একাংগে আকৃষ্ট ও বিকৃষ্ট করেছে; এবং দুর্গন্ধ যেমন আমাদের কৌতূহল জাগিয়েই গা গোলায় তেমনই মনুষ্য সমাজের ক্লেদ ও কলুষ তিনি ঘাঁটতে ছাড়েন নি, আবার ভুলতেও পারেন নি। পক্ষান্তরে ফ্লবেয়র-সুলভ নেতিবাদে আর তাঁর সমর্থন নেই—সম্প্রতি তিনি ঘৃণা ও অনীহ প্রত্যাখ্যান পেরিয়ে এক মরমী বিশ্বাসে পৌঁছেছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তি লোকোত্তরে বলে লৌকিক ভাষায় তার অভিব্যক্তি যদিও অসম্ভব, তবু তার তাৎপর্য আস্থা-বানের বোধগম্য তথা অনুভূতিসাপেক্ষ।' হাক্সলে যে-বংশজাত, বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্য সে-বংশের পিছনে পিছনে অনুসরণ করে ফিরেছে সদাই। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে তিনি তাঁর চিন্তাকে উজ্জ্বল ও ধারাল করে তুলতে পেরেছিলেন। একদিকে পিতামহ বৈজ্ঞানিক, পিতা অধ্যাপক, অপরদিকে ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর

মাত্রার নিকটাত্মীয় স্থানীয়। সুতরাং দুটি আপাতবিরোধী ভাবনাস্রোত তাঁর মানস-সরোবরে এসে মিশেছিল—একপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জড়বাদ অপরপক্ষে উদারনৈতিক আদর্শবাদ। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর থেকেই হাক্সলে তাঁর পরিস্রুত চিন্তা, ও বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধি নিয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন এবং তীব্র অস্মিতার প্রয়োগ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী শক্তিতে সময় ও সমস্যাকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রেয়োবাদের বাণী-প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন। 'সাউথ উইণ্ড' (১৯১৭) প্রকাশের পর 'ক্রোম ইয়েলো' (১৯২১), 'মর্টাল কয়েল্‌স্‌' (১৯২২); 'এ্যান্টিক হে' (১৯২০); 'দোজ্‌ ব্যারেন লীভস' (১৯২৫) প্রভৃতি অন্য উপন্যাসগুলিতেই তরুণ ঔপন্যাসিক হাক্সলের রচনা-মাধুর্য এবং সুইফট-সুলভ বিদ্রূপবাণ আভা ছড়িয়ে ছিল প্রতিভার। 'The style of the young novelist had a seductive charm. Here was a writer with something of the incisiveness of Swift and the well-bred ease of Congreve exploiting the ample resources of a dual vocabulary, scientific and literary, which gave him a wide range of metaphor and allusion and which was further enhanced by a precise know ledge of music and art. Intellectual exuberance found expression in pointed and often outrageous epigrams and in a tantalizing allusiveness that led him to choose recondite illustrations and to avoid the obvious. Nowhere, inspite of his erudition, was he stilted or pedantic, and his prose, although its apppeal was primarily to the intellect, was capable of much vividness and colour in scenic description'. হাক্সলে এই সব উপন্যাসে এবং তাঁর প্রায় সারাজীবনের সাহিত্য-আরাধনায় বিভিন্ন রকম চরিত্রের অঞ্জলি দিতে পারেন নি, পক্ষান্তরে কয়েকটির কক্ষেই বারংবার প্রবেশ-প্রস্থান করেছেন। তাঁর বহুদূরগামী দৃষ্টির শাণিত ছুরিকা অন্তর্ভেদী হলেও এবং সময় সময় তা পৈশুন্যে পরিণতি পেলেও তাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ শিল্পী ও উগ্র নীতিবাদীর দ্বৈত সত্তা অবিরাম দ্বন্দ্বে মেতে থেকেছে এবং হাক্সলে কোন একটিকে নিপুণভাবে বেছে নিয়ে স্বস্তি পেতে পারেন নি। তাঁর সকল কৌতুক-বিদ্রূপের আড়ালে 'একটি আহত মানবাত্মার গোঙানি শোনা গেছে বেদনার শয্যা থেকে'। 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' (১৯২৮) হাক্সলের সুদীর্ঘ ও স্মরণীয়

উপন্যাস। এতে সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর নিরশ্বাস পরিদৃষ্ট হয়েছে এবং শিল্পী ও নীতিবাদীর অন্তর্বিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। অতঃপর তাঁর চেতনা পথ খুঁজেছে ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয়তার গুহ্যমার্গে। 'আইলেস ইন গাজা' (১৯৩৬) সেই নীতিবাদী, ধর্মানুসন্ধানী, দেবতাশ্রয়ী হাক্সলের দর্শনকে অত্যন্ত উচ্চাশায় ও উচ্চাদর্শে প্রতিফলিত করেছিল। এখানে তিনি যেন ভারতের আত্মাকে স্পর্শ করেছেন। অ্যান্টনি, তাঁর অন্যান্য নায়কদের মতোই বুদ্ধিজীবি, শ্লেষসিদ্ধ এবং ঘোর নীতিবাদী কিন্তু তার পরিবর্তিত চিদ্‌বৃত্তির স্বচ্ছ-সুন্দর রূপান্তর, সর্বজীবের মাঝে তার মুক্তি-বিশ্বাস, এই জগতের অসারতা এবং সকল জীবনের অভিন্নতা ও এককতা তার কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়ার ফলে তাকে অনেকাংশে ভারতীয় দর্শনে উন্মোহিত ভাবা স্বাভাবিক। এর পূর্ববর্তী উপন্যাস 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-এ (১৯৩২) হাক্সলের কলা-কৈবল্যের স্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান ছিল। তিনি এই উপন্যাসে ইউটোপিয়ার বিপরীত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। প্রেয়োবাদের সংগে বৈজ্ঞানিক জড়বাদকে জড়িত করে, সুইফট-শোভন শ্লেষ ও বিদ্রূপে তিনি নতুন জগতের যে-ভবিষ্যৎ ছবি এঁকেছিলেন তার শেষ কথা ছিল আত্মার প্রতি সততা। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে জীবনের সকল প্রসাদ সুরক্ষিত হলেও মানুষ যদি অকস্মাৎ অনুভব করে যে, নতুন সাহসী জগতের সংগে কিছুতেই সে পা মেলাতে পারছে না, পারছে না তার উপযুক্ত হতে, যদি যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত মানুষ প্রেম, ধর্ম, আদর্শ, ব্যক্তিত্ব সব হারায় তাহলে সে যেন দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার পরীক্ষাকেও সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে, জনের মতোই প্রস্তুত থাকে জীবনের শেষ যন্ত্রণা মৃত্যুর জন্য,—যদি তার আত্মার আলোক তাকে বিশ্বাসের পথ দেখায়। আর, এই বিশ্বাসই হলো হাক্সলের আপন 'মরমী বিশ্বাস'। 'আফটার মেনি এ সামার' (১৯৪০) ; 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ' (১৯৪৫) ; 'এপ্ অ্যাণ্ড এসেন্স' (১৯৪৮) ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে নীতি-বাদী হাক্সলেকে আবিষ্কার করা শক্ত নয় কিন্তু অনেকেরই ধারণা তিনি যেন ইদানীং পাঠকের ঘনীভূত আগ্রহকে ক্রমশই তরল করে তুলছেন ('...there is a noticeable falling off in both power and interest') যদিচ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতে 'আফ্‌টার মেনি এ সামার'... 'প্রথমত অসম্ভব লাগলেও, কাহিনী যতই এগোয়, পাঠকের আদিম অবিশ্বাস ততই কমে আসে ; এবং শেষে যখন বইখানির উৎকট উপসংহারে থামা যায়, তখন সে-দৃশ্য যেন চোখের সামনে থেকে সরতে চায় না, ভাবচ্ছবি আরও বেশি করে পেয়ে বসে। অর্থাৎ পুস্তকখানির

ছত্রে ছত্রে অতুলনীয় শিল্পচাতুরীর তথা আজন্ম অনুশীলনের স্বাক্ষর আছে…’ ‘টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ’ উপন্যাসে হাক্সলে নতুন একটি পরীক্ষা করেছিলেন, জীবনাতীত জগতে তিনি আঙ্কল ইউস্টেসকে পাঠিয়েছিলেন মৃত্যুর সচেতন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। এতে লেখকের দর্শন, অতীন্দ্রিয়তা এবং আলোক-অন্ধকারের চিরন্তন লীলা সংশ্লেষিত হয়েছিল। ‘এপ্ অ্যাণ্ড এসেন্স’ গ্রন্থটিতে হাক্সলের উদ্যত শ্লেষ পুনর্বার উদ্ধত হয়েছে—এতে তিনি এমন এক সমাজের কথা বলেছেন যেখানে মানুষের ইচ্ছা-বাসনাকে আইনের দ্বারা চালিত করার চেষ্টা হয় এবং রাজ্য চালায় উন্নুকরা (eunuchs), যে-রাজ্য আবার শয়তান বিলায়েলের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত এবং যেখানে নর-নারীর স্বাভাবিক সদ্‌প্রবৃত্তির জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হয়……শাস্তি মৃত্যু। উপন্যাসটির আরম্ভ গান্ধী-হত্যার দিন থেকে। বইটিতে হাক্সলের একটি চরিত্র বলছে, ‘Gandhi was a reactionary who believed only in people, squalid little individuals governing themselves, village by village and worshiping the Brahman who is also Atman. It was intolerable. No wonder we bumped him off’. অলডাস হাক্সলে উপন্যাসের আধারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেন নি। তিনি আধেয় বস্তু সম্পর্কেই বরাবর সচেতন থেকেছেন, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আধুনিক-জীবনের জটিল গ্রন্থি-মোচন করেছেন যদিও কোন নির্ভরযোগ্য সমাধানের পথ-নির্দেশ করতে পারেন নি। কিন্তু মানুষের জন্য, সমাজের জন্য তাঁর কাতরতার, অস্থিরতার অন্ত নেই এবং তা এত বিশুদ্ধ যে তিনি তাঁর প্রায় সমগ্র সাহিত্যকর্মে নতুন নতুন ভাবনার এক আলাদা জগৎ তৈরি করে ফেলেছেন। সেই স্বয়ং-সৃষ্ট জগৎ থেকে হাক্সলে মানুষের এই সংকটকালে ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন। তাঁর আত্মমুখ উদ্‌গতিতে মানুষ স্থায়ী আশ্রয় না পাক, অস্থায়ী স্বস্তি পেয়ে থাকে। এই ভয়ংকর যুগে তা-ই বা মন্দ কী! ‘His is a supple, many-sided talent ; he has allowed his witty, but facile, satire of a helplessly drifting age such scope, that the moral anarchy of our day owes him some of its most telling descriptions.’

•

সমারসেট মম (১৮৭৪—) সম্বন্ধে যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল। কারণ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে নাট্যকার, ছোটগল্পকার এবং ঔপন্যাসিকের অত্যন্ত ব্যস্ত ভূমিকা সত্ত্বেও তিনি মানুষের জ্ঞানচেতনায় একটি শুদ্ধ কণিকাও

যুক্ত করতে পারেন নি, অত্যন্ত সীমিত পরিমণ্ডলে বারংবার পরিক্রমা সেরে নিজেই হাঁপিয়ে পড়েছেন। হয়ত এখন, তাঁর এই জীবন-সন্ধ্যায় সব কলরব এবং নিষ্ফল আয়োজন যখন থেমে আসছে, যখন নিস্তেজ আলোয় বসে আপনার সংগে আপনি কথা বলার সময় এসেছে, তখন তিনি,—সমারসেট মম নিজেই বুঝতে পারছেন যে, কত দীন উদ্‌যোগে তাঁর সাহিত্যের যাত্রারম্ভ হয়েছিল। কত স্বল্প শক্তিতে তিনি নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন। সভ্যভাবে তাঁর গল্প-উপন্যাসকে একটি পরিতৃপ্তি কিংবা একটি ইচ্ছাপূরণ ব্যতীত অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কখনো কখনো, খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি তাঁর সাধ্যবদ্ধ সীমানা ছেড়ে বাইরে আসবার আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আর, সেই আগ্রহ-প্রচেষ্টাই তাঁকে 'অফ হিউম্যান বনডেজ'-এর (১৯১৫) লেখকরূপে পরিচিত করেছে। বস্তুত মম এই রচনায় সাধনা, সিদ্ধি ও মহৎ ভাবপ্রকাশের সন্নিকর্ষে পৌঁছেছেন। তাঁর রচনার বিপুল তালিকা থেকে এমনি কয়েকটি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি জানান চলে, বাকী সকলের খবর না-নিলেও কোন ক্ষতি হয় না। 'অফ হিউম্যান বনডেজ' নামটি মম সংগ্রহ করেছিলেন স্পিনোজার নীতিবিদ্যার বই থেকে। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র ফিলিপকে মম নিজের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা দিয়ে সাজিয়েছিলেন—ফিলিপ আসলে ছদ্মবেশী মম এবং এই ছদ্মবেশের আড়ালটুকু এত স্বচ্ছ, এত স্পষ্ট যে, আসল মানুষটিকে চিনতে বিলম্ব হয় না। মম যথাসম্ভব ঔৎকর্ষে ও উপরিকতায় এই উপন্যাসটিকে শতাব্দীর এক স্মরণীয় সৃষ্টিরূপে নির্মাণ করেছেন। যদিচ রচনাটির সংগে থিওডোর ড্রেজার-এর 'অ্যান আমেরিক্যান ট্রাজিডি'র ভাবৈক্য অনুভব করেছেন কেউ কেউ—অনেকাংশে একই দৃষ্টিভংগীতে লেখা, বহুক্ষেত্রে একই আবেদন ফলিত হয়েছে। 'দি মুন এণ্ড সিক্সপেন্স' (১৯১৯) মম্-এর আরেক বহুপঠিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস। ঘটনার ঘনঘটায় অস্থির এই কাহিনীর মধ্যবিত্ত নায়ক আঁকার উন্মাদনায় ঘর, বাড়ি, সংসার সব ত্যাগ ক'রে চলে গেল সেই মনোরম তাহিতি দ্বীপে। সেখানে এক দেশীয় মেয়েকে বিয়ে ক'রে মনের আনন্দে বাড়ি সাজাল, ঘরের দেওয়ালে নিজের হাতে রঙ করল। কিন্তু এ সুখ তার ভাগ্যে বেশীদিন সইল না। মম্ অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। হঠাৎ নায়কের অত্যন্ত এক কুৎসিৎ ব্যাধি ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত তন্দ্রার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে তবে তিনি পাঠকদের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছেন এবং নিজেও পেয়েছেন শান্তি। কুষ্ঠ-ব্যাধিতে মারা যাবার আগে নায়ক বলে গেল তাহিতি-তনয়াকে, তা'র সারা

জীবনের যাবতীয় আঁকার কাজকে নষ্ট করে ফেলতে। আর তাদের ভালবাসার কুঁড়েটিকে পুড়িয়ে দিতে। 'রেইন' (১৯২১) কাহিনীটিও সুবিখ্যাত। প্রাচীনপন্থী এক মিশনারীর একটি বারনারীকে ভালবাসা এবং আস্তে আস্তে তার চরিত্র থেকে নীতির বর্ম খসে পড়া এবং গভীরভাবে প্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার এই সংবেদনশীল কাহিনীটি জগতের ইংরাজী গল্প পাঠকদের অত্যন্ত মুগ্ধ করে। মম্-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা-কৃতিত্ব 'কেকস্ অ্যাণ্ড এল' (১৯৩০) বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রূপে এবং দক্ষ চরিত্র চিত্রণে বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট সংযোজন রূপে স্থান পেতে পারে।

অতঃপর উৎক্রান্তির ক্লান্তিময় কাল।

এই উৎক্রান্তির কাল যেন ম্যাথু আর্নল্ডের 'ডোভার বীচ' কবিতায় বর্ণিত সৈনিকদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যাদের পিছনে বাধার তুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, যাদের সামনে ক্রুদ্ধ সমুদ্রের নিষেধ। যারা এই তুই নিষেধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ক্ষোভ, যন্ত্রণাকে প্রকাশ করার আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে নিজেরাই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ক'রে শক্তি ক্ষয় করছে—'Where ignorant armies clash by night'.

তবু এই বিলীয়মান আলোর ধূসরতায়-ও আমরা বহুজনের মিছিল দেখেছি। এই মিছিলের জনতার মুখে গোলকধাঁধার মধ্যে পথ খুঁজে বেড়াবার উদ্‌ভ্রান্ত হতাশা। আবার কেউ কেউ স্বীয় বিশ্বাসে স্থিতধী, তাঁদের চলাফেরার মধ্যে অন্ধের পথ হাতড়াবার ভাব প্রকাশিত হচ্ছে না, এবং গোলকধাঁধার পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা দেখে আমাদের বেদনার্ত হতে হচ্ছে না। তাঁদের সঙ্গে পাঠকরা যত ন্যূনতম পথেরই যাত্রী হোন না কেন, যাত্রার স্বল্পসময়টুকুর মধ্যে তাঁদের অন্তরের প্রতীতি, বিশ্বাসের স্থৈর্য পাঠকদের মনেও সঞ্চারিত হচ্ছে। এঁদের সাহিত্যের উপজীব্য সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। এবং এঁদের মধ্যে উত্তুঙ্গ প্রতিভার মহিমা হয়তো মেলে না। পাঠককে এঁরা হয়তো ডি. এইচ. লরেন্স-এর মতো অভিভূত করেন না, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মতো প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে সচকিত করেন না।

এই সময়ের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রিস্টলি অন্যতম।

জন্ বয়েন্‌টন প্রিস্টলি (১৮৯৪) ডিকেন্সীয় ভঙ্গীতে দিলখোলা মেজাজী গলায় হার্দ্য গল্প বলবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে 'দ্য গুড্ কম্প্যানিয়ন্‌স' লেখেন। ঘটনা

নির্ভরতা এবং ভাবালুতা এই বইকে ভারাক্রান্ত করেছে। এবং লেখক যে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কলম ধরেছিলেন, মনে হয় সেটি জোর করে আমদানি করা। তবু ইংরাজী উপন্যাসের বাজারে বইটির সুনাম আজও অক্ষুণ্ণ আছে। 'এঞ্জেল পেভ্‌মেণ্ট' (১৯০১) বাস্তবানুগতায়, শৈল্পিক উৎকর্ষে লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে পরিচিত হবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাস লেখক সম্পর্কে পাঠক মনে যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, পরবর্তী 'লেট্‌ দ্য পীপ্‌ল সিঙ্‌' (১৯৩৯), 'ডে লাইট অন্‌ স্যাটারডে' (১৯৪৩), এবং 'ব্রাইট ডে' (১৯৪৬) তা পরিপুরণ করতে পারে নি। যদিও শেষোক্ত বইটিতে একজন সৎ পশম ব্যবসায়ী এবং তার পরিবার কেমন করে আর এক স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীর চক্রান্তে ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল, তার বর্ণনা পাঠকের মনে থাকবে। আরো মনে থাকবে তিনটি বোন, একটি পিকনিক, একটি আত্মহত্যা এবং প্রথম প্রণয়ের মৃত্যুর সেই মর্মস্পর্শী বিবরণ।

চার্লস মর্গ্যান, (১৮৯৪—১৯৫৮) উন্নত আদর্শবাদিতা, দার্শনিকতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং কৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া, এইসব সদগুণ সত্ত্বেও স্বদেশে সমালোচক মহলে বিশেষ সমাদর পাননি। ১৯৫৮ সালে তাঁর মৃত্যুতে ফ্রান্স-এর পাঠক-সমালোচক বেশি ব্যথিত হয়েছিলেন ইতিশ্রুতি। গভীর সমবেদনা ও নির্লিপ্ততায় তিনি মানুষের ব্যর্থতার কথা বলতে পেরেছেন। 'পোর্ট্রেট ইন্‌ মিরার' (১৯২৯) তাঁকে প্রথম খ্যাতি এনে দিয়েছিল। 'দ্য ফাউণ্টেন' (১৯৩২) আনে জনপ্রিয়তা এবং 'দ্য ভয়াজ' (১৯৪০) এবং 'জাজেস স্টোরি' (১৯৪৭) বহু পঠিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। ফ্রান্স-এর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা শেষোক্ত বইটিতে চড়া সুরে বেজেছে।

ফ্র্যাঙ্ক সুইনারটন-কে (১৮৮৪—) পাঠক অনেকদিন মনে রাখবে। তাঁর অমায়িক, প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন ও চরিত্রচিত্রণে কুশলতা, দক্ষ শিল্পীর নৈপুণ্যে প্লটটিকে ধীরে ধীরে মেলে ধরা, তাঁকে একজন জনপ্রিয় সুলেখকের মর্যাদা দিয়েছে। 'নকটার্নে' (১৯১৭), 'দি জর্জিয়ান হাউস' (১৯৩২) এবং 'দি ডক্টর্স ওয়াইফ কাম্‌স টু স্টে' (১৯৪৯) তাঁর সমসাময়িক অনেক ঔপন্যাসিকের চেয়ে তাঁর মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী করেছে।

আচিবল্ড্ জোসেফ ক্রোনিন তাঁর প্রথম বই 'হ্যাটার্স কাস্‌ল্'-এর (১৯৩১) অসাধারণ সাফল্যে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্যদের মতো ক্রোনিন হয়তো সমাজ ও রাষ্ট্রের চাপে ব্যক্তি কেমন করে পায়ের তলায় মাটি হারাচ্ছে, সে-সম্পর্কে অতটা সচেতন নন। বলিষ্ঠ ভাষা, বাস্তবানুগতা, এইসব সদগুণকে তিনি তেমন করে কাজে লাগাতে পারেননি সব জায়গায়। গ্রেহাম গ্রীন ও এভেলিন উআও-এর মতো তাঁর মধ্যেও একটি ধর্মপ্রাণ নীতিবাদী হৃদয় আত্মার মুক্তি খুঁজেছে। তা সত্ত্বেও তাঁর কয়লাখনি জীবনের অভিজ্ঞতা, চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা, এইসব নিয়ে তিনি যখনি আসরে নেমেছেন, তখনই ক্রোনিন আমাদের কাছের মানুষ। 'দি থ্রি লাভ্‌স'-এর (১৯৩২) অ্যানা হয়তো নেহাৎই প্রভুত্বকামী। 'গ্র্যাণ্ড ক্যানারি'-র (১৯৩৩) চিকিৎসক এবং নায়িকা যে প্রেমকে চেনায়, ম'মের নীরস এবং স্টিফানৎসাইগ্-এর 'অ্যামক'-এর মতো সরস গল্পে আমরা সেই অদ্ভুত প্রেমের সার্থকতর বর্ণনা পেয়েছি। বহুখ্যাত 'দি সিটাডেল'-এর (১৯৩৭) ডাক্তার, তার আদর্শবাদিতা, তার অর্থগৃধ্নুতা, তার অনুশোচনা, তার স্ত্রীর মৃত্যু পাঠকসমাজকে দীর্ঘদিন ধরে আকৃষ্ট করেছে। আর যে বইটিতে ক্রোনিন প্রতিভার সোপান স্পর্শ করতে পেরেছেন তা হলো 'দি স্টারস্ লুক ডাউন' (১৯৩৫)। এর নায়ক, কয়লাখনি জীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, এর বন্ধু কেমন ক'রে এক ধনী, অপদার্থ কারখানা মালিকের স্ত্রীর সঙ্গে ভাব ক'রে, নিজে বহুজনকে ধ্বংস ক'রে 'New Capitalist' হয়ে বেরুল, সে কথা অতি আন্তরিকতায় বলতে পেরেছেন ক্রোনিন। তবে, তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'দি অ্যাডভেঞ্চার ইন্ টু ওয়ার্লড্‌স'-এ যখন দেখি, বিভিন্ন উপন্যাসে ব্যবহৃত সেইসব পুরনো মালমশলাই তিনি ধর্মবিশ্বাসে ও ভাবপ্রবণতায় গদগদ কণ্ঠে বর্ণনা করেছেন, তখন হতাশ লাগে। স্বল্প পুঁজি নিয়ে আসরে নামবার বিপদই এই।

ক্ষমতাময়ী লেখিকা স্টেলা বেন্‌স (১৮৯২-১৯৩৪) তাঁর বহুল ও বিচিত্র ভ্রমণঅভিজ্ঞতার সঙ্গে মার্জিত কৌতুকবোধ, মানবীয় নির্বোধিতা ও স্খলনের সম্পর্কে সহানুভূতি এবং সর্বোপরি চিত্রময় ভাষা ও সুবেদী মনের মিশ্রণে যে-সব উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে 'টু বিট ট্রান্সপ্লানটেড' (১৯৩১) হয়তো সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কিন্তু ঔৎকর্ষে 'দি পুয়োর ম্যান' (১৯২১) এবং 'দি লিট্‌ল্ ওয়ার্ল্ড' (১৯২৫) শ্রেষ্ঠ বলেই দাবী জানাবে।

প্রথম উপন্যাসই যাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে রইলো তাঁদের মধ্যে 'কন্সটাণ্ট নিম্ফ'-এর (১৯২৪) লেখিকা মার্গারেট কেনেডীর প্রতিভা অবিস্মরণীয়। সুরস্রষ্টা স্যাঙ্গার, তার ছেলেমেয়েরা, লুইস ডড্, তার স্ত্রী, এদের প্রেম, বিফলতা এবং ট্রাজেডি পাঠকের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। টেসা-র মৃত্যুর বর্ণনা, এবং টেসা-র মৃতদেহ যখন হোটেলের শয়নকক্ষে পড়ে আছে, তখনই হোটেলের নাচঘরে স্যাঙ্গার-এর 'সলোমন' শুনতে শুনতে, টেসার হৃদয়ঢালা প্রেম যে সে একদিন ভুলে যাবে, তখনই যে সে ভুলে যাচ্ছে, সেই উপলব্ধির বিরুদ্ধে লুইস্-এর শিশু সুলভ বিক্ষোভ ভুলবার নয়।

রোজামণ্ড্ লেহ্মান, 'ইনভিটেশন টু দি ওয়ালজ্' (১৮৩২), 'দি ওয়েদার ইন দি স্ট্রীস' (১৯৩৬) লিখেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে অবশ্যম্ভাবী রুচি বিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ডাসটি অ্যানসার'-এর (১৯২৭) দীপ্তি ম্লান হয়নি। এই উপন্যাসের নায়িকা জুডিথ্-এর বয়ঃসন্ধি থেকে যাত্রা শুরু করে, মৃত চার্লস, জীবিত রডি, টমাস ও জুলিয়ান সব কয়টি ভাইয়ের সঙ্গে প্রেমের নিষ্ফল পরিণতির ভেতর দিয়ে পথ চলে, কৈশোরের কোমল রঙীন স্বপ্ন থেকে যৌবনের প্রখর বাস্তবে উত্তীর্ণ হবার অভিজ্ঞতা লেখিকা এমন কোমল গলায় জাপানী লণ্ঠনের মতো সুন্দর চিত্রকল্প ভাষায়, এমন করে বলেছেন যে, কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ এই উপন্যাসে আশ্চর্য সফলতায় ফুটেছে। শেষ অধ্যায়ে জুলিআনের প্রেমে নিষ্ফল মারিয়েলার করুণ চিঠিটি এই দ্বিতীয় নায়িকাকেই পাঠকের ভালবাসা এনে দেয় বেশি।

লুইস্ গোল্ডিং-এর (১৮৯৫—) 'ম্যাগনোলিয়া স্ট্রীট' (১৯৩২) লেখককে জে. বি. প্রিস্টলির মতোই খ্যাতিমান করেছিল। কিন্তু সুন্দর গল্প বলা ছাড়া অন্য হাতিয়ার তাঁর হাতে ছিল না। এবং সেই ক্ষমতা আগেই 'ফরোয়ার্ড ফ্রম ব্যাবিলোন' (১৯২০), 'ডে অফ অ্যাটোনমেণ্ট'-এও (১৯২৫) দেখা গিয়েছিল। কিন্তু 'ম্যাগনোলিয়া স্ট্রীট'-এর পর লেখক কেমন যেন ফুরিয়ে গেলেন। এই বইয়ের খ্যাতির জোরেই তাঁর অন্যান্য দু' একখানা বই, যেমন 'ফাইভ সিলভার ডটারস' (১৯৩৪) ইত্যাদি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। স্বল্প ক্ষমতার সাধারণ লেখক তিনি।

নিজের ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করবার জন্তে ক্লাইভ্ স্টেপ্‌ল লুইস্ (১৮৯৮—) উপন্যাসের যে সব বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন, সে অতি বিচিত্র। এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয়বাদ, বিজ্ঞান সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা এবং রাজা আর্থারের সম্পর্কে গল্প কথা, এই নিয়ে তিনি উপন্যাস লেখেন। কৌতূহলের বিষয় হলো, তাঁর উপন্যাসের স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রী সবই বর্তমান সময়ের। 'আউট অফ দি সাইলেণ্ট প্ল্যানেট' (১৯৩৮) এবং 'ছাট হিডিয়াস স্ট্রেংথ্' (১৯৪৩) এই খাপছাড়া মানুষটির লেখন ক্ষমতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মৌলিক চিন্তাশক্তি, এবং সে চিন্তাকে ভাষা দেবার অবিসংবাদী ক্ষমতা নিয়ে নেভিল্ শূট (১৮৯৯—) এ যুগের পাঠককে কিছু ভাল উপন্যাস দিয়েছেন। 'পায়েড পাইপার' (১৯৪২) জনপ্রিয় হতে পেরেছে। 'দি চেকার বোর্ড' ও 'মোস্ট স্ট্রীট'-এ শূট্-এর চিন্তাশীল মন কি নিপুণ কৌশলে অতি জটিল ভাববস্তুকেও সহজে প্রকাশ করতে পারে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। আর ব্যক্তিগত জীবনে এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শূট 'নো হাইওয়ে' (১৯৪৮) উপন্যাসে প্লেনের ইঞ্জিনঘরের ক্লান্তি, হতাশা, আশ্চর্য নৈপুণ্যে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। সস্তায় মনভোলানোর পথে না হেঁটে খুব দায়িত্বের সঙ্গে, যোগ্যতার সঙ্গে বিমানের ইঞ্জিনীয়ার, ক্রু, এদের জীবনের কথা বলতে পেরেছেন শূট।

নীরব কর্মী, পরিশ্রমী লেখক রিচার্ড চার্চ-কে (১৮৯৩—) প্রতিভার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাড়পত্রও হয়তো দেওয়া চলে না। তবু চার্চ, সমসাময়িক জীবন-চিত্রণের এক সার্থক লেখক হিসাবেই পরিগণিত হবেন। বিশেষতঃ 'দি পর্চ' (১৯৩৭), 'দি রুম উইদিন' (১৯৪০) পাঠকদের কাছে বিশেষ প্রিয়।

এঁদের থেকে কিছু আগে, ডি. এইচ. লরেন্স প্রমুখদের প্রতিভা যাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, উপযুক্ত মর্যাদা পেতে দেয়নি, তিনি হলেন ক্যাথারিন্ ম্যানসফিল্ড (১৮৮৯—১৯২৩)। কোলেৎ, প্রুস্ত ও চেখভ-এর অনুরাগী ছিলেন তিনি। সমালোচনা ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে স্বজ্ঞা তাঁর ছোট গল্পগুলিতে অদ্ভুত মৌলিকতা এনেছে। এই সচেতন ও সন্ধানী শিল্পীর ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'Her language, swayed by the hard imperious craving for the perfect phrase, reaches the quality of the inevitable through

an instinct for the essential, and an absolute honesty of statement'. দুঃখের কথা এই, যখন তিনি সিদ্ধির পথে, সার্থকতার পথে এগোচ্ছিলেন, তখনই তাঁর মৃত্যু হয়। মান্ৎজ্, মারি, আঁদ্রে মোরোআ, মুফাঙ্গ্, আল্পার্স প্রভৃতি তাঁর উপর যে সব বই লিখেছেন, তাতে, বিশেষ করে আল্পার্স-এর বইএ ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড সম্পর্কে পাঠকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করানো হয়েছে। 'ব্লিস' (১৯২০), 'দি গার্ডেন পার্টি' (১৯২২), 'দি ডাভ্স নেস্ট' (১৯২৩) এই তাঁর গল্প সংগ্রহ। শ্রীমতী ম্যান্সফিল্ড-এর প্রতিভা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে যে সব গল্পে তার মধ্যে 'দি ফ্লাই' অন্যতম।

জীবন-দর্শনের অন্তর্মুখিতায়, প্রচলিত সংস্কারের আবরণ তুলে জীবনের নগ্ন ও বীভৎস রূপ উন্মোচনে এবং নির্মম, রূঢ় সত্যভাষণে যিনি দুঃসাহসিকতা দেখান, সেই লেখিকা র‍্যাডক্লিফ হল্-এর কু ও সু খ্যাতি বিজড়িত বই 'ওয়েল অফ লোনলিনেস' (১৯২৮) ইংলণ্ডে অদ্ভুত হৈ চৈ তুলেছিল। তথাকথিত অশ্লীলতার অপরাধে বইটি নিষিদ্ধ হয়। অথচ, লেখিকা আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর প্রথম বই 'অ্যাডাম্স ব্রিড'-ও (১৯২৬) তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। যদিচ দ্বিতীয় বইটির গুরুত্ব অনেক বেশি। সমালোচক ও প্রকাশকদের বিমুখিতায় র‍্যাডক্লিফ্ হল ক্রমশ কলম গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন। ১৯২৮ সালের ইংলণ্ড আরো সংবেদনশীল, আরো সহিষ্ণু হলে র‍্যাডক্লিফ্ হল ইংরাজী সাহিত্যকে এমন কিছু দিতে পারতেন, যা নিয়ে আজকের ইংরাজী সাহিত্য হয়তো গর্ববোধ করতে পারত।

শ্রমজীবি সম্প্রদায় নিয়ে লিখেছেন হাওআর্ড স্প্রিং (১৮৮৯ —)। সমসাময়িক বহু জনের মতোই তিনিও মূল্যায়নে বিমুখ। বাস্তবানুগ, রূঢ় এবং সত্য চরিত্র চিত্রণেই তাঁর কৃতিত্ব। আর এ কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মাই সন, মাই সন' (১৯৩৮) এবং 'দেয়ার ইজ নো আরমার' (১৯৪৯)।

ব্রুক ফ্রেডরিক কামিংস (১৮৮৯—১৯১৯), তাঁর সময়ে ইংলণ্ডে মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে সব গবেষণা ও তথ্য-প্রকাশ চলছিল তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, অবচেতন ও চেতন মনের দ্বন্দ্বকে উপজীব্য করে 'বারবেলিঅন' ছদ্মনামে 'দি জারনাল

অফ এ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ম্যান' উপন্যাস লেখেন। প্লট ও সংগঠনে এ উপন্যাস অতীব দুর্বল। তবু নতুন পথ সন্ধানের কৃতিত্বে উপন্যাসটি স্মর্তব্য।

•

সুগঠিত প্লটের মোহত্যাগ ক'রে গভীর দায়িত্বে ও পরিশ্রম সহকারে যিনি 'আই অ্যাম জোনাথান সেরিভেনার' (১৯৩০), 'বার্থ মার্ক' (১৯৫৯) প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছেন সেই ক্লড্ হাউটন সাহিত্যের ছাত্রের কাছে পাঠের পুনরাবৃত্তির দাবী করতে পারেন। তাঁর লেখা প্রেরণাহীন এবং তিনি শুধুই দক্ষ উদ্ভাবক এ রকম ভ্রান্ত ধারণা কেউ কেউ পোষণ করেন। তবু হাউটন (আসল নাম সি. এইচ. ওল্ডফিল্ড) সম্পর্কে বলা হয়—'He has, in fact, real inspiration but there is self-consciousness about it which appears to impede its ease of expression'.

জয়েস কেরীর (১৮৮৭—১৯৫৭) মৃত্যু হয়েছিল উনসত্তর বছর বয়সে। এই অন্যতম প্রতিভাশালী লেখকের বইগুলির প্রকাশ-তারিখ থেকে বোঝা যায়, কতদিন ধরে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, কত গভীর ছিল তাঁর দায়িত্ব-বোধ। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য বই 'আইসা সেভড' (১৯৩২), এবং তারপর 'মিস্টার জনসন' (১৯৩৯), 'চারলি ইজ মাই ডার্লিং' (১৯৪০), 'টু বি এ পিলগ্রিম' (১৯৪২), 'দি হরসেস মাউথ' (১৯৪৪), 'এ ফিয়ারফুল জয়' (১৯৪৯), 'প্রিজনার অফ গ্রেস' (১৯৫২), 'এক্সসেপ্ট দি লর্ড' (১৯৫৩), 'নট অনার মোর' (১৯৫৫) পর পর প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর থেকে যা পাবার তা আমরা পেয়েছি, এই সান্ত্বনার বুদ্বুদ কিন্তু ফেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে তাঁর শেষ বই 'ক্যাপটিভ অ্যাণ্ড দি ফ্রী' (১৯৫৯) প্রকাশিত হবার পর। তাঁর মৃত্যুর পর এই অসমাপ্ত বইটি প্রকাশিত হয়। এ বই পড়ে পাঠকের মনে একটা ক্ষতির বোধ জাগে, যে ক্ষতি অপুরণীয়। কেরীর লেখার ভেতরে তাঁর লেখক-মানসের একটি ক্রমিক পরিণতি কেমন করে পরিপূর্ণতায় উত্তীর্ণ হলো, তার প্রকাশ আমরা দেখি। প্রাণোচ্ছল সৃজনীশক্তি, গভীর অনুসন্ধানী মন, প্রগাঢ় হৃদয়ানুভূতি তাঁর সাহিত্যকে ঐশ্বর্যময় করেছে। সবচেয়ে প্রশংসনীয় এই যে, কেরীর রচনায় কোথাও সহজে মন ভোলাবার প্রয়াস নেই। তাঁর চরিত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিশ্বাস নিচ্ছেন, ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়ছেন, আবার আশায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন, যা সৎ এবং সার্থক লেখকেরই লক্ষণ। তাই জনৈক আফ্রিকান্ কেরানী, জনৈক বস্তিবাসী

শিশু, রাজনীতিক চেস্টার নিম্নো, এই সব চরিত্র কেরীর বইয়ের পাতা থেকে মাথা তুলে পাঠকের দিকে আঙুল নির্দেশ করে নিজেদের বাঁচবার দাবী ঘোষণা করে। কেরীর মৃত্যু যে বয়সে হয়েছে, তা হয়তো অপরিণত বয়স নয়। তবু পাঠকের পক্ষে তাঁর বিদায় গ্রহণকে সুস্থির ভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সমালোচকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের-ও বলতে ইচ্ছে করে—নির্মম ব্যাধি এবং মৃত্যু যখন এই লেখককে ছিনিয়ে নিল, একমাত্র তখনই বিদ্যুচ্চমকে প্রকাশিত হলো তাঁর প্রতিভার বিশালতা। আমাদের চোখে প্রতিভাত হলো 'the uncommon stature (in these times when titans are rare) of an artist whose creative vitality and abnormally minute observation combined in a vision knowing neither indulgence nor cold heartedness'—Leguois and Cazamian.

গ্রীন ত্রয়ী-র মধ্যে হেনরী গ্রীন-কে (১৯০৫) ব্রিটনের 'ক্রুদ্ধ তরুণ দল্'-এর পূর্বসূরী এক 'কিঞ্চিৎ কম ক্রুদ্ধ প্রৌঢ়' বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে সব লেখকরা দেশেবিদেশে কলম ধরলেন, তাঁদেরই মতো হেনরী গ্রীনের লেখাতে যে বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে তা অতীব রূঢ় এবং উগ্র। অথচ বয়সের হিসাবে হেনরী গ্রীন তাঁদের অগ্রজ। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সাহিত্যের ফসল যখন দেখা দেয়নি, সেই সময়ই হেনরী গ্রীন যে বই লিখেছেন, সেই 'লিভিং' (১৯২৯) পাঠের পর লেখাটির উগ্রতা ও কটুত্ব পাঠকের রসাস্বাদনকে ব্যাহত করে। বার্মিংহাম অঞ্চলের কারখানা শ্রমিকের জীবন হয়তো অতি কঠোর ভাবে নির্মম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লেখকের ভাষাও অতি কঠোর, অতি রূঢ় হবার ফলে জীবনের নগ্নতা ও কুশ্রীতা সম্যক্ ভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি। জীবনের রূঢ়তা উদ্ঘাটনে ব্যস্ত থেকে হেনরী গ্রীন অনুকম্পায়ী ও সংবেদনশীল হতে ভুলেছেন। এবং লেখকের অন্তরে বেদনা, যন্ত্রণা ও সহানুভূতি না থাকলে জীবনের বেদনাও যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় না। যে-জন্য মার্কিন লেখক আলেকজাণ্ডার স্যাক্সটন-এর 'গ্রেট মিড্ল্যাণ্ড' উপন্যাসে শিকাগোর রেল শ্রমিকের জীবন অতি সার্থক এবং হৃদয়গ্রাহীভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে, যে জন্য অনেক কম সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী হয়েও ক্রোনিন 'স্টারস্ লুক ডাউন'-এ কয়লাখনির শ্রমিকের দুঃসহ জীবনকে স্মরণীয় করতে পেরেছেন, ঠিক সেই কারণেই হেনরী গ্রীন, তাঁর আন্তরিকতা ও সততা সত্ত্বেও

বিফল হয়েছেন। এবং তাঁর শেষ উপন্যাস 'ব্যাক'-এর (১৯৪৬) উপজীব্য এক যুদ্ধ প্রত্যাগতের মনোবিকার। এই উপন্যাস সম্পর্কে পাঠক একই অভিযোগ তুলবেন। হেনরী গ্রীন-এর উপন্যাসে প্রতিবেশ ও ঘটনাবলী সৃজনে ভুল নেই। কিন্তু তাঁর 'clipped speech glrates on susceptible ears'.

ফ্রেড্রিক লরেন্স গ্রীন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের লেখক। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের মতো তিনি বিশ্বাসহীনতার জ্বালায় ভুগছেন না। মানুষ জীবন সম্পর্কে যত জল্পনাকল্পনাই করুক না কেন, আসলে সে মানবীয় প্রবৃত্তির ক্রীতদাস, এবং বহু ভুলভ্রান্তির জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়িত হয়ে তার চূর্ণ বিচূর্ণ সত্তা ঈশ্বরবিশ্বাসে মুক্তি পাবে, এই বিশ্বাস ফ্রেডরিক গ্রীনের অন্তরে অতি সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলিতে মরণোত্তর জীবনের এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস 'জুলিআস পেণ্টন' (১৯৩৪), 'অন দি নাইট অফ দি ফায়ার' (১৯৩৯), 'দি সাউণ্ড অফ উইণ্টার'-এ (১৯৪০) তিনি পথ-সন্ধানী শিল্পী। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত 'অড্ ম্যান আউট'-এ তিনি কাঙ্ক্ষিতব্য লক্ষ্যে উত্তীর্ণ। জনৈক পলাতক-এর আত্মগোপন করবার বর্ণনা এতে এতদূর সাফল্যের সঙ্গে বর্ণিত যে এই উপন্যাসের ঘটনাক্ষেত্র বেলফাস্ট শহরের অলিগলি সম্পর্কে পাঠকরা রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। আইরিশদের সম্পর্কে এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত যে, তাদের লেখার থেকে 'The unpleasant truth that is Ireland' উঁকি মারে। ফ্রেডরিক গ্রীন সম্ভবত সেই অপবাদ খণ্ডন করতেই 'এ ফ্ল্যাস্ক ফর দি জার্নি'-র (১৯৪৬) জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপকে নির্বাচিত করেছেন। জার্মানীর প্রাথমিক সাফল্যের সময়ে বন্দীশিবিরে ইংরাজ, ফরাসী ও পোল যুদ্ধবন্দীদের জীবন, যন্ত্রণা ও হতাশা এই উপন্যাসে মালমশলা জুগিয়েছে। লেখকের ধীরস্থির মেজাজ আমাদের আকৃষ্ট করে। তাঁর পরিণত ও উদার মন নিয়ে, তিনি যুদ্ধোত্তর সমাজে অবশ্যম্ভাবী নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলোকে সুবিচার করতে পারেন। তাঁর লেখার উপরের বুনোনিটা হয়তো কোমল ও মোলায়েম। কিন্তু সেই কোমলতা কোন দুর্বলতাকে আড়াল করতে চাইছে না। ফ্রেডরিকের বিশ্বাস ও বক্তব্যে কোন জোড়াতালি নেই। তাঁর কিছু কিছু শৈল্পিক বিচ্যুতি ব্যতীত তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক।

বিশিষ্টতায় যাঁর স্থান সর্বোচ্চে তিনি হলেন গ্রেহাম গ্রীন। ১৯০৪ সালে তাঁর

জন্ম। ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত 'দ্য টাইম্‌স্‌'-এর সাংবাদিক হিসেবে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করেছেন। ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হয়েছে তাঁকে। গোঁড়া রোমানক্যাথলিক গ্রেহাম গ্রীনকে, পাপ, মানুষের পতন, প্রলোভন, এই সব মৌল বিশ্বাসই অনুপ্রাণিত করেছে বেশি। 'দি ম্যান উইদিন' (১৯২৯), 'স্তামবুল ট্রেইন' (১৯৩২), 'ইংল্যাণ্ড মেড মি'-তে (১৯৩৫) যে গ্রেহাম গ্রীনকে আমরা পাই, তাতে তিনি সাংবাদিক, ভ্রাম্যমাণ এবং কথক। এইসব উপন্যাস তাঁর লেখকজীবনের প্রস্তুতি। গ্রীন 'ব্রাইটন্‌ রক্‌'-এ (১৯৩৮) তাঁর পরিণত প্রতিভার নিঃসংশয় ছাপ রাখলেন। একজন সমাজবিরোধী গুণ্ডা, তার প্রেমাস্পদ মেয়েটির প্রতি ঘৃণা ও প্রেম, এই দুই অনুভূতির দোটানায় কেমন করে দীর্ণ হচ্ছে, তার কাহিনী বলতে গিয়ে গ্রীন মানুষের মনে সু ও কু-এর নিরন্তর দ্বন্দ্বকেই প্রস্ফুটিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনেই তাঁর বিশ্বাস সম্যক প্রকাশিত। 'দি পাওআর অ্যাণ্ড দি গ্লোরি'-র (১৯৪০) নায়ক এক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মেক্সিকান ধর্মযাজক। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে তার জীবনকে পর্যালোচনা করেছে। এবং তার মধ্যে এক বৃহৎ ও মহৎ মানবসত্তা ফুটে উঠেছে। 'দি হার্ট অফ্‌ দি ম্যাটার'-এ (১৯৪৮) গ্রীন এক পরম পরিণতিতে উত্তীর্ণ। ঔপনিবেশিক সভ্যতা কেমন ক'রে মানুষকে ধীরে ধীরে দুর্নীতির গ্রাসে কবলিত করে, তাই বলতে গিয়ে গ্রীন বাইবেলের অতি পুরাতন, এবং মৌল দুটি বিশ্বাসকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। আদমের পতন থেকে, মানুষ নিরন্তর পাপ করে চলেছে, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে ভাল হতে পারে এই একটি বিশ্বাস। আর অপর বিশ্বাস হচ্ছে, মানুষের অন্তর পাপশূন্য তবু প্রলোভন ও দুর্নীতি তার পতন ঘটায়। গ্রেহাম গ্রীনের এই শেষ উপন্যাসটি বহু পঠিত হয়েছে। পাঠক মনের উপর এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছে। এই যুগের সাহিত্যিক হয়েও গ্রীন বিষয়বস্তু নির্বাচন করলেন সুপ্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে, এতে পাঠকরা প্রথমে বিস্মিত হয়েছেন। তারপর তাঁদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে উপন্যাসটি। গ্রীন-এর সম্পর্কে শেষ কথা বলবার সময় আসেনি, তবু কোন কোন সমালোচক এ কথা বলেছেন, 'without any other comparison, we may think that Green's novels are at least as important to English literature as those of Hardy and more important than those of Lawrence'. এই উক্তির আতিশয্য কতখানি সমর্থনযোগ্য তা অবশ্যই বিবেচ্য।

এভ্‌লীন ওয়াও হয়তো গ্রেহাম গ্রীনের মতোই রোমান ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী, তবু, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'এ হ্যাণ্ডফুল অফ্‌ ডাস্ট'-এ (১৯৩৪) বিশ্বাসের সহজ আত্মসমর্পণের চেয়ে বিদ্রূপ ও শ্লেষের সুরই সোচ্চারিত হয়েছে। তাঁর প্রথমদিকের রচনাগুলি উপভোগ্য, কিন্তু তাতে পাঠকের মন ভরে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্রমশ এভ্‌লীন ওয়াও লেখাতে গভীরতা আনবার চেষ্টা করেছেন। 'ব্রাইডস্‌হেড রিভিসিটেড' (১৯৪৫) এবং 'পুটআউট মোর ফ্ল্যাগস্‌'-এ (১৯৪৮) কৌতুকের হাল্কা রসে ওয়াও তাঁর চরিত্রদের চলবার পথ সহজ করে দিতে পারেননি। যুদ্ধোত্তর সমাজে মানুষের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের শোচনীয় পরিণতির পূর্বাভাস ক্রমেই ওয়াও-এর লেখাকে ভারী করেছে। তবু ওয়াও-এর পরবর্তী উপন্যাসগুলি পড়লেও বোঝা যায়, এখনও ওয়াও তাঁর বক্তব্যকে সম্যক সঙ্গতিতে প্রকাশ করতে পারছেন না। প্লট, চরিত্র, পরিণতি, সবকিছুর মধ্যেই ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত। এবং এই ভারসাম্যের অভাব লেখকের নিজেরই মধ্যে। তাঁর আত্মবিশ্বাসে তিনি স্থির হতে পারছেন না, আর এই অস্থৈর্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে তাঁর লেখাকে। অথচ পথ খুঁজে পাবার, আত্মবিশ্বাসে স্থির হবার আকুতি তাঁর লেখায় পরিস্ফুট। 'দি লাভ্‌ড ওয়ান্‌' (১৯৪৮), 'মেন অ্যাট আরম্‌স' (১৯৫২), 'অফিসার্স অ্যাণ্ড জেণ্টল্‌ম্যান' (১৯৫৫), 'দি অরডিয়াল অফ্‌ গিল্‌বার্ট পিনফল্ড' (১৯৫৭) পড়ে এই মনে হয়, যা বলতে চেয়েছেন, তা যেন বলা হয়নি। লেখকের উদ্দেশ্যের মহত্বে ও সততায় সন্দেহ নেই। কিন্তু 'Waugh has just missed it'.

নিগেল বালচিন (১৯০৮—) 'ডার্কনেস্‌ ফল্‌স ফ্রম্‌ দি এয়ার' (১৯৪২) লিখে দ্রুত খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তারপর থেকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে মৌলিকতা দেখিয়ে পাঠকের মন জয় করতে তাঁর কখনো ভুল হয়নি। এঁর লেখাতে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এমন বাস্তবতায় সজীব হয়ে ওঠে, যে, বালচিনের উপন্যাস পড়ে অতি সুখপাঠ্য কোন আত্মজীবনী পড়বার আনন্দ পাওয়া যায়। তাঁর কল্পনাশক্তি সজীব। 'মাইন ওন একজিকিউশনার'-এ (১৯৪৫) সাইকো-অ্যানালিসিস দ্বারা চিকিৎসা, বা 'এ ওয়ে থ্রু দি উড্‌'-এ হিংসা, প্রতিশোধ-স্পৃহা, এবং প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর মানুষটির মনোবিশ্লেষণ, সব কিছুকেই অতিমাত্রায় বাস্তব করে তুলতে পেরেছেন বালচিন।

এইসব মাঝারি এবং জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে এইচ. ই. বেট্‌স (১৯০৫) অন্যতম। তিনি নাটকীয় প্লট ও দুঃসাহসিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগে কুশলী শিল্পী। তাঁর 'ক্রুইজ্‌ অফ্‌ দি ব্রেড্‌উইনার'-কে (১৯৪৬) অন্যতম 'ক্ল্যাসিক্‌ অফ্‌ দি ওয়ার্‌' বলা হয়েছে। বহু উপন্যাস লিখেছেন বেট্‌স। তবে বর্তমানে তিনি ছোট গল্পেই সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁকে 'উর্বরতম' লেখকও বলা হয়। 'আর্গোসি' পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই বেট্‌সের গল্প দেখা যায়। আধুনিক ইংরাজী গল্প সংগ্রহ মানেই বেট্‌স-এর অপরিহার্য উপস্থিতি।

রেক্‌স্‌ ওআর্নার-এর (১৯০৫) লেখন-রীতি কিঞ্চিৎ পরুষ হবার জন্য তিনি বেট্‌স-এর মতো জনপ্রিয় হতে পারেন নি। তবুও তাঁর 'দি এরোড্রোম' (১৯৪১), 'হোয়াই ওয়াজ আই কিল্‌ড্‌?' (১৯৪৩) বহু পঠিত এবং প্রশংসিত উপন্যাস।

'অ্যানিম্যাল ফার্ম' (১৯৪৫), ও 'নাইনটিন্‌ এইটি ফোর'-এর (১৯৪৯) লেখক জর্জ অরওয়েল ১৯৫০ সালে অকালে বিগত না হলে আরো চিরায়ত সাহিত্য সম্পদে ইংরেজী উপন্যাসকে ঐশ্বর্যবান করতে পারতেন এ কথা মনে করবার কারণ আছে। শ্লেষাত্মক রচনাতেই অরওয়েলের পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছিল। 'অ্যানিম্যাল্‌ ফার্ম'-এ রাজনৈতিক দলাদলিকে আক্রমণ করেন অরওয়েল। 'নাইন্‌টিন এইটি ফোর'-এ, ইংলণ্ডে কম্যুনিস্ট শাসনে কি সন্ত্রাসের কালোছায়া নেমে আসবে তারই নিষ্ঠুর বর্ণনা জীবনলাভ করেছে। সমালোচকরা মনে করেন, অরওয়েল ধীরে ধীরে আরো পরিণত বিষয়বস্তুকে তাঁর লেখনীতে আয়ত্ত করতে পারতেন। তাঁর মধ্যে প্রতিভার প্রতিশ্রুতি ছিল।

এই বর্তমানের বিভ্রান্তি, হতাশা এবং জিজ্ঞাসাকে যাঁরা লেখার পুঁজি করেছেন, তাঁদের উপর জেম্‌স হ্যান্‌লি-র প্রভাব ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যান্য বইয়ের চেয়ে 'লেভিন'-ই (১৯৫৬) এই লেখকের কুশলতার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। জাহাজডুবির পলাতক নাবিক লেভিন, এবং আশ্রয়চ্যুত গ্রেস, যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে এতটুকু দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছে, এই কাহিনী লিখতে বসে হ্যান্‌লি ভাষা, সংলাপ, দুই চরিত্রের জীবনের নাটক বর্ণনা, সব কিছুতেই একটা ক্ষোভ, অস্থিরতা ও প্রতিবাদের সুরকে জীবন দিতে পেরেছেন।

উইলিআম স্যানসম অতীতে ফায়ারব্রিগেড বিভাগে সাময়িক চাকুরে ছিলেন ও বর্তমানে তিনি কাফ্‌কার অনুরাগী, এই দুটি তথ্যকে তাঁর লেখার মাধ্যমে বারংবার ঘোষণা না করলে লেখক হিসেবে আরো উন্নতি করতে পারতেন। তাঁর উপন্যাসদ্বয় 'ফায়ারম্যান ফ্লাউয়ার' (১৯৪৪) এবং 'থ্রী'-এর (১৯৪৬) চেয়ে তাঁর ছোট গল্পই খ্যাতি লাভ করেছে বেশী। 'ক্যাট আপ এ ট্রি' তাঁর বহুখ্যাত গল্প। এতে, এবং অন্যান্য লেখাতেও, স্যানসমের তথ্যনিষ্ঠতা ও শব্দ নির্বাচনে কুশলতা লক্ষ্য করা যায়।

ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখিকা স্টেলা বাওয়েনের মধ্যে জেন অস্টেন ও হেনরী জেম্‌সের প্রভাব আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন উৎসাহী সমালোচক উক্ত খ্যাতনামাদের সঙ্গে স্টেলা বাওয়েন-এর সৌসাদৃশ্যও লক্ষ্য করেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র, চরিত্র, বাক্যসংলাপ, নাটকপ্রিয়তা, গতিহীনতা, এ-ই শ্রীমতী বাওয়েনের উপজীব্য। এবং তাঁর পরিশীলিত মানস, সংযত ভাষা ব্যবহার, কুশল কথনভঙ্গী, ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচকদের কাছ থেকে বহু প্রশংসা অর্জন করেছে। তিনি বহু উপন্যাস রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'দি লাস্ট সেপ্টেম্বর (১৯২৮), 'দি ডেথ্ অফ দি হার্ট' (১৯৩৮) ও 'এ ওয়ার্ল্ড অফ লাভ' (১৯৫৫) সমধিক খ্যাত।

'লস্ট্ হোরাইজন' (১৯৩৩), 'গুড বাই মিঃ চীপ্‌স' (১৯৩৪), 'র‍্যাণ্ডম হারভেস্ট' (১৯৪১), 'নাথিং সো স্ট্রেঞ্জ' (১৯৪৭) ইত্যাদি বহুপঠিত ও জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখক জেম্‌স হিল্‌টন (১৯০০—) সাহিত্যের সমস্যা ও সাহিত্যিকের দায়িত্বের গুরুভার সযত্নে পরিহার করে এসেছেন। নাটকীয় গল্প রোমান্টিক মেজাজে সুন্দর করে বলবার জন্যই তাঁর খ্যাতি। তাঁর প্রথম উল্লিখিত উপন্যাস তিনটির অতিসার্থক চলচ্চিত্রায়ণ হিল্‌টনের খ্যাতিকে অধিকতর বিস্তৃত করেছে।

চার্লস ডিকেন্স-এর প্রপৌত্রী মনিকা ডিকেন্স (১৯১৫—) বাড়ির ঝি, নার্স, কবুতর-পালক, মনস্তত্ত্ববিদ্ এইসব চরিত্র চিত্রণে বাস্তবতা ও তথ্যনিষ্ঠতা ছাড়া অন্য কোন কৃতিত্বেই 'ডিকেন্স' নামের ঐতিহ্য রাখতে পারেননি। এই শ্রমশীল এবং সৎ লেখিকা মোটামুটি জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছেন। 'দি হ্যাপী

প্রিজ্‌নার' (১৯৪৬) এবং 'ফ্লাওয়ার্স অন দি গ্রাস' (১৯৪৯) তাঁর সুবিদিত উপন্যাস।

রেবেকা ওয়েস্ট্‌-এর উপন্যাস রচনার রীতিকে সমালোচকরা অতিমাত্রায় সচেতনতা এবং রহস্যপ্রিয়তার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। সে অপবাদ তাঁর 'রিটার্ন অফ দি সোলজার' (১৯১৮) পড়লে অতিশয়োক্তি বলে বোধ হয়। তবে উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেই শ্রীমতী ওয়েস্ট্‌-এর শিল্পী-কুশলতা ফুটেছে বেশী। এবং মনস্তত্ত্বের জটিল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের কাজের ও ব্যবহারের বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতা অবিসংবাদী। বিবাহিত স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা ও তার ফলে অবশ্যম্ভাবী এক ভয়ঙ্কর পরিণতি যে-কাহিনীটিকে সুপরিচিত করেছে সেই 'সন্ট অফ দি আর্থ' লেখিকার ক্ষমতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একজনের নির্বোধিতা কেমন করে অপরকে প্রতিহিংসায় উদ্দীপিত করতে পারে, তার এমন নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব চিত্র খুব বেশী নেই। বিষয়বস্তু এবং লেখকের সার্থকতায় এর সঙ্গে একমাত্র অলডাস হাক্স্‌লীর 'দি জিয়কন্দা স্মাইল'-এর তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণ পাঠকের অবোধ্য কোন কারণে শ্রীমতী ওয়েস্ট্‌-এর এই গল্পটি এক বিশ্ববিখ্যাত ভূতের গল্পের সংকলনে স্থান পেয়েছে।

শিশুদের নিয়ে উপন্যাস রচনায় ইংরাজ লেখকদের সুনাম দীর্ঘদিনের। ফরেস্ট রীড্‌ (১৮৭৬-১৯৪৭) শিশুদের জগৎকে একটি পবিত্র মাধুর্যে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। 'আংকল স্টিফেন' (১৯৩১), 'দি রিট্রিট' (১৯৩৬), 'ইয়ং টম' (১৯৪৪), তাঁর এই বিশেষ ধরনের উপন্যাস লেখায় অবিসংবাদী কৃতিত্বের পরিচায়ক। গৃহপালিত জীবজন্তু, খামারের জীবন কেমন করে শিশুদের মনকে ব্যস্ত রাখে, আনন্দ দেয় তার অতি সুন্দর বর্ণনা করতে পেরেছেন রীড্‌। তাঁর আত্মজীবনীও উপন্যাসের মতোই সাগ্রহে পঠিত হয়ে থাকে।

এল. পি. হার্ট্‌লীকেও উপন্যাসের বিষয়-নির্বাচনে শিশু ও কিশোরদের জগৎ-ই আকৃষ্ট করেছে বেশী। হার্ট্‌লীর কল্পনাশক্তি, উপলব্ধির সৌকুমার্য তাঁর উপন্যাসে একটা নতুন সুর এনেছে। তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে ভাবপ্রবণতার

আধিক্য, এবং অসম্ভাব্য ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে সব চরিত্রকে একটা সুখের পরিণতিতে পৌঁছে দেবার ঝোঁক তাঁর সব লেখা থেকেই ভারসাম্য হরণ করেছে। 'দি শ্রিম্প এ্যাণ্ড দি এ্যানীমোন' (১৯৪৪), 'দি সিক্সথ হেভন' (১৯৪৬) ও অন্যান্য বই-এর লেখক হার্ট্‌লীর পরিণততম উপন্যাস হচ্ছে 'দি গো বিটুইন' (১৯৫৩)। একটি কিশোর দুইজন বয়স্ক নর-নারীর প্রণয়ের দৌত্যের কাজ করতে নিরত। কেমন করে বয়স্কদের পরিণত অনুভূতির জগতে তার সত্তার উন্মীলন হলো সেই কাহিনী অতি নিপুণতা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিবৃত করেছেন হার্ট্‌লী।

কল্পনার খেয়ালখুশীর জগত আর বাস্তব জগত—দুই পৃথিবীর মধ্যে যথেচ্ছ বিহার করেছেন ডেভিড গার্নেট (১৮৯২—)। তাঁর উপন্যাস 'লেডী ইন টু ফক্স' (১৯২৩), 'এ ম্যান ইন দি জু' ইত্যাদি উপন্যাস তাঁর কল্পনা-প্রিয়তার চিত্রময় উদাহরণ। প্রথম উপন্যাসে কখন তিনি শেয়াল, এবং কখনই বা মানুষের কথা বলছেন, বুঝতে গোলমাল হয়। এই গার্নেট্ এক নেংটি ইঁদুরের জীবন নিয়ে একটি অনবদ্য গল্প 'স্কুইকি পিক্সি' লিখেছিলেন।

ইতিহাস, বিগত শতক, পারিবারিক ইতিহাস, এই সব বিষয় নিয়ে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। স্টুআর্ট-যুগ নিয়ে সার্থক ও সুখপাঠ্য কাহিনী লিখেছেন মার্গারেট আরউইন। 'রয়্যাল ফ্লাশ' (১৯৩২), 'দি গে গ্যালিয়ার্ড' (১৯৪১) তার মধ্যে অন্যতম।

ডেভিড্ লেস্‌লী মারে (১৮৮৮) প্লট, চরিত্র-চিত্রণ ও তথ্যনিষ্ঠায় সুসম্পূর্ণ ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। 'টেল অফ থ্রি সিটিজ্' (১৯৪০), 'এণ্টার থ্রি উইচেস্' (১৯৪২) পাঠকদের কাছে সুপরিচিত।

রোমান্স ও অ্যাডভেঞ্চারে ভরপুর 'হোয়াইল রিভার্স রান' (১৯২৬), 'ম্যান ইন ব্রাউন' (১৯৪৫) ও অন্যান্য উপন্যাস লিখেছেন মরিস ওআল্‌শ (১৮৭৯—)। নীল গার্ন্ (১৮৯১—) স্কটল্যাণ্ডের পটভূমিকায় অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ 'ওয়াইল্ড গিজ্ ওভার হেড' (১৯৩৯), 'দি ড্রিংকিং ওয়েল' (১৯৪৭) ইত্যাদি লিখেছেন।

স্বীয় পরিবারের পটভূমিকায় অতীব উপভোগ্য উপন্যাসত্রয় 'দি হিস্ট্রী অফ

এগ প্যাণ্ডার ভিল্' (১৯২৮), 'নিকী সন অফ এগ' (১৯২৯), 'দি প্যাণ্ডার ভিলস' (১৯৩০) লিখেছেন জেরাল্ড বুলেট (১৮৯৩—)।

বিগত শতকের মধ্যবিত্ত পরিবার নিয়ে অতীব উপভোগ্য উপন্যাস 'প্যাস্টরস্ অ্যাণ্ড মাস্টারস্' (১৯২৫), 'মেন অ্যাণ্ড ওয়াইভস্' (১৯৩১), 'ডটার্স অ্যাণ্ড সনস্' (১৯৩৭), 'এ ফ্যামিলি অ্যাণ্ড এ ফরচুন' (১৯৩৯), 'ম্যানসারভেন্ট অ্যাণ্ড মেডসারভেন্ট'-এর (১৯৪৬) লেখিকা আইভি কম্প্টন বার্নেট্-এর ইংরাজী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাতিস্বিকতা ও মর্যাদাবোধ এই লেখিকাকে তাঁর স্বীয় ক্ষমতার সীমিতি সম্পর্কে সচেতন রেখেছে। তিনি কালের বাতাসে গা ভাসাননি। নাটকীয়তা-পূর্ণ কাহিনীকে মুখ্যত সংলাপের মাধ্যমে বিবৃত করতে লজ্জিত হননি। তাঁর পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর উপন্যাসকে একটি গভীরতা দিয়েছে, এবং ধীরে রসাস্বাদন করে না পড়লে শ্রীমতী বার্নেট্-এর লেখার স্বরূপ পাঠকের নজর এড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। ১৮৮৮-১৯০২ এই যুগটিকে লেখিকা সুবেদী মন নিয়ে দেখেছেন, কুশল লেখনীতে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তার সুখ, দুঃখ ও বেদনা। বিগত ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সব কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয়, বর্ত্তমান শতক এই প্রৌঢ়াবস্থায় যে হতাশা, বিক্ষোভ ও অস্থিরতায় ভুগছে, তার কিছুমাত্র শ্রীমতী বার্নেটকে স্পর্শ করেনি। তিনি যেন ম্যাজিক লণ্ঠন হাতে নিয়ে শাদা-কালোর আলোছায়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বপ্নের রঙ মিলিয়ে ছবির পর ছবি দেখিয়ে মনোহরণ করছেন পাঠকের। অথচ, শ্রীমতী বার্নেট সমাজ ও বাস্তব সম্পর্কে সচেতন। সত্য ও বাস্তবতা থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন না।

এ-পর্যন্ত যে-সব ঔপন্যাসিকদের কথা বলা হয়েছে, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের নিয়েই আধুনিক যুগ শুরু। বয়সের হিসাবে যাঁরা ষাট, পঁয়ষট্টি, সত্তর ছুঁয়েছেন, তাঁদের আধুনিক ঔপন্যাসিক বলে চিহ্নিত করতে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতাদের কোন অসুবিধা হয়নি। আপাত-দৃষ্টিতে ব্যাপারটি কৌতুককর বোধ হবে। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখলেই, এই অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতির আশ্বাস মিলবে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ ক'রে প্রথম এলিজাবেথীয় যুগেই সাহিত্যিকরা বিত্ত, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। জাতীয়

ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টায় নিরন্তর শ্রমশীল ইংরাজ জাতকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ রক্ষণশীল বলে পরিহাস করেন। ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যেও সেই পুরনোকে ধ'রে রাখবার এবং তার পটভূমিতে নতুন নতুন ধারাকে বিচার করবার চেষ্টা দেখা যায়। ফ্রান্স-এর মতো এই সাহিত্য বহু নতুন ধারা, বহু নতুন প্রভাবের আন্দোলনে চঞ্চল হয়নি। আবার আমেরিকার মতো এই সাহিত্যের ইতিহাস একেবারে নতুন নয়। তাই, আধুনিক সাহিত্য বলতে এঁরা বিংশ শতকের মধ্যমভাগ বোঝেন না। নিত্য নতুন আন্দোলন ও ভাবধারা ফরাসী সাহিত্যকে উর্বর করেছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে। আবার ইংরাজী সাহিত্যকে তার জাতীয় চরিত্রই বিস্তৃত হতে সাহায্য করেছে। যে সমারসেট মম আশী ছুঁয়েছেন, তাঁর সাহিত্যও তাই, এই সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগের আওতায় পড়ে।

তবু, এই প্রৌঢ়দের পরে, ইংরাজী উপন্যাস-সাহিত্যে আরো নতুন নতুন মুখ ভিড় ক'রেছে। এই অত্যাধুনিকদের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক বা দুই দশক আগে। এবং এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবী যখন দীর্ণ-বিদীর্ণ, আদর্শের ঘরে দেউলিয়া, তারই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় এঁদের শৈশব ও বাল্য কেটেছে। এঁরা চোখের সামনে ব্রিটানিয়াকে সপ্ত সমুদ্রের ঢেউকে রাজদণ্ড হাতে শাসন করতে দেখেননি। এঁদের চোখের সামনে ইংলণ্ডের শক্তি সংকুচিত হয়েছে। সে তার উপনিবেশগুলি হারিয়ে হৃতবল হয়েছে। যুদ্ধে তার যে লোকক্ষয় হয়েছে, বুঝি তা আজও পুরণ হয়নি। লেবর পার্টির পরাজয়; এই তরুণদের মনে তজ্জনিত এক নৈরাশ্য এবং রাজনীতির প্রতি অনাস্থা এঁদের মনকে গভীরভাবে ঘা দেয়। তারই ফলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের সমস্ত দোষক্রটি ও দুর্বলতার প্রতি এঁরা সজাগ। সমসাময়িক সমাজ এঁদের কাছে অগ্রহণীয়। অথচ এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভে এঁরা অক্ষম। তারই ফলে এক সামগ্রিক বিরাগ এঁদের সাহিত্যের মূল উপজীব্য। অত্যুগ্র প্রাতিস্বিক স্বতন্ত্রতাকামী এই তরুণ দল অতএব ফরাসী অস্তিত্ববাদের শরণাপন্ন। অথচ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অসারতা সম্পর্কে এঁরা নিঃসংশয় হলেও, বৈভব, সচ্ছলতা, নিরাপত্তা, উক্ত সমাজের এই সব লোভনীয় টোপের প্রতি এঁদের আসক্তি সুপরিস্ফুট। কেননা উক্ত সমাজের ওয়েলফেয়ার স্টেটের আনুকুল্যে শিক্ষা, চাকুরী এই সবের সুবিধা তাঁরাও গ্রহণ করছেন। তাই এঁদের সম্পর্কে আধুনিক সমালোচক বলেন—'This plebian elite'. এই তরুণ দল যদ্যপি

'Briton's Angry Young Men' নামে অভিহিত, তবুও এই আখ্যা-প্রদানের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ অত্যন্ত মুখর। একথা মনে ক'রলে ভুল হবে না, সম্ভবত এঁরা এই 'Anger'-এর যাথার্থ্য সম্পর্কেই সন্দিহান।

জন্ ব্রেইনের প্রখ্যাত 'রুম অ্যাট দি টপ'-এর নায়ক জো ল্যাম্প্টন শ্রমিক-সন্তান। ধনীদের সে অন্তরে ঘৃণা করে, অথচ যেন-তেন-প্রকারেণ, সেই ধনী সমাজে পাত পাবার জন্য তার সমস্ত চেষ্টা ব্যয়িত। তাই ধনী-কন্যা সুসানকে সে ভাল না বেসেও বিয়ে করে, এবং নিজের জীবনে বহু পদস্খলন থাকা সত্ত্বেও তার প্রেমিকা এলিসের জীবনের একটা সামান্য অপরাধকে দায়ী ক'রে এলিসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। পরিশেষে এলিস আত্মহত্যা করে এবং জো সত্যই সবচেয়ে উপরের কামরায় সিঁড়ি ভেঙে পৌছয়। মধ্যবিত্ত মানসের এই দুর্বলতা, জোড়াতালি দিয়ে চলবার চেষ্টা, সহজে ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা, এ সবকে যখনই ব্রেইন্ নির্মম শলার খোঁচায় উদ্ঘাটিত করেন, তখনই তাঁর লেখা সার্থকতা পায়।

জো ল্যাম্পটনের মতো সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্ধ চরিত্রের মানুষদের বড় ক'রে দেখাবার চেষ্টায়-ই এই 'রাগী ছোকরাদের' দৃষ্টিভঙ্গীর গলদ প্রমাণিত হয়েছে। তাই জন্ ওয়েইন্-এর 'হারি অন্ ডাউন'-এ (১৯৫৩) নায়ক চার্লস্ লাম্লেকে দেখি, মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে চ্যুত হয়ে সে শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভিড়ছেনা। ধনীর কন্যাকে প্রণয়ের ছলনায় মুগ্ধ ক'রে অর্থবান হবার চেষ্টা করছে। ওয়েইন্-এর ভাষার আড়ষ্টতা বইটিকে দুর্বল করেছে।

টমাস্ হাইও্-এর 'হ্যাপী অ্যাজ ল্যারী'-র নায়ক ল্যারি ভিনসেন্ট যাবতীয় মানবিক দায়িত্ব পরিহার ক'রে মানসিক ক্লীবত্ব অর্জন করেছে এবং সেই ক্লীবত্বই লেখকের মতে ল্যারির চরম সুখের অবস্থা। তা'র স্ত্রী বেটী রাস্তায় গাড়িতে চাপা পড়লে সে ফিরেও দেখে না। জনৈকা বৃদ্ধা অন্ধ মহিলা রাস্তা পার ক'রে দেবার জন্য সানুনয় অনুরোধ ক'রলে সে জড়ের মতো নিষ্পলক চেয়ে থাকে। বন্ধুরা তার বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য চাকরী দিতে চাইলে সে ইণ্টারভিউ-এ বোবা সেজে থাকতে চায়। চাকরী করবার দায়িত্বও সে স্বীকার করতে চায় না।

কবি ও ঔপন্যাসিক কিংসলি এমিস্, ছোট একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পটভূমিকায় 'লাকী জিম্' লিখেছেন। এর নায়ক জিম ডিকসন, তার কর্তৃপক্ষ নেড্ ওয়েল্‌শকে খুশি রাখবার জন্য সারাদিন খোসামুদি করে। অথচ স্বল্পবিদ্যা ওয়েল্‌শ-এর উপর তার যে বিতৃষ্ণা জমে উঠে, তাকে মুক্তি দিতে সে নানারকম ছেলেমানুষী ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। দুর্বল চরিত্র জিম ডিকসন নানা অসম্ভব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হাসে। এই কৌতুকের শরণ না নিয়ে তার উপায় নেই। কেননা তার বিতৃষ্ণাকে সে অন্যভাবে মুক্তি দিতে পারে না। এবং 'he will not seek resort to stronger means for he must have his job'. এমিস্-এর দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে সুস্থতর।

'আণ্ডার দি নেট' (১৯৫৬) উপন্যাসের লেখিকা আইরিস্ মারডক্-কে উক্ত দলভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু 'স্যাণ্ড ক্যাস্‌ল' ও 'দি বেল'-তে (১৯৫৮) আইরিস্ মারডক্ মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁর নিজের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

এই 'রাগী ছোকরা'দের দলে যাঁদের ফেলা যায় না অথচ যাঁরা শক্তির স্বাক্ষর নিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে 'হেম্‌লক অ্যাণ্ড আফটার'-এর (১৯৫২) লেখক অ্যাংগাস্ উইল্‌সন; 'দি ডাভস অফ ভেনাস'-এর (১৯৫৫) লেখিকা অলিভিয়া-ম্যানিং; 'হেস্‌টার লিলি'-র (১৯৫৪) লেখিকা এলিজাবেথ টেলর; 'কার্ডস অফ আইডেনটিটি'-র (১৯৫৫) লেখক নিগেল ডেনিস; 'লর্ড অফ দি ফ্লাইজ্'-এর (১৯৫৪) লেখক উইলিয়াম গোল্‌ডিং; এবং 'দি স্ট্রাগল অফ অ্যালফ্রেড উডস'-এর লেখক উইলিয়াম কুপার-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

লেবর পার্টির পরাজয়ের পর এই সব তরুণ ক্রুদ্ধ লেখক সম্প্রদায় তীব্র নৈরাশ্য ও Cosmic disgust-কে আশ্রয় ক'রে তাঁদের চিন্তার প্রতিপালন করেছেন। ধনিকশ্রেণীর মানুষী উন্নাসিকতা এবং সার্বিক সমাজ-অব্যবস্থা হঠাৎ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তাঁরা বৈরাগ্যের সংগে অনুভব করলেন—আজ মানুষের কি করুণ অবস্থা! সমাজ ও রাজনীতির ঘটনাবর্তে প্রাতিস্বিক মানুষ এযুগে দিশাহারা! তার আত্মা প্রত্যহ লাঞ্ছিত, অপমানিত। জীবন এখন সব সময় মৃত্যুর আকস্মিকতায় পাংশু ও বিবর্ণ হয়ে থাকে। সর্বাধুনিক কথাসাহিত্য তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই সংকটকালে পৃথিবীর সংকীর্ণ পথে অভিযানের খবর সংগ্রহ করতে ব্যগ্র হলো। বিশদ ও বিন্যস্ত খবর। তাই, বর্তমান মূল্যহীন

সমাজবোধের প্রতি নবীনদের এই অসীম নৈর্ব্যক্তিক ভাবপ্রকাশ এবং গভীর অনীহায় অন্তকার উদ্‌বেগ ও কল্যকার শাসানিকে নিয়ে বদ্‌রাগী তরুণদের সাহিত্যপ্রচেষ্টা—যা প্রবীণদের দৃষ্টিতে আধুনিক সাহিত্য-মন্বন্তর ব্যতীত আর কিছু নয়। এঁদের উদ্দেশ্য ক'রেই হয়ত কড্ওয়েল বলেছিলেন, 'It is the peculiar suffering of the petit-bourgeoisie that they are called upon to hate each other......No companionship or solidarity is possible'. তবে ফ্রান্স-এর বেলায় একটি কাল্যবসানের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যেতে যেতেও যে আলোকোত্তাপ ছড়ায়—গোঁড়া বিধি-নিষেধসর্বস্ব, নিস্তরঙ্গ ইংলণ্ডের গৃহে সেই আলোকোত্তাপ বহুদিন হলো নির্বাপিত। এখন সব উত্তেজনা মুমূর্ষুর যন্ত্রণার মতো শোনায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফরাসী কথাসাহিত্য

"Take from our hearts the love of the beautiful
And you take away all the charm of life "

—Rousseau : Emile—Bk. IV

ফরাসী ভাষায় একটি শব্দ আছে, 'roman'। শব্দটি দ্বিবিধ অর্থ বহন করে ; 'Romance' ও 'Novel'-এর স্বতন্ত্র অর্থ ওই একটি শব্দেই সন্নিহিত হয়েছে।

কাহিনী ও উপন্যাসে কল্পনার স্থান আগে, সেদিক থেকে বিচার ক'রলে ফরাসী ভাষায় কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্যের (Imaginative literature) উপস্থিতি হয়েছে একটু বিলম্বে ; রেনেসাঁসের আগে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি বলা ঠিক। তবে ফরাসী সাহিত্যে মধ্যযুগ চিরকালই এক বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করে আছে। যুগে যত আধুনিকতার রঙ লেগেছে, লেখকরা যতই নতুনতর চিন্তার সান্নিধ্য অনুভব করেছেন, ততই তাঁরা মধ্যযুগের সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছেন, গ্রীক-লাতিনের সম্পদ আহরণে ব্যগ্র হয়েছেন।

আজকের যে ফরাসী ভাষার সঙ্গে জগদ্ব্যাপী পরিচয় তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই। তার আগে Vicux Francais অর্থাৎ পুরাতন ফরাসী চৌদ্দশতক পর্যন্ত অস্থিরতায় বিচরণ করেছে। Moyen francais অর্থাৎ মধ্য ফরাসী এবং রেনেসাঁস ফরাসী ষোড়শ শতাব্দী অবধি নানা পরিবর্তিত আকারের মধ্যে অনিশ্চয়তার কাল কাটিয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর আধুনিক ফরাসী উৎক্রান্ত হলো এমন একটা পর্যায়ে যখন লাতিনের বাহুমুক্তি ঘটে স্বচ্ছন্দবিহার সম্ভব হলো।

ফরাসী সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে। ক্রেঁতিয়াঁ দ্য ত্রোয়া ছিলেন তখনকার এক অসাধারণ শিল্পী, তিনি সাধারণ্যে আর্থারিয়ান রোমান্সকে

প্রচলিত করে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের সেই আদিমকালেও তিনি যে কতখানি শিল্পবেত্তা ছিলেন তার পরিচয় রয়েছে ক্রেঁতিয়াঁর 'ল্য কোঁৎ দ্য গ্রাল' অথবা Perceval নামক অসমাপ্ত রচনায়। তাতে তিনি অতীন্দ্রিয় রসের সমাবেশ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে লেখায় প্রতীক ব্যবহার করার বিস্ময়কর পারঙ্গমতাও দেখিয়েছিলেন। 'গ্রাল' বস্তুটি কি এই অনুসন্ধানের ফলাফলে আবিষ্কৃত হয় যে 'লাস্ট সাপার' ছবিতে সেটি জাহাজরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আজ ভাবলে অবাক লাগে, ক্রেঁতিয়াঁ সাহিত্যের সেই অজ্ঞান যুগে, অপরিচ্ছন্ন চিন্তার কূলে বসে কেমন ক'রে সেদিন অত আধুনিক হবার দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছিলেন! এতদ্ব্যতীত তাঁর কাব্যে প্রেম, অ্যাডভেঞ্চার এবং বাস্তবতা এত বিন্যস্তাকারে, শৈল্পিক-প্রতীতিতে প্রতিমূর্ত হয়েছিল যে, পরবর্তীকালের রচয়িতারা বহু চেষ্টা করেও তাঁর প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি।

এই আর্থারিয়ান রোমান্সকে একত্র ক'রে, পাঁচখণ্ডে একটি বৃহদাকায় গদ্যোপন্যাসে রূপান্তরিত ক'রে 'লান্সেলত-গ্রাল' প্রকাশিত হয় ১২২৫ সালে ; বলা বাহুল্য ফরাসী ভাষায় সেটিই প্রথম গদ্যোপন্যাসের স্মরণীয় প্রয়াস। কিন্তু চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত গদ্যসাহিত্য মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হতে পারে নি ; কাব্যেরই তখন জয়জয়কার। দ্বাদশ শতাব্দীতেই ফরাসী মহাকাব্য 'শাঁসোঁ দ্য জেস্‌ত্‌' প্রকাশিত হয়েছিল, তখন দেশময় সামন্ত-তান্ত্রিক আভিজাত্য সম্মান ও প্রতিপত্তি আদায় করে চলেছে মানুষের।

চিন্তানায়কদের আবির্ভাব ইতালীয় রেনেসাঁসকে কল্পনায়, চৈতন্যে যেমন ঐশ্বর্যযুক্ত করেছিল ফ্রান্সেও তেমনি প্রাক-রেনেসাঁস ও রেনেসাঁসের অন্তর্বর্তীকালে কয়েকজন ভাবুক-প্রবরের প্রত্যাভিজ্ঞা সাহিত্য ও সমাজজীবনকে উজ্জীবনে উন্মগ্ন করেছিল। কথাসাহিত্যের আলোচনা করতে গেলেও সেইসব উন্নেতাদের অল্পবিস্তর পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ তাঁদের চিন্তাবিদ্ধ রচনা তদানীন্তন ফরাসী গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এলেন ফ্রাঁসোয়াঁ রাবেলে (১৪৯৪), তাঁর 'গারগঁতুয়া পঁতাগ্রুয়েল' ফরাসী ধ্রুবসাহিত্যের অঙ্গীভূত। রাবেলে প্রথম জীবনে সন্ন্যাসধর্ম পালন করেছিলেন, তারপর হয়েছিলেন চিকিৎসক। তাঁর নিজস্ব একটি ছোটখাট দল ছিল যাঁরা প্রায়ই সচ্চিন্তায় অংশ নিতেন এবং ঘন ঘন অ্যারিস্ততল ও প্লেটো আলোচনায় ব্যাপৃত থেকে মানসিক উৎকর্ষতা সাধন করতেন। রাবেলে যত বেশী উদ্ধৃত হয়েছে,

ততবেশী বোধহয় পঠিত হয় নি। কারণ, সে সব রচনা তাঁর ভাষায় আয়ত্ত করার অসুবিধা এবং অন্য ভাষায় অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ, তাই অধিকাংশ লোকের কাছে তিনি দুরধিগম্য হয়েই রইলেন কিন্তু যদি তাঁর রচনার অন্তস্থলে প্রবেশ করা যায় তাহলে দেখা যাবে তিনি শুধুই ব্যঙ্গকার, Rationalist বা সংস্কারক ছিলেন না—প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, মনুষ্যত্বের প্রবর্ধক, প্রজ্ঞাপরায়ণ সেই ব্যক্তিটি রেনেসাঁসের কাল-কে শুধুমাত্র একক প্রচেষ্টায় যতখানি উদ্বুদ্ধ, উদ্বোধিত করেছিলেন, কোন দেশের আর কোন লেখকের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়নি। তিনি ছিলেন সরল, আনন্দময় পুরুষ। 'Be frolic now, my lads, cheer up your hearts'—এই ছিল তাঁর বচন। কোলরিজ এই সদানন্দ পুরুষটির প্রাক্কলনে বলেছিলেন, 'I could write a treatise in praise of moral elevation of Rabela's work which would make the church stare and the convention groan, and yet would be the truth and nothing but the truth'.

মিশেল দ্য মঁতেন্ (১৫৩৩-৯২) উত্তর রাবেলে যুগের মানুষ, প্রায় বছর পঞ্চাশের বয়োকনিষ্ঠ এই ব্যক্তিটি ছিলেন রাবেলের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি রেনেসাঁসের সম্পূর্ণকরণে গুরুতর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর আগে ক্যালভিন (১৫০৯-৬৪) লাতিন ভাষায় 'এঁ্যাস্‌তিত্যুসিয়োঁ ক্রেতিয়েন্' গ্রন্থে আপন মতবাদ প্রকাশ করেছেন এবং পরে সেটি অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাবে ও ভাষায় ফরাসীতে অনূদিত করা হয়, যাতে সকল শ্রেণীর মানুষ বিনা আয়াসে সেই মতবাদ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ফরাসী গদ্যসাহিত্যে বইটির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, কারণ ওটি ফরাসীর প্রথম আধিবিদ্যক রচনা। ১৫৭১ সালে মিশেল দ্য মঁতেন্ জাগতিক কোলাহল থেকে ছুটি নিয়ে তাঁর নিজের নির্জন দুর্গাবাসে বসে আপনার সংগে আপনি বাক্যালাপে রত হলেন আর তখনি ফরাসী সাহিত্যে এক মহৎ রচনার খসড়া তৈরি হয়ে গেল। ন' বছর বাদে যখন তাঁর 'এসে' গ্রন্থের দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হলো, তখন তিনি গোড়াতেই পাঠকদের স্পষ্ট করে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে বইটির বিষয় একান্তই আত্মগত : 'সে মোয়া ক্যু জ্য পাঁ্য'। তিনি আপনার পানে তাকিয়ে এবং হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর অবাধ নির্দয় আচরণ লক্ষ্য করে বুঝেছিলেন মানুষ কোনদিন জীবন-সত্যে উপনীত হতে পারবে না। যুক্তি-তর্কের বিনশ্বরতা, মনুষ্যজীবনের সদাচঞ্চল, নিয়ত-অস্থির সত্যাসত্য, বিশ্বাস-

অবিশ্বাস—কোন কিছুরই চিরস্থায়ী মূল্য নেই। এককথায় তিনি ছিলেন নাস্তিক্যবাদের পরিপোষক, কিন্তু তা বলে মঁতেন্ জীবন-পলাতক ছিলেন না—negation-ই তাঁর মূল কথা ছিল না। তিনি যদিও বলতেন, 'The world is nothing but babbling and words' কিন্তু তবু তাঁর লেখায় এমন এক গম্ভীর গভীর প্রশান্ত তন্ময়তার জগৎ অপেক্ষা করে আছে যাতে বেদনাবিক্ষুব্ধ অশান্ত পৃথিবীর সমুদয় মানুষ সন্তৃপ্ত অনুষঙ্গ পেয়ে এসেছে।

গল্প, কাহিনী বা উপন্যাসের অনুন্নত আকার ষোড়শ শতাব্দীতে ইতস্তত পরিলক্ষিত হলেও সঠিকভাবে (in the strictest term) তার জনকত্ব কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির উপর আরোপ করা যায় না। রাবেল বা মঁতেন কিংবা পরবর্তীকালে রুশো, ভলতেয়ার ইত্যাদির চিন্তা এবং চিন্তাসমৃদ্ধ গদ্য রচনা থেকে ধীরে ধীরে তা হয়ত একদিন বিশেষ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। তবু, সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স যখন ধর্মযুদ্ধের নৃশংসতা থেকে মুক্তি পেয়ে সভ্য, সংহত জীবনের মাঝে শক্তির ললিত বাণী খুঁজে ফিরছে তখন 'লাস্ত্রে' গ্রন্থে প্রথম ফরাসী উপন্যাসের বীজ অংকুরিত হলো। ওই সময় সময় আরো কয়েকটি অনুরূপ উপন্যাসধর্মী রচনার জন্ম হয়েছিল কিন্তু হালফিল জনপ্রিয়তায় 'লাস্ত্রেই' একমাত্র জীবিত আছে, তাই তার গুরুত্ব অধিক। এই উপন্যাসের রচয়িতা অনোর দ্য উর্ফ (১৫৬৭-১৬২৫) ডিউক অফ স্যাভয়ের আত্মীয়স্থানীয় অত্যন্ত সৎ লোক ছিলেন। তিনি স্প্যানিশ ডায়েনায় গ্রীক রোমান্স-এর অনুবাদ পড়ে পড়ে উদ্দীপিত হন এবং তাঁর চাকুরীর (ডিউকের অধীনস্থ চাকুরে) অবসর সময়ে নিতান্তই আত্মতৃপ্তির আবেশে কলম ধরেন। 'লাস্ত্রে' পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৬০৭ সালে এবং অসমাপ্ত শেষ খণ্ডটি উর্ফ মারা যাবার পর তাঁর একান্তসচিব সমাপ্ত করার ভার নেন। একটি মেষপালক ও মেষপালিকার প্রেমোন্মেষ এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে উর্ফ-এর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আলোকপাত ঘটছে। উর্ফ-এর যিনি প্রণয়িনী ছিলেন তাকে পাওয়া তাঁর ঘটেনি, তিনি হয়েছিলেন উর্ফ-এর ভ্রাতৃবধূ। তাই, উপন্যাসের কল্পিত কাহিনীর ছায়ায় ছায়ায় তিনি নিজের শরীরি প্রেমের ছবিকে সঞ্চারিত করেছিলেন। বইটির পুরো নাম পড়তে গেলে বারংবার হোঁচট খেতে হয় বিদেশীদের, কেননা তার শিরোনামা, 'L' Astree. ou par plusieurs histoires et sous personnes de bergers et d'autres sont deduits les divers effets de l'honnete amitie' পর্যন্ত

প্রসারিত। তাঁর পাঁচ হাজার পাতার এই দীর্ঘ উপন্যাসটিতে প্রান্তরের গান ধ্বনিত হয়েছে নিয়মানুগ বাস্তবতায়। প্রেমের এক অঙ্গে কত রূপ, তৎকালীন অভিজাত সমাজের কী চেহারা, এবং বিস্ময়কর রহস্যময়তা উফ্ে অত্যন্ত সাবলীল বর্ণনায় বিষয়ীভূত করতে পেরেছিলেন তাঁর সেই কাহিনীতে। উফ্ে-এর সমকালীন ব্যক্তিত্ব গোঁব্যেরভি, লা কাল্‌প্রোনেদ্‌, এবং মাদ্‌মোয়াজেল দ্য স্কুদেরি (১৬০৭-১৭০১), তাঁদের লেখায় উফ্ে-এর প্রবল প্রভাবকে বিন্দুমাত্র পরিহার করতে পারেন নি বরং অন্ধ অনুকরণ করেছিলেন বলা ভাল, কিন্তু পরবর্তীকালেও উফ্ে প্রবর্তিত প্রেমের বিভিন্ন রূপ, সমৃদ্ধাকারে স্তাঁদাল, মরিয়াক, প্রুস্ত ইত্যাদির সুপ্রতিষ্ঠিত রচনায় অনুসৃত ও পরীক্ষিত হয়েছে।

কিন্তু উফ্ে কিংবা মাদ্‌মোয়াজেল দ্য স্কুদেরি এবং তাঁর বন্ধুরা যে রচনার প্রবর্তনা করেছিলেন, তাতে উপন্যাসের বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশিত হলেও সেগুলিকে 'বিশুদ্ধ উপন্যাস' বলে অভিহিত করা বোধহয় যায় না, বরং 'গদ্য কথাসাহিত্য' বললেই সুবিচার করা হয়। নতুবা 'Beautiful letters' আখ্যা দেওয়া চলতে পারে।

মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ (১৬৩৪-৯৩) তেমনি উপন্যাসের সর্বলক্ষণাক্রান্ত 'লা প্রঁ্যাসেস দ্য ক্লেভ' রচনায় ঐতিহাসিক রোমান্স পরিবেশন করেছিলেন প্রায় জেন অস্টেনী লিপিকুশলতায়। লেখাটি পড়লে বোঝা যায় যে, রচনাকালে কাহিনীকার ভাবনা ও কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বহ্বাড়ম্বরে, আপন চিন্তা তাতে প্রযুক্ত হয়েছে, দ্বিতীয় হেনরীর রাজসভায় পরিভ্রমণ করেনি তাঁর মন। এই জাতীয় লেখাকে তবু উপন্যাস হিসাবে স্বীকার করার সুযোগ আছে কিন্তু ইংরাজীতে জন বানিয়ান 'Pilgrim's Progress' নামে যে উপদেশচ্ছলে রূপক বর্ণনা করেছিলেন তা সুললিত গদ্যসাহিত্যের অংশীভূত হলেও কোনক্রমেই উপন্যাসের আওতায় পড়ে না। কারণ, উপন্যাসের ধর্ম কী, তার উত্তরে জে. বি. প্রিস্টলে বলছেন, For the novel must not only have acceptable individuals as characters, but it must make these characters move in a recognisable society. Characters in a society make the novel. মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ ছিলেন সেকালের আলোকপ্রাপ্তা নারী। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনা তাঁকে গভীরভাবে ঘিরে ছিল।

তিনি আপন জীবনের কথা ভেবেই 'লা প্রঁ্যাসেস্ ত্ব ক্লেভ্' নামক হ্রস্ব, উপন্যাসা-ক্রান্ত রচনায় ত্রিভুজ প্রেমের পরিকল্পনা করেছিলেন। সুদর্শনা কোমল স্বভাবা মাদ্‌মোয়াজেল ত্ব শার্ত্র্-এর সংগে বিবাহ হয়েছিল প্রঁ্যাস্ ত্ব ক্লেভ্-এর কিন্তু দু'জনের মধ্যে এক শ্রদ্ধাজনিত আনুগত্য ছাড়া ভালবাসার প্রগাঢ় সম্পর্ক ঘনীভূত হয় নি ; তাই সে নেমুর-এর গভীর প্রেমে আচ্ছন্ন হলো একদিন। কিন্তু নেমুর বিবাহের বাক্‌দান করেছিল রাজকন্যাকে, তবু সে ক্লেভ্-এর প্রেমকে মহার্ঘ্য মনে করে, তাকে পাওয়ার দুর্বার বাসনায় উন্মত্ত হলো। ফলে, ক্লেভ্-এর স্বামী হিংসায়, দ্বেষে এবং নিজের প্রবল কামনায় ছটফটিয়ে একদিন মারা গেল। ক্লেভ্-এর সামনে তখন অবাধ মুক্ত জীবন। কিন্তু নেমুরকে সে আর গ্রহণ করতে পারল না। এর মধ্যে তার মন জীবনের অন্যতর স্বাদে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে।

যুগে যুগে সাহিত্যে বাস্তবতার রূপ বিবর্তন ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীর বাস্তবতা সম্পর্কিত ধারণা বিংশ শতাব্দীতে প্রযোজ্য নয়। তাই, মাদাম ত্ব লাফাইয়েৎ তাঁর রচনায় যে মনস্তত্ত্বমূলক বাস্তবতার আমদানী করেছিলেন তা তৎকালীন কথাসাহিত্যের বাস্তবতা। সেদিক থেকে বিচার করলে ফরাসী কথাসাহিত্যে লাফাইয়েৎ-এর উপন্যাসোপম বড় গল্প 'লা প্রঁ্যাসেস্ ত্ব ক্লেভ্'-এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

প্রধানত 'গিল্ ব্লা ত্ব সাঁতিয়ান্' এর কারণে রেনে ল্য সাজ-কে (১৬৬৮–১৭৪৭) উপন্যাসের জনকত্ব দেবার প্রচেষ্টা প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সময়ের আরেকজন রচনাকার জঁা ফ্রঁাসোয়া রেনার্ড (১৬৫৫-১৭০৯) ছিলেন ধনী বুর্জোয়া। তিনি বহু দেশ ভ্রমণান্তে নিছক খেয়ালের বশে কিছু কৌতুককর নাটিকা এবং অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন।

ল্য সাজ্ ছিলেন মুখ্যত নাট্যকার কিন্তু কাহিনীকার রূপে তাঁর পারদর্শিতা সাফল্যকে আয়ত্ত করতে পেরেছিল বেশী। তিনি নিজে কখনো স্পেন দেশে পদার্পণ করেন নি কিন্তু স্পেনীয় সাহিত্য থেকে মশলা সংগ্রহ করেছেন প্রায় দুর্বৃত্তের মতো লালসায়। ল্য সাজ্ ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী লেখক। ইংলণ্ডে তাঁর সমসাময়িক লেখক ছিলেন ডেফো। স্মলেট 'Roderick Random' উপন্যাসে ল্য সাজকে অনুসরণ করেছিলেন, স্পষ্টত বোঝা যায়—অন্তত তাঁর Picaresque পদ্ধতিকে চিনতে ভুল হয় না। ফরাসী কথাসাহিত্যে ল্য সাজ্-এর আরেকটি কারণে ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। তিনিই হচ্ছেন প্রথম

ব্যক্তি যিনি কেবলমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে জীবিকার্জনের পথটি খুলতে পেরে-ছিলেন। তার আগে সব সাহিত্যসেবীদেরই কেউ না কেউ পৃষ্ঠপোষকতা করত—তা সে সরকারী বা বেসরকারী যাই হোক না কেন! ল্য সাজ্-এর প্রথম দিনকার রচনা 'ল্য দিয়াব্‌ল্ বুয়াতো' (১৭০৭), স্প্যানিশ লেখক ভিলেজ্ দ্য গুভেরা থেকে নৃশংসভাবে লুণ্ঠন ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর 'লিস্‌তোয়ার দ্য গিল্ ব্লা দ্য সাঁতিয়ান'-এর (১৭১৫-৩৫) পটভূমি স্পেন হলেও মোটামুটি মূল ভাবনায় অনুপ্রাণিত এবং উদারনৈতিক থেকে বুর্জোয়া পর্যন্ত সব সমাজকে তীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা প্রহৃত। ল্য সাজ্-এর নানা বিষয়ে অধ্যয়ন ছিল, রচনায় তাঁর বিশদ বিবরণ ফুটত ভাল, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচক্ষণতা ছিল তাঁর। একটি বিশেষ স্বকীয় ভংগীতে তিনি রচনাকে সুখপাঠ্য করতে পারতেন। আগেই বলেছি ল্য সাজ্-কে আধুনিক উপন্যাসের জনক আখ্যা দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং ব্যালজাকের সংগে তাঁর উপমা নিরূপিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যেমন 'novel of manners' সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি ফরাসী কথাসাহিত্যে রেনে ল্য সাজ্‌কে সেই কৃতিত্বের সূচনা বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।

ল্য সাজ্-এর সমকালীন লেখক মারিভো (১৬৮৮-১৭৩৬) ছিলেন তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের কনিষ্ঠ। তিনিও মূলত নাট্যকার। কিন্তু তিনি যে দু'টি উপন্যাস লিখেছিলেন তা সম্পূর্ণ করার ধৈর্য ছিল না তাঁর। তবু, 'ল্য ভি দ্য মারিয়ান্' (১৭৩১-৪১) এবং 'ল্য পেজেঁা পারভেনু' (১৭৩৫-৩৬) এই দু'টি রচনায় তিনি যুক্তিগ্রাহ্য প্রেমের অবতারণা করতে পেরেছিলেন আর তাতে মানুষের চিত্ত-বৈচিত্র্যের কিছু আন্তরিক চিত্রও পরিস্ফুট হয়েছিল। তাঁর নায়িকা মারিয়ান্ পনের বছর বয়সে অনাথ হয়ে পৃথিবীর ভয়ংকরতায় সমর্পিত হলো এবং সেই বিবরণ দিতে গিয়ে মারিভো অত্যন্ত বিচক্ষণতার সংগে জীবনের গূঢ়তর তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর ভাবনায় গভীরতার স্পর্শ লেগেছিল, অর্থহীন মূঢ়তা, যা সেকালের বহু লেখকের রচনাকে নীরস করে রাখত, তা মারিভোকে ক্লিন্ন করতে পারে নি। মারিভোর সংগে রিচার্ডসনের প্রচুর সাদৃশ্য ছিল।

ফরাসী ভাষায় রিচার্ডসনকে যিনি অনুবাদ করেছিলেন সেই আঁতোয়ান্ ফ্রাঁসোয়া প্রেভো-এর (১৬৯৭-১৭৬৩) জীবনটি বড় অদ্ভুত। তিনি সৈনিক

ছিলেন এবং পরে ধর্মযাজক হয়েছিলেন। সেই সন্ন্যাসাবস্থায় প্রেভো গোপনে গোপনে উপন্যাস লিখতেন। পরে গীর্জার সংগে তাঁর রীতিমত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাঁকে দু-দু'বার হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে নির্বাসন দেওয়া হয়। দেশে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি অভিনিবেশ সহকারে রিচার্ডসন্ পড়েছিলেন এবং 'পামেলা' (১৭১২), 'ক্লারিসা' (১৭৫১) এবং 'গ্র্যাণ্ডিসন' (১৭৫৫) ইত্যাদি উপন্যাস ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পেলেন। শুধু তাই নয়, এই অনুবাদের দ্বারা প্রেভো ইংরাজী ও ফরাসী কথাসাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন। তাঁর স্বকপোল-কল্পিত রচনার মধ্যে উপন্যাস, স্মৃতিকথা, ইতিহাস এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতির পঞ্চাশটি বৃহৎ খণ্ড আছে। 'লিস্তোয়ার দ্যু শেভালিয়ের দে গ্রিয়ো এ দ্য মানোলেস্কো' তাঁর ৫০,০০০ শব্দসমন্বিত ছোট উপন্যাস। 'কামনার কি বিপর্যয়কর পরিণতি' হতে পারে তা-ই এই উপন্যাসের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর নায়ক দে গ্রিয়ো অত্যন্ত দুর্বলচেতা অথচ কামনা-প্রবল চরিত্র, যে নিতান্ত অসহায়ের মতো বলতে পেরেছিল, 'Love is an innocent passion how could it have become for me a source of misery and disorder'? শেষ অবধি প্রচণ্ড এক অনীহা ও বৈরাগ্যে সে গীর্জার দিকে ফিরে তাকাল, তাতেই শরণ নিল। একমাত্র ওই দুর্বলতা এবং কিছু বাগাড়ম্বর ব্যতীত প্রেভো তাঁর উপন্যাসে উঁচুদরের শিল্পীর মতো দক্ষ তুলির টানে চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তাঁর মনোবীক্ষা গভীরভাবে অন্তরকে স্পর্শ করেছে এবং প্রেমকে তিনি সম্পূর্ণ অন্য আলোকে দেখাতে পেরেছিলেন। নায়িকা মানো স্নিগ্ধস্বভাবা, ভীরু এবং অল্পবিস্তর ছলনাময়ী—তাতে রক্ত-মাংসের একটি নারীর জগৎ বিচিত্ররূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কৃত্রিমতায়, কষ্ট-কল্পনায় এবং উপন্যাসের তথাকথিত আদর্শের আবরণে আড়ষ্ট কেবলমাত্র প্রাণহীনতায় পর্যবসিত হয়নি। জীবনে প্রেমের দাবী অনস্বীকার্য কিন্তু তা বলে প্রেম যেন শুধুমাত্র কামনাকণ্টকিত উন্মত্ততা না হয়, তার সংগে ধর্ম এসে মিলিত হোক্, প্রেমকে মহত্ত্বে উন্নীত করুক—এই যে ভাবনা প্রেভো তাঁর রচনায় সঞ্চালিত করতে চেয়েছিলেন তাতে রুশোর চিন্তা-সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। রুশো তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'লা নুভেল্ এলোইজ্'-এ প্রেমকে উত্তেজিত বাসনায় খর্ব করার চেয়ে উদাত্ততায় মহনীয় করেছেন। ফরাসী কথাসাহিত্যে প্রেভো-র একটি বিশেষ সম্মানিত স্থান আছে। হয়ত আজও, এই দুই শতাব্দীর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও তাঁর উপন্যাসের নায়িকা

মানো-র সকরুণ বিলাপ রসিক পাঠকের শ্রবণে ঘুম-ভাঙা রাতের অতৃপ্ত আত্মার অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনির মতো ভেসে আসে। মনকে ভারী করে দিয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী কথাসাহিত্যে উপন্যাস-রচনা-নায়করা যেমন একে একে তাঁদের উপযুক্ত ভূমিকা নিয়ে ধীরে ধীরে মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন, কথাসাহিত্যকে যথাসম্ভব ঐশ্বর্যশালী করার চেষ্টায় নতুন থেকে নতুনতর রচনাপাত করছিলেন, তেমনি চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকরা তাঁদের বিশিষ্ট উপস্থিতিতে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গুরুতর প্রভাব হানছিলেন। মণ্টেসক্যু, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো প্রায় একই কালের পথিক, তাঁদের ভাবনাপ্রযুক্ত দার্শনিকতা এবং গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নানা নিবন্ধে সমাহিত করে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের এবং পরোক্ষভাবে কথাসাহিত্যের অনতিপ্রশস্ত ও অনত্যুৎকর্ষ ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করছিলেন। পরবর্তীকালের Romantic কথাসাহিত্য তাঁদেরই নবনিযুক্ত চিন্তা এবং মানসিকতাকে ধারণ করে যে সঞ্জননতায় বৃদ্ধ হবে তার আর আশ্চর্য কি!

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রেভো-র পরে কয়েকজন স্বল্প বিত্তের কথাশিল্পী তাঁদের হাল্কা এবং 'licentious' উপন্যাসের পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, 'লে কন্‌ফেসিয়োঁ দ্যু কোঁৎ দ্য'-এর (১৭৪২) রচয়িতা শার্ল্‌ পিনো দুক্লো, 'লে কুমোয়ার' (১৭৩৩) ও 'ল্য সোপা'-এর (১৭৪৫) রচয়িতা ক্রেবিয়োঁ। দিদেরোর বন্ধু মারমোঁতেল (১৭২৩-৯৯) দু'খানি পরম রমণীয় উপন্যাস লিখেছিলেন। 'বেলিজেয়ার' এবং 'লেজ্‌ ইংকা' গ্রন্থে দাসত্বের বিরুদ্ধে মানবতার মুক্তির বাণীকে সম্প্রচার করেছিলেন তিনি।

১৭৬১ সালে রুশোর এক ও অদ্বিতীয় উপন্যাস 'নুভেল্‌ এলোইজ্‌' প্রকাশিত হলো, তাতে তিনি রিচার্ডসনের পত্রাকারে গল্প বলার ঢংটিতে প্ররোচিত হয়েছিলেন। বস্তুত, রুশোর লেখায় রিচার্ডসনের প্রভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান ছিল। এই উপন্যাসটি যখন তিনি লেখেন, তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠা পার হয়েছে; এবং এক 'মানসিক দুর্যোগে' রুশো বিপর্যস্ত। জেনেভা লেকের কাছে চমৎকার সুদৃশ্য পরিবেশে তিনি তখন অবসর যাপন করছেন এবং সেখানে, যে-মহিলার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন তিনি, তাঁর এক বান্ধবীর প্রেমে উন্মত্তভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু মহিলাটির পূর্বনির্দিষ্ট এক প্রণয়ী ছিলেন, কবি স্যাঁ লাম্‌বেয়ার,—মহিলা তাতেই অবিচলিত থাকা বিধেয় মনে করলেন। রুশোর এই উদ্‌ভ্রান্ত

প্রেম তাঁর উপন্যাসে নাম ও পরিচয় বদল করে বাস্তবাকারে স্থান পেল। আর গল্পের শেষে লেখক একটি সুন্দর সুনীতি জুড়ে দিলেন। শিক্ষক সাঁ্যা-প্রো এবং জুলি-র প্রেমকে অসম্ভব মনে করে রুশো তাঁর লেখায় ধর্ম ও কামনার মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করতঃ একটি অদ্ভুত উপায় বাতলালেন। জুলি তার স্বামীর কাছে সেই দুরন্ত প্রেমের উপাখ্যান বর্ণনা করল এবং শ্রবণমাত্র উদার মতাবলম্বী স্বামীদেবতা তৎক্ষণাৎ প্রো-কে আহ্বান করে তার ওপর অগাধ আস্থায় নিজ বাসগৃহে দুই প্রেমিককে অবস্থান করার সুযোগ দিলেন। এবং তারা সকলেই বিনা প্রতিবাদে সুখে দিনযাপন করতে লাগল। শেষ অবধি জুলি একটি শিশুর সেবা করতে গিয়ে মারা গেল। উপন্যাসটি একালে পড়া দুষ্কর হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রকৃতি অনুযায়ী প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করার ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্যের নয়। প্রথমত দেশব্যাপী রুশোর অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব (তিনি ফরাসী বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন),—দ্বিতীয়ত ফরাসী কথাসাহিত্যে বুদ্ধিজীবিদের ঘন ঘন পদচারণা সাধারণ পাঠকদের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। তারা বহুদিন পরে রুশোর মধ্যে গ্রাম্যজীবনের ছবি এবং একটি ঝঞ্ঝাময় প্রেমের পুনর্বসতি ও পরিশেষে জীবনের মহত্তর ইসারা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। তখন হৃদয়ের কাছে পরাভূত হচ্ছিল যুক্তি। মানুষ অন্তঃসারশূন্য, ফাঁকা, বুদ্ধির বাগবিস্তারে আর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিল না—তাই রুশোর উপন্যাসে যেই তারা জীবনের অন্য সুর শুনতে পেল, ধর্মনীতি এবং প্রেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখল অমনি তাকে অন্তরে স্থান দিল অসীম মমতায়। বইটি এতই প্রভাববিস্তারকারী যে বহু অভিজাত লোক তারপর নগরের কোলাহল থেকে দূরে গ্রামের শান্তিতে বাস করতে গেল, বহু জননী তারপর থেকে সাধারণ্যেই শিশুসেবাকে গৌরবজনক মনে করল। রুশো যে তাঁর পাঠকদের স্তম্ভিত ও মোহিত করেছিলেন তার আরো একটা কারণ হচ্ছে কাহিনী-বর্ণনার অনন্য ভংগী এবং গীতিকবিতার পেলবতার মতো মাধুর্য রুশোর রচনায় সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

রুশোকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁর এক বন্ধু, বের্নার্ভাঁ দ্য সাঁ্যা পীয়ের (১৭৩৭-১৮১৪), তিনি রুশো-পরবর্তীকালের অন্যতম লেখক। বের্নার্ভাঁ ইওরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং মরিসাসে কিছুকাল কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রকৃতির তন্ময়রূপ তাঁর মধ্যে অপার লীলারহস্যের নতুন জগৎ খুলে দিয়েছিল। 'পোল্ এ ভির্জিনি' (১৭৪৮) উপন্যাসে

তিনি তাঁর সেই একান্ত উপলব্ধিকে রূপায়িত করেছিলেন। মরিসাসের নিসর্গশোভা এই প্রথম ফরাসী সাহিত্যের ভাববস্তু হয়ে উঠল। পরে, তাঁর আরেক দীর্ঘ সাহিত্যকর্মে 'এ তুদ্ দ্য লা নাতুর্'-এ বের্নাঁস্তা সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাইলেন, মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে এক নিগূঢ় ঐক্যের খেলা চলেছে অবিরাম। মানুষ তার অত্যয়িত জীবনে প্রকৃতির সংগে একাত্মতায় অতীন্দ্রিয় শান্তির সন্ধান পেতে পারে। তাঁর রচনাভংগীতে এবং হৃদয়ের স্পর্শে সমস্ত উপন্যাসটি অদ্ভুতভাবে সজীব ও সাবলীল হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে ফরাসী উপন্যাস পাঠকরা প্রকৃতি এবং সেই সংগে জীবনের উদাত্ত মহিমময়তাকে এত নিরিবিলিতে কাছাকাছি পান নি। বের্নাঁস্তা বলতে গেলে শাতোব্রিয়ঁার অগ্রদূত যে শাতোব্রিয়ঁা পরবর্তীকালের যুগমানসে গভীর ছায়াপাত ঘটিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ওপর যখন ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসছে তখন এক কৃষক সন্তান রেতিফ্ দ্য লা ব্রেতন্ (১৭৩৪-১৮০৬) স্বীয় ক্ষমতাবলে শহুরে জীবনের পটভূমিতে কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখে আপন উপস্থিতিকে বিশিষ্ট করে তুলতে পেরেছিলেন। লেখক হিসাবে তিনি অত্যন্ত বেসামাল ছিলেন, তবে দেখবার চোখ ছিল তাঁর মোটামুটি এবং সেই দর্শনকে সকৌশলে একটি উপন্যাসের খসড়ায় তালিকাভুক্ত করার যোগ্যতাও ছিল। তাছাড়া নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার আপাত-আলোকের নেপথ্যে অভিশাপের যে ধূসরতা আছে তাকে তিনি তাঁর অনেক রচনায় উদ্ঘাটিত করেছিলেন। 'ল্য পেজ্াঁ পেরভেরতি' (১৭৭৬), 'লা পেজান্ পেরভেরতি' (১৭৮৪) এবং 'লে কোঁতেম পোরেন' (১৭৮০-৫) ব্রেতন্-এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিন্তু তিনি লেখায় মসৃণতা আয়ত্ত করতে পারেন নি।

এই সময় কিছু কিছু আবেগময় গ্রাম্য-উপন্যাসের প্রচলন ছাড়া sophisticated উপন্যাসেরও উদ্ভব হচ্ছিল। তাছাড়া, ছোটগল্প বা কাহিনী একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকার পাচ্ছিল ধীরে ধীরে। চীনা এবং অন্য প্রাচ্যজাগতিক রূপকথা ফরাসী ভদ্রলোকদের বাসস্থানে প্রায়ই হানা দিতে লাগল এবং আরব্যরজনীর অনুবাদ ফরাসীরা মহা আগ্রহে পড়তে লাগলেন।

১৭৮২ সালে একটি মহৎ উপন্যাস রচনা করেছিলেন পীয়ের শোদের্লো দ্য লা ক্লো (১৭৪৪-১৮০৩)। তিনি একখানি মাত্র উপন্যাস 'লে লিয়েজোঁ দাঁ জেরোজ'

লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন যাবজ্জীবনে, কেননা নেপোলিয়নের সেনাদলে তাঁর একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ ছিল। তিনি তথাকথিত অভিজাত সমাজের মনোবিকারকে তাঁর লেখায় তুলে ধরেছিলেন। প্রেম, প্রলোভন এবং দুটি জীবনের বিধ্বংসী পরিণতি আঁকতে গিয়ে তাঁকে হয়তো কিছু ক্ষতস্থানের প্রলেপ উন্মোচন করতে হয়েছিল কিন্তু তিনি লেখাকালীন রুশোর সুনীতি বিস্মৃতি হন নি, তাই পাপাত্মাদের শাস্তিবিধান করা ছাড়া তাঁর আর উপায় ছিল না। উপন্যাসটিতে লা ক্লো-র অন্তর্দৃষ্টি, মনোবিকলন এবং স্বকীয় লেখনী-কৌশল সেকালীন ফরাসীসমাজে সমাদৃত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর আলো এসে পড়ল। জীবন ও সাহিত্যের রঙ পাল্টাতে লাগল। রোমান্টিক যুগভাবনা কথাসাহিত্যের প্রাণকে বৈচিত্র্যে দিল ভরে। বাস্তবতার ছায়া উপন্যাসে প্রগাঢ় হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপন্যাস অনেকখানি এগিয়েছিল। লা ক্লো-র 'লে লিয়েজ়ঁ দাঁ জোরোজ্' সেই যুগোৎক্রান্তির শেষ স্মরণচিহ্ন।

রোমান্টিক যুগের ফরাসী সাহিত্য নতুন চেতনার দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো ১৭৭৮ সালে, রুশোর মৃত্যুর পর। 'রোমান্টিক মুভমেণ্ট'-এর উদ্ভব প্রথম জার্মানী ও ইংলণ্ডে এবং তারপর ফ্রান্সে। যদিও ফ্রান্সে এই নতুন ভাবনা-প্রবাহ অত্যল্পকাল অবস্থান করেছিল তবু তারই মধ্যে ফরাসী কথাসাহিত্য বিচিত্র দিগ বিস্তার করেছে, চিন্তার উন্মেষে সাহিত্যের প্রাণগঙ্গায় নতুনতর তরঙ্গ তুলেছে। রুশোর সংগে তাঁর কালের অন্য কোন মনীষী এমন কি ভলতেয়ারেরও পর্যন্ত মতের বনিবনা হবার উপায় ছিল না। কেননা রুশো আপন অন্তরের অতলস্পর্শী গহ্বরের গহন থেকে যে-ভাবনা সংগ্রহ ক'রে বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে-ভাবনা ধারণ ও পোষণ করে সেদিনকার পৃথিবী এবং আজকের আধুনিক পৃথিবী কত বিচিত্র সাজে সেজে উঠেছে, সে-ভাবনায় অংশ নেবার মানসিক উপযোগ্যতা তাঁর কালের আর কারো ছিল না…'he possessed one quality which cut him off from his contemporaries'। তাঁর দৃষ্টিকে সচকিত ক'রে, এবং চেতনাকে বিদ্ধ ক'রে যে জ্ঞানোন্মেষ হয়েছিল তা একান্তই রোমান্টিক যুগভাবনা এবং সেই নাতিপ্রস্থ ভাবকঠিন পথে তিনি একলা পথিক। আর, সেই নির্জন একাকীত্ব, সকলের নির্বাসিত সেই চিন্তাদিষ্ট পথে একক পরিক্রমা করতে করতে একদিন, তাঁরই

সৃষ্ট, তাঁর নিজের মনোজগৎ তার ভয়ংকর দেহের কালো ছায়া ফেলে ফেলে এগিয়ে এল তাঁকে গ্রাস করতে। অসহায় রুশো তার উদ্যত আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য উন্মত্ত চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'Here I am, alone on the earth no brother, neighbour, friend, society, save myself'… …তিনি বাঁচেন নি, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর ভাবনারা নতুন মর্যাদায় বেঁচেছে।

ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-৯৩) অনেক পুরাতন ধারা ও ধারণাকে মিথ্যা ক'রে দিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা উত্থান-পতনের সংগে সংগে সাধারণ মানুষের চিন্তায় ও জীবনে বহুতর পরিবর্তন সাধিত হলো। সাহিত্য স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিবর্তন থেকে নিস্তার পেল না। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই মধ্যবিত্তরা ফরাসী জীবনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারছিল, বিপ্লবের পর তারা আরও বৃহৎ শক্তিতে সমবেত হতে লাগল, অভিজাতদের প্রতাপ আর তেমন সার্বভৌমত্বে বিরাজ করতে পারল না। রুশো যে 'রোমান্টিক ইমোসনালিজম্' এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাণী প্রচার করেছিলেন, তা-ই সাহিত্যে নতুন মূল্যে ও মানে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

ফরাসী সাহিত্য ও শিল্পে যখনই কোন নতুন আন্দোলন তৈরি হয়েছে, নতুন ভাবতরঙ্গ উঠেছে, প্যারিস শহর তার প্রাণকেন্দ্র হয়ে থেকেছে। প্রচণ্ড বিরোধিতার মধ্যে নতুন নতুন চিন্তার জন্ম হয়েছে। ফরাসীরা সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে জঙ্গমতার বিশ্বাসী। ভাবনায় জাড্যতা আমদানী ক'রে শুধুমাত্র সৃষ্টির উল্লাসে মুগ্ধ থেকে তাঁরা শিল্প বা সাহিত্যকে স্থবির করে তোলেন নি। বরং নানা ভিন্নমুখী চিন্তায়, নানা মতের বিরোধাভাসে সৃষ্টিকে তাঁরা সতত অস্থির-স্পন্দনে সজীব রেখেছেন। আর, প্যারিস নগরী সর্বদাই সেই উত্তপ্ত প্রাণের স্পন্দনকে বহন ক'রে, হার্দ্য পরিবর্তনকে করেছে চাক্ষুস।

ফরাসীতে 'রোমান্টিক আন্দোলন' যখন প্রবল হলো, তখন অংকনশিল্পীরাও তাতে অংশ নিতে অনেক আগে থেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। এই সব রোমান্টিক চিত্রকলাবিদদের ইমপ্রেসনিষ্টিক দৃষ্টি গল্প-উপন্যাসের পরিধি বিস্তার করল, চলচ্চিত্রবৎ ইমেজ-এর সৃষ্টি করল। প্যারীর সালোঁতে রঙ ও তুলিতে তাঁরা যে মেজাজ ফুটিয়ে তুললেন তা একদিন কথাসাহিত্যের অঙ্গনকেও অভূতপূর্ব বর্ণময়তা দিল। পরে এইসব শিল্পীরাই (গতিয়ের, জর্জ স্যাঁ, দ্য মুসে, হুগো) সব্যসাচীর ভূমিকা নিয়েছিলেন, সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা রামধনুর রঙ-বিস্তার

করেছিলেন। আর, কালক্রমে এই পথেই সাহিত্যে একদিন স্যুর-রেয়ালিস্ত্‌দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

মুখ্যত ১৮৩০ সালে, শিল্প বিপ্লবের পর ফরাসী সমাজে কিছু শহুরে প্রোলেতারিয়েত-এর উদ্ভব হওয়ায় কথাসাহিত্য বহু নতুন রুচির পৃষ্ঠপোষকতা পেল। তারা সাধারণ, ঘটনার ঘনঘটায় পরিপ্লাবিত সজীব উপন্যাস পছন্দ করল, কিন্তু যাঁরা বাস্তবানুগ কথাশিল্পী তাঁরা তাদেরই জীবন-নির্বাহকে আশ্রয় ক'রে রেয়ালিস্ত্‌ উপন্যাস লিখে বসলেন,—সেই সব প্রোলেতারিয়েতরা বিশদ বিবরণে কথাসাহিত্যের আসরে হাজিরা দিতে লাগলেন নিয়মিত।

রুশোর পরে ফরাসীর রোমান্টিক দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন শাতোব্রিয়ঁা (১৭৬৮–১৮৪৮)। তাঁর ভাবনাস্পর্শে ফরাসী গদ্যসাহিত্য নতুন বাঁক নিয়েছিল এবং তিনি উত্তর ১৮৩০ থেকে প্রচণ্ড প্রভাবে ফরাসী সমাজ ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর সুললিত বর্ণনাভংগীর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'রেনে' সেকালের তরুণ সমাজে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল। 'রেনে'-র মধ্যেই তারা তৎকালীন রোমান্টিক অধিনায়কের প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করেছিল, কারণ আসলে চরিত্রটি শাতোব্রিয়ঁাকেই ব্যক্ত করেছিল অত্যন্ত রোমান্টিক মেজাজে। আশৈশব নিঃসঙ্গতা, কল্পনারঞ্জিত ভাবনা 'রেনে'কে একটা বিষাদাবৃত সৌন্দর্য দিয়েছিল কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন সেটা তাঁর অপরিসীম চারিত্রিক দুর্বলতা। তাই তাঁর রচনায় নায়কের সেই স্বভাবকে তিনি সমর্থন করেন নি। শুধু কল্পনার ফানুস উড়িয়ে জীবনকে মেদুর করা যায়, তার দেখা মেলে না—সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার যোগ্যতা পাওয়া চাই, আর মানসিক বিষাদ, সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার ক'রে চলে, কেবল ঘনতর অবসাদ ঘোরতর হয়ে আসে জীবনে। শাতোব্রিয়ঁার অনন্য রচনাভংগী ফরাসী গদ্যসাহিত্যের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার বিশ্বকে অনাবৃত করেছিল।

ঝ্যাঝাম্যঁা কঁস্তঁা (১৭৬৭-১৮৩০) তাঁর প্রথম হ্রস্ব উপন্যাস 'আদোল্‌ফ্‌'তে একটি তরুণ এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্কা একটি নারীর প্রেমকে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। তরুণটি যখন তার বয়োজ্যেষ্ঠা প্রেমিকার প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে করতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে আসছিল সেই সময় মেয়েটি মারা গেল এবং আদোল্‌ফ্‌ সকাতরে হৃদয়ংগম করতে পারল যে, তার সামনে পৃথিবী এক অসীম

শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছে ; তার জীবনে সর্বগ্রাসী অর্থহীনতা অতলস্পর্শী হয়েছে। উপন্যাসটি মূলত কঁস্ত াঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা থেকে উৎসারিত, কেমনা মাদাম দ্য স্তায়েল্ যিনি ঔপন্যাসিক বা সমালোচক অপেক্ষা রোমান্টিক যুগের এক অনতিক্রম্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কঁস্তাঁ তাঁর দীর্ঘ ও গাঢ় সখ্যতা পাবার পর মহিলার পরিবেষ্টন ছেড়ে নির্গমিত হবার জন্য ছটফটিয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁকে মৃদু মৃদু প্রতিবাদও তুলতে হয়েছিল। কিন্তু 'আদোল্‌ফ্' রোমান্টিক কথাসাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়, শুধু একটি উল্লেখযোগ্য তারিখ মাত্র। উপন্যাসটির অঙ্গে রোমান্টিকতার কোন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়নি, রক্ষিত হয়নি রোমান্টিক আন্দোলনের ধর্ম। কঁস্তাঁ অষ্টাদশ শতকী ভাব ও ভংগীকে একালীন সাহিত্যরুচিতে পরিবেশন করেছিলেন মাত্র, কেবল তাঁর উপন্যাস ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিক সাহিত্য-সংলগ্ন একটি দিনে প্রকাশিত হয়েছিল এই যা!

'রেনে' বা 'আদোল্‌ফ্'-এর মতো প্রায় উপন্যাসোপম আরেকটি রচনায় রোমাঁ পর্সোনেল বা লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, কাহিনীর আকারে স্থান পেয়েছিল। ১৮৩২ সালে সঁ্যা ব্যোভ্ রচিত 'ভলুপ্‌তে' প্রকাশ পেল, তাতে লেখকের প্রণয় প্রতিমূর্ত হলো আত্মবিশ্লেষণে। মনুষ্য-চরিত্র এবং তার গূঢ়ৈষা উপন্যাসটিতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছিল।

শার্ল নদিয়ের (১৭৮০-১৮৪৪) ফরাসী কথাসাহিত্যে একটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে থাকার যোগ্যতা রাখেন। কারণ, যতই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা হোক না কেন একথা অনস্বীকার্য যে, উপন্যাসে স্বপ্নের বিচিত্র মায়াজালপ্রসূতির এক অলৌকিক রসসৃষ্টি করার প্রথম স্মরণীয় প্রয়াস তাঁরই। তারপর অনেকের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সুর-রেয়ালিস্ত্‌দের হাতে স্বপ্নিল জগতের ফ্যাণ্টাসির নানা রূপবিবর্তন ঘটেছে। নদিয়ের ছিলেন লাইব্রেরিয়ান কিন্তু জীবনে আর্থিক অসঙ্গতি এবং পারিবারিক অসুখ, দুটোই এত ঘনতর হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তিনি সদাই কল্পনার জগতে বেহুঁশ থেকে বাহ্যিক দুর্যোগকে যথাসম্ভব এড়াতে চেয়েছেন।

ফর্মের দিক থেকে ফরাসী কথাসাহিত্য, বিশেষ ক'রে ফরাসী উপন্যাস এমন একটা অবস্থা আয়ত্ত করতে পারছিল, যা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব দিগন্তবিস্তার।

প্রধানত ছোট গল্প এবং ছোট উপন্যাসের (ভোলতেয়ারের 'কাঁদিদ্' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য) ক্ষেত্রে ফরাসীদের কর্মকুশলতা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু স্তাঁদাল (১৭৮৩-১৮৪২) তাঁর উপস্থিতিতে ফরাসী কথা-সাহিত্যকে এবং একটি বিশেষ যুগকে বৃহত্তর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে যেই তাঁর মননশীল লিপিকুশলতা প্রকীর্ণ করলেন অমনি ফরাসী উপন্যাস যেন বহুদিনের বদ্ধ বাধা ঠেলে একটি প্রাণের ঝর্ণায় ব্যালোলিত হলো। স্তাঁদাল উপন্যাসে আরো গূঢ়ৈষার জন্ম দিলেন, চরিত্র-অধ্যয়নে নৈতিকতার অনুভাবে তাঁর সৃষ্ট কাহিনী-কল্পনার জগৎ এক ব্যাপক ও ফলপ্রসূ রূপ পরিগ্রহে স্বকীয় হলো। স্তাঁদাল, যাঁর পিতৃদত্ত নাম আঁরী ব্যেল, গণিতজ্ঞ ও পরে বাস্তুকার হবার অভিলাষে শিক্ষা-জীবন শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এক প্রভাবশালী আত্মীয়ের দাক্ষিণ্যে যুদ্ধ দপ্তরে স্থান লাভ করেন এবং লেফটেন্যাণ্টের পদে উন্নীত হয়ে নেপোলিয়নের সেনাদলের পিছু পিছু ইতালীতে উপস্থিত হন পরে জার্মান ও রুশ দেশেও তাঁর হাজিরা পড়ে সরবরাহ বিভাগের বেসামরিক চাকুরে হিসাবে। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর যখন তাঁর মধ্যে সাহিত্যসন্ধিৎসা জাগে তখন তিনি অনুভব করেন যে, ফ্রান্স অপেক্ষা ইতালীই তাঁর পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া—তিনি মিলানে স্থায়ী হন। ইতালীর, বিশেষ ক'রে মিলানের উপভোগ্য সভ্য প্রতিবেশে বেশ কয়েকবছর কাটাবার পর থেকেই অষ্ট্রিয়ান পুলিশ তাঁকে উত্যক্ত করতে শুরু করে। স্তাঁদালের কার্যকলাপ, ঘোরাফেরা এবং উদারনৈতিক মতবাদে তাদের বিষম সন্দেহ! অনন্যোপায় স্তাঁদাল মিলানের মায়া পরিহার ক'রে প্যারিসে এসে আস্তানা গাড়েন এবং তারপর লুই ফিলিপের অধীনে একটি ফ্রেঞ্চ কনসালের উচ্চপদে আসীন থেকে আজীবন সসম্মানে বাস করেন। পিতার প্রতি স্তাঁদালের আশৈশব বিরাগ ও অনীহা প্রকাশ পেয়েছে, তাই নারীজাতির প্রতি তাঁকে জীবনব্যাপী মমতা ও অনুরাগ প্রদর্শন করতে দেখা গিয়েছিল। তাই, মহিলাদের সঙ্গ তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছে বেশী। স্তাঁদালের রচনায় রুশোর জীবনদর্শনের ছায়া পড়া হয়ত স্বাভাবিক ছিল, কারণ সারা ফ্রান্সের জনমানসে রুশোর তখন একমেব দ্বিতীয়ের আধিপত্য। কিন্তু স্তাঁদাল সে পথও মাড়ান নি বরং ভলতেয়ারের উত্তাপ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি আপন জীবদ্দশায় স্পষ্টত টের পেয়েছিলেন (ঘোষণাও করেছিলেন) যে, যে-শতাব্দীতে তিনি বাস করছেন সে-শতাব্দী তাঁর সাহিত্যকর্মকে তেমন সমাদরে গ্রহণ করতে

পারবে না, বিংশ শতাব্দীর আরো সচেতন, আরো আলোকপ্রাপ্ত মানুষ হয়ত তাঁকে যথেষ্ট সুবিচার করতে পারবে। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। অবশ্য ব্যালজাক ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। স্তাঁদালের ভিন্নমুখী রচনার স্বাক্ষরে যে ফরাসী উপন্যাসের যুগান্তর নিহিত আছে, এ সত্য তাঁর হৃদয়ংগম করতে বিলম্ব হয়নি তাই স্তাঁদালের তৃতীয় উপন্যাস (প্রথম উপন্যাস 'ল্যআর্মস্' এবং দ্বিতীয় 'ল্য রুজ এলানোয়া') 'লে শার্ত্রোজ অ্য পার্ম' (১৮৩৯) প্রকাশিত হবার পর তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলেছিলেন যে, আমরা কিছুই আশ্চর্য হব না, যদি দেখি 'in the ten months since this surprising work was published, there has not been a single journalist who has either read or understood or studied it, who has even alluded to it'. তিনি আরো বলেছিলেন যে, বইটি যদি সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির মানুষ অত সহজেই গ্রহণ করে তাহলে তো 'ক্লারিসা' তার প্রথমাবির্ভাবেই পাঠকের মনে যে মায়া ও মোহ বিস্তার করেছিল, তা-ই এক্ষেত্রেও ঘটবে। যদিও ব্যালজাক এবং পরে আঁদ্রে জিদ্ স্তাঁদাল সম্পর্কে উচ্ছ্বাসবশত কিছু অতিশয়োক্তি ক'রে ফেলেছিলেন বোধহয়, তবু স্তাঁদাল তাঁর সাহিত্যিকযোগ্যতায় ধীরে ধীরে একটি 'কাল্ট' রচনা করেছেন, একথা অনস্বীকার্য। তাঁর লেখার প্রকৃতি (যে প্রকৃতির সংগে তখনো উপন্যাস-পাঠকের পরিচয় ঘটেনি) বাহ্যত শান্ত, মৃদু ও নিরুত্তপ্ত (বরং একটু হিমশীতল বলাই যথার্থ) কিন্তু আগুনের শিখা তাঁর অন্তরে,—যে অগ্নিশিখার অস্থৈর্য তাঁর বাহ্যিক নিস্তরঙ্গতার আস্তরণ ভেদ ক'রে প্রায়ই বেরিয়ে এসে তাঁর উপন্যাসসৃষ্ট চরিত্র ও ভাববস্তুকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু, মানুষের মনে ছুরি চালিয়ে চালিয়ে, তাঁর সেই সজাগ দৃষ্টির ছুরি—তিনি যে অন্তর্লোককে উদ্ঘাটিত করেছেন তা দেখে আজো আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বস্তুত তিনিই ছিলেন মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের প্রবর্তক, উত্তরকালে যা দস্তয়ভস্কী কিংবা প্রুস্তের হাতে প্রবর্ধিত হয়েছে। স্তাঁদাল নিজে যে-জীবন যাপন করতে পারেন নি, অথচ যে-জীবনের অভিলাষী ছিলেন, তাঁর চরিত্ররা সেই অতৃপ্ত অভিলাষের মুখপাত্ররূপে তাঁর মর্মবাণীকে প্রচার করেছে। তাই প্রচলিত রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে তাঁর চিন্তা বিদ্রোহ করলেও, তিনি রোমান্টিক লক্ষণ বিমুক্ত হলেও, নতুন এক রোমান্টিকতা প্রযোজিত করেছেন নিজের অজ্ঞাতসারে। স্তাঁদালের 'ল্য রুজ্ এলানোয়া' (১৮৩০) উপন্যাসটিকে সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক চেতনা সম্পৃক্ত রচনা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তখনকার কালের ফ্রান্স ওই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। যদিও মূল ভাববস্তুটি এক ব্যর্থ প্রেমের অনুশাসনে পরিচালিত। উচ্চাভিলাষী এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিভূ জুলিয়েঁ 'ultra royalist aristocrat' সমাজের নেতৃত্ব নিয়েছিল, সৈ সেনাদলের লাল ব্যাজ ধারণ করার চেয়ে পুরোহিতের কালো ব্যাজকেই শ্রেয় মনে করেছিল। মাদাম মাথিলদের সংগে তার প্রণয় সর্বপ্রকার সামাজিক বাধা সত্ত্বেও যখন একটা পরিণতিতে পৌছব-পৌছব করছে সেই চূড়ান্ত সম্ভাবনার মুহূর্তে বাদ সাধল এক বয়স্কা নারী। মাদাম রেনাল হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বলল, আসলে জুলিয়েঁর মতলব অত্যন্ত অসাধু কেননা তার সংগে জুলিয়েঁর অনেক দিনব্যাপী ভালবাসা, যখন সে তার ছেলের শিক্ষকতা করত, সেই তখন থেকে। জুলিয়েঁর বহু আয়াসলব্ধ মাথিলদে হাত থেকে এইভাবে ফস্কে যায় দেখে সে বিষম উষ্মাভরে প্রতিহিংসাপরায়ণে প্রবৃত্ত হলো। আর, এই প্রতিহিংসা দাঁড়াল জিঘাংসায়। জুলিয়েঁ হত্যার অভিযোগে ধৃত হলো এবং তার শিরোচ্ছেদের আজ্ঞা দিল আদালত। পরিশেষে, এই চূড়ান্ত ব্যাধিতি ও অতিনাটকীয়তার মধ্যে দৃষ্ট হলো, মাথিলদে তার একদা প্রত্যাখ্যাত হবু-স্বামীর মৃতদেহকে গোর দেবার বাসনায় সাশ্রুনেত্রে, বেদনাদীর্ণ অন্তরে বহন ক'রে এক গুহাভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। স্তাঁদালের পরবর্তী উপন্যাস 'লে শার্ত্রোজ্ দ্য পার্ম' (১৮৩৯) এক ইতালীর ছোট আদালতের ইতিবৃত্ত যা তিনি স্বয়ং চাক্ষুস করেছিলেন। এ কাহিনীর নায়কও তরুণ, তবে জুলিয়েঁ অপেক্ষা কম দুরভিসন্ধির চরিত্র সে। উপন্যাসটিতে স্থলে স্থলে স্তাঁদালের উচ্চ রাজনীতিপ্রজ্ঞা এবং গভীর মনস্তত্ত্বভিজ্ঞা বিচ্ছুরিত হয়েছে নিদারুণ পারদর্শিতায়। কিন্তু কাহিনীটির সর্বাঙ্গীন মৌলতা তিনি বোধহয় দাবী করতে পারেন না। কারণ, কিছু চরিত্র ও ঘটনা ব্যতিরেকে উপাখ্যানটি এক ইতালীয় ক্রনিকল থেকে আহৃত হয়েছিল। তার ছোটগল্পের সংকলন 'ক্রোনিক্ ইতালিয়েন' রচিত হয় ইতালীতে থাকাকালেই। স্তাঁদালের শেষ, অসমাপ্ত এবং উল্লেখযোগ্য রচনা 'লুসিয়ঁ৷ ল্যোয়েন্'-এর পাণ্ডুলিপিতে হাত পড়ে ১৮৩৪ সালে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ করা হয়নি ১৮৪২ পর্যন্ত। এই রচনায় তার চাকুরী-জীবনের প্রশস্ত প্রতিচ্ছায়া বিশদ অভিজ্ঞতায় পরিস্ফুট হয়েছিল। তিনি অসাধারণ শৈল্পিক ক্ষমতায় লুই ফিলিপের সময়কালীন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিজয়বার্তা ঘোষিত করেছিলেন উপন্যাসটিতে।

ব্যালজাক (১৭৯৯-১৮৫০) ছিলেন স্কটের লেখার ভক্ত। স্কটের

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ধারা তিনি নিজের উপন্যাসে প্রবর্তন করেছিলেন। এক উন্নত কৃষক বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে ব্যালজাক আপন মেধায় ও দুরন্ত অনুভূতির তাগিদে বেশ তরুণ বয়স থেকেই লিখতে শুরু করেন। আর, এই লেখা ছিল নানা ধরনের—গথিক থ্রিলার থেকে ঐতিহাসিক কাহিনী, সব রকম রচনায় হাত বাড়িয়ে শেষে কোনক্রমেই সাফল্যকে আয়ত্ত করতে না পেরে ব্যালজাক তাঁর এক বন্ধুর সহযোগিতায় ছাপাখানার অন্যতম মালিক হয়ে বসেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, ছাপাখানা দেনার দায়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে যেই বন্ধ হলো তখনি ক্ষুব্ধ, দিশেহারা ব্যালজাক মনের জ্বালায় রচনাকর্মে মনোনিবেশ করলেন। তার আগে পিতা-মাতার ইচ্ছায় প্যারিসে থেকে কিছুদিন আইনের শিক্ষানবিসী করেছিলেন তিনি, কিন্তু তাতে মন টেঁকে নি, পজিটিভিস্ট ফিলসফি তখন থেকেই তাঁকে অমিত আসক্তিতে আকর্ষণ করেছে। যখন ব্যবসার ভূত তাঁর কাঁধ থেকে নামল অথচ দেনার জের মেটে নি, তখন পাওনাদারদের হাত থেকে নিস্তার পাবার সাধু সংকল্পেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু সূচনা তেমন সুবিধার হয় নি, পরে 'লে শোর্নাঁ' (১৮২৯) ব্যালজাককে প্রথম সাফল্যের স্বাদ দিল। এই ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসটির পৃষ্ঠভূমি ১৭৮৯'র বিপ্লব পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এক রয়্যালিস্ত তরুণ বিশ বছর যাবৎ শ্রমিক জীবন যাপন করে হঠাৎ অত্যধিক কাজের চাপে মারা গেল—কাহিনীর বিষয় ছিল এই। ব্যালজাকের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নানা ঘটনার মিছিল এসে ভীড় করেছে তেমনি তাঁর সারা জীবনব্যাপী বিপুল সাহিত্যকর্মে জীবনের প্রায় সব দিকের জানলা তিনি খুলে দিয়ে গেলেন। অমানুষিক পরিশ্রমে, অসীম ধৈর্যে তিনি একটি একটি একটি করে মানুষের চরিত্রকে তাঁর রচনার যাদুঘরে সঞ্চয় করেছেন। উনবিংশ শতাব্দী, শুধু উনবিংশ শতাব্দীই বা কেন বলব, সাহিত্যের জন্মকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ফরাসীদেশ ব্যালজাকের মতো অমন একটি সর্বতোমুখী, অভিজাত অথচ সংকথাশিল্পীর আগমনকে সগৌরবে লক্ষ্য করে নি। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যের সেই বিপুল একত্র সঞ্চয়নকে মৃত্যুর কয়েক বছর আগে 'লা কোমেদি য়ুমেন' নামে অভিহিত করে গিয়েছিলেন (তাতে ছোটগল্প সহ প্রায় আশীটির উপর রচনা আছে)। যদিও পরিকল্পনার চূড়ান্ত ফলাফল তাঁর দেখে যাওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু একথা ঠিক তাঁর আগে এবং তাঁর সময়কালে জীবনের এমন সর্বদিক্‌দর্শী ভাষ্যকার, এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রচয়িতাও কেউ ছিলেন না যিনি স্পর্ধার সংগে তাঁর সাহিত্যের

ভাণ্ডারকে অমন একটি বিশ্বজনীন নামে চিহ্নিত করে দিয়ে যেতে পারেন। সময়ের কৌশলে ব্যালজাককে রোমান্টিক যুগের সদস্য করবার প্রয়াস ব্যর্থ হবে, কেননা তিনিই প্রথম রেয়ালিস্ট্ ঔপন্যাসিক অথচ রোমান্টিক এবং তার সংগে এসে মিশেছিল novel of manners-এর রীতি ও প্রকৃতি। ফলে তাঁর মধ্যে এমন একটা নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল, এমন একটা ভংগী যা অপরাপর শিল্পীর অনায়ত্ত ছিল (শার্লট ব্রন্টিও একই ভংগীর অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্ত ছাড়া তিনি এই 'অদ্ভুত মিল'-এর খবরটি জানতে পারেননি, সম্ভবত বোধহয় তিনি ব্যালজাক পড়তেন না) কিন্তু সেই আয়ত্তাতীত নিজস্বতা তাঁর কিছু দুর্বলতারও কারণ বটে। যদিও পরে তিনি আপনাকে সংশোধন করেছিলেন (এক্ষেত্রে তলস্তয়ের নিখুঁত শিল্পরচনা স্মর্তব্য) তবু তাঁর সেই প্রাথমিক প্রমাদকে ডিকেন্স অথবা পো'র মতো একই দোষের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। ১৮২৯ সালে 'লে শোনাঁ' প্রকাশিত হবার পর থেকে ব্যালজাক কিঞ্চিৎ সাফল্যের স্বস্তি টের পেতে থাকেন এবং তার পরের বিশ বছর অনলস কাজে প্রায় নিদ্রাহীন দিন-রাত কেটেছে তাঁর। তিনি অন্তহীন শক্তিতে শুধু কালো কফিতে ঠোঁট ভিজিয়ে রাতের পর রাত জেগে কাজ করতে পারতেন। একটি উপন্যাসকে মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন ক'রে প্রুফ শীট-এর গায়ে নতুন ক'রে লিখে দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। বিশ বছরের বিরামহীন সাহিত্যকর্মে ব্যালজাকের হাত দিয়ে নব্বুইটি উপন্যাস, ছোটগল্প; নাটক ইত্যাদির অপর্যাপ্ত ফসল ফলেছে। তিনি সর্বদাই উঁচু সমাজে বিচরণ করেছেন, অর্থের প্রতি অসীম মমতায় নানা ব্যবসায়ে ঝুঁকি নিয়েছেন, তাঁর নিজস্ব পোশাক-আশাক, অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং অর্থোপার্জনের লালসা, হীরাজহরৎ সংগ্রহ করার নেশা এবং সর্বোপরি অমানুষিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা—তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রকেই এত বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে ভরে তুলেছে যে তাঁর উপন্যাস-সৃষ্ট প্রায় দু'হাজার (!) চরিত্র অপেক্ষা তাঁকে কম রঙীন মনে হয় না। টাকাটা তাঁর জীবনে সততই গুরুতর ভূমিকা নিয়েছে। তাই তাঁর গ্রন্থের অনেক চরিত্রকেই তিনি অর্থের নিশ্চিন্ততায় রেখেছেন এবং তদ্দ্বারাই নিজে সেই নিশ্চিন্ত আরামের উত্তাপটি ভোগ ক'রে তৃপ্তি পেয়েছেন। কিন্তু নিজের জীবদ্দশায় অর্থকে বশে আনার চেষ্টা সফল হয়নি ব্যালজাকের, তবে আঠার বছর ধরে যে সম্ভ্রান্ত পোল মহিলাটির প্রণয়ে তিনি আদ্যোপান্ত আসক্ত ছিলেন এবং যাঁকে আঠারো বছর ধরে ক্রমাগত উত্তপ্ত প্রেমপত্র (লেত্র্ আ লেত্রঁজের নামে প্রকাশিত) পাঠিয়ে শেষ পর্যন্ত

যখন ১৮৫০ সালে তাঁকে বিয়ে করলেন, তখন কিছুদিনের জন্য তিনি অর্থাভাবের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন কিন্তু সে-সুখ তাঁর কপালে বেশীদিন ভোগ করা হয়ে ওঠে নি, কেননা কয়েক মাস পরেই তাঁকে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। ব্যালজাক তাঁর উপন্যাসকে প্রথমত দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন: (১) এ তুদ্ দ্যম্যোর এবং (২) এ তুদ্ দ্য ফিলোজফিক্। তার মধ্যেও আবার রচনার প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ ছিল। প্রথমোক্ত অংশকে তিনি এইভাবে এক এক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন, Scenes of private life : তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, 'গোস্‌বেক্' (১৮৩০), 'লা ফাম্ দ্য ত্রাঁত্ আঁ' (১৮৩১), 'ল্য কোলোনেল শাবেয়ার' (১৮৩২), 'ল্য ক্যুরে দোতুর' (১৮৩২) এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ল্য পেয়ার গোরিও' (১৮৩৪)। Scenes of provincial life: 'ইউজেনী গ্রাঁদে' (১৮৩৩), 'উর্স্যুল্ মিরুয়ে' (১৮৪১), 'লেজিলিউসিয়োঁ পের দ্যু' এবং অন্যান্য। Scenes of country life ও political life-এ ছিল যথাক্রমে 'ল্য মেদ্স্যাঁ দ্য কম্পান্' (১৮৩৬)। 'ল্য ক্যুরে দ্য ভিলাজ্' (১৮৩৯) এবং 'আঁ এপিসোদ্ সু লা তেরর্', 'ল্য দেপুতে দার্সি', 'তেলেব্রোস্ আফেয়ার' ইত্যাদি। তাঁর দর্শন বিষয়ক উপন্যাসগুলি, যা তিনি ১৮৩১ সাল থেকে ১৮৩৫ সালের সময়কালে লিখেছিলেন সেগুলি দ্বিতীয়াংশে স্থান পেয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'লা প্যো দ্যো শাগ্র্যাঁ', 'রেশার্স দ্য লারসোলু' এবং দুটি 'মিষ্টিক' উপন্যাস 'লুই লাম্‌বেয়ার' ও 'সেরাপ্লাতা'। স্তাঁদালের মতো অত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা না থাকলেও ব্যালজাক তাঁর রচনায় হরেকরকম মানুষকে আমদানী করেছেন এবং তার মধ্যে কিছু কিছু চরিত্রের প্রতি আগে থেকেই তাঁর হৃদ-দৌর্বল্য সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যেমন মা হলেই তিনি তার পবিত্রতা রক্ষায় তৎপর হন অল্পবয়সী মেয়ে মাত্রই তাঁর কাছে দেবদূততুল্য ঠেকে আবার বহু পুরোহিতের মধ্যেই তিনি অসাধু আচরণ লক্ষ্য করেন এবং তথাকথিত উঁচু সমাজের উন্নাসিকতা তিনি সহ্য করতে পারেন না মোটেই আর পাপাত্মাদের শাস্তিবিধানেই তিনি যে বেশী স্বস্তিবোধ করবেন এই রকম একটা ভাব দেখান। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও চরিত্রগুলির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় সহানুভূতির অভাব হয়নি, সব কিছুর আড়ালে লেখকের প্রচণ্ড তিতীক্ষা ও মনোবল এমন ভাবে উত্থিত আছে যাতে চরিত্রগুলিকে সব সময়েই সজীব ও প্রাণবন্ত মনে হওয়া স্বাভাবিক। পাঠকের এই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কেউ যেন হাত ধরে এক বিরাট জীবন্ত

মনুষ্য-মিছিলের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাঁরা সাহিত্যে নতুন রুচি ও ভংগীর বিশ্বাসী, তাঁরা হয়ত ব্যালজাককে তেমন নিবিড় সম্প্রীতিতে গ্রহণ করতে পারবেন না, যতটা পারবেন স্তাঁদালকে তবে অন্যথায় তাঁকে এই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠকথাশিল্পী বলেই মনে হবে যদিচ আমার ধারণা ঔপন্যাসিক-কথাকারের কোন শ্রেণীতে ব্যালজাককে বসান যায়, এবম্বিধ মতান্তরের অবতারণা না করেও বলা যায় যে, ব্যালজাক হচ্ছেন একটা পুঞ্জীভূত শক্তি—যে-শক্তির সঞ্চয় থেকে উত্তরকালের কথাসাহিত্য একটু একটু তাপ সংগ্রহ করে নতুন আলোকে স্ফুরিত হয়েছে।

ব্যালজাকের বিশেষ বন্ধু ভিক্তর হুগো (১৮০২-৫৫) কবি-নাট্যকার হলেও ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর কম জনপ্রিয়তা নেই অন্ততঃ দু'খানি উপন্যাসের জন্য। তাঁর 'নোত্র্‌দাম দ্য পারি' (১৮৩৯) বা 'লে মিজেরাব্‌ল' (১৮৬২) জগতের তাবৎ উপন্যাস-পাঠকের কাছে সর্বকালে একই আবেদনে পঠিত হয়ে আসছে। হুগো ভবিষ্যৎ জীবনে মিলিটারীতে নাম লেখাবেন এই সদভিপ্রায়ই পোষণ করতেন কিন্তু সতের বছর বয়সে তিনি এক সাহিত্য-সমীক্ষা স্থাপনান্তে এবং বিশ বছর বয়সে দুরু দুরু বক্ষে একটি কাব্যগুচ্ছ প্রকাশ করে সব পূর্ব-পরিকল্পনাকে ভণ্ডুল করে দিলেন। তারপর আরো দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে তিনি নাট্যরচনায় ব্রতী হন। তাঁর প্রথম নাটক 'Cromwell' সাধারণ্যে বেরোয় ১৮২৭ সালে এবং ১৮৩০ সালে প্রকাশ পায় 'হেয়ারনানি'। এই 'হেয়ারনানি' নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে ব্যালজাক, আলেকজান্দার দ্যুমা, দ্য মুসে ইত্যাদি ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পালরা উপস্থিত থেকে হুগোকে সাধুবাদ জানান। রাজনীতির কারণে প্রায় বিশ বছর তিনি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত ছিলেন, নির্দিষ্ট সময় পার হলে যখন দেশে ফেরেন তখন প্রায় রাজকীয় সমারোহে তিনি অভ্যর্থিত হন এবং রাতারাতি তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসী-বহির্ভূত জগতে হুগো প্রধানত তাঁর উপন্যাসের জন্যই প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, আর এই উপন্যাসে তিনি শেক্সপীয়রিয় ভংগীতে গল্প বলতে জানতেন, নাট্যরসটি ছিল তাঁর আয়ত্তের মধ্যে এবং ডিকেন্সের মতো আশ্চর্য সব ঘটনা আমদানী করার পারদর্শিতাও তাঁর ছিল, ফলে গল্প এমন জমাট ক'রে বাঁধা হয়ে যেত যে, উপন্যাসসেবীরা কোন শৈথিল্যেই অননিবিষ্ট হতে পারেন না। 'লে মিজেরাব্‌ল'-এ তাঁর জঁ্যা-ভালজঁ্যা চরিত্রটি সর্বান্তকরণে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং সুইনবার্ন

অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করতঃ ওই উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'the greatest epic and dramatic work of fiction ever created or conceived'. তবু, আজ বুঝতে অসুবিধা হয় না, হুগোর উপন্যাস প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দাবী করতে পারার পরিপন্থী। কারণ তাঁর অনুপ্রেরণার অগভীরতা, নাতিপ্রশস্ত দর্শন এবং মনস্তাত্ত্বিক অসচ্ছলতা। হুগোর কথাসাহিত্য বিরাট নদীর মতো কিন্তু তাতে ঢেউ ওঠে কম।

প্রস্পার মেরিমে-র (১৮০৩-৭০) সময় থেকেই বোধহয় সাহিত্যে 'নন্দন আন্দোলন' (Aesthetic movement) বা 'Art for Art's sake'-কে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন সম্পূর্ণ হচ্ছিল। স্তাঁদালের বন্ধু মেরিমেকে প্রথম দর্শনে রোমান্টিক-আন্দোলন বহির্ভূত মনে করাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি নিজে যেমন মানুষ হিসাবে অত্যন্ত ধীর-স্থির ও সংযত ছিলেন তেমনি তাঁর রচনায় সেই ধীর-স্থির-সংযতভাবের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছিল, তাছাড়া মহাত্মারা যেমন সংসারের যাবতীয় ভাল-মন্দে থেকেও কিছুতে জড়িয়ে না পড়ে মোহহীনভাবে আপন নির্দিষ্ট কর্তব্যে রত থাকেন, তেমনি মেরিমে-ও তাঁর লেখায় অদ্ভুত মোহহীনতা অথচ জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন কোন বেগে বা আবেগে বশীভূত না হয়ে। তিনি ফরাসীতে ভিন্নতর গল্পরচনার স্বাদ এনেছিলেন এবং তাঁর শিল্পবিচক্ষণতা সম্যকরূপে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল ছোট গল্পে। ফরাসী ছোট গল্পকে তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী ধনী করে গেছেন। 'Great as Balzac and Hugo are in general literature, they have not so high a position in the special art of the short story as Prosper Merimee has. Merimee is the 'creator of modern conte' ('Worlds Thousand Best short stories': Vol III—J. A. Hammerton). মেরিমের অসাধারণ ছোটগল্প 'কারমেন' এবং 'কোলোম্বা' আজও ফরাসী পাঠকরা সবিস্ময়ে পড়ে থাকে। তাছাড়া তাঁর 'ক্রোনিক দ্যু রেন্ দ্য শার্লনোফ্' (১৮২৯) অদ্যাবধি ফরাসী ভাষায় লিখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে মর্যাদা পাবার যোগ্য। ফ্যাণ্টাসির প্রতিও তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল, তিনি লিখেও ছিলেন এবং প্রচুর প্রশংসাও পাওয়া হয়েছিল তাঁর। মেরিমের সাতষট্টি বছরের জীবদ্দশায় তিনি লিখেছেন অত্যন্ত কম, কিন্তু যা লিখেছেন তা পরবর্তী-পুরুষদের (মোপাসাঁ এবং মম ?)

ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর সম্পর্কে আরেকটি গুণ বিভূষিত হয়েছে, তিনিই বোধহয় প্রথম কথাসাহিত্যিক যিনি রুশ সাহিত্যে অদম্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি তৎকালীন-প্রাপ্ত রুশ গল্প উপন্যাসকে ফরাসী ভাষায় অনূদিত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

ইংলণ্ডে তখনো সেই শক্তিমতী রমণী জর্জ এলিয়টের উদয় হয় নি, ফ্রান্সে আধুনিক মন ও দৃষ্টি নিয়ে উদ্‌ভাসিত হলেন জর্জ স্যাঁ (১৮০৪-৭৬)। ওরোর দুপ্যাঁ তাঁর বিবাহিত জীবনের অসফলতা থেকে মুক্তি পেয়ে জীবিকানির্বাহের আশায় কলম ধরেছিলেন, তখনই তিনি জর্জ স্যাঁ ছদ্মনামে প্রচারিত হন। এলিয়েটের আগে স্যাঁ-ই হচ্ছেন প্রথম আধুনিক মহিলা ঔপন্যাসিক যিনি তৎকালে পুরুষদের মতো অনেকাংশে মানসিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছিলেন এবং নিজের অসমান্তরাল জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে তাঁর রচনার বিষয় হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এলিয়টের সংগে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র বা রচনার ধারা—কোন কিছুরই সাদৃশ্য ছিল না, শুধু সাধারণ মানুষের জন্য উভয়েই গভীর সমব্যথা অনুভব করেছেন, জাগতিক নিষ্ঠুরতায় তাঁদের অন্তরাত্মা বারংবার বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। ১৮৩১ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত স্যাঁ যা লিখেছেন ('অ্যাঁদিয়ানা'-১৮৩১; 'ভালেন্তিন'-১৮৩২; 'লেলিয়া'-১৮৩৩) তার মধ্যে বেশী জায়গা জুড়ে আছে প্রেম, যে দুরন্ত প্রেমের উপাখ্যান মূলত তাঁর আপন জীবন (দ্য মুসে এবং শপ্যাঁর সংগে তাঁর গভীর প্রণয় হয়েছিল) থেকে উৎসারিত। পরের দিকে তিনি এই ধারা পরিবর্তন করলেন লেখায় এবং আরো গভীর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে idealistic socialismকে বরণ করলেন এবং তাঁর সেই নবলব্ধ বিশ্বাসকে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টা করলেন নতুন উপন্যাসে ('ল্য ম্যোনিয়ের দাঁ জিবো'-১৮৪৫; 'ল্য পেসে দ্য ম্যসিয়োঁ আঁতোয়ান' ১৮৪৭)। শেষ জীবনে তিনি আর শহরে ছিলেন না, পৌত্র-পৌত্রী পরিবৃতা হয়ে গ্রামের বাড়িতে, প্রকৃতির ঘনসান্নিধ্যে বসে কয়েকটি অনাড়ম্বর প্রান্তরের উপন্যাস 'লা মার্ক্' ও 'দিয়াব্‌ল' রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি অত্যন্ত আদর্শীকৃত। তার কারণ, জর্জ স্যাঁ বুঝতেন সাহিত্য বা শিল্পচর্চার শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আদর্শ, একটা সদ্‌ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। তাঁর ওই আদর্শীকৃত কৃষক জীবনের চেহারা দেখে বয়োকনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ফ্লবের একবার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'Do you think that such people really exist'? মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে স্যাঁ আবার

রোমান্টিক রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই সময় আবার জীবনেতিহাসও-লেখেন তিনি আর মুসে-র সংগে তাঁর প্রণয়কাহিনীটিও লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু জর্জ স্যাঁ—ব্যক্তিগত জীবনে ওরোর দুপ্যাঁ, ঔপন্যাসিক হিসাবে তত গুরুত্ব দাবী করতে পারেন না যতটা পারেন কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বৃহৎ চরিত্ররূপে।

ওয়াল্টার স্কট সারা বিশ্বে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আবেশ ছড়িয়েছিলেন তাতে আর সকলের মতো ফ্রান্সও মুগ্ধ না হয়ে পারে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে রোমান্টিক ভাববিজড়িত novel of m nners-এর প্রভূত সমৃদ্ধির সংগে সংগে ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল। ভিক্তর হুগো মধ্যযুগীয় প্যারিসকে অনাবৃত করেছিলেন, তার আগে ত্রয়োদশ লুইয়ের সময়কালীন রিশল্যু-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কাহিনীকে প্রতিফলিত করেছিলেন তিনি তাঁর 'স্যাঁ-মার্স্' উপন্যাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবিচলিত ক্ষমতার অধিকার নিয়ে এলেন আলেকজান্দার দ্যুমা (১৮০৩-৭০)। স্কটের পর শ্রেণী নির্বিশেষে সব পাঠকদের অপরিসীম আনন্দ দিতে পেরেছেন বোধহয় একমাত্র তিনিই। দ্যুমা ছিলেন ওস্তাদ কারিগর তাই কালের অবরোধ অতিক্রম করেও তাঁর সেই অসির ঝনৎকার আর রোমাঞ্চের চমৎকার এই বিংশ শতাব্দীর অশান্ত এবং ভাবকঠিন জীবনেও অমলিন স্থান করে নিয়েছে। দ্যুমা সর্বপ্রথম নাট্যকারের পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, ঐতিহাসিক নাটক লিখতেন তিনি, কিন্তু তাতে শেষ অবধি তেমন সাফল্য এল না দেখে প্রায় বছর দশেক পরে বন্ধুদের ভজনায় তিনি উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এবার সিদ্ধিদাতা তাঁকে আর নিরাশ করলেন না, অতি দ্রুততা, অতি নাটকীয়তা, সংলাপের দুর্বলতা এবং ইতিহাসের অপ্রামাণিকতা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যের কারখানায় যে অস্ত্রগুলি তৈরি হলো তার অনেকগুলিরই ধারে আজো মরচে পড়ে নি। 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' (১৮৪১) তাঁর প্রথম এবং অসাধারণ জনপ্রিয় কাহিনী যা জগতের সবরকম মনের মানুষকে একশ বছরেরও ওপর অপার পাঠের আনন্দ বিতরণ করে আসছে। 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্সে'র সেই অবিস্মরণীয় ত্রয়ী কিংবা ডার্টাগনানকে কে ভুলতে পেরেছে? 'ল্য কোঁৎ দ্য মোন্তক্রিস্তো' (১৮৪৫) দ্যুমার আরেক জনপ্রিয় উপন্যাস।

কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, আপন মস্তিষ্কপ্রসূত নকসায় তৈরি ঘোর লাল রঙের

অদ্ভুত একটি জামা-গায়ে উনিশ বছরের এক তরুণ হুগোর দ্বিতীয় নাটকের প্রথম রজনীতে উপস্থিত ছিল। তরুণটি তখন চিত্রকলার সাধনা করে। পরে তাঁর কবি-খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়ায় এবং আরো পরে তদানীন্তন ফ্রান্সের এবং আজো সারা পৃথিবীর অভিজাততম কবি বোদলেয়র তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'লে ফ্লোর দ্যু মাল্' (flowers of evil) তাঁকে উৎসর্গ করেন। সেদিনের সেই তরুণটি হলেন থিয়োফিল গতিয়ের (১৮১১-৭২)। গতিয়ের প্রথম প্রথম রোমান্টিক দলে ভিড়ে খুব সোরগোল তুলেছিলেন, পরে হঠাৎ নতুন ধারণার বশবর্তী হয়ে 'Aesthetic movement' (নন্দন তত্ত্বের আন্দোলন) বা 'art for arts sake'-এর বুলিকে মহা উৎসাহে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। কবি হলেও গতিয়ের কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন। অন্তত তাঁর 'মাদ্‌মোয়াজেল্ দ্য মোপ্যাঁ' (১৮৩৬) সম্পর্কে গুরুত্বপুর্ণ মনোভাব পোষণ করা উচিত। কেননা উপন্যাসটির মুখবন্ধে যুগোদ্ভাবিত নতুন তত্ত্ব 'art for art's sake'-এর পরিপুর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি দার্ঢ্য ভাষায় হেঁকে বলেছিলেন, শিল্প জিনিসটা এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, অত অল্প আয়েসে, সাধারণ রুচিতে সেই সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে মানুষকে। এমন করে স্পর্ধার সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পের স্বতন্ত্র মর্যাদা এর আগে কেউ বোধহয় প্রতিষ্ঠা করতে চান নি। গতিয়ের সাহিত্যের সব শাখাকেই স্পর্শ করেছিলেন কিন্তু পরিপুর্ণভাবে কোনটিতেই বোধহয় নিজের দাবী ঘোষণা করতে পারেন না। তিনি ছিলেন একটি চরিত্র, রোমান্টিক যুগের এক সজীব চরিত্র। আর, সেই বিদ্যালয়ের সবচেয়ে উদ্যোগী প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, যে বিদ্যালয়ে শিল্পার্থেই শিল্পের পাঠ্য একদা সারা বিশ্বের তাবৎ সাহিত্য-শিল্পীদের আয়ত্ত করতে হয়েছিল। 'মাদ্‌মোয়াজেল্ দ্য মোপ্যাঁ' ছাড়াও তিনি 'ল্য রোমা দ্যলা মোমি' এবং 'আঁরিয়াঁ মারাল্লা' ইত্যাদি আরো কয়েকটি উপন্যাস এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে নিজের বহুমুখী বাসনাকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন, কিন্তু সেগুলির উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে গেছে। এক পলায়নী মনোবৃত্তি এবং কিছু ভূগোল বিস্তার ছাড়া তাঁর উপন্যাসগুলি আর কোন জাত-ধর্মের দাবীদার নয়।

জর্জ স্যাঁ-র প্রণয়ী অ্যালফ্রেড দ্য মুসে-র (১৮১০-৫৭) প্রতিভা কাব্যের গগনকে আলোকিত করে নাটকে ও কিছু গল্পকাহিনীতে বিস্তীর্ণ হয়েছিল এবং যেহেতু আমাদের আলোচ্যবস্তু কথাসাহিত্য সেহেতু মুসের গল্পকাহিনী 'ফ্রেদ্‌রিক

রে বের্গেরাত্রা', 'মিমি প্যাজোঁ' এবং 'ইস্তোয়ার দাঁ মেয়ার্ল স্ত্রঁ'-এর আলোচনা প্রয়োজন আছে। জর্জ স্যাঁ-র সংগে তাঁর অন্তরঙ্গতার সহৃদয়-সংবাদও তিনি উপন্যাসের মেজাজে পরিবেশন করেছিলেন 'লা কোঁফেসিয়োঁ দাঁ অঁফাঁ দ্যু সিয়েক্‌ল্‌'-এ (১৮৩৬) এবং তাঁর এই গল্পরচনাগুলিতে গভীর জীবনবীক্ষা, দক্ষ শিল্পীজনোচিত বর্ণনা ও ক্রপদী সুর মুসের সহজাত উচ্চ শিল্পবোধের প্রতি আমাদের সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মায়।

ইউজেন স্যু (১৮০৪-৫৭) উত্তরকালের রহস্য রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা কাহিনী-রচয়িতাদের সামনে এক অনুপ্রেরণার জগৎ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। বিশদ বিবরণে রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে নিগূঢ় তলদেশকে উদ্ঘাটিত করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সমাজ-জীবনের উলঙ্গ প্রকাশ তাঁকে প্রভূত জন-প্রিয়তা দিয়েছিল। ফেনিমোর কুপারের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিনি যে স্মরণীয় গ্রন্থটি ('আতর্‌-গুল্‌') রচনা করেছিলেন, সেটি তাঁর উত্তমর্ণের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীত হয়েছিল।

কিন্তু ১৮৪০ সালের পর থেকে যুগ ও সমাজের আবহাওয়ায় যে পরিবর্তন চিহ্নিত হলো, উপন্যাস, গল্পের অন্তরে ও বাইরে সেই হাওয়া-বদলের স্বাস্থ্যও ফুটল। কাব্যের জগতে বোদলেয়র তখন এক সম্পূর্ণ নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে উদয় হয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক কবিরা সেই অদম্য প্রাণশক্তির কাছে খদ্যোতের প্রভা নিয়ে মিটমিট করছেন কেবল। উপন্যাসেও তেমনি গুস্তাভ ফ্লবেরের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সমকালীন আর সব ঔপন্যাসিককে ম্লান করে দিয়েছে। পরে ফরাসী কথাসাহিত্যে আরো যে বাস্তবতার সঞ্চার হয়েছিল এবং 'স্বাভাবিকতা' ও 'প্রতীকতা'র নতুন মন্ত্রে উপন্যাসের হয়েছিল হার্দ্য পরিবর্তন,—তার সেই নতুন মোড় ফেরার ইতিহাসটি সূচিত হয়েছে গুস্তাভ ফ্লবেরের আবির্ভাবে। সমারসেট মম তাঁর 'The world's Ten Great Novels' গ্রন্থে বলেছেন, 'He did not think that to live was the object of life; for him the object of life was to write: no monk in his cell even more willingly sacrificed the pleasure of the world to care of God than Flaubert sacrificed the fullness and variety of life to his ambition to create a working art'। ফ্লবের (১৮২১-১৮৮০) তাঁর

প্রথমাবির্ভাবকেই স্মরণীয় করেছিলেন 'মাদাম বোভারী' (১৮৫৭) নামক জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসটিতে। তিনি রোমান্টিকতার রশ্মিকেই অঙ্গে মেখে প্রাথমিক যাত্রা শুরু করেছিলেন, পরে বাস্তবতার নতুন ধারায় স্নান করে তিনি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু বায়রন, স্কটের রোমান্টিসিজম যে তাঁকে আদৌ স্পর্শ করেছিল, এটাই অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার। কারণ, আশৈশব তিনি যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, হাসপাতালের সীমানায়, রোগীদের যন্ত্রণাকাতর সন্নিধানে (তাঁর বাবা ছিলেন হাসপাতালের সার্জন) তাতে তাঁর পক্ষে রোমান্টিক ভাবলেশরহিত থাকাই স্বাভাবিক ছিল। ফ্লবেরের সাহিত্যিক-জীবন তাঁর অভিভাবকদের সম্মতি পায় নি, তাই তিনি নেহাৎ অনিচ্ছায় আইন পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ স্নায়ু-দৌর্বল্যের গুরুভারে তাঁর মনোরাজ্যে কিছু ওলটপালট হলো আর তিনি বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন দূরে, নির্জন কোলাহলমুক্ত একটি বাগান-বাড়িতে, তাঁর বাবা একদা যেটি কিনে রেখেছিলেন। ফ্লবেরের মৃত্যুর পর তাঁর প্রেমের গোপন তথ্য সবিস্ময়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে, যে-প্রেম তাঁর রচনায় হয়ত ভিন্ন ভংগীতে মর্যাদা পেয়েছে। বিষাদগ্রস্ততা, দুঃখবাদ এবং অতিমাত্রায় নিয়তিবাদ ছিল তাঁর রচনার অনুষঙ্গী। তিনি মধ্যপ্রাচ্য সফরকালে এই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন যে, রোমান্টিকতার প্রশ্রয়ে আর যুগের কথাসাহিত্যকে আশ্রয় করা যাবে না। ভাবের সংগে বুদ্ধিকে যোগ করতে হবে, কুৎসিতকে নির্মম কুশ্রীতায় নগ্ন করতে হবে, সুন্দরকে তার সর্বোত্তম শোভায় আর এই পথে উপনীত হতে গেলে যেটি সর্বাগ্রে অবলম্বন করা প্রয়োজন তা নিছক সত্য। লেখকের Impersonalityতেও তিনি ছিলেন বিশ্বাসী, তাই স্পষ্ট করে বলে গিয়েছিলেন তিনি 'the artist should so arrange matters that posterity will believe that he has never lived'. এতদ্ব্যতীত, ভাষাসংস্কারে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায় প্রবাদের মতো পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। 'মাদাম বোভারী' ফ্লবেরের কলাকৈবল্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, বিশদ বাস্তবানুগতায়, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে অস্ত্রোপচারিত সমাজের ও মানুষের চেহারা স্ফুটিত করে তিনি বলেছিলেন, 'M'me Bovary is weeping at this moment in twenty villages of France'. এমা বোভারীর নৈরাশ্যপীড়িত, নিঃসঙ্গ জীবন এবং সুখের সন্ধানে তার প্রেমের পথে দুঃসাহসিক অভিযানকে বর্ণিত করতে গিয়ে লেখক যতখানি দ্বিধাহীন, অসংশয়িত হয়েছিলেন তাতে প্রচণ্ড নির্মমতা ও ব্যাধিতি প্রকটিত হলেও তা শোচনীয় সত্য, বাস্তব। সাড়ে চার বছরের স্বেদসিক্ত পরিশ্রমে 'মাদাম বোভারী'

লেখার পর ফ্লবের 'সালাম্‌বো' (১৮৬২) নামে যে উপন্যাসটি লিখলেন তা অনেকাংশে ইতিহাসাশ্রিত। যুদ্ধ, নৃশংসতা, কামনা-লোলুপতা ইত্যাদি মানুষের ভয়ংকর প্রবৃত্তিতে উপন্যাসটি একটু বেশী ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি এই রচনায় প্রতীকের ব্যবহার করেছিলেন। এতৎসত্ত্বেও 'মাদাম বোভারী'র সেই উত্তাপ কিন্তু এতে ছিল না। তাঁর দ্বিতীয় মহৎ উপন্যাস 'লেত্যুকাসিয়োঁ সোঁতিমেঁতাল' (১৮৬৯) রোমান্টিক যুগের এক তরুণের ব্যর্থ কাহিনী, অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে এবং নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। 'ব্যুভার্ এ পেকুশে'-র (১৮৮১) রচনাকার্য তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, তাতে এমন দুটি সাধারণ চরিত্রকে উপস্থাপিত করা হয়, যারা জগতের সব আধুনিক জ্ঞানার্জনে ব্যগ্র অথচ তাদের সে মানসিক উপযোগ্যতা নেই। ফ্লবের তাঁর সাহিত্য-সাধনার শেষের দিকে আরও যেন আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন, তাঁর মধ্যেই একটা নিজস্ব সম্পূর্ণ জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছিল, প্রতীকের ছায়ায় ছায়ায় তিনি মনের বিভিন্ন ভাবকে, নানা মেজাজকে অত্যন্ত ঋজু বর্ণনায় প্রকাশ করেছিলেন। আর যত দিন যাচ্ছিল, তাঁর ভাষা তত ধীর-গম্ভীর অথচ বন্ধনহীন সজীবতা পেয়েছিল। ফ্লবের নিঃসন্দেহে জগতের এক মহৎ সাহিত্যপুরুষ। প্রিস্টলে তাঁর 'মাদাম বোভারী'র সংগে তলস্তয়ের 'অ্যানা কারনিনা'র তুলনাশেষে বলেছেন, 'Flaubert's industry and patience, like his pride in and devotion to his art, are to be admired and if necessary to be imitated ; but perhaps if he had given his solid talent an airing, let the sun shine on it, we might have seen it flame into genius'.

ফ্লবেরীয় বাস্তবতা, স্বাভাবিকতা ও প্রামাণিকতা তখন ফরাসী উপন্যাসে এমন উত্তেজনায় ব্যক্ত হয়েছিল যে, ফ্লবেরের প্রভাবমুক্ত থাকা সমকালীন অন্য কথাসাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই, এডমণ্ড (১৮২২-৯৬) ও জুলে (১৮৩০-৭০) দ্য গঁকুর নামে দুই ভাই যখন একত্রে উপন্যাস-সাধনায় অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁরা রচনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতা ও প্রামাণিকতা বজায় রাখতে যে যে জায়গা পরিভ্রমণ করলেন তার বিস্তারিত হদিশ নিয়ে রাখলেন সযত্নে, মানুষের মুখের অভিব্যক্তি টুকে রাখলেন, ভৃত্য থেকে অন্য শ্রমজীবীদের আচার-আচরণ অত্যন্ত অভিনিবেশে সঞ্চিত করলেন, তারপর যখনই তাঁরা

উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন তখন সেইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে চরম কৌশলে ব্যবহার করে বাস্তব প্রতিবেশ সৃষ্টি করতে চাইলেন নিজেদের উপন্যাসে। প্রথম প্রথম ভাই দু'টি অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ও শিল্পকে আবার সাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে 'লাফাম্ য়ো দিজ্‌উইতিয়েম্ সিয়েক্‌ল' লিখলেন; তারপর সমকালীন যুগচিত্রকে অংকিত করতে তাঁদের লিখতে হলো 'রেনে মোপের্‍ঁ্যা', 'জার্মেনি লাসের্‌ত্যুয়ো' (প্রোলেতারিয় উপন্যাস), 'মাদাম জেরভেসে' এবং এইসব উপন্যাসের চরিত্রশালায় আবিষ্কার করা গেল গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের আবাল্য বন্ধুকে, পরিবারের চাকরটি—এমন কি খুড়ী-পিসীরাও দুই ভাইয়ের বাস্তব চিত্রাংকনের উত্তম থেকে রেহাই পেলেন না। কিন্তু ফরাসী কথাসাহিত্যে তাঁদের দান অকিঞ্চিৎকর হলেও (সব আন্তরিকতা, স্বাভাবিকতা ও স্বকীয়তা সত্ত্বেও) ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন সাহিত্যের উন্নতিকল্পে একটি স্থায়ী ও মূল্যবান বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন, যেটি আজও ফ্রান্সে 'গঁকুর আকাদেমী' নামে প্রচলিত এবং সাহিত্যপ্রতিভার উৎসাহকল্পে প্রবর্তিত।

এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) নিজেকে নিয়ে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচুর বিতর্কের অবকাশ দিয়েছেন। সমালোচকরা কেউ কেউ তাঁর অসাধারণ সাহিত্য-নৈপুণ্যের উল্লেখে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চেয়েছেন, কেউ বা বিস্তৃত কারণ না-দর্শিয়ে শুধুমাত্র উন্নাসিকতায় ক্ষান্ত থেকেছেন। কিন্তু জোলা বিশ্ব-কথাসাহিত্যে একটি অনতিক্রম্য ও অবশ্যম্ভাবী ক্ষমতা, সারা পৃথিবীতে যিনি অগাধ শ্রদ্ধায় পঠিত হয়ে থাকেন এবং আজও বিশেষ করে আমেরিকায় ও সোবিয়েৎ রাশিয়ায় তাঁর প্রভাব ও প্রতাপ দুর্দমনীয়। কথাসাহিত্যে ন্যাচারালিজ্‌ম-তত্ত্ব অবাধে প্রধূমিত হবার পর থেকেই জোলার যত বাড়বাড়ন্ত কিন্তু ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড তখন তাঁকে তেমন সমাদরে গ্রহণ করতে পারে নি এবং আজো বোধহয় ইংলণ্ডে তাঁর পাঠকের সংখ্যা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কমই হবে। জোলা প্রচুর লিখেছেন কিন্তু সমালোচকরা ভ্রূকুটি করে বলে থাকেন, তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফরাসী মেজাজ ও ভংগীটির অনুপস্থিতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়েছেন বটে, তবে চূড়ান্ত বাছাইয়ে কয়েকটিমাত্র নামই রত্নের মতো জ্বলজ্বল করে বাকী সবে ক্ষণিক দীপ্তি, চিরায়তের আবেদন-বিহীন। তবু, চেষ্টা করলেই জোলাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কেননা উনবিংশ শতাব্দীর ন্যাচারালিজ্‌ম-তত্ত্বের সবচেয়ে দায়িত্বপুর্ণ মুখপাত্র জোলা, তাঁর অসাধারণ

তন্নিষ্ঠায় ও জীবনবীক্ষায় আমাদের ক্রমাগতই তাঁর দিকে টানছেন এবং আমরা ইচ্ছা করলেই সেই আকর্ষণী শক্তি থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ উৎপাটিত করতে পারছি না। জোলা একটা কথা অত্যন্ত পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, কথাশিল্পীর চরিত্রসৃষ্টিতে, ঘটনা সংস্থাপনে কল্পনার অবকাশ থাকবে নিশ্চয়ই—কিন্তু সেই কল্পনা যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরবে, তাতে একটা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ছবি থাকবে। প্রয়োজন হলে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো চুলচেরা করে বিচার বা ব্যাখ্যা করতে হবে সব কিছু। তাই, তাঁর সব প্রামাণিকতার আন্তরিকতা সত্ত্বেও পাঠক নিজেকে আগন্তুক মনে করেন, তাঁর সকল তত্ত্বের চৌকাঠ অতিক্রম করে রচনার ভিতরে প্রবেশ করতে তাঁদের বাধ-বাধ ঠেকে। 'He is our special correspondent or guide to the markets and their workers, the financiers and cocottes, the dram shops and the slums, the big store and its assistants, the peasants sowing and reaping, and so on through the programme ; but though he may instruct, entertain, horrify us, he weaves no spell about us, still leaves us outside the peculiar enchantment of literature'. কয়লাখনির মানুষদের নিয়ে লেখা 'জেরমিনাল' (১৮৮৫) জোলার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বইটি লেখবার আগে তিনি বেলজিঅম ও উত্তর ফ্রান্স খনি অঞ্চলের আওতায় বেশ কিছুকাল কাটিয়ে বিশদ খবর সংগ্রহের পর তবে রচনার কাজে হাত দেন। সেই খনি অঞ্চলে চিত্রশিল্পী ভ্যানগগ্, শ্রমিকদের ধর্মীয় উন্নতিকল্পে তাঁর জীবন কিছুদিনের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। শ্রমিকদের মুখে 'কয়লাখনির খ্রীস্ট' গগের প্রশস্তি শুনে জোলা সেই শ্রুতিকেও কাজে লাগিয়েছিলেন। সমবেত-জীবনের প্রচণ্ডতাকে তিনি নিপুণভাবে বর্ণনা দিতে পারদর্শী ছিলেন বলে 'জেরমিনাল' অত জীবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী হতে পেরেছিল। শ্রমিকশ্রেণী (তিনি কোনদিনই বামপন্থী ছিলেন না) তাঁর রচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 'লা সোমোয়ার' (১৮৭৭) উপন্যাসে সেই শ্রমিকশ্রেণী এবং পানোন্মত্ততার যে চাঞ্চল্যকর ছবি এঁকেছিলেন তিনি, তার স্বপক্ষে জোলা নিজেই বলেছিলেন, এটিই বোধহয় প্রথম উপন্যাস, 'which has the smell of the people'। ১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো প্রুশিয় যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা 'ল্য দিবাক্ল' (১৮৯২) এবং কৃষক-জীবনের উন্মোচন 'ল্য তেরা' (১৮৮৭) জোলার সবিশেষ ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগও

('নানা'র নামও উল্লেখযোগ্য) এনেছেন সমালোচকরা। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জোলার সততা নিষ্ঠা ও সাংবাদিকসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তিনি সাধারণ মানুষের বন্ধু হতে চেষ্টা করেছিলেন,—তাঁর এ পরিচয়টুকু মুছে ফেলে দেবার নয়। ড্রেফ্যুর ব্যাপারে তিনি যে দুঃসাহসিক ওকালতি করেছিলেন তাতে তাঁকে ফেরার হতে হয়েছিল, কিন্তু দেশের অন্তরকে তিনি নায়কের গৌরবে জয় করে নিয়েছিলেন।

ফ্লবের ছিলেন মোপাসাঁ পরিবারের পুরনো বন্ধু। গী দ্য মোপাসাঁর (১৮৫০-৯৩) লেখক-জীবনে হাতেখড়ি দেবার জন্য তাঁর মা তাঁকে ফ্লবেরের কাছে পাঠান। তিনিই ফ্লবেরের খাঁটি উত্তরসাধক। যে ন্যাচারালিস্টিক প্রকৃতি মোপাসাঁ তাঁর কথাসাহিত্যে পরীক্ষা করেছিলেন তা বোধহয় ফ্লবেরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ কিন্তু তিনি তদপেক্ষা আরো পুরুমাত্রায়, আরো কঠিন ভারসাম্যে সেই তত্ত্বকে ব্যবহার করেছিলেন। তিনিই বোধহয় জগতের প্রথম ছোট গল্পকার যিনি পাঠক-রুচির প্রাত্যন্তিক ও আত্যন্তিক বিভেদের মাঝখানে সেতুরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। যারা উপন্যাসে বুদ্ধি খুঁজত এবং যারা কেবলই পাঠের আরাম, তারা উভয় গোষ্ঠীই বোধহয় মোপাসাঁর ওপর কিছু আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছিল। ফ্লবেরের মতো তিনিও নর্ম্যাণ্ডিতে বসবাস করেছেন এবং সেখানকার চাষীরা তাঁর বহু রচনায় প্রাণসঞ্চার করেছে, তাছাড়া ১৮৭০-এর যুদ্ধে মোপাসাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল, পরে মন্ত্রী দপ্তরের সামান্য একটি চাকরী করতে করতে বহু মনুষ্যচরিত্রের বিচিত্রতা সাগ্রহে লক্ষ্য করার সুযোগ পেলেন তিনি ; বিশেষ করে বুরোক্র্যাটদের স্বরূপ তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হল। এদেরই তিনি ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন অনেক সময়ে। মোপাসাঁর গোড়ার দিককার অধিকাংশ রচনাই সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল, পরে কয়েকটি সংকলনে 'লা মেজোঁ তেইএর' (১৮৮১); 'কোঁৎ দ্য লা বেকাস্' (১৮৮৩) ; 'কোঁৎ দ্যু জুর য়ে দ্যলানুই' (১৮৮৫) গল্পগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। ১৮৮০ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত, (চাকুরীর মায়া ত্যাগের পর) মোপাসাঁ তড়িৎগতিতে প্রায় তিনশ 'কোঁৎ' অর্থাৎ ছোটগল্প লিখে ফেলেছিলেন এবং ছ'টি উপন্যাস। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'বুল্ দ্য সুইফ' যখন প্রকাশিত (জোলা এবং তাঁর বন্ধুরা মিলে যে গল্পগ্রন্থে উদ্যমী হয়েছিলেন) হয়, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর। উপন্যাস ক'টির মধ্যে 'যুনে ভিয়ে' (১৮৮৩) এবং 'বেল্ আমি' (১৮৮৫) সাফল্যের আয়ুতে টিঁকে গেছে। মোপাসাঁর শেষ

জীবনটুকু তীব্র বেদনার এবং হাহাকারের। ১৮৯১ সালে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং তিনি আত্মহত্যা করতে চান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেন না। তখন তাঁকে উন্মাদাগারে স্থানান্তরিত করা হয়, মানসিকতার ভয়ংকর দ্বন্দ্বে ক্ষয় হতে হতে একদিন সেখানেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। শেষ দিকে যখন মোপাসাঁর ব্যক্তিত্বে বিক্ষিপ্ততা এসেছে এবং তার ক্রমিক বৃদ্ধি ঘটছে তখন যে কয়েকটি রচনা ('ল্যে ওরলা' ; 'আপারিসিয়োঁ' ইত্যাদি) তিনি লিখেছিলেন তাতে তাঁর সেই অসংবৃত মনের সশংক ছাপ ফুটেছিল ; একটা প্রচণ্ড ব্যাধিতির পংকে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিলেন তিনি। এই বিশ্বের ছোট গল্পের জনক যদি তলস্তয় হন, তাহলে অনতিপ্রশস্ত ক্ষমতার সীমানায় অবরুদ্ধ থাকলেও মোপাসাঁ তাঁর সার্থক উত্তরসাধক। কিন্তু ছোটগল্পের আরেক অসাধারণ শিল্পী চেখভের কথা উঠলে, মোপাসাঁ আপনা থেকেই যেন ম্লান হয়ে যান, তাঁর বাস্তবানুগ দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটিও চেখভের অমিত প্রভার কাছে দীন আয়োজনে সংকুচিত হয়। এরকম ধারণাই পোষণ করেছেন সমারসেট মম্, তাঁর 'Greatest Stories of All Times'-এর মুখবন্ধে। কিন্তু মোপাসাঁ ফ্লবেরের মতো বিশদ ছবিতে বাস্তবকে ফুটিয়েছেন, বিশেষত তাঁর অধিকৃত স্বকীয় গল্পবলার ভঙ্গী ; এই দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনের একাকীত্বের হাহাকারকে সরল-অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ণনা—তাঁকে দুই শতাব্দীর অসাধারণ জনপ্রিয় কাহিনীকাররূপে পরিচিত করেছে, সেকথা ভুললে চলবে না। মোপাসাঁ বোধহয় শোপেনহাওয়ারের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন তাই তিনি অত্যন্তরকম দুঃখবাদী ও নিয়তিবাদী। মনুষ্য প্রকৃতির কুৎসিত ও নির্মম দিকটা তাঁর চোখে পড়েছে বেশী, এবং সেই কারণেই প্রেম, ভালবাসা, মায়া, মমতাকে মানুষের একটা অদম্য মোহ বলে ধরেছেন তিনি, যে মোহের আরামবিলাসে মানুষ প্রতিনিয়তই বোকার মতো আত্মসমর্পণ করে খুশি হতে চায়। স্বল্পবিত্ত হলেও মোপাসাঁর চতুর গল্প বলার চরম কৌশল ও ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র অস্বীকার করা যায় না এবং তাঁর মৃত্যুর পর থেকে অগণিত ভক্ত-বাধ্য পাঠকের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেও হেয় করার সাধ্য নেই কারো—যদিও সত্যকথা বলতে কি, ইদানীংকালের চিন্তায় মোপাসাঁ আর অন্তর থেকে তেমন করে আহ্বান করতে পারছেন না।

ফ্লবের অস্তমিত হবার পর, জোলা নতুন দীপ্তিতে জ্বলছিলেন আর তাঁকে ঘিরে অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ কয়েকটি উপগ্রহ মিটমিট করছিল। তার মধ্যে গঁকুর

ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন আর ছিলেন আলফঁস দোদে (১৮৪০-৯৭) এবং জোরিস-কার্ল্ হুইস্ম্যান্স (১৮৪৮-১৯০৭)। অবশ্য এই একই সময়ে মোপাসাঁও বিরাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। আলফঁস দোদে খুব সূক্ষ্ম ও সুমিত শিল্পপ্রয়োগে স্নিগ্ধ ও আনন্দদায়ক গল্প লিখতেন বলে সমকালীন সাহিত্যেই তাঁর সব আবেদন নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। ফরাসী উপন্যাস-পাঠকরা অন্ততঃ একটি গ্রন্থের জন্য তাঁকে আজও স্মরণে রেখেছেন। 'লেত্র্ দ্য মযুলঁ্যা' (১৮৬৯) তাঁর নিজ প্রদেশের কাহিনী, অত্যন্ত স্বাভাবিক রসমাধুর্যের আলোয়-ছায়ায় সুবিন্যস্তভাবে বর্ণিত হয়েছিল। ১৮৭০-এর ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয় যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী কালকে কেন্দ্র করে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প 'লে কোঁৎ দ্যু লঁ্যদি' (১৮৭৩) বাস্তবানুগ সকারুণ্যে পাঠকের মনে তীব্র বেদনার সঞ্চার করে। ছোট গল্পে সত্যই তাঁর বিস্ময়কর নৈপুণ্য ছিল…'Alphonse Daudet can make a story out of nothing'। অনেকের অভিমত 'সাফো' (১৮৮৪) উপন্যাসটিতে মোপাসাঁর রচনাপ্রকৃতির অস্পষ্ট রেখাপাত ঘটলেও দোদের ওটি শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর সংগে তদানীন্তন রুশ কথাসাহিত্যিকদের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল,—বিশেষ করে তুর্গেনেভের সংগে সৌহার্দ্যের সম্পর্কটুকু এডমণ্ড দ্য গঁকুরের বিখ্যাত পত্রিকার সংবাদে পাওয়া যায়। জার্মেইন ম্যাসনের ধারণায় 'His style has not dated ; alert, poetical, impressionistic, it has the charm of freshness, spontaniety and familiarity'.

এবার শুধুই ন্যাচারালিজম-এর বাণী নয় নন্দনতত্ত্বের নতুন মূল্যায়নে এবং বোদলেয়রের নিজস্ব শিল্পজগতের নতুন প্রবাহে ফরাসী কথাসাহিত্য আরো সূক্ষ্মতায়, আরো বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যে অস্থির হচ্ছিল। কবিতায় প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া চলছিল এবং ইমপ্রেসনিস্ট অংকন-শৈলীর গুরুতর প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যে।

জে. কে. হুইসম্যান্স (১৮৪৮-১৯০৭) গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্দনা করতে গিয়েছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে একথা মনে হলেও আসলে তাঁর প্রচণ্ড কর্মশক্তি ছিল যা তাঁকে নিজস্ব পথে চালনা করে নিয়ে যায় এবং জোলা-উদ্ভাবিত বাস্তবতায় প্রোলেতারীয় উপন্যাস ('অঁ মেনাজ্' ; ১৮৮১) লিখলেও শেষ পর্যন্ত 'রিলিজিয়স মিষ্টিসিজম'-কে ('কাথেদ্রাল্', ১৮৯৮) তিনি আশ্রয় করেন। হুইস্ম্যান্স নিজের মধ্যে কোনদিনই স্বস্তি খুঁজে পান নি। হতাশায়, সন্দেহে এবং মতি-

স্থিরতার অভাবে তাঁর মন সর্বদাই সংক্ষুব্ধ থেকেছে আর সেই সংক্ষোভের প্রভাবপাত ঘটেছে তাঁর রচনাকর্মে। স্বকীয় ভংগী, ভাষার ঐশ্বর্য এবং ভাবের বিনিময় সত্ত্বেও পৃথিবীর প্রতি বৈরাগ্যে ও বিরক্তিতে নয়, নিজের সম্পর্কে প্রচণ্ড আশাহীনতায় তাঁর কথাসাহিত্য কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়েছে। তবু, পরবর্তী যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের ওপর হুইসম্যান্স-এর প্রভাবের প্রচণ্ডতা লক্ষ্যণীয়। পল্ ভ্যালেরি-র তুল্য কবিও তাঁর কাছে ঋণবদ্ধ, এ কথা ভ্যালেরি নিজেই স্বীকার করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তীকালটুকুতে ফরাসী কথা-সাহিত্যে শান্তি ছিল না। ভিন্নমুখী চিন্তার স্রোতে, নতুন ও পুরনো রচনাধর্মের সংমিশ্রণে এমন একটা অগোছাল ও বিপর্যস্ত চেহারা নিয়েছিল যার কোন একটি বিশেষ ধারাকে কিংবা কোন বিশেষ মতাশ্রিত জীবনদর্শনকে বেছে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা শক্ত। তাছাড়া এসময়ে এমন যুগন্ধর কথাশিল্পীও কেউ বিরাজ করছিলেন না, যাঁকে অবলম্বন করে ফরাসী কথাসাহিত্য কোন নিশ্চয়তার স্থির তটভূমিতে উত্তীর্ণ হতে পারে। কেউ কেউ তখন সাহিত্যের 'স্বাভাবিকতা' ও 'বাস্তবিকতা'র পাঠকে অক্লেশে বিসর্জন দিয়ে আইডিয়ালিস্ট উপন্যাস লিখছিলেন, কেউ বা বাহ্যিক বস্তুদর্শনের নিয়মনিষ্ঠাকে স্বীকার না করেই আত্মজীবনী-মূলক বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস ধারায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখছিলেন। জঁা ভাল্ (১৮৩২-৮৫) 'expressed his hatred of society with a bitter humour in his triology Jacques Vingtras' ('লঁ ফঁা', 'ল্য বাশ্লিয়ের', 'লঁ্যাকুর্জ' ১৮৭৯-৮৬)। He was a keen observer and sketched lively portraits. in a vigorous style. ইউজেন ফোর্মোতাঁ (১৮২৩-৭৬) transposed an idyll of his youth in 'দোমিনিক্' (১৮৬২), one of the best examples of French analytical novel which has lost none of its appeal.'

পরবর্তী যুগের সিম্বলিস্টদের ওপর প্রভাব ফেলেছিলেন 'ভেরা', 'লামুর', 'সুপ্রেম্', 'কোঁংক্রুয়েল্' ইত্যাদির রচয়িতা ভিলিয়ের দ্য লিল্-আদাম্ (১৮৪০-৮৯)। তিনি ছিলেন উচ্চবংশজাত এবং তাঁর জাত্যাভিমান সম্পর্কে সচেতনতায় সাহিত্যে পদার্পণ করেই তিনি জোলা ইত্যাদি পরীক্ষিত কথাসাহিত্যের ধারাকে মুহূর্তে

নস্যাৎ করে দিয়ে এই বস্তুজগতের বাইরে অন্য এক জগতের মাঝে শান্তি খুঁজে ফিরতে লাগলেন। পার্থিব সুখ-আনন্দকে বাতিল করে তিনি প্রেমের অতি-প্রাকৃত রূপকে আহ্বান করলেন। তাঁর ধারণা ছিল সাহিত্যে বাস্তবতা অপেক্ষা ইলিউশনের প্রতাপ বেশী। 'আক্‌সেল্' নাটকে তিনি সেই সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভিলিয়ের-এর আগমনে ফরাসী কথাসাহিত্যের বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার ওপর দিয়ে যে হঠাৎ একটা শিরশিরে হাওয়া বয়ে গেল লিয়ঁ ব্লোয়া (১৮৪৬-১৯১৭) তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে দিব্যজ্যোতির মৃদু ও মধুর উত্তাপকে সঞ্চালিত করলেন। তাঁর এই ধর্মানুভব একান্তই তাঁর অন্তরের আলোকিত কক্ষ থেকে উদ্ভাসিত। গীর্জার আনুকূল্যে নয়। বরং ধর্মযাজকদের প্রতি কঠোর সমালোচনায় তাঁকে অনেকাংশে বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতীকের ব্যবহারটা কাব্যেই প্রচলিত হয়েছিল বেশী, কিন্তু ধীরে ধীরে কথাসাহিত্যেও প্রতীকতার নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। পিয়েরে লোতি (১৮৫০-১৯২৩) সর্বপ্রথম সেই প্রতীকতার প্রত্যক্ষ সমর্থনকে পরিস্ফুট করলেন কয়েকটি উপন্যাসে। তাঁর আধুনিক পাঠকসংখ্যা হয়ত বিরল কিন্তু তাঁর লেখায় শিল্পী-জনোচিত মাধুর্য সেকালের পড়ুয়ামহলকে চমৎকৃত করেছিল, তাছাড়া তাঁর সহজ-সরল ছন্দোময় কাব্যিক রচনাভংগী, স্বপ্নময় রাজ্যে অবাধ বিচরণ লোতির উপন্যাসগুলিকে রোমান্টিকতার ভাবলক্ষণে বৈচিত্র্যময় করে রেখেছে। ব্যক্তিগত জীবনে লোতি ছিলেন নৌবিভাগীয় কৃত্যকের পদস্থ কর্মচারী। জগতের বহু দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রত্যক্ষ-দর্শন তাঁর অভিজ্ঞতার সরণিকে প্রশস্ত করেছিল। নিজের স্মৃতি দিয়ে এবং অন্তরের প্রীতি দিয়ে সেইসব অভিজ্ঞতাকে তিনি আশ্চর্য সকৌশল উপন্যাসে রূপ দিয়েছিলেন। জুলিয়ঁ ভিয়ঁ (লোতির আসল নাম) প্রথম কাহিনীর আখ্যানবস্তু গ্রহণ করেছিলেন আপন জীবন থেকে। কনস্তান্তিনোপলে এক তুর্কী তন্বীর সংগে যে প্রেম সঞ্চার হয়েছিল, তাই নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'আজিয়াদে' (১৮৭৯)। তাহিতি, জাপান, ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে ভৌগোলিক সীমানার আরও অনেক ছোট জায়গা লোতির উপন্যাসের বিচিত্র পটভূমি তৈরি করেছে। তার মধ্যে 'ল্যো মারিয়াজ দ্য লোতি' (১৮৮২) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। লোতি পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান যন্ত্রসভ্যতাকে সুনজরে দেখতে পারেন নি, বরং প্রাচ্যের

অপেক্ষাকৃত শান্ত, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় পলায়ন করা তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন।

জোলার কবরের কাছে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, তার যিনি বক্তা ছিলেন সেই আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪),—ভোলতেয়ারের মতো এক বলিষ্ঠ-চিন্তার, অনবনত চরিত্রের বজ্রকঠিন ব্যক্তি। ধর্মীয় অন্যায়, রাজনৈতিক ভণ্ডামি এবং সামাজিক অবিচার তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তীব্র প্রতিবাদ করতেন। অথচ সেই প্রতিবাদের ভাষাও কোনদিন শালীনতার সীমানাকে ছাড়িয়ে যায় নি, বরং আপন অন্তর্দর্শনে ব্যঙ্গচ্ছলেই তার গভীরতর রূপটি ব্যক্ত হয়েছে। দুর্বিনীত হবার গ্লানি ফ্রাঁসকে স্পর্শ করেনি কখনো। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় মানব জীবনের প্রবক্তারূপে অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যেই তাঁর সমাধির ওপর মাটি চাপা পড়ল, প্রায় তৎক্ষণাৎ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-অভিভাবকরা ফ্রাঁসের জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার ওজন কষে রায় দিলেন যে, এতকাল তিনি যে-সম্মানিত আসন পেয়ে এসেছেন আসলে তিনি তার আদৌ উপযুক্ত ছিলেন না, কারণ তাঁর সাহিত্যসেবায় আন্তরিকতা থাকলেও ক্ষমতার সীমিতিতে এবং কালের নতুন মানদণ্ডে তাঁকে অকিঞ্চিৎকর ছাড়া আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। এক মুহূর্তে ফ্রাঁস সম্পর্কে সব উৎসাহ নিভে গেল, পরবর্তী যুগের মানুষকেও তাঁর সম্বন্ধে আর বিশেষ আগ্রহী হতে দেখা গেল না। সাহিত্যের দাবাখেলায় (?) এমন নাটকীয় পরাভব এবং অকস্মাৎ প্রস্থান খুব বেশী ঘটে নি। তাঁর প্রতি জনগণেশের এই প্রচণ্ড কৌতুকের কারণ নাকি, 'He lacks the creative energy and depth of master novelist ; his thought is not original ; his famous style has not a contemporary tone and ring, and too often suggests an eighteenth century Pastiche ; his elaborate scepticism and irony, at a time when, unlike Voltaire, he ran no risks can be irritating or wearisome, and his novels of contemporary life, if we except 'Crainqubille' seem thin and unreal.' আনাতোল ফ্রাঁসের আসল নাম Jacques Anatole Thibault, তিনি এক পুস্তক বিক্রেতার সন্তান এবং তাঁর প্রথম সাহিত্য সাধনা শুরু কাব্যের বন্দনায়। তারপর সমালোচকের ভূমিকা নিয়ে তিনি সিম্বলিস্টদের ভৎর্সনা

করলেন অতিমাত্রায় জটিলতা সৃষ্টি করার জন্য আর ন্যাচারালিস্টরাও তাঁর হাত থেকে রেহাই পেলেন না। ফ্রাঁসের প্রথম সাফল্য পরিশীলিত চিন্তা ও পরিচ্ছন্ন বিদ্রূপের এক সহৃদয় রচনায়,—'ল্য ক্রিম্ দ্য সিল্‌ভেস্ত্র্ বোনার্' (১৮৮১) তাঁর বহুতর সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। খ্রীস্টধর্মের গোড়ার দিককার আলেকজান্দ্রিয়াকে তিনি চিত্রিত করেছিলেন 'তেই' কাহিনীতে, তবে ফ্রাঁস এতদিন পর্যন্ত যা লিখছিলেন, এবার সেই বৃত্তের বাইরে এসে তিনি প্রবৃত্ত হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগচিত্র, সমাজ-ব্যবস্থা ও যুগমানসকে প্রতিবিম্বিত করতে। তাঁর চারটি উপন্যাসের একটি গ্রন্থে—'লিস্তোয়ার্ কঁতঁপোরেন্' (১৮৯৬-১৯০১) লেখার পর থেকে তাঁর চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসছিল, তীব্র নাস্তিক্যের সংগে গভীর সমাজবোধের সমন্বয় হচ্ছিল। ফ্রাঁসের নির্দিষ্ট জীবনদর্শন, জীবন সৌন্দর্যের প্রতি অসীম মমতা, প্রচ্ছন্ন কৌতুকপ্রিয়তা এবং রচনাভংগী ধ্রুপদী স্বরমাত্রিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কালক্রমে সাহিত্যের মঞ্চ থেকে অকস্মাৎ অগৌরবের বিদায় পেলেন তার কারণ বোধ হয় যুদ্ধ। ১৯১৪ সালের পর আনাতোল ফ্রাঁসই ফরাসী দেশের ঐতিহ্যবাহক, সংস্কৃতিধারক ও সমাজসাধক রূপে উদ্‌গমিত হয়েছিলেন কিন্তু যুদ্ধের পর ভাবনার ক্ষেত্র যখন সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, পুরাতন বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা যখন এক নিমেষে চুরমার হয়ে গিয়ে নতুন চিন্তার আলোকে সব কিছুর মূল্যায়ন হতে লাগল তখনই হঠাৎ আনাতোল ফ্রাঁস ফুরিয়ে গেলেন, তাঁর এতদিনকার সুচিন্তিত ও সবিশ্বাস সাহিত্য-সাধনার স্থবিরতা এবং তুচ্ছতা আবিষ্কৃত হলো। তিনি বিস্মৃতির ভারী পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। কিন্তু একদিন হয়ত সহৃদয় পাঠকরা আবার স্মৃতির পর্দা ঠেলে, পুরনো ধুলোর পুরু আবরণ সরিয়ে তাঁর রচনায় নতুন করে আলো খুঁজবেন। হয়ত, 'who will then perhaps go back to 'Thais' to a short story like 'The Procurator of Judea', or to some of the old literary Causerie pieces, glinting with irony and wise mischief, all so pleasant and easy to read, and all—except of course for those critics who have dismissed this author as a mere Fake—so hard to write. When the literary world is tired of alternating doses of syrup and vinegar, perhaps it will return with pleasure to the light dry wine of Anatole France'.

উপন্যাসে ন্যাচারালিস্ট তত্ত্বের প্রয়োজন ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল, বিশ্লেষণ এবং প্রতীক ধীরে ধীরে নতুন অধিকারে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। অনেক কথাশিল্পীই ন্যাচারালিস্ট তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। পোল বুর্জে (১৭৫২-১৯০৫) সেই বিদ্রোহীদের একজন। তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিক ছিলেন এবং মনস্তত্ত্বমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী রচনায় তাঁর যোগ্যতা স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না। শেষ জীবনে বুর্জে অন্তরের নতুন নির্দেশ শুনে ধর্মীয় এবং অত্যন্ত পরিশুদ্ধ রচনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু 'ল্য দিসিল্' (১৮৮৯) উপন্যাস এবং এক সমালোচিত নিবন্ধগ্রন্থ 'এসে দ্য প্সিকোলোজি কঁতঁপোরেন' (১৮৮৫) ছাড়া তাঁকে স্মরণ রাখার আর প্রয়োজন হয় না বোধহয়। এই আলোচনার বইটিতে তিনি বোদলেয়র, স্তাঁদাল, ফ্লবেরের নতুন মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন, কারণ বুর্জে মনে মনে তাঁদের ঋণ স্বীকার করতেন। পোলবুর্জের সমকালীন আরেকজন বিশিষ্ট লেখক হলেন এলেমির বুর্জ্ (১৮৫৭-১৯২৫)। তিনি অবশ্যই বুর্জের বুদ্ধি দাবী করতে পারেন না, কারণ অতীত ইতিহাসের অস্পষ্ট ছায়ালোকিত পথে বিচরণ করতে চেয়েছেন তিনি, সংগে একমাত্র অবলম্বন, একটি ব্যথা-বেদনার সকরুণ ঝোলা। 'ল্য ক্রেপুস্ক্যুল দে দিয়্যো' ইত্যাদি উপন্যাসে সেই পরিচয়ই আছে।

রেনে বাজ্যাঁ (১৮৫৩-১৯৩৭) ও অঁরি বোর্দো (১৮৭০-১৯৫৪) নামে দুই ক্যাথলিক লেখক কোন অসাধারণ ক্ষমতা ধারণ না করলেও মোটামুটি আন্তরিকতার সংগে তৎকালীন ফরাসী পরিবার, ফরাসী জীবন, ফরাসী কৃষক-জীবনকে তাঁদের স্ব স্ব উপন্যাসে চরিত্রায়িত করেছেন। বাজ্যাঁ প্রচার করতে চেয়েছিলেন ফিরে চল মাটির টানে—তাঁর 'লা তের কি ম্যোর' ; 'ল্য ব্লে কি লিভ্' ইত্যাদির উপন্যাসের মূল স্বরটি তাই। অপরপক্ষে বোর্দো অত্যন্ত গৃহমুখী। সংসার, গার্হস্থ্য সমস্যা, ধর্মের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি মানুষের সাধারণ বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেবার একান্ত প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তিনি তাঁর উপন্যাসে।

আরেকদল সুসংহত ও সুনিশ্চিত নতুন ক্ষমতা এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত ফরাসী কথাসাহিত্যে মস্ত শূন্যতার ফাঁক প্রায় খাঁ খাঁ করছিল। মোরিস্ বারে (১৮৬২-১৯২৩) যদিও তাঁর সময়ে ফরাসীতে বেশ প্রভাবপাত ঘটিয়েছিলেন

তবু একক প্রচেষ্টায় সেই শূন্যস্থানকে সম্পূর্ণ করার প্রতিভা তাঁর আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। তিনি এককালে অত্যন্ত সাগ্রহে পঠিত হয়েছেন কিন্তু পরবর্তী কাল তাঁর প্রতি অত আর মনোযোগী হবার প্রয়োজন অনুভব করে নি। বারে ছিলেন সাংবাদিক এবং প্রখরমাত্রায় রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি। তাঁর স্বদেশ লোরেঁতে প্রুশিয় আক্রমণ বারে-র শৈশবকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, উত্তর জীবনেও তিনি সেই ঘটনা ভুলতে পারেন নি, দুঃস্বপ্নের মতো তা তাঁকে তাড়না করে বেড়িয়েছিল। ন্যাচারালিজম্-এর নৈর্ব্যক্তিক মূল্যকে উদ্বায়িত করে তিনি আপন তত্ত্ব ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন সাহিত্যে। উপন্যাস তাঁর কাছে ছিল নিজ ভাবনা প্রকাশের বিস্তৃত ক্ষেত্র এবং সেদিক থেকে তাঁকে ধারণা-রোপক বা 'disseminator of ideas' বলা যেতে পারে, যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থে উপন্যাস রচনার এতাবৎকাল প্রচলিত ধারাকে পাল্টে নতুন অবস্থায় উন্নীত করেছিলেন। মোরিস্ বারে তাঁর প্রথম উপস্থিতিকে উল্লেখ-যোগ্য করেছেন তিন খণ্ডে সমাপ্ত এবং একত্রে সংকলিত 'ল্য কুল্ত্ দ্য মোয়া' গ্রন্থে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ল্য রোমাঁ দ্য লেনার্জি নাসিওনাল্' (১৮৯৭-১৯০২) বারে-র সমসাময়িক যুগভাবনা ও রাজনীতিক-ধারণাকে প্রতিফলিত করেছে। এই সময় তাঁর স্বদেশ লোরাঁর প্রতি বিশেষ কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। 'লা কোলিন্ অ্যাস্পিরে' ; 'লে দেরাসিনে' উপন্যাসে সেই পরিচয় মুদ্রিত আছে। তিনি সম্পূর্ণ আঞ্চলিক প্রীতির হৃদয়াবেগে ভেসে যান। ১৮৯৪ সালে ক্যাপ্টেন দ্রেফ্যু-র মামলা নিয়ে দেশব্যাপী যে চাঞ্চল্য হয়েছিল, তাতে জোলা থেকে ফ্রাঁস কেউই হাত পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। সাহিত্যেও তার আলোড়ন এসে পৌঁছেছিল, আবিল করেছিল সাহিত্যকে। তাছাড়া জীবনেও তখন নতুন মত ও পথের বিপুল উদ্ভ্রান্তি,—ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সবই এক বিরাট অস্থিরতার চক্রে ঘুরছে। বারে-র রচনাও সেই উৎক্রান্তির চিহ্ন বহন করে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগের কয়েকজন লেখক হলেন জুল রেনা (১৮৬৪-১৯১০), যিনি অসীম কৌতুকপ্রিয়তায় বাস্তবকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : 'পোয়াল্ দ্য কারোৎ' ১৮৯৪)। জঁা জোরে (১৮৫৯-১৯১৪), যিনি ১৭৮৯-র বিপ্লব থেকে উদ্ভূত ফরাসী বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছেন (তাঁর উপন্যাসে তীব্র সমাজবোধ ব্যক্ত হয়েছে) ; শার্ল মোরা (১৮৬৮–১৯৫২) ছিলেন সত্যকার ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক-প্রতিভা রাজনীতি

প্রজ্ঞায় এত বেশী আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে তাতে তাঁর উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। ১৮৯৯ সালে তিনি মনার্কিস্ট-ক্যাথলিক আন্দোলনকে জীবন্ত করলেন এবং রোমান্টিকতা তাঁর সমর্থনলাভে বঞ্চিত হলো। জোলার শিষ্য পোল আদম্ (১৮৬২-১৯২৯) এবং প্রুস্তের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ক্ষমতার পূর্বপুরুষ রেনে বেলেস্ (১৮৬৭-১৯২৬) ফরাসী কথাসাহিত্যে নিজেদের চিহ্নিত করেছিলেন। 'ব্যু ব্যু দ্য মপাঁরনাস্' রচয়িতা শার্ল লুই ফিলিপ-ই (১৮৭৪-১৯০৯) বোধহয় একটি যুগনিঃশেষের অন্তিম শিল্পীদের একজন—অন্তিম অথচ অযোগ্য।

রেনে বেলেস্-এর মতো মার্সেল প্রেভো (১৮৬২-১৯৪১) রমণী চরিত্রের অধ্যয়ন ও মনস্তত্ত্ব-রচনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। আলিয়ঁা ফুর্ণিয়ের্ (১৮৮৬-১৯১৪) উপন্যাসে আইডিয়ালিস্ট ধারার প্রবর্তনা করলেন তাঁর একটিমাত্র বই 'ল্য গ্রঁা মোল্‌ৱা-য়ে'। তাতে একটি সজীব প্রেমের কাহিনী অত্যন্ত আবেগের সংগে কথিত হয়েছিল। সেই তারুণ্যের দীপ্তি পাঠকদের বিমোহিত করে এবং উপন্যাসটি বিশ্বজনীন আবেদন পায়।

উনবিংশ শতাব্দী অস্তমিত হলো। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের চরিত্র ও চিত্র নতুন দিগন্তকে স্পর্শ করল। এল ১৯১৪ সাল। যুদ্ধের হুঙ্কার পৃথিবীর বুকে সন্ত্রাস ছড়িয়ে জীবনের রূপ দিল বদলে। মানুষের জ্ঞানোন্মেষ ঘটল, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেল, গ্রন্থের স্তূপে মানুষের ক্রমবর্ধমান পাঠ-তৃষ্ণার স্বাক্ষর রইল কিন্তু জীবনের স্বস্তি থাকল না, পুরাতন প্রথা, বিশ্বাসকে এক নিমেষে বাতিল করে দিয়ে, নতুন অর্থে শান্তি, সংহতি এবং নিরাপত্তার সন্ধান চালাল মানুষ। সেই অনিশ্চিত অনুসন্ধানের শেষ হয়নি আজো। জীবনের পরিবর্তিত রূপ আবশ্যিকভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে, তাতেই সাহিত্য থাকে সচল ও প্রাণবন্ত। ফরাসী কথাসাহিত্যও সেই হার্দ্য পরিবর্তনকে নিবিড় সততায় স্বীকার করে নিয়েছে। জাগতিক এবং মানসিক জটিলতর ও সূক্ষ্মতর ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত বাহনরূপে নিজেকে প্রসারিত করেছে স্তরীভূত বৈচিত্র্যে। আদ্যকালের মতো এখন আর উপন্যাসকে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল, ডকুমেণ্টারি, ইডিওলজিক্যাল ইত্যাদি শব্দতে তার সীমানা ছোট করা চলল না ববং সুর রেয়ালিজম, এক্সজিসটেনসিয়ালিজম ইত্যাদি গভীর ও গূঢ় অর্থবোধ্যতায় উত্তীর্ণ হল

কথাসাহিত্য। বের্গসঁ-র দর্শনতত্ত্ব এবং ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর ফরাসী উপন্যাসের কথাবস্তুতে আশ্চর্য নৈপুণ্যে মিশে গেল আর বৈদেশিক মহাশিল্পীরা তাঁদের অলঙ্ঘনীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করলেন, বিশেষ করে দস্তয়ভস্কী, জেমস জয়েস ও ফ্রাঞ্জ কাফকা। অত্যাধুনিক ফরাসী উপন্যাসে অবশ্য মার্কিন কথা-সাহিত্যিকদের আকর্ষণ এড়ান যাচ্ছে না—ডস পাসোজ, হেমিংওয়ে, উইলিয়াম ফকনার এমন কি স্টাইনবেক পর্যন্ত বারেবারেই হানা দিচ্ছেন, তাঁদের অপ্রতিরোধ্য আবেদনে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোধূলি-লগ্নে ফরাসী সাহিত্যচিন্তার আকাশকে রাঙা করে এসেছিলেন এক মহৎ প্রতিভা—রম্যাঁ রোলাঁ (১৮৬৮-১৯৪৪)। তখনো প্রথম মহাযুদ্ধের আতংকিত পদধ্বনি শোনা যায় নি। অভিযোগ আছে রোলাঁ প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকাকে দূর থেকে (সুইজারল্যাণ্ডে) অনাগ্রহীর অবিচলিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁর প্যাসিফিস্ট মনোভাব ও তৎসংক্রান্ত নিবন্ধ তাঁকে স্বদেশে অত্যন্ত অপ্রিয় করেছিল কিন্তু তবু তাঁর সৌভ্রাত্রের আকাঙ্ক্ষা, মানবতার বন্দনা তাঁকে এমন এক জীবনদর্শনে ব্যাপৃত করেছিল যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করার কারণ ছিল না। এই জীবনদর্শন তাঁকে ভারতের আত্মানুসন্ধানে প্রচেষ্টিত করেছে, তাই তিনি লেনিনবাদ ও গান্ধীবাদকে একসূত্রে বাঁধবার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তাই রবীন্দ্রনাথের মহৎ ঔদার্যের পাশে বারংবার এসে দাঁড়িয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও রোলাঁর সেই 'সত্তার স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণা' পত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন। আর এই জীবনদর্শনই এক মহৎ ভবিষ্যদ্বক্তার সুপ্রোথিত বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি স্থির বুঝেছিলেন যে, ইউরোপের সকল সর্বনাশকে রোধ করতে গেলে সব ভেদাভেদ, তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠে ফ্রান্স ও জার্মানীর বন্ধনকে দৃঢ়সংবদ্ধ করা প্রয়োজন। 'We are the two wings of the west. If one be broken there is an end of flight.' রোলাঁ মূলতঃ ছিলেন দার্শনিক, তাঁর মহৎ চিন্তা, গভীর জীবনবোধ ও অসাধারণ শিল্পাসক্তি তাঁকে বিংশ শতাব্দীর এক বরেণ্য পুরুষের অন্যতর শ্রদ্ধার আসন দিয়েছে, তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই শুধু উপন্যাস রচনায় তিনি চরম সার্থকতা দেখাতে পারেন নি। 'জঁা ক্রিস্তফ' (১৯০৪-১২) তাঁর দশ খণ্ড ব্যাপী, মহৎ ভাবনাসংযোজিত এক ধ্রুপদী উপন্যাস। রাইনল্যাণ্ডের সংগীতশিল্পী এবং ফরাসী নায়ক অলিভিয়ারের সখ্যতা,

তাদের সাধারণোর্ধ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা, পুরনো জার্মানীর বেথোভেন ও গ্যোতের প্রতি বিশ্বাস এবং তদ্দ্বারা দুই দেশের আত্মিক মিলন—এসবেরই আড়ালে রোলাঁর বিদগ্ধ মন ও মহামানবোচিত দৃষ্টি কাজ করেছে, তাঁর অন্তরের বিশ্বাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অকৃত্রিম সততায়। এমন এক সময় গেছে, যখন 'জঁা ক্রিস্তফ' সারা বিশ্বে অসীম শ্রদ্ধায় পঠিত হয়েছিল, আজ তাতে কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়েছে হয়ত, কিন্তু রোলাঁ, মানবতার বন্ধু রোলাঁ, তাঁর কীর্তির চেয়েও মহৎ হয়ে বেঁচে আছেন। যদিও ঔপন্যাসিক রূপে ইদানীং তাঁর গুরুত্ব কিঞ্চিৎ হ্রাস করা হচ্ছে: 'The pressure of the idea was too much for the not very robust novelist in Rolland; he lacked the creative energy and sheer human stuff, essential for fiction, to keep his narrative convincing, engaging, vital to the end.' রোলাঁর মানসিক গতি কোন্ পথে ধাবিত হয়েছিল, কোন্ স্তরে—তার পরিচয় রয়েছে জগতের কয়েকজন পরম পুরুষের জীবন অধ্যয়নের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহে। 'মাইকেল আঞ্জলো' (১৯০৫), 'তলস্তয়' (১৯১১), 'গান্ধী' (১৯১৪), 'রামকৃষ্ণ' (১৯২৯) এবং 'বিবেকানন্দ' (১৯৩০) তাঁর বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত হবার মতো উন্মগ্ন চিদ্‌বৃত্তি সৃষ্টি করেছিল রোলাঁয়। তিনি আরো দু'টি বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো তাঁর দ্বিতীয় রোমাঁ ফ্লোভ্, 'লাম্ আঁশাঁতে' (১৯২২-২৭) যা 'জঁা ক্রিস্তফে'র সমতুল্য হতে পারে নি কোন অংশে। এবং অপরটি হলো ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ, বৃহদাকার বেথোভেন সম্পর্কিত রচনা, 'বেতোভেন, লে গ্রাঁদ এপোক্ ক্রেয়াত্রিস্' (১৯২৭-৪৩)। ঐতিহাসিক রচনা 'কোলা ব্রোনিয়োঁ' (১৯১৯) সহ প্রায় ছ'টি ছোট উপন্যাস, সংগীত সম্বন্ধীয় নিবন্ধ, জীবন বৃত্তান্ত এবং গণনাটক লেখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা রোলাঁর বহুবিধ কর্মকাণ্ডের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে অবশিষ্ট আছে। যুদ্ধের বিধ্বংসী হিংস্র চেহারা রোলাঁর অন্তরকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করেছে, তাই তিনি বারংবার মানবতার সাবধান বাণী প্রচার করেছেন, তাই যুদ্ধকে আক্রমণ করে পরিণত বয়সেও তাঁকে লিখতে হয়েছিল 'ক্লেরাঁবো' (১৯২০)। ভলতেয়ার ও উগোর কাছে রোলাঁর চিন্তা জীবনের বহু পরীক্ষিত সময়ে আত্মসমর্পণ করেছে; তিনি তাঁদের প্রভাবকে স্মরণ করে নতুন পথের শরণ নিয়েছেন। তাই তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল: "লড়াইয়ের সময় ভিক্তর হুগো ও ভলতেয়ারের দিকেই আবার আমরা ফিরে তাকালাম; এর আগে আমরা তাঁদের প্রতি

সুবিচার করি নি, এবার তাঁরা আমাদের সংগ্রামের সাথী হয়ে সেই অবহেলার শোধ নিলেন। এখন আর শুধু ভলতেয়ারের বিদ্রূপকে নয় তাঁর মানবিকতাকেও আমি মর্যাদা দিই, সেই স্বাধীন চেতনার অমিত তেজকে, যিনি বলেছিলেন—'দু'দিনের জন্য তো এই জীবন, এই সামান্য সময়টুকু আমরা যেন ঘৃণ্যতার পায়ে বিকিয়ে না দিই'।" (বই পড়া)।

আর্নল্ড বেনেট আঁদ্রে জিদ্ (১৮৬৯-১৯৫১) সম্পর্কে বলেছেন, 'He writes in the very midst of morals. They are not only his background but frequently his foreground.' জিদ্ তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূচনাকাল থেকে নন্দন তত্ত্বের ঘোর বিশ্বাসী এবং সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে নীতি রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। ১৯১৪ সালের পর থেকে কথাসাহিত্য কোন বিশেষ মতাশ্রিত তকমা-আঁটা পরম্পরার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না, ব্যক্তিক অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রকাশকে ধারণ করেছে উপন্যাস বা গল্প। জীবনের ক্রমপরিবর্তমান অবয়বকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসে, অধিকতর মননশীল বিশ্লেষণে, নানা রঙে, নানা ছায়ায়, নানা মেজাজে ও প্রাতিস্বিকতায় অভিভাবিত করে তুলেছেন জিদ্, জয়েস, প্রুস্ত, মোরিয়াক, মান প্রভৃতি একালীন কথাশিল্পীরা। জিদ্ বহুকালাবধি (প্রায় ১৮৯০ থেকে) সাহিত্য-সাধনা করে আসছেন, কিন্তু ১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত তিনি সম্যক পরিচিতিলাভে সমর্থ হন নি এবং তাঁর সেই সসম্মান পরিচিতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল, তারপর থেকে জিদ্ নিজেই যেন অস্থির ও অতৃপ্ত আচরণে সব সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। জিদ্ নিজেও সেকথা অবহিত ছিলেন। তবু তাঁর মনের নির্দেশকে তিনি কখনো অবহেলা করতে পারেন নি, শেষদিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত আত্মানুসন্ধানের পালা তাঁর শেষ হয় নি। আর, তাই জিদ্-এর সমসাময়িক আর কোন কথাশিল্পীই তাঁর তুল্য এত গূঢ়ৈষা রচনা করতে পারলেন না এবং কোন ব্যক্তিই নিজের সম্বন্ধে এত সমালোচনাকে সহ্য করার শক্তি দেখান নি। সব বিরুদ্ধাভাসের মুখোমুখি দাঁড়াতে সজীব ছিলেন তিনি। 'The miracle was that Gide had become a classical writer by the time of his death while remaining a dangerous writer.' সরোজ আচার্য তাঁর 'বই পড়া' গ্রন্থে জিদ্ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'কোন্ মহৎ আদর্শের প্রেরণা জিদ্ দিতে পেরেছেন তাঁর স্বদেশবাসীকে, যখন নাৎসী বুটের তলায় ফ্রান্সের আশা আকাঙ্ক্ষা, গৌরব আর গর্ব গুঁড়িয়ে

পড়ছিল ? বিপ্লবের ঐতিহ্য-গৌরবে ফ্রান্স দুনিয়ার সেরা দেশ। সেই গৌরবকে ম্লান হতে দেয় নি ফ্রান্সের অগণিত দেশভক্ত শিল্পী ও যোদ্ধা জনসাধারণ, নিদারুণ দুঃখের রাত্রিতেও। জিদ্ শুধু পিছু হটেন নি, পথও হারিয়েছেন। ফ্রান্সের চরম দুর্দিনে যাঁরা প্রাণ দিয়ে নতুন কালের প্রাণময় ইতিহাস রচনা করেছিলেন, জিদ্ তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, দুর্ধর্ষ শত্রুর কাছে মাথা নোয়ানোই সুবুদ্ধির কাজ ; কী হবে প্রতিবাদে, প্রতিরোধে ? সত্তর বছর বয়সে আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, দেখেছি তাঁর শিল্পের মহৎ দায়িত্ববোধের বলিষ্ঠ প্রকাশ, আবার জিদ্কেও দেখেছি সত্তরের কোঠায় তাঁর সারা জীবনের অহং সর্বস্ব শিল্পা-দর্শের জের টেনে এসেছেন নিজের জীবনে, জাতির জীবনে চরম সংকট মুহূর্তে। জিদের সর্বশেষ লেখা ডায়েরির পাতায় (১৯৪০-৪৪) ছত্রে ছত্রে তাঁর জীবন-বিরাগী শিল্প-সাধনার স্বাক্ষর। নাৎসী শাসনের অধীনে টিউনিসে বসে ডায়েরির পাতার পর পাতা জিদ্ ভরিয়ে তুলেছেন আত্মসর্বস্বতার সান্ত্বনা দিয়ে। আবার ফ্রান্স যখন তার স্বাধীন সত্তা ফিরে পাচ্ছে চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তখনও জিদের স্বপ্নস্বর্গে কোনও সাড়া নেই, উচ্ছ্বাস নেই।' কিন্তু একথা বললে অন্যায় হবে যে, জিদ্ সেইসব দৃশ্যের অনুরাগী দর্শক ছিলেন না। স্বদেশে কিংবা ইওরোপের অন্যত্র প্রত্যেকটি অগ্রসর-অভিযান, প্রত্যেকটি পশ্চাদপসরণ, পশ্চাৎ-পটের ইতিবৃত্তকে নিয়ে তিনি আপন সত্তার সংগে সংগ্রাম করেছেন অনবরত—কোন সুখের গজদন্ত মিনারে নয়, স্বরচিত রণক্ষেত্রে অশান্ত জীবনযাপনেই তাঁর দিনের বিশ্রাম এবং রাতের নিদ্রা ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বর্তমানের মতের কোলাহলে নিজের কণ্ঠকে মিলিয়ে দিতে চান নি···নীতিবাদী জিদ্, প্রাতিস্বিক জিদ্ বিশ্বাস করতেন বিশ্বের শুভাশুভ আরম্ভ হয় একক সত্তার সার্থক উদ্‌বোধন থেকে। তাই তিনি আগে প্রত্যেক মানুষকে বলেছেন সৎ হতে। বলেছেন 'নিজেকে জান' 'নিজের হও'। জিদের ব্যক্তিসত্তার ব্যাকুলতা অন্তহীন আর এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তাকে তিনি বলেছেন, এমন এক পথ যা দেবতার আবাসে, সত্যের আলয়ে নিয়ে যেতে পারে মানুষকে। অবশ্যই এই ব্যক্তিসত্তার সংগে নীতি বা মর‍্যাল বস্তুটি সংযোজিত থাকবে। আর সেই নীতি প্রয়োজনা-নুযায়ী পরিবর্তন সাপেক্ষ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জিদের মনে সত্যের সংশয় কোনদিন ঘোচে নি ; ঠিক কোন্‌টা সেই আরাধ্য দেবতার পথ যার যাত্রাশেষে তাঁকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে—এই বিচলিত দ্বন্দ্বের অবস্থিতি তিনি মনে মনে প্রতিনিয়তই অনুভব করেছেন। তা আর কোনদিনই অবসিত হলো না। আঁদ্রে

জিদ্ প্রধানত ঔপন্যাসিক নন, বরং তাঁকে মর‍্যালিস্ট এবং সমালোচক বলাই শ্রেয়। তিনি নিজেও একমাত্র 'লে ফো মোনেয়্যোর' (১৯২৫) ছাড়া অপর কোন রচনাকে উপন্যাসের ছাড়পত্র দিতে রাজী ছিলেন না। জিদের পরিবর্তমান চিন্তাধারার দৃষ্টান্ত, এই গূঢ়ৈষ উপন্যাসটিতে প্যারিসের বিদ্যালয়-বালকদের এবং কিশোরদের জগৎ লেখকের বিশেষ মনোভাবনায় বর্ণনা পেয়েছে। আবার এই চিন্তাধর্মের বিপরীত উপন্যাস 'লা পোর্ত এত্রোয়াৎ' (১৯০৯) বাহ্যত বর্ণহীন, তবু হয়ত হৃদয়স্পর্শী, কেননা তাতে জিদ্ তাঁর নায়িকাকে এই মানুষী প্রেমের অবিশ্বাস থেকে উচ্ছিন্ন করে সর্বপ্রাণমন নিয়ে অসীমের উদ্দেশে স্থাপিত করেছেন। জিদ্-এর পাত্র-পাত্রী সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ধারণা ছিল এই যে, 'জিদ্-এর নায়ক-নায়িকারা সংসারবিরত, সমাজাতিরিক্ত : আত্মা স্বেচ্ছাচারী এই সত্যের প্রমাণ হিসাবে তারা হয়তো নরহত্যায় সুদ্ধ পশ্চাৎপদ নয়। তাদের ধ্রুব বিশ্বাস মুক্তির পরাকাষ্ঠা সকলকে ছেড়ে নিঃসহায়, নিরুপায় ভাবে আত্মস্থ হওয়া ; তারা ভাবে যে, ব্রহ্মসাযুজ্যও মূলে একটা অনুভূমিমাত্র—একটা বেদনা একটা সম্ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয় ; এবং সেই জন্যে তারা বিকার-বিক্ষোভকেও বাদ দেয় না, তাদের লুব্ধ ব্যক্তিতা জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গবেষণা করে। কয়েক বিষয়ে জিদ্-এর সংগে পুরনো গ্রীকদের ঐক্য দেখা গেলেও, এই মনোভাব যে ধ্রুপদী আদর্শের পরিপন্থী, তা বলা অনাবশ্যক।' 'লা পোর্ত এত্রোয়াৎ'-ই জিদ্-এর শ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যে নীতি ও শুচিতার কথা জিদ্ নিজমুখে প্রচার করতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নির্বিচার স্বাধিকারপ্রমত্ততায় সেই নীতিহীনতার অশুচি তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। 'লিম্‌মরালিস্ত্' (১৯০২) উপন্যাসটি তৎকালে কলংকের কারণ হয়। ১৮৯৩ সালে জিদ্ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং স্বাস্থ্যান্বেষায় আলজিরিয়ায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন আর সেখানেই তাঁর সংগে অস্কার ওয়াইল্ড-এর সাক্ষাৎকার হয় ও প্রগাঢ় সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে উভয়ের মধ্যে। 'লিম্‌মরালিস্ত্' গ্রন্থে জিদ্ সেই যক্ষ্মা রোগকে বিচিত্রিত করেছিলেন। তাঁর নায়ক ওই কাল-ব্যাধিটিতে ভুগছিল কিন্তু স্ত্রীর পরিচর্যায় ও পরিশ্রমে সে সুস্থ হয়ে ওঠে আর স্ত্রীটি হঠাৎ সেই রোগে আক্রান্ত হয় ; স্বামীদেবতা চরম অবহেলায় ও ঔদাসীন্যে তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয় এবং নিজের ভোগলালসাকে তৃপ্ত করতে সে অন্যতর পথ বেছে নেয়। কিন্তু জিদ্ আপনাকে বোধহয় বেশী প্রতি-বিম্বিত করেছিলেন এদুওয়ার চরিত্রে। জিদ্-এর মতো এদুওয়ারও ঔপন্যাসিক

এবং জিদ্-এর মতো সে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার মাঝে জীবনধারণের নিগূঢ় কারণটি অনুসন্ধান করে ফেরে অথচ নিজে থাকে সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন ও নির্বিকার। 'কাউন্টারফিটার্স' উপন্যাসে অনেক কিশোরকে হাজির করিয়েছেন জিদ্। তার স্বপক্ষে যুক্তি ছিল যে, তুলনামূলক বিচারে ইংরাজী ও রুশ কথা-সাহিত্য অপেক্ষা ফরাসীতে শিশুদের আবির্ভাব হয়েছে কম। কিন্তু তাঁর উচ্চ-ভাবনাসম্ভূত, স্বভাবসিদ্ধ অনেক বড় বড় কথা তিনি সেইসব ছেলেদের মুখে জুড়ে দিয়ে বাস্তবতার শেষ অবস্থা করে ছেড়েছিলেন। জিদ্ যাবজ্জীবনে প্রায় তিরিশখানিরও বেশী গ্রন্থ লিখেছেন কিন্তু তার যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করে আলাদা আলাদা শ্রেণীবিভাগ করা হয়ত শক্ত। আর, এই সব তথাকথিত উপন্যাস, নাটকের প্রত্যেকটিতেই জিদ্-এর স্বরচিত বাণী বল্গাহীন উৎসাহের বশে উপস্থিত হয়েছে। তাই তাঁর গোঁড়া অনুরাগী ব্যতীত আজ অনেকেরই মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হচ্ছে: ফরাসী সাহিত্যের এককালীন উদ্গাতা আঁদ্রে জিদ্ কি কলাকৈবল্যের সাধনায় যথার্থই সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন? সাহিত্যের আসরে যে-সব মহাশিল্পী ধ্রুপদ শুনিয়ে দীর্ঘায়ু হয়েছেন, জিদ্ কি তাঁদের পাশে টিঁকে যেতে পারেন? কিন্তু না, বোধহয় পারেন না।...'but over this threshold of the masters Gide shall not pass. He may have been for many years the revered maitre, the one, and there is always one, allowed to wear a skull cap ; he may have written supremely well, as indeed he often did, and left behind him a very full and fascinating journal ; he may have behaved honourably and with courage about the Congo and about the Soviet Union and possibly, though uncertainty begins here, about the conflicting claims of a Protestant conscience and a taste for pederasty ; he may have had the mostly highly cultivated intelligence in France, in Europe, and unquestionably he made some curious and interesting experiments both in fiction and autobiography ; but he cannot possibly be considered a major creative writer, a European master of the novel'. কিন্তু আমরা জিদ্-এর কাছে এক বিশেষ কারণে ঋণী: তিনিই রবীন্দ্রনাথের ফরাসী 'গীতাঞ্জলি'র উদ্যমী অনুবাদক।

মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২) শুধু যে আধুনিক কথাসাহিত্যের এক মহাশিল্পী তা-ই নয়, তিনি স্বয়ং একটি ঐতিহ্য। যে ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস জীবনময়তার তীক্ষ্ণ ও অভিনব অভিজ্ঞতায় ব্যাপকতরভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রুস্ত তাঁর রচনায় একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, সেই জগৎকে চিনতে হলে ধৈর্য দরকার, দরকার সমানানুভূতিসম্পন্ন মন। তাঁর দীর্ঘ শব্দ প্রবাহের পথ পরিক্রমায় অস্থির হয়ে হাঁপিয়ে পড়লে প্রুস্তের লীলা রহস্য জানা যাবে না,—শান্ত চিত্তে এক পা এক পা করে তাঁর বর্ণনার সঙ্গে এগোতে হবে আর এই অগ্রসর মানে জীবনের পানে যাত্রা—অভিনব অভিজ্ঞতার বুক চিরে চিরে, ভেদ করে অন্তর্লোকে যাত্রা, যার শেষ লক্ষ্য শিল্পের সত্য। প্রুস্ত তাই অবিশ্যম্ভাবীরূপেই এ যুগের এক ঐতিহ্যপরায়ণ কথাশিল্পী এবং হয়ত শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। প্রুস্তের মা ছিলেন এক ইহুদী মহিলা এবং বাবা প্যারিসের এক সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। অভাব তাই প্রুস্তকে কোনদিন স্পর্শ করেনি, তিনি অবাধ স্বাধীনতায় অভিজাত সমাজে প্রবেশপত্র পেয়েছেন, শিক্ষিত বুর্জোয়া পরিমণ্ডলীতে অসংকোচে ওঠা-বসা করতে পেরেছেন। তারপর এক দিন দ্বিধাজড়িত চিত্তে রাসকিন অনুবাদ করে সাহিত্য-সাধনার গোড়াপত্তন করলেন প্রুস্ত। মা-র দেহান্ত হওয়ায় তিনি নতুন এক ফ্ল্যাটে চলে এলেন এবং সেখানকার নিস্তব্ধ-নির্জন শয়নঘরে বসে তাঁর মন, চিন্তা এবং তাঁর রোগ (ছেলেবেলা থেকে প্রুস্ত হাঁপানী রোগে ভুগছিলেন) প্রায় একই সংগে অদ্ভুত কৌশলে কাজ করে চলল! ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে প্রুস্তের শ্রেষ্ঠ রচনাকর্মগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং এই সময়টা তিনি ঘর ছেড়ে কোথাও বিশেষ বেরোন নি, একা, রোগশীর্ণ প্রুস্ত একা ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন আর ধীর চিত্তে নিজের জীবনের বহু-দর্শিত ঘটনাকে এবং মানুষকে আশ্চর্য শিল্পজ্ঞানে প্রতিফলিত করেছেন সাহিত্যে। তিনি সমসাময়িক ফরাসী সমাজের অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন। ১৮২০ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসের পটভূমি বিধৃত হয়েছে। প্রেমকে তাঁর হাতে নতুন শাসনে প্রতিফলিত হতে দেখেছি আমরা, তিনি বলেছেন প্রেম হচ্ছে কল্পনার এমন এক অহংসর্বস্বতা যা ভালবাসার পাত্র-পাত্রীর উপস্থিতিতে বেঁচে থাকে না, থাকে অনুপস্থিতিতে। এদিক থেকে তাঁর এই absence-তত্ত্ব স্তাঁদালের crystallization থেকে স্বতন্ত্র ব্যতিক্রম। প্রুস্ত সর্বসাকুল্যে বোধহয় পনেরোটি উপন্যাস রচনা করে যেতে পেরেছেন। তার মধ্যে 'আ লা রেশার্শ দ্যু তাঁ পের্দ্যু'র প্রথম

খণ্ডটিতে আছে 'দ্যু কোতে দ্য শে সোয়ান্—১৯১৩; আ লঁম্‌ব্র দে জ্যোন্ ফি আঁ ফ্লোর—১৯১৪; ল্য কোতে দ্য গ্যেরমাঁত—১৯২০'। ইংরাজীতে 'Remembrance of Things Past' নামে এই উপন্যাসের সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। স্মৃতি বা স্মরণকে প্রুস্ত নিজের সাহিত্যে বরণ করেছেন অসীম শ্রদ্ধায়, তাঁর কাছে স্মৃতির ছিন্ন তাঁরগুলিকে সংলগ্ন করার, স্মরণের রঙে জীবনের ছবি আঁকার অন্য মূল্য আছে; আছে স্বতন্ত্র তাৎপর্য। তিনি বলেছেন অতীতকে চেষ্টা করে, কষ্ট করে অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমে আয়ত্ত করতে হয় না; তা যেন হঠাৎ ভেসে আসা সুরভি—এক খণ্ড ঢেউয়ের মতো কিংবা একটি সুরের মতো, ছলাৎ করে আমাদের মনের তটে আছড়ে পড়ে, বেজে ওঠে। 'দ্যু কোতে দ্য শে সোয়ান'-এর শুরুতে আছে স্মৃতি-চিত্রের সেই সুন্দর বিবরণটি: চা'য়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে ছোট একটি কেক খাচ্ছে সোয়ান্ আর তার সংগে সংগে শৈশবের স্বাদ পাচ্ছে সে; কোঁম্ব্রেতে তার হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। অতীতকে পুনরুদ্ধার করার এরকম প্রয়াস আরও নজর করা যায় তাঁর রচনায়। পরের খণ্ডগুলিতে [সোদোম্ এ গোমোর (১৯২০-২২); লা প্রিজোনিয়ের (১৯২৪); আল্‌বের্তিন্ দিস্‌পারু (১৯২৫); ল্য তাঁ রত্র্যুভে (১৯২৮)]; প্রুস্ত যেন অপেক্ষাকৃত লিপিশৈথিল্যে দুর্বল হয়েছেন, এমন কথা বলে থাকেন তাঁর আলোচকরা। চরিত্রগুলির আচরণও যেন প্রথম গ্রন্থের মতো তত ধারাল নয়। তার উত্তরে প্রুস্ত নিজেই উচ্চারণ করেছেন, 'My characters in the second part of the book do quite the opposite of what they do in the first and of what could be expected of them!' 'আ লা রেশার্শ দ্যু তাঁ পের্দ্যু' ছাড়া প্রুস্ত কিছু গল্প ও স্কেচ রচনা করেছেন। 'লে প্লেজির্ এ লে জুর' (১৮৯৬); 'ক্রোনিক্' ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুর পর কাগজের স্তূপ ঘেঁটে একটি অসমাপ্ত রচনা 'জঁা সাঁত্যোই' আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৫২ সালে সেটি প্রকাশ পাবার পর প্রুস্তের আগ্রহী মহলে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কেননা রচনাটিতে লেখকের চিৎপ্রকর্ষতার এবং স্বকীয় শিল্পরীতির সুন্দর বিকাশ ঘটেছিল। প্রুস্ত তাঁর অসাধারণ চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতায় অন্তর্লোকের অসংকোচ অবগুণ্ঠন-মুক্তিতে স্বচ্ছ কৌতুক-ধারায় এবং অনন্য বিন্যাসে যে রূপসৃষ্টি করেছেন, তা একটি স্বয়ংকৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করেছে প্রুস্তকে। 'And when we add to this essential creative power the breadth and depth of Proust's mind,

adding to the long vista of memorable personages and scenes equally memorable, passages of subtle analysis and exquisite meditation on life and art, volume after volume of them, we have a great novelist, possibly the greatest our century has yet known.'

গাব্রিয়েল্‌ সিদোনি কোলেৎ (১৮৭৩-১৯৫৪) এমন বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যার দ্বারা তিনি হয়ত অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের যশকে নিঃস্ব করতে পারেন। মহিলার মধ্যে কোন মহৎ ভাবনার উদ্‌বোধ হয়নি, দেশে দেশে সম্প্রীতি সম্প্রচারের দায়িত্ব তাঁর ছিল না, কিন্তু জীবনকে তিনি কোমলে-কঠিনে, প্রেমে-কামনায় বজ্রমুঠিতে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের সীমিতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু অনাড়ম্বর মাধুর্যে, আত্যন্তিক আন্তরিকতায় এবং অদ্ভুত বস্তুনিষ্ঠ অনুভূতিতে তিনি প্রেম, প্রকৃতি, নর-নারীর মিলন, তাদের দৈহিক সম্পর্ককে যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে তাঁর সুস্পষ্ট প্রতিভার আপন-সৃষ্ট পরিমণ্ডলকে স্বীকৃতি না জানিয়ে উপায় থাকে না। ছোট্ট গ্রাম বার্গ্যাণ্ডিতে শৈশব কাটিয়েছিলেন কোলেৎ তাঁর মা-র সংগে —মা-র প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুরক্ত। 'লা স্যগদ্‌' (১৯২৯) উপন্যাসে সেই মা-র কথা তিনি লিখেছেন গভীর মমতায়। কোলেৎ-এর বিবাহিত জীবন শান্তির হয় নি; তাই স্বামীর (লেখক 'উইলি' নামে পরিচিত) কাছ থেকে তাঁকে একদা ছুটি নিতে হয়েছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর কোলেৎ জীবিকা নির্বাহের উদ্‌বেগে মিউজিক হল-এ কাজ নিয়েছিলেন কিছুকালের জন্য, তারপর ধীরে ধীরে সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন। গোড়ায় গোড়ায় নিজের অস্থির জীবনের অভিজ্ঞতা,—সুখের স্পর্শ, দুঃখের স্বাদ, শিহরণ তাঁর রচনায় ['লা ভাগাবোঁদ' (১৯১০); 'লা রেত্রেত্‌ স াঁতিমঁাতাল' (১৯০৭); 'লা মেজোঁ দ্য ক্লোদিন্‌' (১৯২৩)] বিশেষ আয়াসলব্ধ কৌশলে ও কৃতিত্বে প্রকাশ পেতে থাকে। লেখার অভিজ্ঞতা এই তাঁর প্রথম ছিল না, স্বামীর সংগে মিলিতভাবে লেখা 'ক্লোদিন্‌' রচনাগুলির (১৯০০—১৯০৮) আত্মপ্রকাশ ঘটে তার আগেই। কোলেৎকে আরো দু'বার বিবাহ করতে হয়েছিল। তৃতীয় স্বামীর ঐকান্তিকতায় এবং এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সেবায় কোলেৎ, প্রায় অথর্ব (পক্ষাঘাতে একদিক পড়ে গিয়েছিল) কোলেৎ অবিচলিত দৃঢ়তায় কলমের গতিকে থেমে যেতে দেন নি। নারী-

মনের বেদনা, ভালবাসার পূজায় দেহের আরতিতে নারীর চরম ও পরম পাওয়ার অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্ত (মিৎসু ; ১৯১৭) করেছেন সহৃদয় বিচক্ষণতায়। জীব-জন্তুও তাঁর রচনায় মুখ্য চরিত্র নিয়েছে। 'লা শাত্' (১৯৩৩) উপন্যাসে এক তরুণ দম্পতির মিলিত জীবনে একটি বিড়ালের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অপরাপর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'শেরি' (১৯২০) ও 'লা ফ্যাঁ দ্য শেরি' (১৯২৬) এক মধ্যবয়স্কা রমনীর সংগে একটি সন্ত্রস্ত, মেরুদণ্ডহীন তরুণের প্রণয় কাহিনী। 'জিজি' (১৯৪৪) সুকৌশল চরিত্রায়ণ এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের জন্য সমধিক প্রশস্তি পেয়ে থাকে। কোলেতের গদ্যরীতিতে এমন ধ্বনি ও ছন্দোময়তা ছিল, যা তাঁকে তৎকালের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচয়িতার সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়ংকর প্রকৃতি সাহিত্যে যতটা পরিস্ফুট হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি। তবু যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে লড়াইয়ের বাস্তবানুগ ছবি রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে আঁরি বারবুস্-এর (১৮৭৩-১৯২৫) 'ল্য ফ্যো' বা রোলাঁ দোর্জেলেস (১৮৮৬) রচিত 'লে ক্রোয়া দ্য বোয়া' উপন্যাস দু'টি শুধু যুদ্ধের কারণে উৎসর্জিত বলেই তবু কিছু আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যদিও এই শ্রেণীর অতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রেমার্ক রচিত 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' সে-তুলনায় অত্যন্ত উন্নত, অত্যন্ত প্রখর।

এই সময়েরই লেখক ছিলেন আলাঁ্যা-ফুর্নিয়ে (১২৮পৃঃ বর্ণিত)। রূপকথার মতো আবেশ ছড়িয়ে একটি উপন্যাস 'ল্য গ্রাঁ মোয়ুল্নে' (১৯১৩) লিখেছিলেন। কাহিনীর নায়িকাকে লেখক কুড়ি বছর বয়সে একবারমাত্র দেখেছিলেন, আর সেই একান্ত দর্শনের অনুভবে সুখস্মৃতির স্বপ্নের মতো এই কাহিনীর সূত্রপাত। উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। আলাঁ্যা-ফুর্নিয়ে 'বাস্তবতা', 'প্রতীকতা'র জগৎ থেকে অবসর নিয়ে অন্য এক জগতে বিশ্রাম চেয়েছিলেন, তাঁর নিজের কথায় 'এক নামহীন রাজ্য' তাঁকে বারংবার প্রলুব্ধ করেছে। ইভন দ্য গালে সেই নামহীন রাজ্যের নায়িকা, আর দুর্ভাগ্যপীড়িত মোন তার নায়ক—উভয়ের দেখা, আশাভংগ, মিলন এবং পরিশেষে মৃত্যু, এই দিয়ে উপন্যাসটির উপসংহার করা হয়েছে। সমস্ত রচনাটির পরিকল্পনা, বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে, এক বালকোচিত মনোবিকার ছাড়া আর কিছু নয়—এরকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু একমাত্র উপন্যাসটি লিখে ফুর্নিয়ে যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন, তারপর থেকে গ্রন্থটি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা

পেয়েছে, এমন কি ১৯৩০ সালে ফ্রান্সের একটি পত্র 'ল্য গ্রাঁ মোয়্ল্নে'-এর জন্য এক বিশেষ সংখ্যাই প্রকাশ করে ফেলে।

প্রুস্তের মৃত্যু হয়েছিল ১৯২২ সালে, তারপর থেকে ফরাসী কথাসাহিত্যে ১৯৩৯ সালের মধ্যেই নতুনতর জঙ্গমতা আসতে থাকে। অস্থির ও অশান্ত বিংশ শতাব্দীতে অন্ততঃ ছ' জন শক্তিশালী কথাশিল্পী নিজেদের ভিন্নমুখী চিন্তাকে উপন্যাস, গল্পে প্রযুক্ত করেন। স্যুর-রেয়ালিজম রচনার আধার, আধেয় ও কৌশলকে দুর্মদ প্রভাবে শাসন করতে থাকে; সর্বোপরি ছিলেন প্রুস্ত। তাঁর আবেদন এবং অবদান ব্যতিরেকে উত্তরসূরীদের কিছু করার শক্তি ছিল না। কিন্তু এবম্বিধ, বহুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও ফরাসী কথাসাহিত্য বিংশ শতাব্দীতে কাফকা অথবা জেমস জয়েস-এর মতো দুটি উপরিক নাম সৃষ্টি করতে পারে নি (...the French novel in an experimental decade produced no name comparable to Kafka or James Joyce—Geoffrey Brereton.)।

ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক (১৮৮৫-) নিজের জীবনে প্রুস্ত-এর দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু প্রুস্ত তাঁর সময়কালে যে পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছেন তাঁর রচনায়, মোরিয়াক চেষ্টা করেও অদ্যাবধি ততখানি বিস্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর রচনায় একটি জগতের মানচিত্র কিংবা সমগ্র মনুষ্যচিত্র নেই, ছোট হয়ে একটি সুন্দর যত্নার্জিত উদ্যানে সীমিত হয়েছে। যেখানকার মানুষ নিঃসঙ্গ নীতি ধর্মে সমাহিত। যেখানে তাঁর চরিত্ররা অশোভন আচরণ করলেও মোরিয়াক নিজের পরিমিত স্বভাববোধে সামলে নেন। জীবনের ঘৃণা, প্রেম, বস্তুময়তা ও আত্মিকতার দ্বন্দ্বকে তিনি বিশ্লেষণ করেন দেবতার মতো শান্ত প্রত্যয়ে। কাম সম্পর্কে তিনি বিশেষ কোলাহল করতে ভালবাসেন না। আত্মার সজাগ ও সস্নেহ দৃষ্টি দেহকে মৃদু ভৎর্সনায় দমিয়ে রাখে। যদিও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তাঁর বহু চরিত্রই বিস্ময়কর অন্তর্মুখীতায় এবং তীব্র প্যাসনের প্ররোচনায় অনেক ক্ষেত্রে সদাচারকে অটুট রাখতে পারে নি, বরং পাপের প্রতিই তারা যেন একটু বেশী আলুলায়িত ..'He has created a portrait gallery of sinners on a classical model...'। পাপ-পুণ্যের চেতনায়, বিবেকের দংশনেই তাঁর মনস্তত্ত্বের বিচক্ষণ বিকাশ ঘটে। ঈশ্বরের করুণাকণা মোরিয়াক চেষ্টা করলেই পেতে পারেন আর প্রেম, তা সে পাপসিদ্ধ

অথবা অপাপবিদ্ধ যাই হোক না কেন, শেষকালে বিয়োগ-ব্যথায় ভারী হয়ে ওঠে। 'ল্যনেন্যো স্থ ভিপ্যার' (১৯৩২) তেমনি এক বেদনাবিধুর মর্মান্তিক কাহিনী। ইজার প্রেমের শাস্তিতে যে উদ্ধত যুবক ধীরে ধীরে সন্ত্রাস্ত হলো, হঠাৎ সে যে-দিন জানতে পারে যে ইজার সংগে আরেক যুবকের বিবাহ স্থির হয়েছিল, তখনই তার অন্তরে বিদ্বেষ-বিষ প্রবল হয়ে ওঠে, প্রেমের বিশ্বাসে ফাটল ধরে। তার মনে পড়ে সেই প্রথম চুম্বনের রাতে ইজার অকস্মাৎ-বিলাপের অদ্ভুত আচরণ! প্রতিহিংসার আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে যুবক স্বামীটির মনে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইজার ইহলীলা সংবরণে এবং স্বামীর মনস্তাপে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই রচনাটি সম্পর্কে বিশেষ অভিমত জারি করে বলেন যে,…'অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর শিল্পসম্পদের মতো এ গল্পের বাহুল্য একেবারে নেই—এর রূপান্তর তো অভাবনীয় বটেই এমন কি ভাষান্তরও বোধ হয় অসাধ্য। তাছাড়া বইখানি ঘটনাভূয়িষ্ঠ নয় ; নিটোল নিবিড় গীতিকবিতার মতো আবেগ-প্রধান'। 'তেরেস্ দেকেরু' (১৯২৭) উপন্যাসে একটি মেয়ের নিঃসঙ্গতার বেদনাবদ্ধ অবস্থা আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে। বিবাহিত জীবনে তার শূণ্যতা, তার একাকীত্বের বোধ এত প্রবলভাবে তাকে পীড়িত করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত স্বামীর মুখে বিষ তুলে দেবার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত হয়নি সে। 'স্য কি এতে পেড্যু' (১৯৩০) ও 'লা ফঁ্যা দ্য লা নুই' (১৯৩৫) গ্রন্থে সেই চরিত্রেরই পুনরাবির্ভাব ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মোরিয়াকের অন্যান্য প্রশংসাযোগ্য রচনা হচ্ছে : 'ল্য ব্যাজে ও লেপ্রো' (১৯২২) ; এবং 'জেনিত্রিস' (১৯২৩)। আর এই উপন্যাসটিই বোধহয় মোরিয়াকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন। কলারীতিতে বিয়োগ-বেদনার গভীরতায় কিংবা নীতির সুষ্ঠু সম্প্রসারে, তিনটি চরিত্রের সম্পর্কসূত্র স্থাপনের অমোঘ কৌতূহলে উপন্যাসটি সজীব ও স্পর্শাতুর। রচনাটির প্রথম পংক্তিতেই নাটকের মধ্যবর্তী অবস্থার আভাস দেওয়ার এমন দৃষ্টান্ত অন্য কোন উপন্যাসে আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে : Elle dort—She is sleeping. Elle fait semblant, viens—She is pretending, come. মাথিলদে আধবোজা চোখে দেওয়ালের বড় বড় ছায়ায় দেখল তার স্বামী ও শাশুড়ি ফিসফিস করে কথা বলছে। গোঁড়া ক্যাথলিক আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ ছায়ায় প্রতিপালিত মোরিয়াক সাহিত্য সাধনাকে দেবতালাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচনা করতেন। নাটকীয় পরাকাষ্ঠাকে সুস্থিত রেখে, (তিনি নিজে বলেছেন, 'I am a dramatic

author who has written novels') মনস্তত্ত্বের সংকটকে ব্যক্তীকৃত করে সকৌশল গল্প বলার ক্ষমতাও আয়ত্ত করেছেন তিনি। তাঁর বর্ণনার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিবিধি অধিকমাত্রায় আগ্রহ জন্মায় তাঁর সম্বন্ধে। ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক নিঃসন্দেহে এই বিংশ শতাব্দীর এক উচ্চ শিল্প-প্রতিভা তবে কত উচ্চ, প্রুস্তের পরে আধুনিক ফ্রান্সের মন্ত্রদাতার উচ্চতা তিনি পেয়েছেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর উগ্র সমর্থকদের সঙ্গে বাদানুবাদ করার প্রয়োজন দেখি না।

যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে কয়েকজন কথাশিল্পী রোমাঁ ফ্লোভ্-এর প্রচলন করলেন উপন্যাসে। রজে মার্তঁ্যা দ্যুগার (১৮৮১-১৯৫৮); জ্যুল্ রোমঁ্যা (১৮৮৫—) এবং জোর্জ দ্যুআমেল্ (১৮৮৪—) তাঁদের অন্যতম। রজে মার্তঁ্যা ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানে ও সুচিন্তিত পরিশ্রমে একাদশ (?) খণ্ডের একটি বৃহৎ ও তাঁর মহৎ উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'লে তিবো' একটি ফরাসী বুর্জোয়া পরিবারকে সামনে প্রসারিত রেখে যুগচিত্র আঁকার সার্থক প্রচেষ্টা। তিবো পরিবারের (গল্সওয়ার্দির ফরসাইট পরিবারের চেয়ে ক্ষীণ হলেও অনেক মিল আছে) দুটি ছেলের (আঁতোয়ান ও জাক) একজন ডাক্তার অপরজন সংগ্রামশীল বুদ্ধিবাদী। তারা বোঝে যে নিজেদের আন্তর-বৈষম্যে আজ সবাই এমন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে যে সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ক্লাস, শ্রেণী আর ধোপে টিঁকছেনা কিন্তু শ্রেণী বহির্ভূত সমাজকেও প্রতিষ্ঠিত করার উদারতা তাদের আছে, কেননা, তাদের আশা ও আগ্রহ মানুষের আরো বৃহত্তর মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠ করা। এল যুদ্ধ। তার তাণ্ডব হু-হু শব্দে জীবনের সব লণ্ডভণ্ড করে বয়ে গেল। আর ধ্বংসের উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে লেখক প্রত্যক্ষ করালেন দুই ভাইয়ের অপমৃত্যু হয়েছে—তাদের পুরাতন নীতি ও বিশ্বাসের শেষ নিঃশ্বাস ঘটেছে। দ্যুগার গোড়ার দিকে আরো একটি উপন্যাস 'জঁা বারোয়া' (১৯১৩) লিখেছিলেন। তাতে দ্রেফুর ব্যাপারে বুদ্ধিবাদী, তরুণ সমাজের ঔৎসুক্য ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শিত হয়েছিল। সর্বক্ষেত্রে নিখুঁত ও তথ্যশীল হবার দুর্বার বাসনা লেখককে জীবনের দ্রষ্টব্যতাকে সোজাসুজি দেখার ক্ষমতা দিয়েছিল।

জোর্জ দ্যুআমেল (১৮৮৪—) এবং জ্যুল্ রোমঁ্যা (১৮৮৫—) ছিলেন unanimist নীতিভুক্ত সদস্য। অনেকটা জোলার সিদ্ধি থেকে আহৃত

সাহিত্যদর্শন—জনতার মাঝে মানবতাকে বিতীর্ণ করার নীতির পরিপোষক। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণের মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করতে সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে একীকরণের ভাব ও ধারণাকে ত্বরান্বিত করা এবং তার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে সমবেতভাবে সামগ্রিক অর্থে বাঁচার সার্থকতায় জনতাকে আগ্রহী করা। সেনাদলের সার্জন জোর্জ দ্যুআমেল দু'টি বিপুলাকার গ্রন্থে মানুষের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন তাঁর সংবেদনশীল মন নিয়ে। পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ প্রথম উপন্যাস 'ভি এ অভাঁত্যুর দ্য সালাভ্যাঁ' (১৯২০-৩২) একটি স্ববেদী যুবকের অসুখী ও হতাশ জীবনের কাহিনী। দ্বিতীয় উপন্যাস 'লা ক্রোনিক্ দে পাসকিয়ে' (১৯৩৩-৪৫) শেষ হয়েছে দশ খণ্ডে। প্রায় একশ' বছরের পরিধিতে বিস্তৃত এই বৃহৎ রচনা-কর্মটিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের (দ্যুআমেল-এর নিজ পরিবারই বোধ হয়) ছবি পরিস্ফুট হয়েছে।

জ্যুল রোমাঁ্যা তাঁর লেখায় unanimist মন্ত্রের প্রচার করেছেন আরও উচ্চৈঃস্বরে। তাঁর সময়ের পরিধি আরো বিস্তৃত এবং পশ্চাৎপট আরো ব্যাপক। ৬ই অক্টোবর ১৯০৮ থেকে ৭ই অক্টোবর ১৯৩৩ পর্যন্ত ফরাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক অবস্থাকে তিনি বিশদ ভাবে প্রতিফলিত করেছেন 'লেজ্ ওম্ দ্য বন্ ভলোঁতে' (১৯৩২-১৯৪৭) নামক উপন্যাসে। পঁচিশ বছর ধরে লেখা সাতাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বিশাল রচনাকর্মটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সমস্ত কাহিনীটি একটি মাত্র নায়ক কিংবা একটিমাত্র পরিবারের দ্বারা সমন্বয়িত নয়। বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন মতের বৈপরীত্যেও যোগসূত্রতা আবিষ্কৃত হয়েছে এ উপন্যাসে এবং মানুষের প্রেম ভালবাসা ও শুভ মানসিক বুদ্ধির প্রতিও আস্থাস্থাপন করা হয়েছে। উপন্যাসটি সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত না হলেও উল্লেখযোগ্য রচনা। অন্তত আঙ্গিকের দিক থেকে এই রচনাপদ্ধতি সহজে বিস্মৃত হবার নয়।

জগতের সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর কাছে আঁদ্রে মোরোয়া-র (১৮৮৫—) পরিচয় জীবনীকাররূপেই নিষুপ্ত হয়ে থাকা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তিনি অন্তত লিটন স্ট্রেচির মতো অতীত জীবনে ও ঐতিহ্যে রোমান্টিকতায় চংক্রমিত হয়েছেন, শুধু এইটুকু বলে দায়িত্ব এড়ান গেলেও সত্য কথা বলা হয় না। মানুষের প্রতিটি কার্যকলাপের আড়ালে তার কি প্রকৃতি প্রোদ্ভিন্ন হয়েছে এই রহস্য

আবিষ্কারের নেশায় মোরোয়া একদিন জীবন-বৃত্তান্ত লেখায় প্রোৎসাহিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাই বলে তাঁর ঔপন্যাসিক-ক্ষমতাকে হ্রস্ব করা মুস্কিল। তবু মোরোয়া 'এ-কালের আধি-ব্যাধির সংক্রমণ একেবারে এড়াতে পারেন নি'। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রাক্কলনে 'তথাপি নিছক ধ্বংসোন্মাদনায় মোরোয়া সমসাময়িকদের সমকক্ষ নন; এবং তার কারণ হয়তো এই যে আজকে স্বজাতির ঐতিহ্য লুপ্তপ্রায় বলে তিনি ঐতিহ্যশূন্যতার সমূহ বিপদ অন্তরে অন্তরে বুঝেছেন; কিংবা বিশ্বব্যাপী প্রলয়কে আলোকিত করতে চাইলে যে-পরিমাণ আতসবাজি দরকার, তা তাঁর ঘরে নেই। কিন্তু কারণ যাই হোক্‌, অন্ততঃ উপন্যাস রচনায় মোরোয়া বরাবরই ফরাসীদের মহান আদর্শের অনুগত। অবশ্য এত দিন ধরে তিনি যত বই ছাপিয়েছেন, তাতে উক্ত আদর্শের অস্তিত্ব শুধু অভাবের দ্বারাই বিজ্ঞাপিত কিন্তু 'ল সের্ক্ দ ফামি' পড়লে আমরা মানতে বাধ্য যে সত্যই সবুরে মেওয়া ফলে। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর বই মোরোয়া নিজে তো পূর্বে লেখেন নি বটেই, এমনকি অপরেও সম্প্রতি লিখেছেন কিনা সন্দেহ।' মোরোয়ার 'ল্যা সের্ক্ দ্য ফামি'-র (১৯৩২) পূর্বতন রচনাগুলি হলো 'লে সিলঁাস্ দ্যু কোলোনেল ব্রাম্ব্‌ল্' (১৯১৮) এবং 'লে দিসকুর দ্যু দক্ত্যোর ও গ্রাদি' (১৯২২)। এইসব গ্রন্থের চরিত্রগুলি লেখক জীবনের বাস্তবতা থেকে আহরণ করেছেন বলে কথিত। শেলী, প্রুস্ত, জর্জ সঁা ও ভিক্তর উগোর জীবনন্যাস মোরোয়ার রচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোরোয়ার রচনাবলী তাঁর স্বদেশ অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকতর সমাদৃত।

পল মোরঁা (১৮৮৮—) সম্পর্কে 'স্বগত' গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঘোষণা হচ্ছে, 'সুর রেয়ালিসৎ-নামক নব সম্প্রদায়ের পুরোধা ছিলেন পল্ মোরঁা; এবং তাঁর 'উভের লা নুই' ও 'ফের্মে লা নুই' উপাধিধারী দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প পুস্তক-দুটি প্রসাদগুণের পরাকাষ্ঠা না দেখালেও ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। সে কাহিনীগুলির অভূতপূর্বতার সঠিক সমাচার দেওয়া শক্ত; কারণ সে-অসামান্যতা কোনও মুদ্রাদোষ থেকে উদ্ভূত নয়, কেবল পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলার প্রতিভাস। অবশ্য সেই প্রতিবিম্বপ্রকরণে কতকটা স্বকীয়তা ছিল; কিন্তু মোটের ওপর তাও সিনেমা চিত্রপদ্ধতির অনুগামী। অর্থাৎ মোরার চরিত্রচিত্রণে সুসঙ্গতির কোনও বালাই থাকত না, উপাখ্যান রচিত হত গোটা কয়েক বিশ্লিষ্ট ঘটনার পরম্পরায়। গল্পগুলির অন্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভাষাগত;

সে ভাষা অনেকটা আধুনিক বাঙালী লেখকদের রচনারীতির মতো—স্বদেশী ব্যাকরণের প্রকৃতি-বিরোধী এবং ইংরাজী শব্দকোষের অধমর্ণ।' অতঃপর মোর্ঁার দৃষ্টি-পরিবর্তন ও দিক্-বিক্রুতি ঘটেছে, তিনি নিজের প্রারম্ভিক ধারা ও ধারণাকে বরতরফ করে বহুবিধ রচনায় (গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত) আপনাকে বিস্তৃত করেছেন কিন্তু অপরাহ্নকালীন এই রচনাগুলিতে (প্রধানত 'একাং এসে শিয়ঁা' ; ১৯৫৪ উপন্যাসে) তিনি তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেন নি উপরন্তু তাঁর সযত্ন-সঞ্চিত সম্মানে সেগুলি যেন মর্যাদাহীনতায় ভিয়মান…'have not added much to his prestige as a Novelist'. 'কিন্তু 'ল্য বুদা ভিভঁা'র মতো এক আধখানা রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রাথমিক প্রসিদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি'। প্রারম্ভে তাঁর রচনায় যে ঔজ্জ্বল্যকে উপলব্ধির উদ্দীপ্তি বলে মনে হত, ক্রমে অভ্যাসদোষে তাকে ঝুটো জহরতের চাকচিক্যের মতো লাগল ; তাঁর নিরাসক্ত সমালোচনাশক্তি বহু ব্যবহারে হঠকারিতায় গিয়ে ঠেকল ; অতি পরিচয়ের ফলে কূপমণ্ডুকের লক্ষণ দেখা দিলে সেই বিশ্বব্যাপ্ত মনে। এই অবস্থায় হঠাৎ এক দিন তাঁর 'ফ্লেশ দোরিয়ঁা' বেরোল ; এবং চমৎকৃত পাঠক উৎফুল্ল চিত্তে আবার স্বীকার করলে যে মোর্ঁার আর যাই অধঃপতন ঘটুক না কেন, পশ্চিমের দিঙ্ নিরূপকদের মধ্যে তিনি এখনও অগ্রগণ্য।' মোর্ঁাকে অনেক বিদেশী সমালোচক আধুনিক মেরিমে বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন কিন্তু এই বিবেচনা উভয়ের পক্ষেই কতটা সম্মানজনক তা ভাববার বিষয়।

লুই ফেদির্নঁা সেলিন্ (১৮৯৪—) যুদ্ধের সময় যদিও নাজীদের সমর্থন করে অত্যন্ত লজ্জাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু তাঁর দুর্মদ শক্তির ভয়ংকর রচনা 'ভোয়ায়াজ ও বু দ্য লা নুই' (১৯৩২) তৎকালীন ফ্রান্সে প্রবল উত্তেজনা ও প্রচণ্ড সোরগোল উপস্থিত করেছিল। মানুষের প্রতি আস্থাহীনতা এবং নির্মম বিধ্বংসী মনোভাব বইটির স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে একমাত্র বৈশিষ্ট্য। তাঁর অপরাপর উপন্যাস—'মর্ আ ক্রেদি' (১৯৩৬), 'ফ্যেরি পুর উ্যন ওত্র্ ফোয়া'তেও (১৯৫২) এই একই স্বর পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

ঐতিহ্যবাদী ক্যাথলিকের বজ্রনির্ঘোষের মতো আঁরি দ্য মঁতের্লা(১৮৯৬—) এর রচনায় প্রচণ্ড সংবেদ্যতা পরিবৃত হয়ে আছে। সাহিত্যে তিনি প্রেমের পেলবতা আদপেই পছন্দ করতেন না। তাঁর পৌরুষদীপ্ত উপরিকতা রমনীদের

এক নিকৃষ্ট জীব ব্যতীত আর কিছু ভাবতে শেখায় নি। তিনি কলেজী বিদ্যা শেষ করেই সোজা ১৯১৪ সালের যুদ্ধে গিয়ে ঢুকেছিলেন। খেলাধুলায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল, এমন কি ষাঁড়ের লড়াইয়ে পর্যন্ত তিনি অভিজ্ঞ হতে পেরে-ছিলেন। ফরাসী কথাসাহিত্যে এতাবৎকাল মনস্তত্ত্বের যে চর্বিত-চর্বণ হচ্ছিল তাতে পাঠককুলে কিছু কিছু রুষ্টতার গুঞ্জন ধ্বনিত হয়েছিল। মঁতেরলা সেই অশুভক্ষণে অবক্ষয়িক চিন্তাবিলাসকে সরিয়ে সজীবতার পৌরুষাদর্শ প্রচার করলেন। তিনি নাট্যরচনায়ও উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু তা আমাদের এলাকাভুক্ত বিষয় নয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হলো 'লা রলেভ্ দ্যু মাতাঁ' (১৯২০); 'লেজ্ অলাঁপিক্' (১৯২৪); 'লে বেস্তিয়ের' (১৯২৬) এবং 'লে জ্যোন্ ফি' (১৯৩৬-৩৯)।

আঁদ্রে মালরো (১৯০১—) এই শতাব্দীর বিশ্ব কথাসাহিত্যে এক হীরক-প্রভাপ্রদীপ্ত প্রতিভা। তিনিও নিজের সাহিত্যে প্রেমকে উপজীব্য করে বেঁচে থাকেন নি; উচ্চণ্ড কর্মমুখরতায় জীবনের জটিল গ্রন্থিমোচন করেছেন। সমসাময়িক ফরাসী কথাসাহিত্যে তখন অস্থিরতার অনিশ্চিত দিন-বদল চলেছে। ১৯৩০ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন এবং যুদ্ধের ধমক সগর্জনে বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আর সেই প্রতিবেশে সাহিত্যেও সূচিত হয়েছে সংকটময়, বিচলিত অবস্থা। দৃঢ়চেতা মালরো প্রাতিস্বিক মনোক্রিয়তায় এবং স্বতন্ত্র জীবনদর্শনে প্রেমের বিশ্লেষণকে অপনীত করে উপন্যাসকে কর্মমোক্ষতায় সচল করলেন। সহজাত শিল্পবোধের সংগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সুবেদী মনের কাব্যিক প্রকাশ তাঁর রচনাকে এমন এক বৈশিষ্ট্য দান করেছে যা আলোচ্যকালের কোন সাংবাদিকপ্রবণ ফরাসী কথাশিল্পীর পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। মালরো'র ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল। মিলিট্যাণ্ট কম্যুনিস্ট হিসাবে তিনি ১৯২৬ সালের চীনা বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েন, স্প্যানিস গৃহযুদ্ধও তাঁর দেখা এবং ফরাসী প্রতিরোধক আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকে কিন্তু তিনি আর কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখেন না; দ্য গলের দলে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৪০ সালে তাঁকে কয়েদ করাও হয় কিন্তু তিনি পলাতক হয়েছিলেন। মালরো কোনদিনই গোঁড়ামির দ্বারা এবং অন্ধ স্তাবকতায় কম্যুনিস্ট পার্টির সেবা করেন নি; শিল্পীর সত্যাসত্যকে তিনি সর্বতোভাবে স্বমর্যাদায় উচ্চাশ্রয়ে রেখেছেন (…'Malraux was never an

orthodox Communist, blindly following party line'—Geoffrey Brereton)। বহু-ব্যস্ত জীবনের বহুবিধ বৈচিত্র্যে নিমজ্জিত হওয়ার এই যে অভিজ্ঞতা, একেই তিনি কার্যকরী করে তুলেছিলেন উপন্যাসে। তাঁর প্রথম রচনার (লা তাঁতাসিওঁ দ্য লক্সিদাঁ; ১৯২৬) চিন্তা ও পটভূমি দূর প্রাচ্যে বিধৃত। সেই সময়ের এক দ্যুতিময় উপন্যাস 'লে কঁকের়া' (১৯২৮) চীনা বিপ্লবকে কেন্দ্র করে রচিত এবং একটি বুদ্ধিবাদী চরিত্রের যুগপৎ প্রাতিস্বিক ও সামবায়িক দ্বন্দ্বের সংকটে বর্ণিত। 'লা কঁদিসিওঁ য়্যুম্যান্' (১৯৩৩) মালরোর অসাধারণ লিপিচাতুর্যের নিদর্শন। বইটিতে চিয়াংকাইশেকের পতনকালে সাংহাইয়ের সীমানায় ক্যিও নামক নায়কের গভীর আত্মোপলব্ধির মানবিক গুণসম্পন্ন ঘটনাবস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। স্পেনীয় যুদ্ধের ওপর সংস্থাপিত 'লেস্‌পোয়ার' (১৯৩৭) এক মহৎ উপন্যাস এবং হয়ত মালরোর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই হবে। রাজনীতি-সচেতন এই সব রচনার পাত্ররা শুধুমাত্র জীবনসত্যেই উন্মীলিত হয়নি; পারিপার্শ্বিকতার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিশদ ব্যাখ্যায় প্রচিত করেছে। আর, মালরো মৃত্যুর নিবেদনে (নিও-রোমান্টিকদের তত্ত্ব 'মাল্ দ্যু সিয়েক্ল') অধিকতর স্বস্তি পেয়েছেন, তাঁর অধিকাংশ চরিত্রই প্রণাশে আস্থাস্থাপক। বাঁচতে বড় আসে না তারা, প্রচণ্ড উদ্‌বেগে জীবনের কাজ চটপট সেরে ফেলে মৃত্যু-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে তারা অঙ্গ জুড়োতে চায়। আঁদ্রে মালরো সন্দেহাতীতভাবে যুগন্ধর কথাশিল্পী—তাঁর প্রতি সুবিচার করতে গেলে তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত জীবনদর্শনকে বোঝবার মানসিক উপযোগ্যতা পেতে হবে। 'His personal vision, created world, myth are not unlike Hemingway's, but though his range is narrower, at least in the three novels he published between 1928 and 1937, his depth of penetration into the confused, contemporary scene is more inpressive'. কিন্তু এইটুকু বললেই বোধহয় মালরো সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না; সত্যের অপলাপই হয় বরং।

•

ফরাসী বৈমানিক আঁতোয়ান দ্য স্যাঁৎ এক্স্যুপেরি (১৯০০-৪৪) প্রধানত নিজের বায়বীয় অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে স্থানান্তরিত করে ফরাসী কথাসাহিত্যে টিঁকে গিয়েছিলেন। একবার বিমান অভিযাত্রায় বেরিয়ে তাঁর আর ফিরে আসা হয়নি। কোন মহৎ মনোভাবনাকে আপন রচনা-সংলগ্ন করতে না পারলেও

তিনি স্বচ্ছ কল্পনা-কৌলিন্যে, সংযত প্রক্ষোভে এবং শিল্পসুষমায় আকাশের সুদূর সৌন্দর্যকে নিকটবর্তী করেছেন। তাঁর প্রথম রচনা 'কুরিয়ে স্যুদ' (১৯২৯)। আর কোন গ্রন্থকে (পিলো দ্য গের্ ; ১৯৪১ ইত্যাদি) সঠিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা অবিবেচকের কাজ হবে বোধহয়। এগুলি সবই এক্স্যুপেরির নভোমণ্ডলের দর্শন, ভূগোল এবং মনস্তত্ত্ব। তাঁর 'তের্ দেজ্ ওম্' (১৯৩৯) তাঁর উপন্যাসাবলীর মধ্যে জটিলতম হলেও লেখক একে লিরিকের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছেন।

জঁা ককতোর (১৮৯২—) বর্তমান প্রসিদ্ধি প্রধানত চলচ্চিত্রাশ্রয়ী হলেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে এড়িয়ে চলা যায় না। ককৃতো কবিতায় স্যুর রেয়া-লিজম-এর অনুসারী কিন্তু উপন্যাসে আশ্চর্য ভাবে পলায়ন-প্রবৃত্তি তাঁকে কেবল এক স্বপ্নময়, কল্পজগতের উদ্ভাবকরূপে পরিচিত করে রেখেছে—'ল্য পোতোমাক্' (১৯১৯) কিংবা 'লেজ আঁফাঁ অরিবল' (১৯২৯) পাঠে সেই ধারণা ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় না। ককৃতো একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সমালোচক এবং চলচ্চিত্রকার।

জঁা জিয়োনো (১৮৯৬) অনেকটা রুশোর রচনাদর্শে, আধুনিক নগর সভ্যতার বাষ্পাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা থেকে গ্রামে প্রকৃতির ঘনসান্নিধ্যে কৃষকদের কাছাকাছি ডাক পাঠিয়েছেন মানুষকে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগরে'র প্রতিধ্বনির মতোই শোনায় সে ডাক। কিন্তু গল্প-কৌশলের অভাব এবং বক্তব্যবস্তুর ছন্নছাড়া ভাব তাঁর ধ্রুপদী ভঙ্গী সত্ত্বেও তাঁকে নেহাৎই সাধারণ লেখকের অবস্থায় আবদ্ধ রেখেছে। জিয়োনো-র শ্রেষ্ঠ রচনাকর্মের হদিশ আছে 'ত্রিলোজি দ্য পাঁ' নামক পুস্তকে।

রেম রাদিগে (১৯০৩-২৩) মাত্র সতের বছর বয়সে একটি পরিণত চিন্তার উপন্যাস কি করে লিখেছেন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। উপন্যাস লেখার আগে রাদিগে কবিতা লিখতেন। টুক্‌রো কাগজে লিখে দুমড়ে-মুচড়ে রাখতেন পকেটে। জঁা ককতো এই তরুণ বন্ধুটির সাহিত্যক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই প্রথম চিনলেন তাঁকে। যদিও তাঁর ক্ষমতার হিসাব ফরাসী পাঠক-সমালোচকদের কাছ থেকে হারিয়ে যায় নি, কিন্তু তাঁরই মতো অপ্রাপ্তবয়স্ক এক লেখিকা ফ্রাঁসোয়াজ

সাগাঁ একখানি মাত্র বইয়ে যেভাবে সারা জগতের চোখ তাঁর দিকে ফেরাতে পেরেছেন এবং যে-পরিমাণ অর্থময় সৌভাগ্য তাঁর ওপর বর্ষিত হয়েছে, তার সিকির সিকিও রাদিগে পেলে বর্তে যেতেন। অথচ, একথা না বলে থাকতে পারা যায় কী করে যে, সাগাঁর তুলনায় রাদিগের প্রতিভা আরো বিচিত্রপথে পরিভ্রমণ করেছে! 'ল্য দিয়াবল ও ক্যোর্' উপন্যাসে রাদিগে অত্যন্ত সুবেদী মনে একটি কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ ও তদপেক্ষা বেশি বয়সের এক বিবাহিতা রমণীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। পিছনে ছিল মহাযুদ্ধ। যে-যুদ্ধ সম্পর্কে তরুণটির নিজেরই স্বীকারোক্তি: এক চার বছরের দীর্ঘ অবসর। মার্ত-এর (নায়িকা) স্বামী যুদ্ধে চলে যাবার পর থেকেই ছেলেটি সেই দীর্ঘ ছুটিকে প্রেমের কাজে লাগায় আরাম করে। শেষে অবৈধ প্রণয়ের ফলস্বরূপ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মার্ত যায় মারা এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী অবস্থায় উপন্যাসটির যবনিকাপাত ঘটে। গল্পের পরিকল্পনায় রাদিগের কোন আহামরি কৃতিত্ব হয়ত ছিল না কিন্তু আবেগ বা প্রক্ষোভকে বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের সংগে সমান ওজনে মিশিয়ে তীক্ষ্ণ অথচ সংযত ভাষায় এমন নিছক বর্ণোজ্জ্বল বর্ণনা ছিল যা পাঠক বা সমালোচক কারো পক্ষেই অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব ছিল না। রাদিগে অত্যন্ত অল্প বয়সে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ল্য বাল্ দ্যু কোঁৎ ওর্জেল' প্রকাশিত হয় রাদিগের মৃত্যুর পর। সমালোচকরা এ উপন্যাসটিকে অবশ্য এক কথায় 'a modern version of the theme of 'La Princesse de clèves' বলে সেরে দিয়েছেন। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, রাদিগে এবার আগে থেকেই নিজের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে, তাঁর রচনায় অশ্লীলতা ও অশুচিতার অভিযোগকে তিনি খণ্ডন করে 'রোমাঁ দামুর শান্ত' জাতীয় উপন্যাস লিখবেন। তাই এসব দিকে নজর রাখতে গিয়ে আসল প্রাণবস্তুতেই যে বেহিসেব হয়ে গেছে তার আর খেয়াল ছিল না। তবু এই সময়ে ফরাসী সাহিত্যে রাদিগে-কে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এবং এমন কথাও বলা হয়েছে—'Stendhal sees more than he feels, but he remains in the tradition of the French moralists, of Mme de La Fayette, of Choderlos de Laclos, and in the category of French artists, where we would place Radiguet, who give primacy to the senses and the reason of man—' Fowlie.

শেষ যুদ্ধের সময় থেকেই মানুষের বিশ্বাসে ফাটল ধরছিল, ঐতিহ্যের

মূল্যবোধকে আঁকড়ে অস্তিত্বকে আর টিঁকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় যাঁরা প্রাতিস্বিক চিন্তায় জীবনকে নতুন চেতনায় জাগ্রত করতে চাইলেন একজিসটেন্সিয়ালিজম বা অস্তিত্ববাদ জন্ম নিল তাঁদেরই মধ্যে। কিন্তু এই নতুন মন্ত্র বেশি করে বেজেছিল তিন জনের প্রাণে,—ফ্রান্সের সার্ত্র, জার্মানীর হাইডেগগার আর ইয়াসপারস্। (যদিও সার্ত্রই এই নীতির প্রবর্ধক, প্রতিপালক ও অধিনায়ক বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন) দস্তয়ভস্কি, নীৎসে, রিল্‌কে, কাফকা ও কাম্যুকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, কারণ তাঁদের মধ্যে আছে উদগ্র প্রাতিস্বিকতা। অস্তিত্ববাদ বস্তুটি কি? 'Existentialism is not a philosophy but a label for several widely different revolts against traditional philosophy...The refusal to belong to any school of thought, the repudiation of the adequacy of systems and a marked dissatisfaction with traditional philosophy as superficial, academic and remote from life—that is the heart of existentialism'.

জাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫—) সেই অস্তিত্বতত্ত্বকে নিজের তথ্যে অপরাপর অস্তিত্ববাদীদের অপেক্ষা স্বতন্ত্রচিহ্নিত করেছেন জগজ্জনের কাছে। তিনি বলেছেন, মানুষের সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে তার সম্পূর্ণতায়। আর, এই সম্পূর্ণতা আয়ত্তাধীন হয় মৃত্যু পর্যন্ত এগিয়ে। এই শিক্ষাটুকু তাঁর হাইডেগগার-এর কাছ থেকে লাভ করা। সার্ত্র-এর নিজের জবানীতে: 'there are two kinds of existentialists. There are, on the one hand, the Christians, amongst whom I shall name Jaspers and Gabriel Marcel both professed catholics; and on the other existential atheists, amongst whom we must place Heidegger as well as the French existentialists and myself. What they have in common is simply the fact that they believe that existence comes before essence—' কিন্তু সার্ত্র আবার নিরীশ্বরিক অস্তিত্ববাদের পরিপোষক, আর তা তাঁকে অন্যদের চেয়ে তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, দিয়েছে বৈশিষ্ট্য। দস্তয়ভস্কি এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'If God did not exist everything would be permitted'—সার্ত্র বলছেন অস্তিত্ববাদের

আসল যাত্রারম্ভ সেখান থেকেই। তবে ইদানীং অস্তিত্ববাদ নিয়ে নানা মতভেদ, নানা ভুল বুঝাবুঝির পালা চলেছে। চলেছে নানা অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ। সার্ত্র-এর এই নবার্জিত তত্ত্বটির সুষ্ঠু প্রয়োগ ও শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে 'দি ওঅল' নামক ছোট গল্পটিতে (ল্য ম্যুর; ১৯৩৯ গ্রন্থের পাঁচটি গল্পের একটি)। 'Probably, the short story 'The Wall' is the best introduction to the heart of Sartre's thought. Even, as despite its ending it is above comparison with O' Henry; it is also, despite its style, far richer than the short stories of Hemingway'. সার্ত্র—অভিজ্ঞ দর্শন শিক্ষক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, মনস্তাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক সার্ত্র নিজের সজ্ঞান-বিশ্বাসকে বিশেষায়িত করে তাঁর প্রায় সব রচনায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রথম উপন্যাস 'লা নোসেয়'তে (১৯৩৮) নায়কের হঠাৎ বমনোদ্রেক হওয়ায় তার সামনে থেকে বাইরের বৃহত্তর পৃথিবীর অস্তিত্ব মুছে গেল। তার এই অভিজ্ঞতা জন্মাল যে, বহির্জগতের সচেতন অনুভূতি আসলে অর্থহীন এবং বর্ণহীন যদি মনের অবস্থা ঠিক ঠিক মতো কাজ না করে। জগতের সব ভাল মন্দ, মনের অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিবেশনির্ভর। তার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই, মনেই তার অর্পণ, মনেই তর্পণ এবং মনই তার দর্পণ। সার্ত্র ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করেছিলেন এক অভিনব ও কাঙ্ক্ষিতব্য উপন্যাস-চক্র বা Novel-cycle (লে শ্যমাঁ দ্য লা লির্বেতে; লাজ্ দ্য রেজোঁ; ল্য স্যুর্সি; লা মর দাঁলাম্)। পারীর পতন থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন জীবনের ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যায়, নানা উত্থান-পতনে এই উপন্যাসের চরিত্ররা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে পৃথিবীর স্বাদ নিয়েছে। এই বিশাল, নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী-গ্রন্থে সার্ত্রকে, তাঁর রচনা-রীতি আর মনোভাবনাকে চিনতে পারা গেছে পরিষ্কারভাবে। যদিও তাঁর নির্দেশিত পথের সংগে শেষ পর্যন্ত সকলের মতের মিল না-ও হতে পারে। তাঁর স্বদেশেরই অনেক সমালোচক এই সব রচনার অস্তিত্ববাদ থেকে অনেক কিছু অনর্থ আবিষ্কার করেছেন, বলেছেন, একটা তত্ত্বকে খাড়া করবার জন্য আয়োজনের সদ্ প্রচেষ্টা আছে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু স্বতোৎসারিত, সবাস্তব জীবনবোধ সেখানে কোথায়? সব আয়োজিত রূপসজ্জার আড়ালে কি নিহিলিজম-এর বন্দনা গানই গাওয়া হয়নি? সার্ত্র নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বুঝবার অবকাশ দিয়েছেন অসামান্য দু'টি প্রবন্ধ-গ্রন্থে: 'ল্যাত্র্ এল্য নেআঁ' (১৯৪৩) এবং 'লেক্সিস্তঁ্যসিয়ালিজম্ এ উ্যমাঁনিজ' (১৯৪৬)। সার্ত্র খুব কম কথাশিল্পীকেই সমাদর করতে

চেয়েছেন। তিনি স্তাঁদালের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন, প্রুস্তের বুর্জোয়াবাদকে পছন্দ করেন নি। মোরিয়াককেও, দেবতা যেমন শিল্পী নন তিনিও তেমনি দেবতা নন বলে নাকচ করেছেন। সার্ত্র চান: 'a writer to participate in his period (s'engager) not in order to preserve it but to help in its process of change, to precipitate its evolution. Nothing, he warns, assures us that literature is immortal. The chance for literature to day is, he believes the chance for Europe, for democracy, for peace.'

সিমন্ দ্য বোভোয়ার (১৯০৮—) শুধু যে সার্ত্র-এর মন্ত্রসঙ্গিনী ছিলেন, তাই নয়, তাঁর জীবনসঙ্গিনীও বটে। কিন্তু তবু তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সার্ত্র-এর প্রভাব ও ব্যক্তিত্বে হারিয়ে যায় নি, স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে স্পষ্টতই। তিনিও একাধারে নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও নিবন্ধকার। 'লে মঁাদারঁ্যা' (১৯৫১) উপন্যাসই বোভোয়ার-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এমন কথা বিবেচিত হয়ে থাকে। তিনি সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদতত্ত্বে একাত্ম হয়েছেন, তার মূল বাণী রচনার ভাঁজে ভাঁজে ন্যস্ত করেছেন কিন্তু সেই সংগে নারীদের অধিকার (ল্য দ্যোজিয়েম্ সেক্স ; ১৯৪৯) সাব্যস্ত করার কথাও ভোলেন নি। তিনটি প্রাণীর জটিল জীবন-সমস্যাকে নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণের ধারাও (লঁ্যা ভিতে ; ১৯৪৩) প্রবাহিত হয়েছে। তাছাড়া, তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিও (পুর উ্যন মরাল দ্য লাঁবিগুইতে ১৯৪৭ ; ফোতিল ক্রলে দ্য সাদ ; ১৯৫২ ইত্যাদি) অপ্রতিরোধ্য যুক্তি-নির্ভর— রচয়িতার পরিচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনার পরিচায়ক।

আর্থার কোয়েসলার পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, আধুনিক ফরাসী কথাসাহিত্যে তিনটি নামই স্মর্তব্য…'In France the three vital writers are Andre Malraux, Jean Paul Sartre and Albert Camus.' কিন্তু তিনি আরেকটি সুস্পষ্ট মন্তব্যে শ্রেষ্ঠত্বের যে শেষ বিচার করেছেন, সে-সম্পর্কে কারো কারো মতদ্বৈধতা থাকা স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন, ওই তিন শক্তিধরের মধ্যে আবার আলবের কাম্যুর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করে উপায় নেই। …'of these, the greatest is Camus'. আঁদ্রে জিদের রায়ও অনেকটা তার ধার কাছ ঘেঁসে গেছে। আলবের কাম্যু-কে (১৯১৩-৬০) নিয়ে তবু

মতভেদের অন্ত থাকে না। তিনি অস্তিত্ববাদের সমর্থক ও প্রচারক কিনা এসম্পর্কে প্রচুর বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। কেউ বলেছেন, হ্যাঁ, রিলকে ও কাফকার মতো তিনি অংশত অস্তিত্ববাদের সর্তকে পালন করেছেন (...'Rilke and Kafka share some of the most characteristic features of the movement, as does Camus in whose Myth Of Sisyphus a tragic world view is redeemed by Nietzsche's amor fati') কারণ তিনি অতি মাত্রায় প্রাতিস্বিক। অপরপক্ষের ধারণা, মারলো-র মতো কাম্যুকেও অস্তিত্ববাদের আওতায় আটকে তাঁর অস্তিত্বকে সংকুচিত করে ফেলা যায় না, কেননা প্রথম কথা তিনি প্রয়োজনকে অস্তিত্বের আগে সংস্থাপন করে নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে বড় কথা, কোন বাদ-এর বিবাদ অপেক্ষা তাঁর কাছে শুদ্ধ শিল্পের ভজনা করাই হয়ত শ্রেয় ছিল। কিন্তু তবু কেন তাঁর নাম অস্তিত্ববাদের আন্দোলনে জড়িত আছে—এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। তার প্রথম হেতু বোধহয় তিনি একদা সার্ত্র-এর খুব নিকটবর্তী হয়েছিলেন, উভয় শিল্পীর চিন্তা-সাযুজ্য ঘটেছিল, মেলবন্ধন হয়েছিল সাহিত্যমতের। তারপর সার্ত্র যেই কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে নিজের হাত মেলালেন, কাম্যু তখুনি সরে এলেন,—দু' জনের মধ্যে সেই প্রথম বিভেদের রেখা পড়ল। আর, দ্বিতীয় কারণ বোধহয় তাঁর 'লেত্রাঁজে' (১৯৪২) গ্রন্থে অস্তিত্ববাদের কিছু কিছু লক্ষণ ধরা পড়েছিল। তিনি তাতে 'remote from life'-এর বিশ্বাসকে তুলে ধরেছিলেন। তবে কাম্যু তাঁর সাহিত্যে কোন্ বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, জীবনকে উজ্জীবিত করতে কোন্ পথকে আশ্রয় করেছেন অথবা কোন্ মতকে,—তার ধারণা পাওয়া যায় 'ল্য মিত্ দ্য সিসিফ' (১৯৪৩) নামক রচনায়। তিনি বলেছেন, সংগ্রাম করা, প্রতিকূলতার সংগে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকাই মানুষের ধর্ম। মানুষ এ পৃথিবীতে কিছু চিরকাল বাস করতে আসে না। যে ক'দিন তার আয়ু সে ক'দিন তাকে সততার সংগে অস্তিত্বের সংগ্রাম করতে হবে। আত্মবিনাশ মুক্তির পথকে জটিলই করে, সুগমতা দেয় না। আর মানুষের এই কর্মে কোন ফল লাভের আশা না করাই বাঞ্ছনীয়—মা ফলেষু কদাচন। রচনাটির শেষ পঙ্ক্তিতে তিনি বলছেন : 'I leave Sisyphus at the foot of the mountain. One always finds one's burden again. But Sisyphus teaches the higher fidelity that negates the gods and raises rocks. He too concludes that all is well. This universe henceforth without a master

seems to him neither sterile nor futile. Each atom of that stone, each mineral flake of that night-filled mountain, in itself forms a world. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy'. কাম্যু তাঁর 'লা পেস্ত' (১৯৪৭) উপন্যাসে উত্তর আফ্রিকার একটি শহরে প্লেগ ব্যাধির সংক্রমনকে উচ্চকিত করে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য স্মরণ করিয়েছেন, মানবতার মূল সত্যটুকু অবিচল নিষ্ঠায় তুলে ধরেছেন; তার আড়ালে কাজ করেছে জর্মন কর্তৃক ফ্রান্স অধিকৃত হওয়ার পর উদ্ভূত সমস্যা। ডাঃ রিয়্যো নির্দিষ্ট জীবনদর্শনে পরিচালিত সংস্কারমুক্ত, দৃঢ়চেতা মানুষ। বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র-সন্নিবেশিত হয়েছে উপন্যাসটিতে আর এইসব চরিত্রের মিছিল থেকে লেখকের একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল জগৎ প্রতিভাত হয়েছে। ডাঃ রিয়্যোকে উদ্দেশ্য করে তারুও বলছে: 'This epidemic has taught me nothing new, except that I must fight it at your side. Each of us has the plague within him ; no one, no one on earth, is free from it. We must keep endless watch on ourselves lest in a careless movement we breathe in somebody's face and fasten the infection on him'. 'লা শ্যুত্' (১৯৫৬) উপন্যাসেও কাম্যু মনুষ্যত্বের অভিভাষণ দিয়েছেন, পাপ-পুণ্য, অসদাচরণের সাধারণ চিদ্‌বৃত্তি একটি বিশেষ দর্শনে বিশ্লেষায়িত। তাঁর নায়ক এখানে আপন স্বজ্ঞার যন্ত্রণায় অস্থির। তার নিজের পতনকে সে নিজেই ত্বরান্বিত করেছে। তবু সে জীবনপলাতক নয়। তীব্র হৃদ-বেদনার মধ্যেও সে উপলব্ধি করে জীবনের স্পন্দন। দুরন্ত শীতের মধ্যেও গ্রীষ্মের মৃদু মহৎ উত্তাপ। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'কালিগুলা'-ই (১৯৪৪) সাধারণ্যে প্রচুর প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তার কারণে বলা হয়েছিল 'clear-sighted earnestness in trying to illuminate the problems of the human conscience in our time'. এই ১৯৬০ সালে এক মোটর দুর্ঘটনায় কাম্যুর শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে। জীবন ও শিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল: 'The end of art the end of each life, can only be to add to the sum of freedom and responsibility that is in every heart and in the world.'

কিন্তু অস্তিত্ববাদের আলোচনা করতে গিয়ে সেই লোকটির কথা বলা দরকার যিনি ফরাসীর মাটিতে এই তত্ত্বের প্রথম পরিচয় করিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে গাব্রিয়েল মার্সেল সর্বপ্রথম এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ('Gabriel Marcel who first introduced Existentialism in France in 1925') তিনি আবার একই সংগে খ্রীষ্টীয় অস্তিত্ববাদের উৎসাহী উদ্যোক্তা। তাঁর কয়েকটি নিবন্ধ-গ্রন্থে সেই সব বিষয়কে তিনি প্রাঞ্জল করেছেন। তিনি নাটকও লিখেছেন, কিন্তু কোন উপন্যাস লিখেছেন কি না তা জানা যায় না। এই সময়ের আরো কয়েকজন অস্তিত্ববাদী লেখক যাঁরা নানা প্রচেষ্টায় নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের নামোল্লেখ প্রয়োজন আছে। তাঁরা হলেন: র‍্যানে এতিয়ঁাবল্ (লঁফাঁ দ্য ক্যোর ১৯৩৭), মোরিস ব্লাঁশো (লারে দ্য মর্ ১৯৪৮) রবের ম্যারল (লা মর্ এ মঁ মেতিয়ে ১৯৫৩) ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর গত কয়েক দশকে ফরাসী কথাসাহিত্য পুরাতন অভ্যাস-বশে প্রাণকে ধারণ করে রেখেছে বলাই বোধহয় ঠিক। কথাসাহিত্যিকরা নানা প্রচেষ্টায় চারদিকে হয়ত বিতীর্ণ হয়েছেন, ইতস্ততঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যত হয়েছেন, কিন্তু কয়েকটি নাম-সৃষ্টি করা ছাড়া বোধহয় কথাসাহিত্যে নতুন কোন প্রাণবস্তু সংযোজিত হয় নি। রামঁা ফ্লোভ-কে এখনো অনেকে পছন্দ করছেন, পছন্দ করছেন অংশত আত্মজীবনীমূলক কল্পকাহিনীকে মনোবিশ্লেষণে পরিবেশন করতে, কেউবা এখনো সমাজ সম্বন্ধে নানাভাবে তাঁদের চিন্তাব্যয় করছেন, আব কেউ কেউ (সংখ্যায় এঁরা গরিষ্ঠ) উপন্যাসের আদিম চাহিদায়—অর্থাৎ নিছক পাঠের আনন্দদানের উদ্দেশ্যকে জীবিত রাখতে ক্রমশ জনপ্রিয়তায় স্ফীত হচ্ছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীকে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁদের কয়েকজন হলেন, আঁরী ত্রোয়া, (লারাইন্ ১৯৩২; আমেলি ১৯৪৫;) (আফ্রিকার অরণ্য ও জীবজন্তুদের নিয়ে একটি বৃহৎ রচনা-প্রয়াস ত্রোয়াকে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য দিয়েছে।) মরিস দ্রয়ঁ (লে গ্রঁাদ ফামি); এর্ভে বাজঁ্যা (লা তেত্ কঁত্র লে ম্যুর ১৯৪১; ল্যাভ্-তোয়া এ মার্শ্ ১৯৫২); ফেলিসিয়ঁ্যা মার্সো (লম্ দ্যু রোয়া ১৯৫৩; বেরর্জের ১৯৫৪); রজে নিমিয়ে (ল্য হুসার ব্লো ১৯৫০) প্রভৃতি। এখনকার পৃথিবীতে ছোট গল্পের ভাঁটা পড়ছে ক্রমশ। ইংলণ্ডের মতো ফ্রান্সেও (যে ফ্রান্স সম্পর্কে বলা হত 'Short story is French') তাই ছোট গল্প ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। পাঠকদের আশানুরূপ উৎসাহ পাচ্ছে না। তবু, বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ দেবার কাজে যাঁরা চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন

মার্সেল আর্লঁ (১৮৯৯) তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও ছোটগল্পকার। 'লর্দ্' (১৯২৯) উপন্যাসে তিনি পুরাতন ঐতিহ্য ও ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তাঁর গল্পের কয়েকটি সংকলন গ্রন্থে (তের্ নাতাল্; লে প্লু বো ছ নো জুর) কাফকার্যের বিশেষ ছায়া পড়েছে। কিন্তু, 'amongst writers of undisputable talent special mention must be made of Romain Gary for his famous Education europèenne (1945) a vigorous and concise picture of the Polish resistance, and for his later books which depict the chaos of modern world : Tulipe (1946) and Le Grand Vestiaire (1949).'—Germaine Mason. রমঁ্যা গারি-র 'লে রাসিন দ্যু সিয়েল' নামক বৃহৎ ও উচ্চ ভাবনাসম্ভূত উপন্যাসে তাঁর আসল কীর্তি আশ্রয় করে আছে।

তবে বিংশ শতাব্দীর ফরাসী কথাসাহিত্যে যে মহিলা শুধু এলেন দেখলেন এবং জয় করলেন, সেই ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁর (১৯৩৫—) মতো এত সহজে ভাগ্যের দাক্ষিণ্য পায় নি কেউ। তিনি মাত্র আঠার বছর বয়সে একটি বই লিখে রাতারাতি জগৎজোড়া নামার্জন করেছিলেন। নামের সংগে সংগে অতুল বৈভব হয়েছে তাঁর, 'প্রি দে ক্রিতিক'-এর পুরস্কারমাল্যও গলায় ঝুলেছে। যে বইটির কারণে তাঁর এই জগৎজোড়া জনপ্রিয়তা, সেই 'বঁজুর ত্রিস্তেস্' (১৯৫৫) সাগাঁর কাছে যেন কামধেনু-বিশেষ। কারণ, বইটি মহিলাকে শুধু যে বর্তমান সাফল্য ও সৌভাগ্য দান করেছে, তা-ই নয় অন্যান্য রচনাগুলিকেও সেইভাবে কাটবার বিধানপত্র দিয়েছে। 'বঁজুর ত্রিস্তেস্'-তে লেখিকা যুগযুবমানসকে প্রতিভাসিত করেছেন, জীবনের হতাশা, ব্যর্থতা মোহভঙ্গকে দৃঢ়সন্নিকৃষ্ট করতঃ সকৌশল গল্প-বর্ণনা করেছেন। তাতে নিঃসন্দেহে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় রক্ষিত ছিল, কিন্তু তাঁর পরবর্তী দুটি বই 'উঁ সের্তঁ্যা স্যুরির্' (১৯৫৬) এবং 'দাঁ জ্যুঁজুর্, দাঁ জ্যুঁ না' (১৯৫৭) কিংবা 'এমে ভু ব্রাহ্‌ম্‌ন্' (১৯৫৯) সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমরা মিছেই এতদিন তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহকে তীক্ষ্ণ ও সজাগ করেছিলাম। ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁর ফরাসী সাহিত্যকে দেবার মতো সত্যি কোন সঞ্চয় ছিল না। তাই আবশ্যিক কারণেই তিনি ফুরিয়ে গেছেন।

সম্প্রতি ফরাসী কথাসাহিত্যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে—পুরনো বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নতুনকে আলিঙ্গন করার আকুলতায়। এবং এই নব্য উপন্যাসের (রোমাঁ হুভ্যো) জন্য ক্রমাগত বদরাগ প্রকাশ করে আসছেন প্রধানত দু'জন। বয়সে তাঁরা যদিও 'ছোকরা' তবু চিন্তায় তাঁদের অন্য নব্যনীতি, কণ্ঠে ভিন্ন নবীনতার তেজ। তাঁরা সাহিত্যে জঙ্গমতার ভক্ত এবং স্পষ্টতঃই তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে, উপন্যাস রচনায় প্রাচীন পন্থা সর্বাগ্রে ও সর্বাংশে পরিত্যাজ্য। ফরাসী কথাসাহিত্যে এই দুই নব্যনায়ক মিশেল ব্যুতর ও রব-গ্রীয়ের লক্ষ্য সেই এক,—সাহিত্যের সত্য। কিন্তু তাঁদের পথ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। ব্যুতর-এর 'লা মোদিফিকাসিয়ঁ' উপন্যাসে তবু একটি নিটোল গল্পাভাস মেলে কারণ তিনি তার পরিপন্থী নন কিন্তু রব-গ্রীয়ে তাঁর 'দঁ লা লাবিরিন্ত্'-এ একটি ব্যাপক ও বিরাট অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন বিস্ময়কর বিশদতায়। কাহিনী সেখানে তুচ্ছ, চিত্রকল্পই প্রধান এবং সেই চিত্রকল্প থেকে পরিস্ফুটমান জীবনের দর্শন-ই সার কথা। কিন্তু কিছুদিন আগে বত্রিশ বছরের এক নবীন কথাশিল্পী আঁদ্রে শোয়ার্জ-বার ফরাসী কথাসাহিত্যকে তাঁর প্রথম উপন্যাসেই ভীষণভাবে চমকে দিয়েছেন। 'ল্য দের্নিয়ের্ দে জ্যুস্ত্' পড়ে ফরাসী পাঠকমহল বিহ্বল ও বিচলিত। বইটি গঁকুর পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে।

যুগানুরূপ সাহিত্যাংকনে ফরাসী কথাশিল্পীরা কোনদিন অকৃতবিন্ত থাকেন নি। তাই অবক্ষয়ের এই কালকেও মৌলিক ও কৌলিক প্রথায় কথাসাহিত্যের অঙ্গীভূত করে চলেছেন আধুনিক ফরাসী সাহিত্যশিল্পীরা। জীবনের সার্বিক অস্থিরতাকে সযত্নে, ঐকান্তিকতায় শিল্পবস্তু করে তোলবার প্রয়াস পাচ্ছেন। অষ্টাদশ বা রেনেসাঁসকালীন সাহিত্যও আজ হয়ত স্বমর্যাদায় জীবিত আছে, কিন্তু এখনকার জীবনশিল্পীরা পৃথিবীর সব কলরবের মাঝখান থেকে উত্তরায়ণের পথ খুঁজছেন। খুঁজছেন নতুন দিগন্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রুশ কথাসাহিত্য

'But, I, in love, was mute and still.'

—PUSHKIN : Eugene Onyegin-Canto 1. st. 52

মহাদেশটি একদা একাংশ মেলেছে ইওরোপ-পানে, আরেক পদ তার এসিয়ায় প্রসারিত। কার্পাথিয়ান পর্বত থেকে উরাল পর্যন্ত ইওরোপাভিমুখী আর উরাল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এসিয়-সন্নিধানী। এই বিরাট ভূখণ্ডটির মাঝে রুশ-সংস্কৃতি জাগ্রত ছিল। জাগ্রত ছিল কিন্তু ব্যাপ্ত ছিল না। নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে মুক্তি পায়নি কখনো। তাই, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে পর্যন্ত ইওরোপকে রুশ সাহিত্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য দেখাবার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু কে জানত, একদিন সারা পৃথিবীর জন্য বিস্ময়ের এমন ব্যাপক আয়োজন অপেক্ষা করে থাকবে! যে-দেশ অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে নিজেকে দুরধ্যয়িত রেখেছে,—অগোচরে, একান্ত সংগোপনে তার সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্‌বর্তন হয়েছে এবং আগামীকালের জগৎ-সভায় অমিত শক্তির সাহিত্যদূত পাঠাবার কাজে প্রস্তুতি চালাচ্ছে সেই দেশ—তা কে জানত! এই কথাশিল্পীরা উদিত হবার আগে রাশিয়া পশ্চিমের সংগে মধ্যযুগে যোগাযোগ রেখেছে, রেনেসাঁসকালীন আলোক বহন করে এনেছে নিজেদের চিত্তে, চিন্তায়,—ফ্রান্স, ইতালী, ইংলণ্ডের অনুপ্রেরণায় পরিচালিত হয়েছে, হয়ত বা নিঃসংকোচে তদ্দেশীয় ভাবনা ও চিন্তাহরণ করেছে। কিন্তু তুর্গেনিভ, গোগল, পুশকিন, তলস্তয় কিংবা দস্তয়ভস্কী ইওরোপীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ না-করা পর্যন্ত রাশিয়াকে উদ্‌ভ্রান্ত বর্বরতার নিঃসীম অন্ধকারপুঞ্জ ছাড়া অন্য কিছু ভাববার অবকাশ মেলে নি বহির্জগতের।

রুশ সাহিত্যের প্রথম প্রয়াসারম্ভ কবে থেকে! বোধহয় দশম শতাব্দীর সায়াহ্নকাল থেকে। সেই যখন কিয়েভ রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তন হলো। ('It is common knowledge that the beginnings of Russian literature coincide with the introduction of Christianity in to the state of Kiev at the end of the tenth century'—An Outline of Russian Literature.) যখন রাশিয়া কনস্তান্তিনোপল থেকে ধর্মের আলোকশিখা জ্বালল প্রাণে এবং বাইজেনতাইন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হলো।

রাশিয়ার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'দি অ্যাপোস্‌ল্' ১৫৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। তার অনেক আগেই ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে নানাবিধ রচনার পাণ্ডুলিপি অসংখ্যাকারে পাওয়া যাচ্ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্মাত্মাদের জীবনী-গ্রন্থ, বিভিন্ন ধর্মীয়প্রবচনমূলক পুস্তক এবং সুসমাচার জাতীয় লেখা আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। মুদ্রণের কৌশল তখন আয়ত্তাধীন হয়েছে এবং মস্কো থেকে মুদ্রণ-জনিত্র রাশিয়ার শহরে শহরে ছড়িয়ে পড়ছিল অতি দ্রুত। তাছাড়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে পিটার দি গ্রেট নামে এক জার রাজত্ব করতে এসে রাশিয়ার আত্মোন্নতি ঘটিয়ে গেলেন। তিনি যদিও অন্যান্য জারেদের মতোই নৃশংস হয়েছেন, ধ্বংসের পথেই তাঁর সৃষ্টির রথ ক্ষিপ্র হয়েছে, প্রতিবন্ধকতা সহ্য করার সহনশীলতা তাঁরও ছিল না, তা সে যেই হোক না কেন! আপন সন্তানেরও সেই দুর্বিনীত মূঢ়তার ক্ষমা নেই—তার শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পিটারই অজ্ঞানাচ্ছন্ন রাশিয়াকে সভ্যতার আলোকস্পর্শ অনুভব করতে দিয়েছেন—তিনি পশ্চিমের জানলা খুলে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি শিল্প, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে গীর্জার একাধিপত্য খর্ব করলেন, সহজ উপায়ে যাতে বিদ্যা অধীত হয় তার ব্যবস্থা করলেন এবং নিজে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে (প্রথম রুশ সংবাদপত্র) ঘন ঘন তাতে লিখতে লাগলেন। আর, এই সব কৃতকর্মের পিছনে পিটারের একটিমাত্র উদ্দেশ্যই রইল—স্বেচ্ছাচারিত উপযোগিতাবাদ।

রুশ গদ্যসাহিত্য বিষয়ে সর্বপ্রথম জ্ঞাত করলেন পুশকিন ও লার্মোনটভ। মূলত দু'জনেই কবি, কিন্তু দু'জনেই কথাশিল্পী। রুশ সাহিত্যের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ওই দু'জনকে দিয়েই আরম্ভ। যদিচ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিখাইল লোমোনজভ, গ্যাভারিইল দেরজহ্বাভিন, দেনিস ফোনভিজিন ইত্যাদি কবি ও নাট্যকাররা আপন আপন ক্ষেত্রে স্ফুরিত হবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন

কিন্তু তাঁদের ক্ষমতার নিদর্শন একান্তভাবেই স্বদেশে পরিখ্যাত ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন হাওয়া বদলে গেল। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তরোত্তর যে প্রসার ঘটছিল, ভোলতেয়র, রুশো, দিদেরো প্রভৃতি ফরাসী চিন্তানায়ক ও সাহিত্যশিল্পীদের যে সাহিত্যস্বাদ পাওয়া চলছিল আলোকপ্রাপ্ত রুশবাসীদের—অকস্মাৎ একদিন তা সব থেমে গেল। চারদিকে আতংক আর সন্ত্রাসের পাহারা বসল, ছাপাখানার স্বাধীনতা আর অক্ষুণ্ণ রইল না এবং উদারনৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচারকদের ধরে ধরে বন্ধ করা হতে লাগল ফাটকে। শুধু এখানেই ক্ষান্তি নয়, সন্দেহভাজন লেখকদের লেখা না-ছাপারও কড়া হুকুমনামা জারী হলো আর কাউকে কাউকে মৃত্যুর দরজা দেখিয়ে দেওয়া হলো সোজা এবং কেউ কেউ নির্বাসন পেলেন সাইবেরিয়ার মরুপ্রান্তরে। 'A Russian writer, then, was compelled to face some severe challenges if he was at all serious. Was he ready to defy the censorship, to risk being ordered out of St. Petersburg or Moscow, a possible exile to Siberia ?'

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে প্রাচীন, চিরায়ত সাহিত্যবস্তুর প্রতি সমকালীন সাহিত্যিকদের নজর কমল। তাঁরা তখন প্রেমের বিষাদময় বিষয়-বস্তুতে আশ্রিত হলেন। এবং এই সময়ের একজন বিশিষ্ট রুশ নিকোলাস কারামজিন (১৭৬৬-১৮২৬) তাঁর উপন্যাসোপম কাহিনীতে প্রণয়কে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কলাকৌশলে উপস্থাপিত করে, জনচিত্তজয়ী হয়েছিলেন। তাঁর 'লেটার্স অফ্ এ রাশিয়ান ট্র্যাভেলার' বিপ্লবী ফ্রান্সে বিধৃত, ইওরোপের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিকৃত। কারামজিন সেকালের রাশিয়ায় সুনিশ্চিত একটি সাহিত্যধারার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁর রচনাভংগী পরবর্তীকালের তরুণগোষ্ঠীকে প্রেরণা দিয়েছিল এবং তাঁর সংবেদনশীল কাহিনী-বিস্তারে রোমান্টিকতার লক্ষণ প্রযুক্ত থাকায় তিনি একটি স্বতন্ত্র আসন পেয়ে আসছেন। কারামজিনের অনেক অনুসারী তৈরী হয়েছিল, তাঁরা কাব্যে ও কথাসাহিত্যে ইংরাজী ও জর্মান রোমান্টিকতা আনয়ন করতঃ শিক্ষিতমহলকে যৎপরোনাস্তি খুশি করতে পেরেছিলেন। আইভ্যান ক্রাইলভ (১৭৬৯-১৮৪৪) রুশ সাহিত্যের প্রথম পুরুষ যিনি পুস্তক বিক্রয়ের প্রচলিত সংখ্যায় বিস্ময়কর পরিবর্তন আনেন। তাঁর 'ফেব্‌ল্‌স' (নানা দেশের সংকলিত কাহিনী) এমন প্রচণ্ড জনস্বীকৃতি পেল যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সমস্ত বিশ্বাস্য ধারণাকে আমূল বদলে

পঁচাত্তর হাজার বই বিক্রী হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে এটা এক স্মরণীয় ঘটনা। গ্রিবোয়েদভ, (১৭৯৫-১৮২৫) তৎকালীন রেয়ালিস্ত কবি ও নাট্যকার 'দি ফলি অফ্ বীয়িং ওয়াইজ' নামক গদ্যকাব্যে যুগ ও জীবনকে অত্যাশ্চর্য আন্তরিকতায় অংকিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমরা পুশকিন ও লার্মোনটভ থেকেই শুরু করি। আগের অংশটুকু কেবল ঐতিহাসিক পশ্চাৎভূমির ধারণা বিতীর্ণ করুক।

'Pushkin with his profound insight, his genius, and his purely Russian heart, was the first to detect and exhibit the chief symptom of the sickness of our intellectual society, uprooted from the soil and raised above the people. He exhibited and set in relief before us our negative type, the disturbed and unsatisfied man, who can believe neither in his own country nor in its powers, who finally denies Russia and himself (that is, his own society, his own intellectual stratum, raised from our native soil), who does not want to work with others, and who suffers sincerly.' ১৮৮০ সালের ৬ই জুন মস্কোতে পুশকিনের এক মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়েছিল, তাতে বহু সাহিত্যরসিক ও রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতিতে তুর্গেনিভ ও দস্তয়ভস্কী পুশকিনের সম্বন্ধে দুটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তখনকার রাশিয়ায় দুটি ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক মতবাদ প্রবলাকারে বিরাজ করছিল—ওয়েস্টার্নার্স ও স্লাভোফিলস। প্রথমোক্ত মতের সমর্থকরা ইওরোপীয় ধ্যান-ধারণার পূর্ণ পরিপোষক আর দ্বিতীয় দল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তুর্গেনিভ ওয়েস্টার্নার্সদের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন আর স্লাভোফিলসদের দৃষ্টিকোণ থেকে পুশকিনকে বিচার করে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন দস্তয়ভস্কী। উপরিল্লিখিত উধৃতিটি দস্তয়ভস্কীরই ভাষণাংশ।

পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৬) মুখ্যত কবি কিন্তু তিনি দীর্ঘায়ু হলে গদ্যসাহিত্যের প্রতি আরো নজর দিতেন হয়ত এবং শুধু 'ক্যাপ্‌টেইন্‌স্ ডটার' বা 'হিস্ট্রি অফ্ পুগাচেভ্‌স্ রেবেলিয়ন' বা 'ইউজীন ওনিজিন' অপেরা লিখেই ক্ষান্ত হতেন না—আর তাতে রুশ সাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্য হয়ত আরো সমৃদ্ধ হতো। কিন্তু জন্ম তাঁর এক বনেদী পরিবারে এবং বনেদী পরিবারের যাবতীয় খামখেয়াল

তাঁকে আজীবন সঙ্গদান করেছে। তিনি বহুসময় অলস ভাববিলাসে কাটিয়েছেন, প্রেমে এবং ডুয়েল লড়ায় তাঁর সবিশেষ হাতযশ ছিল আর জুয়া-বাজীর ব্যাপারেও তিনি কম যেতেন একথা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁর মনীষা—ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য এবং প্রাচীন ও নবীন ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি তাঁকে সর্বশ্রদ্ধেয় করেছে। পুশকিন তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রাতঃকালে ভোলতেয়র কিংবা বায়রনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সত্যি কিন্তু স্বকীয় শিল্পবোধ এবং স্থবেদী লেখনীতে অচিরেই ওই দুই সাহিত্যপুরুষের শরণমুক্ত হয়ে তিনি আপন ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন লেখায় এবং অনুশীলিত যত্ন ক্রমে তাঁকে ভোলতেয়র ও বায়রন অপেক্ষা উপরিকতা দেয়। 'ইউজীন ওনিজিন'-কে (১৮২৩-৩১) প্রথম রুশ উপন্যাসের গুরুত্ব দেবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ('Everything concurred in making Eugene Onegin the first Russian novel, a work of national significance—') যদিও সেটি কাব্যের আকারে বর্ণিত। তার কারণ বোধহয়, 'ডনজুয়ান' বা 'চাইল্ড হ্যারল্ড্' দ্বারা অনুপ্রাণিত এই রচনাটিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনীর বর্ণনা ছিল, ছিল প্রেম এবং তৎকালীন রাশিয়ার সমাজচিত্র। স্তাঁদালের মতো পুশকিনও রোমান্টিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর রোমান্টিকতার ভাবতরঙ্গ উদারনৈতিকতার নদীতে এসে মিশেছিল। এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যধারার বৈপরীত্য ঘোষণায় ছিল ব্যস্ত। তাঁর 'কুঈন অফ্ স্পেড্স্', 'দি শট্' বা 'দুব্রোভ্স্কী' প্রভৃতি ছোট ছোট কাহিনীগুলিতে দুরন্ত প্যাসন ও প্রক্ষোভ সহকারে জুয়াবাজ, ভদ্রলোক-ডাকাত ইত্যাদির বর্ণনা ছিল। পুশকিন অত্যন্ত অল্পবয়সে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যান। অনেকেরই ধারণা দ্বন্দ্বযুদ্ধটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত—তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনায় আয়োজিত। কিন্তু তাতে বিশ্বসাহিত্যের ও রুশ সংস্কৃতির ক্ষতি হয়েছিল অনেক। কারণ, 'He was a mature artist, able to succeed in many forms, who must have taken with him into the grave several master-pieces now lost for ever.' পুশকিন যখন দেহত্যাগ করলেন তখন একটি রুশ সংবাদপত্র কালো বর্ডার দিয়ে তাঁর মৃত্যুসংবাদটি ছেপে লিখেছিল, 'রুশ-সাহিত্যের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হলো'। তাই দেখে এক পদস্থ পুলিশ কর্মচারী সক্রোধে বলেছিল, 'একটা লোককে নিয়ে অকারণ এই হৈ-চৈ'র মানে কী, যে-লোক গুরুত্বপূর্ণ পদ পর্যন্ত অধিকার করে নি কোনদিন?'

কিন্তু মিখাইল লার্মোনটভ (১৮১৪-১৮৪১), অষ্টাদশ শতাব্দীর আরেক সুনিশ্চিত সাহিত্য-প্রতিভাও যখন অকালে সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের উত্তেজনায় প্রাণত্যাগ করলেন তখন রুশ সাহিত্য সত্য সত্যই বহুলাংশে নির্জীব হলো। পুশকিনের মতো লার্মোনটভও মুখ্যত কবি এবং পুশকিনের মতো বায়রনভক্ত। কিন্তু তিনি শেলীর ভাবসংস্পর্শেও এসেছিলেন এবং তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য মানুষের অতীন্দ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিকতার বিশ্বাসানুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছে। লার্মোনটভ স্কট, শেলী, বায়রনের সাহিত্যকর্মে গাঢ় অনুশীলন চালিয়েছিলেন এবং নেপোলিয়নের চরিত্রকে মনে মনে আরাধনা করতেন। আট বছর বয়স থেকে তাঁর কাব্যের জগতে পরিক্রমা শুরু হয় এবং সতের বছরের মধ্যে প্রায় তিনশ' কবিতা, তিনটি নাটক ও উপন্যাসোপম কাহিনী ইত্যাদি লিখে ফেলেন। পুশকিনের মতো লার্মোনটভের জীবনেও প্রেম সর্বদাই অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। দশ বছর বয়সেই তিনি প্রথম প্রেমের আতিশয্যে জর-জর হয়েছিলেন এবং ১৮৪০ সালে একটি প্রেমের ব্যাপারে রাশিয়াস্থ ফরাসী দূতের পুত্রকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। পরিণতি-স্বরূপ লার্মোনটভকে বন্দী করা হয় এবং ককেশাসে নির্বাসন দেওয়া হয়। তাঁর 'এ হীরো অফ্ আওয়ার টাইম' (১৮৪০) উপন্যাসটির অবস্থিতি এই ককেশীয় পার্বত্যভূমিতে। উপন্যাসটি ইংরাজী সহ বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কাহিনীর নায়ক, যে জীবনের বহুতর অভিজ্ঞতায় প্রবুদ্ধ, আপন অস্তিত্বের মাঝে এক প্রচণ্ড শক্তির চেতনা অনুভব করে অনবরত। এবং তাই, সেই অনুৎকর্ষিত শক্তির সম্যক প্রকাশ না-হওয়ায় দিশাহীনতা তাকে বেপথু করে। কাণ্ডাকাণ্ড বর্জিত নানা ঘটনার প্রবাহে ভেসে যায় সে এবং ক্রমাগত নারীদের সান্নিধ্য সন্ধান করতে করতে, ছলনা ও প্রতারণায় তাদের ভোলাতে ভোলাতে নিজের প্রতি হঠাৎ তার প্রচণ্ড হতাশা জন্মায়। এই পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপার-ব্যবস্থার প্রতি তার ক্ষোভ ও অনাস্থা জমা হয় ঘোরতর। উপন্যাসটি জগৎময় বিখ্যাত হয়ে আছে। তৎকালীন রাশিয়ায় উপন্যাসটির গুরুত্ব হয়ত অনেক, হয়ত তাতে দেশের যুগচিত্র সুচারুভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, হয়ত Serfdom এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন পেয়েছে। মানুষের প্রাতিস্বিকতা, ব্যক্তিসত্তার শোচনীয় অবমাননাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংবেদনশীল বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে। কিন্তু তাই বলে 'এ হীরো অফ্ আওয়ার টাইম'-কে শ্রেষ্ঠ রুশ উপন্যাস (মিরস্কি

তাঁর ইতিহাসে বলেছেন) আখ্যা দেওয়া যায় না। তার কারণ, রচনাটিকে উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা সে-বিষয়েই গুরুতর সন্দেহ বিদ্যমান আছে। 'Strictly speaking, A Hero of Our Time is not a novel at all but a series of five tales, and no matter how good the characters are that they share, no matter how beautifully they are told, five tales do not add up to a novel, just as five pavilions cannot equal in their architectural importance a splendid palace.'

রোমান্টিক আন্দোলনের আসরে রাশিয়া দেরী করে নেমেছিল কিন্তু পুশকিনের রচনায় তার প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আগেই। গোগোল এসে সেই প্রত্যয়কে সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় রূপ দিয়ে গেলেন এবং রুশ কথাসাহিত্য দেশের সর্ববিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও ইওরোপীয় সাহিত্যে আপন মর্যাদার স্থান করে নিতে উন্মীলিত হলো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে কয়েকজন রুশ কথাশিল্পী প্রক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় কারামজিন, পুশকিন, লার্মোনটভের অনুসৃত ও পরীক্ষিত কথাসাহিত্যের পন্থাকে প্রশস্ত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এইসব প্রচেষ্টার জাত ও স্বাদ ছিল বিভিন্ন প্রকার। কেউ ঐতিহাসিক বর্ণনা-বিস্তারের আশ্রয় নিলেন, কেউ স্কটের ধারায় রাশিয়ার হারানো দিনের ঐশ্বর্য সন্ধানে ব্যগ্র হলেন, আবার কেউবা ফরাসী 'গিল ব্লাস'-এর অনুকৃতিতে সৃষ্টি করলেন তার রুশীয় সংস্করণ। জাগোস্কিন-এর 'য়ুরী মিলোস্লাভ্স্কী', আইভ্যান লাজহেচনিকভ-এর 'দি হাউস অফ আইস' এবং ভাসিলি নেয়ারজেহ্বনি'র 'দি অ্যাড্ভেঞ্চার অফ প্রিন্স শিসতিয়াকোভ্' ওই শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই সব স্বল্প-পরিচিত কথাশিল্পী বা যুগপথিকরা রুশ সাহিত্যের সিঁড়ি তৈরি করেছেন। যে সিঁড়ি বেয়ে গোগোলের প্রবেশ ত্বরান্বিত এবং সহজসাধ্য হয়েছিল।

নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৮৫২) কি রেয়ালিস্ত পদবাচ্য অথবা রোমান্টিক ভাবানুসন্ধানী? যদিও সমালোচক বেলিনস্কি তাঁকে 'প্রথম রুশ বাস্তববাদী' বলে ছাড়পত্র দিয়েছেন তবু তিনি যে রোমান্টিকতামুক্ত কঠোর বাস্তববাদী একথা স্পষ্ট করে স্বীকার করা যায় না। গোগোলের 'the visible laughter with invisible tears'-এর আড়ালে যে প্রখর কল্পনাসঞ্জাত মন

কাজ করেছে, যে বাধাবন্ধহীন ভাবনার বর্ণময়তা উচ্ছ্বসিত হয়েছে তাতে তাঁকে রোমান্টিকতার প্রসাধক (যত শীর্ণ ও জীর্ণ ভাবেই হোক না কেন) ভাবাই বিধেয় (...a great many critics call him a Romantic and admire him as a creator of dreams and fantastic visions, a mystical narrator of weird fanciful stories.') গোগোলের এই কল্পনার প্রতাপ আশৈশব তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে থেকেছে, তাই তিনি একদা নিজেকে অভিনেতা তৈরি করবার প্রচণ্ড বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাসনায় নিস্তেজ ও হতোদ্যম হবার পর তিনি সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন এবং জর্মান রোমান্টিকদের অনুকারী হয়ে রুশ ভাষায় রূপকথা, উপকথা ইত্যাদির এক কাহিনী-সংকলন (ইভনিংস্ অন এ ফ্রুফ্‌ট নিয়ার দিকাঙ্কা; ১৮৩১) প্রকাশ করেন। প্রায় স্কটের ভংগীতে গোগোল অতীতের বীরত্বরঞ্জিত ঐতিহাসিক উপন্যাসও লিখেছিলেন একদা। 'তারাস্ বুল্‌বা' সপ্তদশ শতাব্দীতে সংস্থাপিত কসাক ও পোলদের যুদ্ধ ও মদমত্ততার কাহিনী,—চূড়ান্ত রোমান্টিকতার চিন্তা-বিলাসে পরিকল্পিত ও লিখিত হয়েছিল। ১৮৩৮ সালের পর থেকে ইতিহাসের আলোয়-ছায়ায় নিরুদ্দেশ ভ্রমণ ছেড়ে গোগোল সোজাসুজি কল্পনার প্রমত্ত সাগরে অবগাহন করলেন এবং অতঃপর তাঁর কোন কাহিনীর নায়ক অকস্মাৎ নাসিকা উধাও হওয়ার বিভ্রাটে পুলিশের শরণাপন্ন হলো (দি নোজ), কোথাও তাঁর কেরানীমানসপুত্র হঠাৎ নিজেকে স্পেনের রাজা ভেবে উল্লসিত হলো (দি মেময়ার্স অফ এ ম্যাড্ ম্যান)। গোগোলের অধিকাংশ লেখা পড়ে মনে হয় তিনি যেন কোনদিনই তাঁর শৈশবাবস্থা কাটাতে পারেন নি। শিশুসুলভ সারল্যে যথেচ্ছভাবে কল্পনার জগতে পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। ১৮৩৮ সালের পর থেকে গোগোল যে নভেলেট বা উপন্যাসোপম বড় গল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে 'দি ওভারকোট' (১৮৪২) কাহিনীটির আবেদন মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, যদিচ এতেও তিনি আপন চরিত্রানুযায়ী বালকোচিত কৌতুকপ্রিয়তার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। এই গল্পের নায়ক এক সামান্য অফিস কর্মচারী, অত্যন্ত দরিদ্র। মনে মনে সে একটিমাত্র ইচ্ছাই পোষণ করে—একটি নতুন ওভারকোট। বহু সাধ্য ও সাধনার বিনিময়ে সে যেদিন কোটটি নিজের মুঠোয় পেল এবং প্রথম গায়ে চড়িয়ে খুশির স্বাদ নিচ্ছে সেদিন রাত্রেই সেটি খোয়া গেল, ছিনিয়ে নিল এক দুর্বৃত্ত। ক্ষোভে, দুঃখে সে ছুটে গেল পুলিশের কাছে, প্রতিকারের আশায়। কিন্তু এক মহা হোমরা-চোমরা তার সব নালিশ-

অভিযোগ স্রেফ উড়িয়ে দিয়ে দিল তাকে তাড়িয়ে। লোকটি মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে এল এবং এই প্রচণ্ড শোক সামলাতে না-পেরে সে একদিন মারা গেল। কিন্তু গল্পের এখানেই শেষ নয়। গোগোলের ভারসাম্যের অভাব এবং বল্গাহীন কল্পনার দৌড় এই মানবীয় অনুভূতির করুণ রসাশ্রিত কাহিনীতেও অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া আমদানী করেছে। লোকটি মারা যাবার পরও স্বস্তি পায় না, তার অতৃপ্ত আত্মা শহরের পথে পথে বিদেহী হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ খোঁজে। এক রাত্রে সুযোগ এসে তাকে ধরা দেয়, এবং সেই হোমরা-চোমরা লোকটি, যে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদা তাকে দেখতে পায়। দেখতে পায় তার গায়ের ওভারকোট। ভূত টুপ করে কোটটি তুলে নেয় এবং আর ফিরে আসে না। এক নিপীড়িত মানবাত্মার বিচার ও রায় এমনিভাবেই শেষ করেন গোগোল। যদিও দস্তয়ভ্স্কি কাহিনীটি সম্পর্কে প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করেছেন (Dostoevsky contended that the whole tradition of Russian prose could be traced back to 'The overcoat.') তবু একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কাহিনীটি বাস্তবতা-বহির্ভূত এক রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণতার অবাধ উদ্ভাস আর গোগোল তাঁর সমাজ-সচেতনতা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও সেই রোমান্টিক কল্পনার রথকে বারংবার এত দ্রুত ছুটিয়েছেন যে, বাস্তবতা তাঁর সংগে তেমন করে পাল্লা দিতে পারে নি কখনো। বস্তুত গোগোলের প্রাক্-সাহিত্যজীবনের সর্বতোমুখী ব্যর্থতার জ্বালা তাঁকে কল্পরাজ্যে স্থায়ী করেছিল এবং তিনি তাতেই অপরিসীম স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চিন্ত আরাম বোধ করতেন। জীবন থেকে তিনি সব সময়েই অবকাশ চেয়েছেন, অবকাশ-রঞ্জনের জন্য বেছে নিয়েছেন নিজের গড়া অবিশ্বাস কল্পনার অনায়াস কৌতুক-কৌতূহলের আশ্রয়, আর সেই আশ্রয়ে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি জীবনের কিছু উদ্গত অশ্রু আর কিছু স্নিগ্ধ হাসি পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাহলেই কি জীবনের সব বাস্তবতার উদ্দেশ নেওয়া হলো, সততায় সারা হলো দুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবনের, ঊষর-কঠিন পৃথিবীর সকল কর্তব্য? আসলে গোগোলের কাছে শিশুর সমস্যায় শরণাপন্ন হওয়া যায়, কিন্তু জীবনের কোন গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁর পরামর্শ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান যায় না। তবু গোগোলের সেই বালকোচিত অন্তরের সাহিত্য-সৃষ্টিকে অস্বীকার করার ক্ষমতা নেই কোন সমালোচকের। সেখানে তিনি অনন্য প্রতিভার পরমাশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। রুশ জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর উপস্থিতি অত্যুচ্চ

ইমারতের মতো—দস্তয়ভ্‌স্কি থেকে শুরু করে আরো অনেক উত্তরসাধকরা যার ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছেন, কিন্তু তাকেই সরাসরি অবলম্বন করে চিরকালের বাসিন্দা হন নি। তবে, গোগোলের আন্তরিকতা ছিল অকৃত্রিম। তিনি হয়ত মনে মনে চাইতেন যে, তাঁর দ্বারা মানুষের কিছু উপকার হোক, সমাজের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত হোক, জীবনের বঞ্চনা তাঁর লেখায় ভাষা পাক—কিন্তু নিজেকে তিনি বিশ্বাস করতেন না, ভুল-ঠিক বিবেচনার দ্বন্দ্বে অস্থির হতেন প্রতিনিয়ত। মাত্র একবার, খুব স্বল্প সময়ের জন্য, তিনি তাঁর চিরাচরিত অভ্যস্ত পথ ছেড়ে অন্য জগতে পাড়ি দিয়েছিলেন। 'ডেড্‌ সোল্‌স'-এর (১৮৩৬-৪১) আগে রাশিয়ায় অত ব্যাপক পটভূমিতে, অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশে, বাস্তবতার অনকুণ্ঠ প্রকাশে কোন উপন্যাস লেখা হয়নি। শুধু তাই নয়, গোগোল যেন এই রচনায় অনেকখানি আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন, শিল্পী হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে বহুলাংশে দায়িত্বপরায়ণ ও সম্পূর্ণ হতে পেরেছিলেন। তাঁর কৌতুক এখানে শুধুই অবিশ্বাসের মায়া ছড়ায় না, গভীর অর্থবোধে জীবনের পায়ে পায়ে জড়ায়, হাসি শুধু আর হাসি থাকে না, তাতে যেন অলক্ষ্যে মেটাফিজিক্স-এর সুর বাজে। কিন্তু উপন্যাসটি লেখার সময় তিনি সর্বদা বিবেচনার দ্বন্দ্বে চঞ্চল হয়েছেন। ভুল করছেন না ঠিক করছেন! আর, তাঁর এই দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিল পুশকিনকে লেখাটির কয়েক অধ্যায় পড়ে শোনাবার পর থেকে। 'ডেড্‌ সোল্‌স'-এর দ্বিতীয় অংশটুকু লেখার ইতিহাস আরো মর্মান্তিক। গোগোলের হৃদয়ের জাগরণ এবং শিল্পীসত্তার ভাবসংঘাত তাঁকে এত অস্থির ও এত উত্তেজিত করে ফেলেছিল যে, তিনি নিজের উপর অত্যাচার চালিয়ে চালিয়ে প্রায় ক্ষয় করে আনছিলেন। পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে এবং আবার লিখে বাইরের অর্গল বন্ধ করে স্বেচ্ছা-নির্বাসনেও তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। (নতুন করে লেখা পুনর্সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটিও তিনি আগুনে নিক্ষেপ করেন এবং তারপর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে) 'ডেড্‌ সোল্‌স'-এ শুধু যে তদানীন্তন রাশিয়ার প্রতিচ্ছবি, কোচম্যান, অভিজাত ভদ্রশ্রেণী, পাবলিক প্রসিকিউটর ইত্যাদির অসংখ্য চরিত্র এবং সমাজের গলদ ও দুর্নীতি প্রতিভাসিত হয়েছিল তা-ই নয়, ভূমিদাসদের মৃতদেহ সংগ্রহ-করার এক ব্যাধিত, করুণ চেহারাও সুস্পষ্ট হয়েছে উপন্যাসটিতে কিন্তু তা কখনোই হৃদয়গ্রাহ্যতার মাধুর্যকে অপহরণ করতে পারে নি। গোগোল এখানে প্রাপ্তমনস্ক শিল্পীর দক্ষতা দেখিয়েছেন। বইটি প্রকাশ পাবার পর (সেন্সরের কাটাকুটির পর) সারা রাশিয়ায় প্রভূত উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সঞ্চার

হয়েছিল। সমালোচক বেলিনস্কি বিরাট নিবন্ধে লিখেছেন, 'This is a purely national work ..It derives from the depth of popular life ; it is as truthful as it is merciless, and patriotic ; it strips the veils from reality ; it is inspired by a passionate love of the true essence of the Russian world.' গোগোল নিজে উপন্যাসটিকে 'কবিতা' আখ্যা দিয়েছিলেন। 'দি ইন্সপেক্টর জেনারেল' গোগোলের উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তায় নতুনতর খ্যাতিকে যুক্ত করেছিল। মূল উপাখ্যানটির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পুশকিন এবং এটি মঞ্চে অভিনীত হবার পর সারা রাশিয়ার শিক্ষিত জনমানসে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। গোগোল যদিও রোমান্টিকতার ভাবমুক্ত হবার সদিচ্ছায় জীবনকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে এবং কখনোই তাঁর অনুগত পাঠকের অভাব হয় নি, তবু, তিনি উত্তরকালের সাহিত্য-প্রতিনিধিদের তাঁর রচনায় তেমন স্পষ্ট করে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি, পারেন নি উদ্‌গত করতে। বরং সে-তুলনায় পুশকিনের প্রভাব কিছু প্রত্যক্ষ —একথা বলেছেন ক্রপটকিন।

১৮৬৩ সালে ফ্রান্সে গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের বিখ্যাত সাহিত্যপত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন : 'চার্লস এডমণ্ড, তুর্গেনিভকে আমাদের সমীপে নিয়ে এলেন। এই বিদেশী লেখকের কী সুন্দর প্রতিভা! তিনি এক অতিকায় সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ শক্তি —শাদা চুলে তাঁকে দেখায় যেন পর্বত অথবা অরণ্যের আত্মার মতো।'

তুর্গেনিভই (১৮১৮-৮৩) প্রথম রাশিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাণীকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ইওরোপে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভাব ও মেজাজ তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট হয়েছিল অপরিসীম কলাকৈবল্যে। যদিও তাঁর সহজাত সাহিত্য-প্রতিভাকে অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই, তবু তিনি যেন অনমনীয় উদ্যমের দৃঢ়তাকে তাঁর রচনায় সম্যকভাবে সঞ্চারিত করতে পারেন নি। প্রায় তিরিশ বছর ফ্রান্স ও জর্মানীতে অতিবাহিত করে তুর্গেনিভ নতুন ধ্যান-ধারণায় উন্মীলিত ও উজ্জীবিত হয়েছিলেন। ফ্লবের, জোলা, হেনরী জেমস্ ইত্যাদি তৎকালের অনতিক্রম্য সাহিত্যপুরুষদের সঙ্গ ও সাহচর্য তাঁর চিন্তাভংগী ও দৃষ্টিভংগীতে স্বচ্ছতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিল। তিনি সৌন্দর্যের উপাসনা করেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, শিল্প-সচেতন মন নিয়ে মনুষ্য-চরিত্রের অধ্যয়ন করেছেন প্রায় ফরাসী প্রতীতিতে কিন্তু কোন সময় তাঁর রচনায় প্রচারের

গন্ধ সৃষ্টিকে কলুষিত করতে পারে নি যদিচ জীবন থেকে সরে যাবার পলায়নী-প্রবৃত্তিও তাঁর ছিল না। যে কালে তিনি বসবাস করেছেন তার সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর, যে-চেনা মানুষরা সমাজের সমস্যা-কণ্টকিত দরজা দিয়ে পৃথিবীর বুকে চলতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয় তাদের কথা তিনি ভোলেন না। 'This insistence on the writer's civic responsibility worked upon the diffident and malleable man that Turgenev was. It led him to fasten his attention upon the social and contemporary aspect of life with greater concentration than if he had followed the promptings of his own unpolitical mind.' তাঁর উপন্যাস কখনো ভারসাম্যের অভাবে পীড়িত হয় নি, তিনি নিজে হয়ত কিছু বিষাদ ও নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন কিন্তু তার গুরুভার তাঁর চিন্তা ও রচনাকে অসুস্থ করে নি কদাপি। তিনি রাশিয়া থেকে কিছুকালের জন্য অবসর নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু দেশকে ও মাতৃভাষাকে কোনদিন বিস্মৃত হন নি, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্তে সংযমী শিল্প-চেতনায় ইওরোপীয় ও ফরাসী যত্নে এবং ভাষাভংগীতে কৃষক, ভূমিদাসদের মর্মবেদনা উদ্‌ঘাটিত করেছেন, মধ্যরাশিয়ার অরণ্যভূমিতে পরিভ্রমণ করেছেন অক্লেশে, তরুণীদের সকরুণ লাবণ্য-কমনীয়তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, আবার কখনো গ্রীষ্মের রাত্রে গনগনে আগুনের সামনে বসে তাঁর সৃষ্ট কৃষক-শিশুরা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য সব গল্প বলেছে। আর, সবচেয়ে বড় কথা, এই সব গল্প বলতে গিয়ে তিনি কখনো ঘটনাবস্তুর উর্ণজালে পদে পদে জড়িয়ে পড়েন নি···'The germ of a story with him, was never an affair or a plot.'—একথা লিখেছিলেন হেনরী জেমস্‌, ১৮৮৪ সালে। তুর্গেনিভ-এর শিল্পীসত্তা বহির্দেশের ভাবনা-কৌলিন্যে মলিন হয় নি, তিনি ইওরোপীয় ধ্যান-ধারণার শ্রেষ্ঠ উপচারটুকু নিঃশেষে পান করে বলীয়ান হয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু কখনো তার পদলালিত্য স্বীকার করেন নি—রুশ মানসিকতা সদাই তাঁর মধ্যে সজাগ থেকেছে···'It is unthinkable that such a language should have been given to any but a great nation'. তুর্গেনিভ সম্পর্কে তাঁর অনেক স্বদেশী সমালোচক মৃদু অনুযোগের গুঞ্জন তুলছেন এই বলে যে, তিনি পশ্চিমের অনুরাগী থাকায় ইওরোপে তাঁর প্রতাপ কিঞ্চিৎ বেশি এবং তাঁকে প্রয়োজনাতিরিক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে, অথচ তাঁর তুল্য অন্য রুশ সাহিত্যিকরা তেমন আমল পান নি। কিন্তু এ অনুযোগ বোধহয়

সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ পশ্চিমে বা ফ্রান্সে তাঁর সমাজ-সচেতনতার ন্যায্য স্বীকৃতি বরং উপেক্ষিতই হয়েছে,—অধিকাংশ সমালোচকই তাঁর গল্প বলার শিল্পকেই সপ্রশংস অভিনন্দনে অভিষিক্ত করেছেন, কিন্তু শিল্পীর কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার উদ্দেশ নিতে গেছেন ভুলে। এতদ্ব্যতীত আজ এই একশ' বছরের পথ অতিক্রম করার বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের উদ্বিগ্ন মনকে এই ধারণায় শান্ত করেছে যে, তুর্গেনিভ সর্বাগ্রে ছিলেন মানুষ এবং শিল্পী, যে-শিল্পী কোন বিশেষ মতে বা পথে, কোন বিশেষ দলের অদল-বদলের সংকীর্ণ প্রণালীতে আবদ্ধ হন নি, পৃথিবীর ব্যাপ্তিতে নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন। কবির মতো স্নিগ্ধ স্বরে নরম শব্দে তিনি উপন্যাস লিখেছেন, আকাশের গায়ে তারাদের প্রশান্ত জগৎ যেমন পৃথিবীর পানে কোমল চোখে চেয়ে থাকে, তেমনি করে তাঁর চরিত্ররা গ্রন্থজগৎ থেকে আমাদের হৃদয়ে দৃষ্টি মেলে দেয়। কিন্তু না, বাইরে থেকে তাঁকে ভাবপ্রবণ রোমান্টিক মনে হলেও অন্তরে তিনি বোধহয় দৃষ্টবাদ আর নাস্তিক্যে দোলায়িত হয়েছেন। তুর্গেনিভ-ই সর্বপ্রথম বহির্জগতে রাশিয়া সম্পর্কে সব সংশয় ভেঙে দিয়েছিলেন, তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর আচরণ দেখে রাশিয়া সম্বন্ধে ধারণা বদলেছিল, তাদের পেলবতা আর কোমলতা দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। সেই সব স্বভাব-মধুর কমনীয় চরিত্র-বিশিষ্ট গল্পের (দি সিংগার্স ; বেঝ্‌হিন মেডো ; এরমোলাই অ্যাণ্ড দি মিলার্স ওয়াইফ) সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে আর কিয়ৎ-কালের মধ্যেই সেগুলি চিরায়ত সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয় এবং তুর্গেনিভকে দেশে-বিদেশে বন্দনা করা চলতে থাকে। তুর্গেনিভ-এর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'রুদিন' ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক ও চতুর্দশ দশকের এক ব্যর্থ প্রবক্তা, যে স্বপ্নাদর্শে আপন জীবনকে একদিন পরভূমে নিঃশেষ করে দিল, কর্মের কোন ক্ষেত্রেই নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে পারল না, এমন কি তার জীবনে যখন প্রেম এল অভিসারে, তখনও সে তাকে যোগ্য মর্যাদায় আহ্বান জানাতে ভুলল। 'রুদিন'-এর চরিত্রকে তুর্গেনিভ যুগ-প্রতিনিধি করে তুলতে পারেন নি, কিন্তু পার্শ্ব চরিত্রগুলির সংগে তার সম্বন্ধের উৎস সন্ধানে লেখক অত্যন্ত কুশলী পরোৎকর্ষতা প্রদান করেছেন। 'এ নেস্ট অফ জেন্ট্‌লফোক'-এর (১৮৫৯) নায়ক রুদিন অপেক্ষা অধিকতর মনোবল কায়েম করলেও এবং ভালবাসার আমন্ত্রণে সাড়া দেবার সাহস দেখালেও জীবনকে সে তেমন ঐকান্তিকতায় জীবিত করতে পারে নি বরং তদপেক্ষা কাহিনীর নায়িকা লিজা

বহুলাংশে প্রার্থিত ; তার শক্তি, অন্তরৈশ্বর্য এবং মানসিক উপরিকতা তাকে নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় কাব্যিক-চরিত্র রূপে প্রতিভাসিত করেছে। তুর্গেনিভের প্রকৃতিতে বোধহয় নারীসুলভ কিছু কমনীয়তা ছিল তাই অধিকাংশ রচনায় তিনি পুরুষের তুলনায় রমনীদের প্রতি যত্নবান হয়েছেন, তাদের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়েছে তাঁর। 'অন দি ঈভ্' (১৮৬০) উপন্যাসটিও রমনীকুলের উপরিকতার সাক্ষ্য বহন করছে এবং এতেও বুদ্ধিবাদী নায়কের ব্যর্থতা ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন তুর্গেনিভ। 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স্' (১৮৮২) তুর্গেনিভ-এর সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও বলশালী উপন্যাস বলে কথিত। এতে তিনি তাঁর প্রচলিত রচনা-পদ্ধতির আমূল সংস্কারে উদ্যত হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে যে অভিযোগ এতকাল হাওয়ায় ভাসত যে, তিনি পুরুষ-চরিত্রের তুলনায় নারী-চরিত্রাংকনে অপেক্ষাকৃত অধিক পারঙ্গম—সেই অভিযোগ অপনোদন করতে বদ্ধপরিকর তুর্গেনিভ এবার তাঁর নায়ককে শক্তিশালী করে প্রাচীন ও নবীন ভাবসংঘাতের জীবনরণক্ষেত্রে প্রতিযোগীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন, নিহিলিজম্-এর নতুন বাণী প্রচার করে তাঁর সম্পর্কে সকল ব্যর্থতার মিথ্যাকে খণ্ডন করতে চাইলেন। 'নিহিলিস্ট' শব্দটি তাঁরই দৌলতে প্রসার পেল এবং বইয়ের নিহিলিস্ট-নায়ক বাজারোভ তৎকালীন রাশিয়ার র‍্যাডিক্যাল-পন্থীদের দ্বারা ভীষণভাবে ভর্ৎসিত হলো। কারণ, তাদের এই ধারণা হয়েছিল যে, আসলে তুর্গেনিভ-এর দেশীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্বাসের নিদারুণ অভাব ঘটেছে এবং বাজারোভ চরিত্রটি তাদেরই উদ্দেশ্যে এক বিরাট মুখব্যাদান ও দাঁতখিঁচুনী ব্যতীত আর কিছু নয়। তুর্গেনিভ এই কঠিন অপবাদ সহ্য করতে পারলেন না। নীরবে কিন্তু ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সাহিত্যের সংস্পর্শ থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর সরে রইলেন। ইতিপূর্বে তাঁর কিছু মন্তব্যে তিনি সরকারের বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন এবং সংক্ষিপ্ত কারাবাস ও নির্বাসনে তাঁর শাস্তিভোগ সারা হয়েছিল। পাঁচ বছরের অবিচ্ছিন্ন মৌনতার পর তিনি 'স্মোক' (১৮৬৭) উপন্যাসে পুনর্বার মুখ খুললেন এবং রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল দলরা বাদেনবাদেনে পরস্পর সাক্ষাৎ করতঃ সমসাময়িক সমস্যার বিষয়ে স্ব-স্ব ভাব ও মনের আদান-প্রদান করল। তুর্গেনিভ-এর 'ভার্জিন সয়েল' (১৮৭৭) তাঁর বিপুল খ্যাতিতে অধিকতর মর্যাদা যুক্ত করে নি, তবে হেনরী জেমস্ এই উপন্যাসের বক্তব্যে এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তুর্গেনিভ-এর মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর 'দি প্রিন্সেস্ ক্যাসামাসিমা' উপন্যাসটিকে সমলোচকরা 'ভার্জিন সয়েল'-এর সংগে তুলনা করতে

বাধ্য হয়েছিলেন। তুর্গেনিভ সম্পর্কে সুবিন্যস্ত একটি বিশ্লেষণে একালের এক সুতীক্ষ্ণ সাহিত্যশিল্পী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বলেছেন, 'Turgenev did not see his books as a succession of events; he saw them as a succession of emotions radiating from some character at the centre...the connection is not that of events, but of emotions...Turgenev's ear for emotion was so fine that even if he uses an abrupt contrast, or passes from his people to the sky or to the forest, all is held together by the truth of his insight.' এই যে অন্তর্লোকের সত্য, অন্তর্দৃষ্টির সত্য, এই সত্যই শিল্পীর সত্য। তুর্গেনিভ নেতা ছিলেন না, ছিলেন না ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি যা ছিলেন তা-ই হয়েছেন,—তিনি শিল্পী। একদা একটি পত্রে তুর্গেনিভ লিখেছিলেন: 'I can not stand the empty skies, but I adore life, its reality, its whims, its accidents, its rites, its swiftly passing beauty.' বিশুদ্ধ শিল্পী না হলে এমন করে কে বলতে পারত একথা?

ষষ্ঠ দশকে রাশিয়ার সমাজ-জীবনে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে নিজেদের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি জ্ঞাত করছিল এবং সাহিত্যে, বিশেষত অস্ত্রো-ভস্কির নাটকে তাদের রূপদর্শন করা চলছিল। কিন্তু গোগোল এবং তুর্গেনিভের পর উপন্যাসের দ্বারা যিনি রুশ কথাসাহিত্যতে নতুন শক্তি সঞ্চার করলেন, সেই আইভ্যান গনচারভ (১৮১২-১৮৯১) যদিও তুর্গেনিভের পয়লা নম্বর শত্রু এবং ভিন্ন গোত্রের লেখক তবু তাঁর রচনায়ও তৎকালীন রাশিয়ার সেইসব অলস, ভাবনাপ্রবণ, স্বপ্নদর্শী, কর্মে অপটু যুবকদের প্রতিকৃতি রূপায়ণের ব্যত্যয় ঘটে নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'এ কমন স্টোরি' (১৮৪৭) অবশ্য রোমান্টিকধর্মী কিন্তু তিনি স্বদেশে 'ওবলোমোভ' গ্রন্থটিতেই মহা সোরগোল তুলেছিলেন এবং প্রত্যেক শিক্ষিত রুশবাসী গ্রন্থটির অসাধারণ প্রভাবের দুরতিক্রম্য ক্ষমতাকে নিজেদের জীবন ও চিন্তা থেকে রোধ করতে পারে নি। 'ওবলোমোভ' (১৮৫৯) শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছিল দীর্ঘ দশ বছর। ওবলোমোভ আরাম ও প্রাচুর্যের মাঝে মানুষ, ভূমিদাসদের স্বেদসিক্ত পরিশ্রমে তার সৌভাগ্যের প্রাসাদ উদ্ধত হয়েছিল। সে অলস দিনযাপনে জীবনের তাৎপর্য আবিষ্কার করে এবং দিবাস্বপ্নে ও নানা কল্পনার রঙে কালাতিপাত করাকে পরম ধর্মজ্ঞানে যাবতীয়

কর্ম থেকে বিরত হয়। কলেজী শিক্ষাও তাকে সেই ধারণা থেকে মুক্ত করতে পারে না। জীবনে বসন্ত সমাগম হলে প্রেমকে যদিচ সে স্বীকার করার সাহস দেখায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেও সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এমনি করে ধীরে ধীরে জীবন ও কর্ম থেকে তার প্রস্থান ঘটল, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর বিন্দুতে তার অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে মিলিয়ে আসতে লাগল। উপন্যাসটি হয়ত সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত ছিল না কিন্তু তাতে তৎকালীন রাশিয়ার জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন ছিল বলে জনমানসে প্রচণ্ড একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। লেখক অত্যন্ত বিশদ বর্ণনাকারে একটি চরিত্রের ব্যর্থতা, তার জীবন থেকে পলায়নের অপচেষ্টায় অসহায় পরিণতিকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গনচারভ-এর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দি প্রেসিপিস্' (১৮৬৯) লিখতেও সময় নিয়েছিল দশ বছর। ভোল্গা অঞ্চলের পটভূমিতে ষষ্ঠ দশকের জাতীয় জীবনযাত্রা ও মনোভংগী বিধৃত হয়েছিল এই উপন্যাসে। গনচারভ তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসের অসাধারণ সাফল্যেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তিনি চাইছিলেন তাঁর সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করতে। রাশিয়ার সামগ্রিক রূপকে বাস্তবানুগ বিশ্লেষণে চিরস্থায়ী কীর্তি স্থাপন করতে আর সেই কারণে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস পরিশ্রম ও অধ্যয়ন সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সাড়া জাগাতে পারে নি, পারে নি সাফল্যকে স্পর্শ করতে। অতিমাত্রায় সজাগ ও সচেতন গনচারভ এই রচনায় ভেরার প্রেমে ব্যর্থতা হেনে নতুন যুগশক্তির ও যুগচিন্তার যবনিকা টেনে দিতে চেয়েছিলেন, তাছাড়া, তাঁর গুরুগিরির গুরুভার বইটির স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতিকে করেছিল ক্লিষ্ট। আর তাই, গনচারভ-এর সংস্কারাবদ্ধ, বুর্জোয়া চিন্তা-প্রোথিত এই উপন্যাসটির ধরন-ধারণ রুশ পাঠকদের হৃষ্ট করতে পারে নি।

১৮৬০ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার অন্তরে ও বাইরে প্রভূত পরিবর্তনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছিল। এই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক বিবর্ধনের প্রথম হেতু সূচিত হয়েছিল বোধ হয় কৃষক ও ভূমিদাসদের স্বাধীনতার উদ্‌ঘোষণা থেকে। জারেদের বিরুদ্ধে তলে তলে প্রচণ্ড জনবিক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল। নিহিলিস্টরা আস্তে আস্তে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছিল গণজাগরণে, স্বতন্ত্র বিপ্লবী দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। নতুন নতুন ভাবনার বাণী ও চিন্তার আলোকঝর্ণা বয়ে নিয়ে এলেন বাকুনিন, পিসারেভ, পিটার ল্যাভরভ। মার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল'-এর অনুবাদ সারা হলো। এতৎসহ শিক্ষার প্রসার পেতে লাগল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মানুষ বহুপ্রকার গোঁড়ামি ও প্রাচীন ধারণাকে বিসর্জন

দিয়ে স্বাভাবিকতায় পারল মুক্তির নিশ্বাস নিতে। জারেদের অন্ধকার রাজত্ব থেকে এবার যেন কোথাও কোথাও সমাজবাদের ক্ষীণ আলোকশিখা লক্ষ্য করা যেতে লাগল। দস্তয়ভ্স্কি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগে থেকেই রাশিয়ায় পপুলিস্ট আন্দোলন প্রবল হয়েছিল। আর উনবিংশ শতাব্দীতে মার্ক্সবাদীরা দুর্দমনীয় শক্তিতে পপুলিস্টদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ালেন। এর মধ্যবর্তী সময়ে কয়েকজন কথাশিল্পীর সাহিত্যপ্রচেষ্টা বিশ্বসাহিত্যকে কতখানি সম্পদশালী করেছিল জানি না, তবে রুশ কথাসাহিত্যের ইতিহাসকে ঘটনাময় করেছিল, দিয়েছিল একটা সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা। পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব অবদান অবজ্ঞাত থাকলেও হয়ত ক্ষতি হয় না, কিন্তু একটি দেশের সাহিত্য-ইতিহাস তাতে বিঘ্নিত হয়, সংযোগের সূত্র যায় ছিঁড়ে। তাই, কালের সেইসব স্বল্পনাম মশালচীদের উদ্দেশ নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

আলেকজান্দার শেলার মিখাইলভ, মিখাইল সালতিকভ (১৮২৬-৮৯; যিনি 'দি গলোভ্লিয়ভ্স' উপন্যাসে রুশ বুদ্ধিজীবিদের প্রকৃতি উন্মোচন করে এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাস্তবানুগ স্কেচ ও রচনায় রুশ জনসমাজে সম্মানিত স্থান পেয়েছিলেন), কনস্তানতিন লিওনিতেভ ইত্যাদি ঔপন্যাসিক ও রচনাকাররা আপন আপন কলাবিধি প্রয়োগ করে রুশ কথাসাহিত্যের ইতিহাসকে তথ্যাক্রান্ত করেছেন। কিন্তু এই সময় যাঁরা আরো সুনিশ্চিত প্রতিভায় রুশ জীবন ও সমাজকে উপন্যাসের অঙ্গে সঞ্চালিত করে অক্ষয় স্থায়িত্ব পেয়েছিলেন, বিভিন্ন মত ও ধুয়ার পরিমণ্ডলকে আশ্রয় করে উজ্জীবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজনকে স্বতন্ত্রভাবে চিনে নিতে দেরি হবার কথা নয়।

মেলনিকভ (১৮১৯-৯৩) তাঁর 'অন দি হিল্স' এবং 'ইন্ দি উড্স' প্রভৃতি উপন্যাসে শুধু যে মহৎ-রচনার বীজ উপ্ত করেছিলেন তাই নয়, প্রাচীন রাশিয়ার বিশ্বাসকে এত সুগ্রথিতভাবে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন যে পরবর্তীকালের মূল্যায়নে গোর্কিও তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ভোলেন নি।

আলেক্সি পিসেমস্কি (১৮২০-৮১) বাস্তবানুসারী ঔপন্যাসিক রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাঁর রচনাতেও ওবলোমভ-জাতীয় চরিত্রের অংকনপটুতা ধৃত হয়েছিল। রুশ সাহিত্যে যারা 'সুপারফ্লুয়াস ম্যান' নামে সমধিক খ্যাত। তাঁর

'এ থাউজেণ্ড সোল্‌স' রাশিয়ার ধ্রুব-কথাশিল্পের অঙ্গীভূত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

কিন্তু অসামান্য ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে উদিত হয়েছিলেন নিকোলাস লেসকভ (১৮৩১-৯৫)। ছোটগল্প, উপন্যাস থেকে শুরু করে নানা দিকে তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মকে বিস্তৃত করেছিলেন এবং এইসব রচনায় চরিত্রের স্পষ্টাভাস, কৌতুকের আবরণে জীবনাভাস প্রতিফলিত হয়েছিল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভংগীতে। তিনি সহৃদয়ে রুশ-জীবনের সামগ্রিকতাকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন কথা-সাহিত্যে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর অসীম জনপ্রিয়তার কারণও ছিল তাই। তাই, মৃত্যুর পরেও নতুন আবিষ্কারের মূল্যে তিনি পঠিত হয়েছেন রাশিয়ায়। রুশ জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে, তাঁর তাৎপর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গোর্কি বলেছিলেন 'he did not write about the muzhik, the Nihilist, the landowner—he wrote about the Russian. One feels that in each of his tales, Leskov was mainly pre-occupied with the destiny of the whole of Russia rather than with that of any individual. He is one of the foremost Russian writers, and his work took in all of Russia!'

তুর্গেনিভ-এর পর রুশ সাহিত্যের দ্বিতীয় মহাশিল্পী ফিডর দস্তয়ভ্‌স্কি (১৮২১-৮১) তাঁর রচনায় সামগ্রিকভাবে যে ধর্ষকাম মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার কারণের সূত্র অনুসন্ধান করে অনেকেই এবম্বিধ ধারণার বশবর্তী হয়েছেন যে, দস্তয়ভ্‌স্কির ব্যক্তিগত জীবনের অরুন্তুদ ক্ষোভ ও বেদনাই তার জন্য দায়ী। বোধের উদয় হবার ঊষাকাল থেকেই যন্ত্রণা, বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুর ঘন ঘন যাতায়াত প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে দস্তয়ভ্‌স্কিকে। তাঁর বাবা ছিলেন এক দাতব্য হাসপাতালের ক্ষুদ্র চিকিৎসক। হাসপাতালের সীমানায় ছোট্ট একটি আশ্রয়ে বসবাসকালেই দস্তয়ভ্‌স্কি দেখেছিলেন জীবনের ভয়ংকর রূপ,—রোগীদের আর্তরব এবং অকস্মাৎ পৃথিবীর দ্বার দিয়ে এক একটি মানুষের প্রস্থান তাঁকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে উন্মোহিত হবার কোন অবকাশ দেয় নি। তারপর ষোড়শ বর্ষে যখন তিনি তাঁর মা-কে হারালেন, সেই ক্ষীণদেহ, রুগ্ন অথচ স্নেহশীলা মা, তখন মৃত্যুর স্বাদ তিনি খুব কাছ থেকে জানলেন। আর তাঁর বাবা

যেদিন ভূমিদাসদের হাতে খুন হন তার অনেক আগে থেকেই দস্তয়ভ্স্কির মনে—হয়ত দুর্ভাগ্যে, তিক্ততায় একটা যূথচারী প্রবৃত্তি জন্মলাভ করেছিল। তাই তিনি অবচেতনভাবে পিতার মৃত্যুই কামনা করেছিলেন (ফ্রয়েড-এর ধারণাজাত উক্তি) যদিও তা ঘটলে তিনি মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। তারপর তাঁর নিজের বিপ্লবী কার্যকলাপের ফলে বন্দী হওয়া এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসন যাওয়া তাঁকে তাঁর অভ্যন্তরে অধিকতর বিমর্ষতার প্রতিবেশ রচনা করতে সাহায্য করেছিল। অবধারিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার অভিজ্ঞতা (প্রথমে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় এবং পরে জারেদের অসীম কৃপায় তা রহিত হয়েছিল) তিনি আপন শরীরের, আপন সত্তার সকল অণু-পরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। যে-মৃত্যুকে তিনি আশৈশব হাসপাতালের সীমানায় খেলা করতে দেখেছেন সেই মৃত্যু যেদিন অমোঘ খেয়ালে তাঁকে বধ্যভূমিতে এনেও কাছ থেকে ফিরে গেল, সেদিন তিনি তাকে আলিঙ্গন করতে সচেতন থাকতে পারেন নি, মৃত্যুর পায়ের ভীষণ শব্দ শুনতে শুনতে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। যখন জ্ঞান ফিরল তখন তিনি লোহার খাঁচায় বন্দী। আর, এই লৌহদণ্ডের বেষ্টনী যা তাঁর অন্তরকে সেদিন গভীর বেদনায় বিদ্ধ করেছিল, তার যন্ত্রণা থেকে তিনি কোনদিন মুক্তি পান নি···একটা অমেয় বিষাদের ঘন তুষার তাঁর সত্তার মূলে পুঞ্জ পুঞ্জভাবে পড়েছে আর পড়েছে। পরবর্তী জীবনেও তিনি কখনো স্বস্তির আরামকেদারায় বসে পৃথিবীকে দু'দণ্ড মুগ্ধ চোখে দেখবার অবসর পান নি। তাঁর ব্যাধি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে,—আর যা তাঁকে কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে ছেড়ে যায়নি তা হলো দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের হুমকীতে, তার সন্তোষবিধানের জন্য তাঁকে ক্রমাগত লিখতে হয়েছে, ক্ষমতাকে করতে হয়েছে ক্ষয়। অনেকেই বলেছেন এইসব কারণে দস্তয়ভ্স্কি ধর্ষকাম, দস্তয়ভ্স্কির শিল্পশালায় তাই এত খুন-জখমের হানাহানি, দুর্বৃত্তদের কানাকানি, তাই হাসি-কৌতুকের এত অভাব, দুঃখ-দুর্দৈবের প্রভাব। কেউ কেউ তাঁর রচনায় ব্যাধিতি আবিষ্কার করেছেন, কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন 'পাগলাগারদের শেক্সপীয়র'। দস্তয়ভ্স্কির প্রথম উপন্যাস 'পুওর ফোক' (১৮৪৬) প্রকাশিত হবার পর সমালোচক বেলিনস্কি লিখলেন 'He does not obtain his effects by that knowledge of life and the human heart which come from experience and observation. He knows them and knows them profoundly but a priori and therefore in a

purely aesthetic and creative spirit,' ওই বছরেই, 'পুওর ফোক' প্রকাশ পাবার অব্যবহিত পরেই তাঁর 'দি ডব্‌ল' উপন্যাসটি বেরোয়। বইটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন 'Dostoevsky plans a thriller and writes The Double, an acute study of the duality of man's character ; he begins a crime story and ends on the theme of salvation'. অতঃপর দস্তয়ভ্‌স্কির মাথায় সেই দুর্ভাগ্যের আকাশ ভেঙে পড়ল। স্বাধীনতাহীনতায় বেঁচে থাকার গ্লানিকে অপনোদন করতে তাঁরা কয়েকজন উদ্যমী তরুণ ইউটোপীয় সমাজবাদে উদ্দীপ্ত হওয়ার ফলস্বরূপ মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে সাইবেরিয়ায় গেলেন নির্বাসিত জীবন যাপন করতে। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর চার বছরের কঠিন যন্ত্রণাক্ত দিনগুলোর কথা তিনি লিপিবদ্ধ করলেন 'মেময়ার্স ফ্রম দি হাউস অফ দি ডেড' (১৮৬২) নামক আশ্চর্য রচনায়। তখন থেকেই দস্তয়ভ্‌স্কির অন্তরে অস্থিরতা আর অশান্তি ছটফটিয়ে উঠেছে, তিনি সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য, সাম্যের জন্য অসহায় কাতরতায় ব্যাকুল হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, মানুষের শক্তির অপচয়ে তাঁর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে 'And how much youth lay uselessly buried within these walls, what mighty powers were wasted here in vain ! After all, one must tell the whole truth ! These men were exceptional men, perhaps they were the most gifted, the strongest of our people. But their mighty energies were vainly wasted, wasted abnormally, unjustly, hopelessly. And who was to blame, whose fault was it ?' দস্তয়ভ্‌স্কি তাঁর সাহিত্য-চেতনার উন্মেষকালেই বাস্তবতার পাঠ-গ্রহণ শেষ করেছিলেন কিন্তু তাঁর যাত্রারম্ভ হয়েছিল কল্পপ্রদে গোগোলের পদাঙ্ক অনুসরণে এবং হফম্যান বা উগোর মতো রোমান্টিকদের কাছে তাঁর যথেষ্ট ঋণ স্বীকার করার কারণ ছিল। কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্তায়, সুবেদী মানসিকতায় শিল্পীর প্রত্যয় ছিল অসাধারণ—তাঁর উপজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা জীবন সম্পর্কে তাঁকে উদাসীন থাকতে দেয়নি, মানুষের প্রতি অবিচারে, তাদের অপমানিত ও অপহৃত আত্মার প্রতি সমবেদনায় তাঁর কিছু না বলে উপায় ছিল না। 'ইন্‌সাল্টেড অ্যাণ্ড দি ইনজিওর্ড' (১৮৬১) উপন্যাসে দস্তয়ভ্‌স্কি অতঃপর তাদেরই প্রবক্তা হলেন যারা সমাজের চোখে মহা ঘৃণ্য এবং গুরুতর অপরাধী।

আর, এই উপন্যাসে প্রথম তিনি নিজেকে চেনালেন, তাঁর ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের উদ্‌ঘোষণার প্রথম পর্ব সারা হলো। সাধারণ রহস্য-কাহিনীর প্রথম রচনা থেকে এ বহুদূর পথ অতিক্রম—এখানে তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। দস্তয়ভ্‌স্কি ধীরে ধীরে আপনার মধ্যে মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বাভাস উপলব্ধি করেছেন, তাঁর দর্শন এবং মনন এক বিশেষ স্বরূপে মনুষ্যচরিত্রের বিচিত্র আলোয়-ছায়ায় প্রতিভাসিত হয়েছে, কখনো ধর্মকামে, কখনো মর্ষকামে মর্ত্যের এই মৃত্তিকায় মানুষ নামক জীবের বিস্ময়কর প্রবৃত্তির রহস্যোদ্ঘাটনে যত্নবান হয়েছেন তিনি। 'নোট্‌স ফ্রম আণ্ডারগ্রাউণ্ড' (১৮৬৪), দস্তয়ভ্‌স্কির তাৎপর্যপূর্ণ রচনা…'তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কর্মের চাবিকাঠি', বলেছিলেন আঁদ্রে জিদ্। বুদ্ধদেব বসু আবার এই রচনার সংগে বোদলেয়রের 'লা ফ্লুর দ্যু মল'-এর সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর অভিমত 'নোট্‌স ফ্রম আণ্ডারগ্রাউণ্ড' যেন 'লা ফ্লুর'-এরই গদ্য বিবরণ, শুধু পিটস্‌বার্গে স্থানান্তরিত হয়ে বোদলেয়রের জগৎকে ব্যক্ত করেছে। দস্তয়ভ্‌স্কির নায়কের মধ্যে যে প্রতিনায়কত্ব বা নায়কত্বহীনতা পরিস্ফুট হয়েছে তা বোদলেয়রের 'আমি'র সর্বব্যাপিতায় সমানশক্তিতে তুলনীয়। দস্তয়ভ্‌স্কির এই 'ভীষণ অন্তর্দৃষ্টি'র উপন্যাসটির আরেক কারণে তাৎপর্য আছে। 'একজিসটেন-সিয়ালিজম' বা অস্তিত্ববাদ রচনাটিতে সম্পূর্ণ সার্থকভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল, 'Notes from Underground is the best overture for existentialism ever written,' তাছাড়া এই তত্ত্বের নিপুণ প্রতিপালক সার্ত্র্ জানিয়েছেন যে আসলে অস্তিত্ববাদের মূল সূত্র নিহিত ছিল দস্তয়ভ্‌স্কির রচনাতেই। 'নোট্‌স ফ্রম আণ্ডারগ্রাউণ্ড'-এ দস্তয়ভ্‌স্কি বললেন, বুদ্ধি কিংবা কর্মের মোক্ষতেও সমাজে দুঃখ ঘোচা সম্ভব নয়, কারণ সমস্ত অসুস্থতা ও অব্যবস্থার জন্ম মানুষের প্রকৃতিতে। যে মনুষ্যপ্রকৃতি সতত অস্থির, আপন সত্তার বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বে অশান্ত। সুতরাং গোলযোগটা মানুষের চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা বা ব্যবস্থায় নয়—সেটির উত্থান তার মনে, তার শরীরে, যা মানুষকে অবিবেচক করে, নিষ্ঠুর করে, বিপদের অনিশ্চিত উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যায় বারংবার। ১৮৬৬ সালে একটি হ্রস্ব উপন্যাস বেরিয়েছিল দস্তয়ভ্‌স্কির। 'গ্যাম্ব্‌লার' প্রধানত তাঁর আপন জীবনের ঘটনায় সমাচ্ছন্ন,—প্রথমা স্ত্রী'র দেহান্তের পর সুসলভার সংগে তাঁর ব্যর্থ প্রেমের বেদনাময় অধ্যায় তাতে সন্নিবেশিত হয়েছিল, আর নিজে যে নেশার দাসানুদাস হয়েছিলেন তিনি, সেই জুয়াখেলার অভিজ্ঞতা তাতে বর্ণনাকার রূপ পেয়েছিল। এই জুয়াখেলা

সম্পর্কে তিনি একদা তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন, 'উপন্যাস, একমাত্র উপন্যাসই এখন আমাদের বাঁচাতে পারে, যদি কেবল তুমি জানতে আমি এর ওপর কত আস্থা স্থাপন করি। নিশ্চয় জেন, আমি আমার লক্ষ্যে পৌছব এবং তোমার মর্যাদার যোগ্য হতে পারব। আর, আর কখনো জুয়া খেলব না। ১৮৬৫ সালে আমার এই অবস্থাই হয়েছিল। তার চেয়ে ভীষণ অবস্থা আমার হতে পারত না কিন্তু তখন আমার কাজই আমাকে বাঁচিয়েছে। আশায় এবং ভালবাসায় আমি আবার কাজ আরম্ভ করছি; তুমি দেখো দু'বছর পরে কি হয়!' দস্তয়ভ্স্কি যখন একথা লিখেছিলেন তখন তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়েছে। দস্তয়ভ্স্কির অন্তরে অবিরাম যে সত্তার সংগ্রাম চলত, সমাজবোধের তীব্র জ্বালা তাঁর মনস্তত্ত্বে যে নব নব চিন্তার উন্মেষ ঘটাত তদ্দ্বারাই তিনি রাসকলনিকভকে স্বতন্ত্র চরিত্র-ঐশ্বর্য দান করেছিলেন। তার হত্যাপরাধের পিছনে শুধুই বস্তুজগতের অপূর্ণ চাহিদা কার্যকরী হয়নি, তার মধ্যে ছিল অস্মিতার ব্যাধিতি—ছিল জীবনের সার্বিক চেহারার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ। বৃদ্ধার বাঁচার কোন প্রয়োজন নেই এবং তার অপর্যাপ্ত টাকা আছে—রাসকলনিকভ তার হাতকে খুনের রক্তে রাঙা করবার এইটাই একমাত্র হেতু ভেবে সন্তুষ্ট হয়নি, সে সোনিয়াকে বলেছিল, 'I wanted to become a Napoleon, and that's why I murdered the old woman.' সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তিতে এই যে অসাধারণ হবার সাধ, এই যে আপন বৃত্তের বাইরে পরিব্যাপ্ত হবার প্রাবল্য, এটা দস্তয়ভ্স্কির আপন স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞা-জাত বিশেষ মনুষ্যচরিত্র অধ্যয়ন। তাঁর হৃদয়ের গোপনে যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সুবেদী মন প্রতিনিয়ত মানুষের পার্থিব যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে উভয়সংকটে দুলেছে, তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর অননুকরণীয় কলা-বিধিতে, প্রক্ষোভিত সংবেদ্যতায় এবং আধা মেটাফিজিক্স-এর রোমাঞ্চে। আলোচ্য উপন্যাসে দস্তয়ভ্স্কির শেষ কথা হচ্ছে মানুষের চরিত্রে সবটুকুই কালো হতে পারে না, তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আছে, তার কর্মের পুনর্বিবেচনা আছে এবং তা আসে ক্লেশকণ্টকিত পথে, নিপীড়ন সহ্য করতে করতে। সেই যে আয়াসলব্ধ আত্মোপলব্ধি (যা রাসকলনিকভকে নবজীবন দান করেছে) তাই একদিন তাকে পবিত্র করে তোলে এবং হয়ত ধর্মের জ্যোতির্ময়ালোক তাকে শান্তির পথ বলে দেয়। আর দস্তয়ভ্স্কির অন্তরে এই যে বিতর্কের সভা বসে তাঁকে অস্থির করে, দেবতার অস্তিত্বের সংক্ষোভ করে অশান্ত—তার পরিচয়

বহন করেছে, প্রতিনিধিত্ব করেছে তাঁর চরিত্ররা, যে-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আঁদ্রে জিদ্ বলেছেন, 'His principal characters are always in the formation never quite emerging from the shadows...Note how profoundly different he is from Balzac, whose chief care seems ever to be the perfect consistency of his characters. Balzac paints like David ; Dostoevsky like Rembrandt, and his portraits are artistically so powerful and often so perfect that even if they lacked the depths of thought that lie behind them, and around them, I believe that Dostoevsky would still be the greatest of all novelists.' 'দি ইডিয়ট'-এর প্রিন্স মিশকিনকে দস্তয়ভ্স্কি মনুষ্যচরিত্রের বিরল প্রবৃত্তিতে সাজাতে চেয়েছিলেন,—তার সারল্য তার উদারতা, তার অসীম সহ্যগুণ তাকে অনেকটা দিব্যকান্তি করেছিল কিন্তু অবস্থার আকস্মিকতায় এবং ঘটনাপারম্পর্যে সেই মানুষ ভাগ্যের বিপর্যয়কে রোধ করতে পারল না। ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তার পৃথিবীবাস সংকটাপন্ন হলো এবং ক্রমশ তার অস্তিত্ব হলো সংকুচিত। দস্তয়ভ্স্কির আপন চরিত্রের অন্তর্নিহিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবসংঘাতের মতো তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররাও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নানাদিকে মুক্তির পথ খুঁজেছে, উত্তরায়ণের জন্য কখনো ব্যাকুল হয়ে মহৎভাব প্রকাশ করেছে, কখনো নিকৃষ্টতম অপরাধের ঘূর্ণাবর্তে বেদনার্ত হতে হতে তাদের মধ্যে জেগেছে আত্মজিজ্ঞাসা, শুভবুদ্ধির আনুকূল্যে তাদের আত্মোপলব্ধি হয়েছে। 'দি ইডিয়ট' সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন, 'The main and fundamental idea of the novel is that the idiot is so morbidly proud that he can't help considering himself a God and yet at the same time he respects himself so little that he can't help despising himself violently.' মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে এই তাঁর সবিশেষ অনুশীলন। দস্তয়ভ্স্কি তাঁর সাধনাকে পবিত্র করলেন 'দি ব্রাদার্স কারামোজোভ'-এর (১৮৮০) অকল্পিত সিদ্ধিতে। তাঁর ভাবনার, তাঁর কলাবিধির সকল নদী এসে মিশল এই একটি গ্রন্থে—একটি সাগর রচনা করল। দস্তয়ভ্স্কির অন্যান্য রচনা যদি দেহ হয়, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয় তাহলে 'দি ব্রাদার্স কারামোজোভ' তার আত্মা। এই উপন্যাসের আধিবিদ্যাবৎ বিশ্লেষণে দস্তয়ভ্স্কি মহামানবের মতো জীবনের নতুন বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে চাইছিলেন···

বিদ্রোহী আইভান মনে মনে অস্তি-নাস্তির দ্বন্দ্বাভাস অনুভব করে এবং পরিশেষে তার এই চূড়ান্ত ধারণা জন্মায় যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার বিনিময়ে এই পৃথিবীতে যদি কোন সুখ-স্বস্তির আশ্বাস না-ই পাওয়া যায় তবে দরকার নেই দেবতার এই জীবনে—অন্যায় অবিচার আর মৃত্যুর কঠিন পরীক্ষা পার হয়ে ঈশ্বরের করুণাকণা আয়ত্তের বাইরেই থাকুক, মানুষ কোন স্বর্গের আশায় কিংবা নরকের ভয়ে নয়, নিজের প্রতি সততায়, সত্তার শুদ্ধির কারণেই সে সজাগ হবে। ফ্রয়েড বলেছিলেন, 'Dostoevsky's place is not far behind Shakespeare. The Brothers Karamazov is the most magnificent novel ever written ; the episode of the Grand Inquisitor, one of the peaks in the literature of the world.' অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগী, স্লাভোফিলস্‌দের উগ্র সমর্থক, উত্তরকালের সাহিত্যশিল্পীদের পথিকৃৎ দস্তয়ভ্‌স্কি জগতের সকল বুদ্ধিজীবি পাঠক ও লেখকের কাছে যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারানসী। তিনি গভীর সংবেশনে কতকগুলি অলীক ছায়াপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন, ধরার ধূলায় রক্ত-মাংসের মনুষ্যলোকে অবতরণ করেন নি, একথা বলে কেউ কেউ তাঁর দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন কিন্তু সে ধারণা অমূলক, কারণ মানুষের মন,—যে রক্ত মাংসের মানুষ এই ধরার ধূলায় বাস করে, তাদের প্রক্ষোভ, তাদের হৃদয়বৃত্তির বিবিধ আচরণ, তাদের সত্তার সংগ্রামকে এমন সততায়,—নিজেকে তাদের প্রতিটি অবস্থায় জড়িত করে, বিপদগ্রস্ত করে এমন একনিষ্ঠতায়, বন্ধুর বেশে আমাদের স্বরূপকে তাঁর মতো আর কেউ চেনায় নি। তিনি আমাদের বিবেকরক্ষক এবং তিনিই আমাদের বিবেকানন্দ—তাঁর ব্যবচ্ছেদাগার শুধুই মানুষের যন্ত্রণার্ত ব্যাধিতির শোচনীয় পরিদৃশ্য নয়, অখণ্ড মানুষের জ্যোতির্ময়লোকও বটে—যেখানকার সত্যবাদী দর্পণে মানুষ আপনার ছায়া দেখে চমকে ওঠে, তারপর তাদের আচরণের হিসাব মেলাতে বসে, তাদের আত্মার উদ্‌বোধন হয়। কিন্তু বহু কথা বলেও দস্তয়ভ্‌স্কিকে পরিমাপ করা যায় না—আসলে তিনি পড়বার বা তর্ক করবার বস্তু নন, হৃদয়ের গভীরে অনুভব করবার মতো একটি গম্ভীর প্রার্থনা।

দস্তয়ভ্‌স্কির মৃত্যুর পর তলস্তয় লিখেছিলেন : 'I never saw the man, had no sort of direct relations with him, but when he died, I suddenly realised that he had been to me the most precious, the dearest, and the most necessary of beings.' কিন্তু প্রত্যক্ষ

আত্মীয়তা না-থাকলেও দস্তয়ভ্স্কি ও তলস্তয় সমালোচকদের তুলনামূলক আলোচনার উত্তেজনা থেকে রেহাই পান নি। কেউ বলেছেন দস্তয়ভ্স্কি হচ্ছেন আত্মার দ্রষ্টা এবং তলস্তয় দেহের। কারো অভিমত প্রথম জনে আছে আত্মমুখ উদ্গতি এবং দ্বিতীয় জনে বিষয়মুখীতা, মহাকাব্যের বিশালতা। কিন্তু কোনপ্রকার তুলনা ও প্রাক্কলন ব্যতিরেকেও দু'টি মহাশিল্পীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানান চলে এবং দু'জনের দু'টি আলাদা জগৎ থেকে সঞ্চারিত আলো-উত্তাপকে অনুভব করা যায়, যায় তাঁদের আকাশের রঙে মুক্তির নিশ্বাস নেওয়া।

কাউণ্ট লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) এই বিশ্বজনীন, সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা পেতেন না যদি তিনি শুধুই ঔপন্যাসিক হতেন, এবং যদি তিনি ঔপন্যাসিক না হতেন তাহলে হয়ত তাঁর সংস্কারকের ভূমিকা নেওয়া, মানুষের মুক্তির গান গাওয়া হতো না এমন একনিষ্ঠভাবে, তদ্গতচিত্তে। তলস্তয়ের হৃদয়ের জাগরণ হবার পুর্বে যে নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে তাতে হয়ত তুর্গেনিভের কাব্যময়তা ছিল না, ছিল না দস্তয়ভ্স্কির উপজ্ঞাজাত প্রগাঢ়তা। কিন্তু যা ছিল,—একটি সংবেদনশীল মন, তাৎপর্যপুর্ণ বর্ণনার আশ্চর্য দখল এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অসাধারণ শক্তি,—সেই নিয়ে তিনি কঠোর পরিশ্রমে নেমেছেন, অবতীর্ণ হয়েছেন পরীক্ষায়। আর নিজেকে সর্বদা নানাবিধ পরীক্ষার প্রহরায় রাখতে রাখতে একদিন তাঁর অন্তরে উপলব্ধির সাড়া পড়েছে—তিনি তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রে উপবেশন করে একটি মহৎ আবির্ভাবের দায়িত্বে মানুষের পৃথিবীবাসের সকরুণ অবস্থায় মুক্তির বাণী শোনাতে চেয়েছেন কিন্তু দূর থেকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর নিয়ম কাঠিন্যের বাকসর্বস্ব নীতি ও প্রক্রিয়ায় নয়, গৃহী সন্ন্যাসীর মতো জীবনের সকল কামনা-বাসনায়, ভ্রান্তিতে বঞ্চনায় বিগলিত হয়ে, নিরুদ্দিষ্ট হয়ে—প্রবৃত্তির বিভিন্ন দাবীকে অনুমোদন করতে করতে, কাছের মানুষের সম্প্রসারণতায়। তাঁর হৃদয়ে পরিষ্কার একটি বিভেদের রেখা জেগে থেকেছে সর্বদা, যদ্দ্বারা কোন এক ইচ্ছার জন্ম হবার সংগে সংগেই অপর পক্ষের প্ররোচনায় তার মৃত্যু হয়েছে, যদ্দ্বারা তাঁর মর্মের সংগে কর্মের আশ্চর্য বৈপরীত্য ঘোষণা হয়েছে বারংবার। তাই তিনি অভিজাত হয়েও কৃষকদের সংগে নিজেকে একস্তরে মিলিত করতে চেয়েছেন, তাই উগ্র প্রাতিস্বিক হয়েও চেয়েছেন জনতার মিছিলে আপনার অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিতে, নিজে দেহের তৃষ্ণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে তবেই

শেষে যৌনকাম সম্বন্ধে মানুষকে করেছেন সাবধান। জীবনকে ভোগ করবার প্রবল বাসনা অনুভূত হবার পরই তিনি পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বলতে পেরেছেন মৃত্যুর গোপন কথা…'মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু প্রতি মুহূর্তেই অপেক্ষা করছে তোমার জন্য' এবং 'মৃত্যুর উপস্থিতিতেই তোমার জীবন বয়ে চলেছে'। 'He was an aristocrat who yearned to identify himself with the peasant. He was an individualist who wanted to lose himself (and us) in the mass. He was an epicurean artist who converted himself to the narrowest puritanism. He had the sexual virility of three ordinary men and feared and finally condemned sexual relations. He had the life-urge of ten ordinary men and went for ever in dread of death.' তলস্তয়-এর মধ্যে এই যে স্ববিরোধী সত্তার সংগ্রাম চলেছে তা তাঁকে যেমন প্রতিনিয়ত অস্থির করেছে, পাঠক-সমালোচককে তেমনি করেছে বিচলিত। তাঁরা সেই কারণে তলস্তয়ের অখণ্ড রূপকে অনুধাবন করতে চান নি, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে তাঁর গোটা ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করেছেন—কেউ তাঁর চরিত্রের আলোয় সমগ্র সাহিত্যকর্মকে বিচার করেছেন, কেউ তাঁর সংস্কারকের ভূমিকাটুকু সুনজরে দেখেন নি, ঔপন্যাসিক তলস্তয়কে প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কেউ আবার ঔপন্যাসিক এবং প্রচারক ও সংস্কারক তলস্তয়কে শ্রদ্ধার আসন দিলেও মানুষ তলস্তয়কে তাঁর অত্যধিক জীবনাসক্তির হেতুতে কীতির চেয়ে মহৎ মনে করতে পারেন নি। আর অন্তর্নিহিত এই বৈষম্য, এই পরস্পর বিরোধী বৈপরীত্য শৈশব থেকে তাঁর অনুসারী হয়েছে। তারপর যখন তিনি গল্প উপন্যাসের আশ্রয়ে নিজের উদ্‌বোধন চেয়েছেন তখন বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে আপনার ছদ্মবেশকেও উন্মোচন করেছেন সম্পূর্ণভাবে, নিজের অস্থির চিত্তচারিতাকে অগোপন করেছেন তাদের ব্যবহারে। তলস্তয় কদাপি উপাখ্যানকে তেমনভাবে প্রশ্রয় দেন নি, (ই. এম. ফর্স্টার বলেছিলেন, তলস্তয়ের উপন্যাসে শুরু-শেষ বলতে কিছু নেই) যতটা দিয়েছেন তার পদ্ধতিকে আর তাঁর এই পদ্ধতিই জীবনাশ্রয়ী বাস্তবতা, যে-বাস্তবতাকে অটুট রাখতে তাঁর অদম্য চেষ্টার বিশ্বস্ততায় এতটুকু অভাব ঘটে নি কোনদিন এবং শেষ পর্যন্ত সেই বাস্তবানুগ জীবনবোধের আকুতি এত প্রবলাকার হয়েছে যে, উপন্যাস-কাহিনীর ক্ষুদ্র আধারে তাকে আর বন্দী করে রাখা যায় নি—ধর্ম, দর্শন, নীতির বৃহৎ এবং

পবিত্র পরিবেশে তাকে মুক্তি দিতে হয়েছে, স্থষ্টি করতে হয়েছে এক আত্মিক জগৎ, বিশ্বের মানুষকে ডেকে বলতে হয়েছে—এস, এই আত্মার আত্মীয় হও। আর তলস্তয় যে এই চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, জনমানসের শ্রদ্ধায় মিশে রয়েছেন তার মূল কারণ তিনি একটি জ্যোতির্ময় ধ্বজার বাহক বলে, একটি মহৎ চিত্তকে তাঁর দেহের নীচে ধারণ করেছেন বলে (যদিচ তাঁর নিজের কামনা বাসনা এবং স্ত্রীর প্রতি অবিচার দেখে তাঁর মুক্তি-মন্ত্রে সংশয় জাগা স্বাভাবিক) এবং তাঁর এই উদ্‌গতি, এই উপরিক মানসিকতা তাঁর রচনার অঙ্গে হয়েছে মুদ্রিত। অন্তত 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'-এর (১৮৬৪-৬৬) মহাকাব্যে, প্রচলিত ইতিহাস-বর্ণনার ধারাকে অস্বীকার করতঃ মানুষের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার—জন্ম, মৃত্যু, প্রেমের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবর্তনেই মানুষের অস্তিত্বকে চরম অভিব্যক্তি-দানের ব্যবস্থাপত্র প্রদানে সেই মহৎ-চিন্তার দ্যুতি ছড়িয়েছেন তলস্তয়। তিনি বলেছেন, যে-প্রাচীন আড়ম্বর-ঐশ্বর্য, যে-বিপুল স্থদূর ইতিহাসের ব্যাকুল বাঁশরী বাজায় তার পরম সার্থকতা সৎ, সত্য ও সারল্যের রাগাশ্রয়ে। মানুষের আস্ফালন সেখানে মূঢ়তারই নামান্তর—মানুষ আপন গর্ব-গৌরবের কারণে ইতিহাস স্থষ্টি করে না, নম্র-নীরবতায় অতীতের বিশ্বস্ত চিত্র ও চরিত্র বর্ণনায় সহায়তা করে মাত্র। তিনি বলেছেন, সকল লোভ-লালসার উর্ধ্বে সততার বসবাস,—মানুষ তার হৃদয়ের গহন মোহের আড়ালে সেই সত্যটুকুকে অবহেলিত যত্নে বাঁচিয়ে রাখে—একদিন তার সময়োচিত আবির্ভাব ঘটবে বলেই। জগতের যাবতীয় ভণিতা-ভণ্ডামী, অন্যায়-অবিচার কিছু দীর্ঘস্থায়ী নয়, সত্য, শুভ, সদ্‌বৃত্তি একদিন তাকে স্বাভাবিক শক্তিতে পশ্চাতে ফেলে যাবেই। 'অ্যানা কারেনিনা'-তেও (১৮৭৫-৭৭) তলস্তয়ের শিল্পীসত্তা ও মহামানবোচিত স্বজ্ঞার সেই তীব্র অনুভূতি তরঙ্গিত হয়েছে এবং পরিশেষে নীতির মন্ত্র হয়েছে ধ্বনিত। স্থখের সংজ্ঞা কী ? জীবনের নানাবিধ বিশৃঙ্খলতায় স্থখের সত্য কি আদপেই নিহিত থাকে, বাসনা চরিতার্থ করার মধ্যেই কি তার সার্থকতা, সম্পূর্ণতা—না নিয়ম-নির্মিত জীবনে, নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তিতে পরম শুদ্ধতায় চৈতন্যের আলোককে ঈশ্বরের ইসারায় প্রজ্জ্বলিত করায় তার শেষ পবিত্র কর্তব্য ? তলস্তয় বলাই বাহুল্য, শেষেরটিকেই প্রথম ও প্রধান বলে বিধিৎসা দেখিয়েছেন।

তলস্তয়-এর স্থষ্টিধর্মী শিল্প প্রধানত এই দু'টি উপন্যাসের অমোঘ প্রভাবেই ব্যতিহারিত। 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'-কে যদিচ হেনরী জেমস্ তেমন স্থনজরে দেখতে পারেন নি, কিন্তু অদ্যাবধি জগতের কোন দেশ কোন কথাসাহিত্যে এমন

সর্বশক্তিমান নিদান সর্বকালের মানুষকে উপঢৌকন দিতে পারেন নি। 'অ্যানা কারেনিনা' এপিক-উপন্যাস নয় বটে কিন্তু মহৎ উপকরণযুক্ত অনুপম কলাবিধির চিরন্তন দিশারী। 'মাই কনফেশন' (১৮৭৯) রচনাতেই তলস্তয়-এর পরবর্তী জীবনের কর্মপন্থা সূচিত হয়েছিল, তিনি নিজের অতীত কীর্তিকে নিজেই ভর্ৎসনা করে মানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে চাইছিলেন, চাইছিলেন আপন ধর্মীয় বিশ্বাসকে আত্মোন্নতির পন্থায়, মানুষের সহজবোধ্য করতে। তাঁর ধর্ম—যাজকদের কর্তৃত্বমুক্ত, ঈশ্বরীয় তত্ত্বের কূট তর্ক-বহির্ভূত, যীশুর বাণীর স্বচ্ছন্দ অনুসরণ মাত্র। তুর্গেনিভ, যিনি তলস্তয় সম্বন্ধে তৎকালেই ঘোষণা করেছিলেন যে, 'In contemporary European literature he has no equal,' তিনি উপন্যাসের জগৎ থেকে তলস্তয়ের মহাপ্রস্থানকে শান্তচিত্তে মেনে নিতে পারেন নি ; তাঁর মনে হয়েছিল এটা মহা অপরাধেরই সামিল। কিন্তু তলস্তয়েরও কোন উপায় ছিল না। ১৮৭৮ সালকে ঘিরে নীতির যে সংকট ব্যাপকভাবে উদ্‌বেলিত হয়েছিল তা-ই তলস্তয়কে আমূল পরিবর্তিত করেছিল। এতদিন ধরে অন্তরে অন্তরে যে-বিশ্বাস পোষণ করে এসেছিলেন এবার তাকে তিনি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে দিলেন। তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর বৈভব, তাঁর সুখ তাঁকে কণ্টকিত করছিল—তাই শেষ পর্যন্ত প্রব্রজ্যা নেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায়ান্তর রইল না। এই শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চরমাবস্থায় পৌছতে তাঁকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হয়েছিল, রুশোর দর্শন এবং যীশুর উপদেশ 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিও' এবং 'হিংসার দ্বারা প্রতিহত হইও না' ইত্যাদি আয়ুধে সজ্জিত করতে হয়েছিল নিজের অন্তরাত্মাকে। ভূমিদাস এবং কৃষকদের সংগে তাঁর অবস্থার ঘোরতর অসংগতির কারণে ভোগ করতে হয়েছিল দুঃসহ যন্ত্রণা আর নীরব নিপীড়ন। সত্তর বছর বয়সে তলস্তয় উপন্যাসের জগতে পুনঃ-প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। 'রেজারেকশন'-ও (১৯০০) অন্যান্য রচনার মতো তলস্তয়-এর মহানুভবতা ব্যক্ত করেছে। একদিকে একটি নারীর চরম অধঃপতন, কলংকের পসরা মাথায় নিয়ে যে দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়। অন্যদিকে তার বিচার করতে বসে যে-পুরুষ, অকস্মাৎ তার চোখের সামনে হারানো জীবন বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে। সে উপলব্ধি করে তার অপরাধ। বিবেকের বিচারপ্রার্থী হয় সে। পরিশেষে তার পুনরুজ্জীবনে বইটির পরিসমাপ্তি হয়। 'ক্রুইট্‌জার সোনাটা'য় (১৮৮৯) তলস্তয় সমাজের ভণ্ডামির মুখোসকে অনাবৃত করেছেন। এই সমাজে যা ভালবাসা বলে, স্নেহ বলে প্রচলিত তার স্বরূপ কি ?

তা কি শুধুই প্রেমের নামে ভোগের মিথ্যাচার নয়? যৌনানন্দ ও কামতৃপ্তির প্রবল তৃষ্ণায় অন্তরের শুদ্ধ স্নেহ-ভালবাসা কি শুষ্ক-শীর্ণ হয়ে যায় না? তলস্তয় কখনো শিল্পকে নিছক ভাববিলাস, কিংবা ক্ষণিক চিত্ততৃপ্তির উপকরণরূপে ধার্য করতে পারেন নি, তাই জীবনের ব্যাধিকে খুঁজে খুঁজে তিনি সর্বদাই আরাম দিতে চেয়েছেন নিজের বিশ্বাসলব্ধ ব্যবস্থাপত্রে। সমাজ ও জীবনের সেই নিদান এবং তা নিরোধ করার উপায় নির্দেশ করতেই তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসা ও জীবনজিজ্ঞাসা কালক্রমে একটি ধারায় এসে মিলিত হয়েছে—তাঁকে করেছে স্বরাষ্ট্রে স্বরাট। ১৮৯৭ সালে তলস্তয় যখন 'হোআট ইজ আর্ট' গ্রন্থে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর ধারণার উদ্দেশ্য দিলেন তখন বার্নার্ড শ' বিস্মিত না-হলেও তরুণ রম্যাঁ রোলাঁ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলেছিলেন তলস্তয়কে (পরে রোলাঁ তাঁর অসীম ভক্ত হন)। তলস্তয় তাতে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত করেছিলেন যে, শিল্পের একটি স্বধর্ম আছে; তা কখনোই লক্ষ্যহীনভাবে স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। মানুষের কল্যাণের জন্য, তাদের প্রেম, মৈত্রী সংস্থাপনে একটি সানুরাগ সমানানুভূতি সৃষ্টির জন্যই শিল্পের জন্ম, তার সার্থকতা। কোন চিত্র, কোন সংগীত কিংবা কোন কাহিনী যখন একটি মনুষ্য-সম্প্রদায়কে, তাদের সকল বিদ্বেষ-বিষ নাশ করে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো বিবশ করে তখন তারা যে আনন্দ পায়, যে তৃপ্তি পায় তার দ্বারা অন্তরে অন্তরে তাদের মধ্যে একটা নিগূঢ় আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়, স্থান, কাল, পাত্রের ঊর্ধ্বে মেলবন্ধন ঘটে মনে মনে, মানুষে মানুষে। একটি সম্প্রদায়ের সেই আনন্দ-অভিজ্ঞতা অন্য সকলের হৃদয়েও সঞ্চারিত হচ্ছে এই অনুভাবনাই হলো ধর্মীয় শিল্প ও বিশ্বজনীন শিল্পের স্বরূপ। 'And this effect is produced both by religious art which transmits feelings of love of God and one's neighbour, and by universal art transmitting the very simplest feelings common to all men.' এই হলো তলস্তয়ের অনুশীলিত আপন শিল্প-অধ্যয়ন। এই তাঁর স্বজ্ঞালব্ধ সাহিত্য-দর্শন। এমনি করেই তাঁর 'সত্য-কথা বলার উদ্‌বেগ' অপার, বারংবার।

তলস্তয় যখন লিখলেন 'একটি মানুষের কতটা জমি দরকার করে' ('হাউ মাচ ল্যাণ্ড ডাজ এ ম্যান নীড্?') তখন তার উত্তরে আন্তন চেখভ (১৮৬০-১৯০৪) তাঁর একটি কাহিনী, 'গুজবেরীজ'-এ সেই কথার প্রতিবাদে জানিয়েছিলেন:

'বিধিমত হয়ত বলা যায় যে, মানুষের মাত্র সাত ফিট মাটিই দরকার করে কিন্তু তা শুধুমাত্র একটি শবদেহর জন্যই যথেষ্ট হতে পারে। একটি মানুষের প্রয়োজন সাত ফিটের বেশি, গোটা ভূসম্পত্তির চেয়েও বেশি,—বস্তুতপক্ষে গোটা পৃথিবীটাই তার প্রয়োজন'। কিন্তু এবম্বিধ প্রতিবাদের অর্থ এই নয় যে, চেখহুব তলস্তয়-এর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতেন বরং তাঁর প্রতি চেখহুব-এর অসীম শ্রদ্ধার অভাব ঘটে নি কোনদিন। তিনি তলস্তয়কে অনুকরণ করেন নি, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁর নীতির-পন্থাকে অনুসরণ করেছেন; তলস্তয়-এর রোমান্টিকতা বিরোধী শিল্প-প্রণালীর অনুসরণ হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যের ভাব ও ভাষায়। এবং তলস্তয়-এর জীবনাশংকায় এই 'সত্যকার রুশীয়'টি (চেখহুব-এর প্রতি তলস্তয়-এর সস্নেহ উক্তি) উদ্‌বিগ্নচিত্তে মন্তব্য করেছিলেন: 'While Tolstoy is in literature, it is easy and pleasant to be a literary man....I am not a believing man, but of all beliefs I consider his the nearest and most akin to me.' তলস্তয়ও তাঁর জীবিতকালে চেখহুব-এর সাহিত্য প্রতিভার প্রতি উন্মুখ আগ্রহী থাকতে বিস্মৃত হন নি, কুণ্ঠাবোধ করেন নি সহৃদয় স্বীকৃতি জানাতে। চেখহুব-এর সেই বিখ্যাত 'দি ডারলিং' (১৮৯৮) গল্পটি পাঠে তলস্তয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন: 'It's like lace woven by a virtuous maiden....There used to be girl lace makers in the old days, who, their whole lives long, wove their dreams of happiness into the pattern. They wove their fondest dreams, their lace was saturated with vague pure aspirations of love'. (Literary portraits—Gorky). চেখহুব যখন চিকিৎসকের পেশাকে বরাবরের মতো বরখাস্ত করে সাহিত্যের সেবা করতে এসেছিলেন তখন রাশিয়ার গণজীবনে আতংকের ঝড় থম্‌কে আছে। স্বৈরতন্ত্রের মহিমায় মধ্যবিত্ত মানুষের সুখ নেই, শান্তি নেই,—শিক্ষার সংকোচ হয়েছে। জার তৃতীয় আলেকজান্দার এক সংকীর্ণচেতা, পরমুখাপেক্ষী পুরুষ। তাঁর যিনি দক্ষিণহস্ত ছিলেন, সেই ব্যক্তিটি শাসনের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করলেন, শ্রেণী-বৈষম্যের ভেদাভেদকে প্রকট হতে দিলেন, আর তাতে স্বার্থপুষ্ট অভিজাতদের সুবিধা হতে লাগল কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্তরা সার্বিক হতাশা, ব্যর্থতা আর একাত্ময়তায় হলো ক্লিষ্ট। চেখহুব প্রত্যক্ষভাবে কোনদিন রাজনীতির সীমানায় নিজের উপস্থিতিকে ঘোরতর করে তোলেন

নি। তাই বহুবিধ রাজনৈতিক মতবাদের উত্থান-পতনের উত্তাপ-শীতলতায় তাঁর রচনার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং উত্তরোত্তর তা মানুষের হৃদয়ে সুগভীর অনুরাগে স্থান পেয়েছে এবং গত অর্ধ শতাব্দীর উপর তিনি সারা জগতের সুবেদী সাহিত্য পাঠকদের কাছে একটি শান্ত তিমিরের বুকে প্রথম কোমল আলোকোল্লাসের মতো বিরাজ করেছেন। মানুষ,—প্রধানত অধঃপতিত মানুষের অসাড় ইচ্ছা, বুর্জোয়াদের দীনতা ও নীচতা যা সেই সব মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে অনবরত সূচীবিদ্ধ করে—চেখভ অন্তরের অপরিসীম সারল্যে, অত্যন্ত বিশদ মনোযোগিতায় তাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। অনেক সময় খুবই তুচ্ছ, নেহাৎই অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে কিংবা জীবনের নিরন্ত নির্ঝর থেকে এক ফোঁটা বারি নিয়ে তিনি যে শিল্পহীন শিল্পের আশ্চর্য কারুকর্ম দেখিয়েছেন, দিয়েছেন সাগরের স্বাদ তা-ই হলো চেখভ-এর প্রতিভার প্রসাদ—তাঁর অননুশীলিত অনুশীলনের দর্শনবিহীন দর্শন। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুগ্ধ জগৎ। তদানীন্তন রাশিয়ার তথাকথিত উর্ধ্বতন বুদ্ধিজীবীরা যখন তাঁর দৃষ্টিপথে আবদ্ধ হলো তখন তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, সেইসব মেজাজী মানুষরা সমাজ ও জীবনের বিচিত্র আবহাওয়ার কারণে অদ্ভুত এক নিস্পৃহ, নিরাসক্ত মানসিকতার ভজনা করছে, কর্মহীনতার গ্লানি ব্যর্থতায়-হতাশায় করছে তাদের বেপথু এবং সস্তা আমোদ ও সুখ-সম্ভোগের চরণদাস হয়ে তারা ক্রমশই জীবনের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। চেখভ প্রথম প্রথম লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের মতো সেই জাতীয় ব্যাধির নিদান খুঁজেছেন তাঁর গল্পে ও নাটকে, অতঃপর অত্যন্ত সহৃদয়ে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তিনি। তাঁর রচনায় প্রধান পাত্ররা প্রায় সর্বদাই 'আংক্‌ল ভ্যানিয়া'-র ডাক্তার অস্ত্রোভ-এর মতো একটা গোপন ইচ্ছা পোষণ করে এসেছে মনে মনে। যে অস্ত্রোভ 'একটি চারাগাছ পোঁতে এবং তার জন্য ভবিষ্যতের হাজার বছর পথ পরিভ্রমণ করে ফেরে'। চেখভ এবার হয়ত বলতে চাইছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ও শাসন ব্যবস্থায় হয়ত আকাঙ্ক্ষিত সুখ-সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা আগামী কয়েকশ' বছরের মধ্যেও আসা সম্ভব নয় তবে প্রেমের মর্যাদা আছে, আছে সততার মূল্য—ঠিক্ ঠিক মতো কাজ ক'রে গেলে একদিন না একদিন অভিলষিত ফল দেখা দেবেই। চেখভ তাঁর অপেক্ষাকৃত স্বল্প জীবনের পরিধিতে যখন প্রথম গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তখন তাঁর সৃষ্ট মানুষরা নিছক কৌতুক প্রকাশ ও লঘু আচরণ জ্ঞাপন ছাড়া আর কোন প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি প্রগলভ হওয়ার অবনমনকে

অপনোদন করে নিজের মধ্যে একটি প্রশান্ত প্রজ্ঞার স্বচ্ছতা বিতীর্ণ করেন—একটি গভীর স্বকীয়তার অবদানে সমৃদ্ধ হয় তাঁর রচনা। প্রচণ্ড ভাবাবেশের বজ্রসুকঠিন ঘটনাসংঘাতে চেখভ-এর গল্প কিংবা নাটক চরম আকস্মিকতাকে আলিঙ্গন করেনি কদাপি। জীবনের বহু পরিচিত দুর্বলতায়, সদা পরিবর্তমান মেজাজে কখনো হর্ষ, কখনো বিমর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে—কখনো মনে হয় হঠাৎ যেন দূর থেকে ঝর্ণার শব্দ আকুল হয়েছে, আবার কখনো পাশের ঘর থেকে কোন মৃত্যুপথযাত্রীর ব্যাকুল উদ্‌বেগ ভেসে এসেছে। চেখভ-এর যে গল্পগুলি আজ সারা বিশ্বে নতুন এক ফর্ম-এর সৃষ্টি করেছে এবং হেমিংওয়ে, ক্যাথারিন ম্যানসিফল্ড কিংবা ক্যাথারিন অ্যান পোর্টার প্রভৃতি যুগশিল্পীরা যে-ফর্মকে আপন আপন রচনায় পরীক্ষা করে নতুন ফর্মুলা উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়েছেন সেই সব গল্পগুলির মধ্যে 'দি ডার্লিং', 'দি গ্রাসহপার', 'দি লেডি উইথ এ ডগ', 'ওআর্ড নাম্বার সিক্স', ইত্যাদি কাহিনীর আবেদন চিরন্তন, শিল্প-প্রকর্ষের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষররূপে বিশ্ব কথা সাহিত্যের দিগন্তকে অভিভূত করেছে। হতভাগ্য ওলেনকার ('দি ডার্লিং') জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন ঘটনার পদলালিত্য করার কি শোচনীয় পরিণতি! যতবার সে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পরম বিশ্বাসের সংগে হাত বাড়ায়, ততবারই নিয়তির দুর্মোচ্য গোলকধাঁধায় সে হয় দিগভ্রান্ত। অথচ কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সে সবারই প্রিয়, সবার 'ডার্লিং'। ওলেনকার মধ্যেই যেন নারী নামক প্রজাতির একটি ব্যর্থতার অসহায় জগৎকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন চেখভ। 'গ্রাসহপার'-এ সেই হতভাগ্য ওলেনকাই যেন ভিন্ন মূর্তিতে ভিন্ন পরিচয়ে নারীত্বের দুর্বলতা প্রকাশ করেছে, সত্যকে চিনতে পারার অভাবে ভালবাসার মিথ্যা মোহকে আঁকড়ে জীবনে হয়েছে ব্যর্থ। আর, 'দি লেডি উইথ এ ডগ' গল্প একটি বিবাহিত নারীর জীবনে অন্য পুরুষের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে আশ্চর্য শিল্প-সূক্ষ্মতার দৃষ্টান্ত দিয়েছে। প্রচণ্ড ভালবাসা সত্ত্বেও যারা সিদ্ধির লক্ষ্যে পৌছতে পারে না, অনেক পথ অতিক্রম করেও পারে না একটি কেন্দ্র-বিন্দুতে স্থির হতে। উভয়েই তারা অতীত জীবনে বাগদত্ত, আবদ্ধ নানা দাবীতে। তাই অনেক কাছে এসেও তারা অনেক দূরেই রইল, বহুদিন শুরু হয়েও তাদের যেন সব কিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। এই তাদের কৌতুককর ট্রাজেডী। চেখভ যখন চরমোৎকর্ষে পৌছেছেন, তখনই মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর অকালবিয়োগে রুশ জাতীয় সাহিত্যেরই শুধু প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় নি, বিশ্ব কথাসাহিত্যের আকাশ থেকেও

একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়েছে। সমারসেট মম তাঁর 'দি গ্রেটেস্ট স্টোরিজ অফ অল টাইম' গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন যে, আমরা জানি তলস্তয় হচ্ছেন ছোট গল্পের আবিষ্কর্তা। কিন্তু রুশ লেখকবর্গের, বিশেষত চেখভ-এর এক বিশেষ মর্যাদার স্থান আছে ছোট গল্পের বিবর্ধনে। চেখভ পাঠে যে বাস্তবতার বোধোদয় হয় মোপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পেও সেই অভিজ্ঞতা জন্মায় না— তাঁর গল্প লেখার শিল্পে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা মুস্কিল।

ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) নিজের প্রতি তলস্তয়-এর সাগ্রহ নেত্রপাত ঘটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তলস্তয়-এর শিক্ষাকে আপন-জ্ঞানে স্বচিন্তার অঙ্গীভূত করেছিলেন। বিপ্লবের পর রাশিয়ায় স্বদেশ ও বিদেশের ধ্রুব সাহিত্যের যে সুলভ সংস্করণগুলি অসংখ্যাকারে প্রকাশিত হচ্ছিল, তার পরিচয় পুস্তিকার মুখবন্ধে তিনি যা লিখেছিলেন তাতে তলস্তয়-এর কণ্ঠ শোনা গেল : 'Literature must finally fulfil the role of the power which most firmly and most intimately unites the people by the consciousness of their desire for the happiness of a life that is beautiful and free.' চেখভ-এর প্রস্থান থেকে গোর্কির প্রবেশকালের মধ্যে রাশিয়ার সমাজ ও গণজীবনে একটি তরংগসংক্ষুব্ধ নাটকের উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যাভিনয় চলেছে। গোর্কি প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে নবীন ও প্রাচীনের ভাবপ্রবাহে একটি নিভৃত সংযোগ স্থাপনা করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই মার্ক্সবাদীরা পপুলিস্ট দলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে রাশিয়ার রাজনৈতিক আসরে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করেছিল। লেনিনের আগমনও হয়েছিল সারা। অতঃপর ১৯০৫ সালে যে বিপ্লবের শুরু হয় তার আগেই রাশিয়ার সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি একটা নব-উজ্জীবনের পরিবর্তনকে সাধিত করার প্রচেষ্টায় প্রস্তুত হয়েছে। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত রুশ সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাস বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যে, প্রাতিস্বিক চিন্তার বৈচিত্র্যে গৌরবান্বিত। নতুন শক্তিগোষ্ঠী উৎসাহে ও উদ্দীপনায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে জীবনের অন্যতর বাতায়নের সন্ধান করে ফিরছেন, যেখান থেকে মানুষের সর্বব্যাপী পরিদৃশ্য পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হয়। পুরাতন পথপ্রদর্শকরূপে তলস্তয়--এর অভিজ্ঞতাকে সামনে উন্মুক্ত রেখে এই অনিকেত নব্য ভাবানুসন্ধানীরা দেশে দেশে করেছেন আপন ঘর, কেউ ফরাসী সাহিত্যে বোদলেয়রের কাব্যে

আকস্মিক আত্মীয়তা পোষণ করেছেন, কোন রুশ অবক্ষয়ীর দল আবার নীৎসের মতবাদে আশ্রয় পেয়েছেন কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সেই শেষ শতকের এবং নতুন কালারম্ভের অধিকাংশ যুগশিল্পীই বোধহয় সাহিত্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের সংগে বাক্যালাপ করতে চেয়েছেন। অথচ ফরাসী প্রতীকতাবাদ কিংবা ইওরোপীয় ঈশ্বরবাদ রাশিয়ার প্রকৃতিতে সহ্য হবার কথা নয়, কারণ দেশ ও সমাজের বিশেষ অবস্থার সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত রূপ তাতে প্রতিফলন করা গেল না, তাই সূক্ষ্মতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা ও প্রতীকে জীবনাবস্থা ও সমাজব্যবস্থার বাস্তবানুগ অভিব্যক্তিকে অতিতর করে তোলার প্রচেষ্টায় তরুণ সাহিত্যশিল্পীদের কৌলিক ও মৌলিক পন্থা আবিষ্কারের সাধনা চলল; চলল দিগ্বিদিকে অস্থিরতার অভিযান। বিপ্লবের আগে যথারীতি বুর্জোয়াদের অখণ্ড প্রতাপ এবং ধনতন্ত্রের প্রসার সাধারণ মধ্যবিত্তদের অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাচ্ছিল। কিন্তু জার-শাসনের সর্ববিধ অত্যাচার এবং ধনী ও বুর্জোয়াদের সৌভাগ্যের পথ অবাধ হওয়া সত্ত্বেও একটা নতুন শক্তির উন্মেষ হচ্ছিল যা রোধ করার ক্ষমতা ছিল না কোন বিরুদ্ধাবস্থার—শিক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতির সেই নতুন শক্তি পুরাতনের জগদ্দল পাথরকে জাতির বুক থেকে সরাতে বদ্ধপরিকর হলো।

গোর্কি ১৯০৫ সালের বিপ্লবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অবশ্যম্ভাবী-রূপেই জার শাসকগোষ্ঠী তাঁর সেই অমার্জনীয় অপরাধে নিশ্চুপ থাকতে পারেন নি। তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল এবং হয়ত জীবনের কঠিনতম সাজাও নেমে আসত তাঁর 'পরে, কিন্তু বিদেশের ক্ষুব্ধ জনমত একটা প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো জারদের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করল। গোর্কি মুক্তি পেলেন। গোর্কি তাঁর আসল নাম নয়, গোর্কি শব্দের অর্থ তিক্ত। আই. এম. পেশকভ তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ভাবনায় যে-পরিমাণ অগ্নিগর্ভ ছিলেন তাতে জারদের পক্ষে তাঁর প্রতি তিক্ত-বিরক্ত না হবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু পেশকভকে গোর্কি নামটি উপহার দিয়েছিল সোবিয়েৎ মানুষরা, যে-মানুষের আত্মার অবমাননা, প্রাত্যহিক যন্ত্রণাকে তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপ দিতে চেয়েছেন আজীবন। গোর্কির দারিদ্র্যলাঞ্ছিত নিজের জীবনটি বেদনায় আচ্ছন্ন। নিজনির এক হৃত দরিদ্র পরিবারে চর্মকার পিতার গৃহে তাঁর জন্ম। সাত বছর বয়স থেকে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের কুটিল সংবর্তকে প্রতিরোধ করতে করতে তাঁর শৈশবের স্বপ্নরাঙা দিন কোন্ প্রগাঢ় অন্ধকারে বিলীন হয়েছে। অনেকরকম পেশায় শক্তিকে ক্ষয় করতে করতে তিনি হঠাৎ

একদিন দেখলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর কিছুই পাওয়া হয় নি, কিন্তু ভোল্‌গার তীরে তীরে ভবঘুরের দিনযাপন ক'রে মনটা তাঁর মৃত্তিকাশ্রয়ী হয়েছে। তবু অন্তরে এক মহাশূন্যতা, অপরিসীম তৃষ্ণা। জ্ঞানের আলো চাই, চাই গ্রন্থ জগতে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। চাই আত্মার উদ্‌বোধন। গোর্কি নিজের জীবনে ও সাহিত্যে সস্তা ভাবাবেগকে উচ্চগ্রামে প্রশ্রয় দেন নি কদাপি, প্রচণ্ড একটা ক্ষমতা বিকীর্ণ করেছেন সর্বদা কিন্তু একবার, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে এবং অনভিজ্ঞ বয়সের চপলতায় লঘুতা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, আত্মবিনাশের পন্থায় তিনি জীবনের মুক্তিকে চেয়েছিলেন ত্বরান্বিত করতে। গোর্কি অতঃপর তাঁর রাজনৈতিক ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে দিলেন, দেশকে অত্যাচারের শৃঙ্খলমোচন করতে মার্ক্সবাদই (যদিচ ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি সব মার্ক্সীয় আচরণে পরিপুর্ণ সম্মতি দিতে পারেন নি এবং তাঁর এই আস্থাহীনতা লেনিনের অনেক কটুকাটব্য পেয়েছে) শ্রেয় মনে হলো তাঁর কাছে। হয়ত তাঁর আবির্ভাব উপযুক্ত সময়েই সম্ভব হয়েছিল, হয়ত দেশ সমাজ ও মানুষের ব্যাধির নিদান স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছিল পুর্বেই, হয়ত অস্ত্রোপচারকের ভূমিকা ছাড়া আর কোন কঠিন দায়িত্ববৃত্তি তাঁর ছিল না, কিন্তু তবু বিপ্লবের আগে এবং পরে গোর্কির ক্লান্তিহীন রচনায় নিপীড়িত মানবের ও রুশ সমাজের যে আপোষহীন উলঙ্গ চেহারার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটছিল, তা রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে এক গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। তিনিই অসংখ্য জনতার চাপা কণ্ঠস্বরকে একটি সুতীব্র ভাষা দিতে চাইছিলেন, গানে নাটকে মানুষের সহজ অথচ সার্বভৌম দাবীকে করতে চাইছিলেন প্রতিষ্ঠা—মুক্তির ব্যাকুলতা দার্ঢ্যভাষায় তিনিই ঘোষণা করলেন। (কারণ, 'তিনি কখনও ভোলেন নি যে প্রাক্তন আত্মীয়তার সূত্রে প্রোলে-তারিয়েতই তাঁর সেরা অনুকম্পার অংশভাক্') আর আসলে গোর্কির সব গান, নাটক, উপন্যাস, কাহিনীই যেন এক একটি পরিপুর্ণ সংগ্রাম—বইয়ের পাতায় পাতায় তিনি যেন রণক্ষেত্র রচনা করেছেন। তাঁর অন্তরের ক্রোধ, উত্তাপ, উষ্মা একটি সৎ, সাহসী ও সংবেদী দেশপ্রেমিকের পরিচয় জানালেও বহুক্ষেত্রে শিল্পী হিসাবে তাঁর নিকৃষ্টতার মহা অপরাধকে রোধ করতে পারে নি। মাতৃভূমির মুক্তিউপাসকরূপে গোর্কির আন্তরিকতা, বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা যতই উপরিকতা গোচরীভূত করুক না কেন সাহিত্য-শিল্পীরূপে প্রধানত তিনি স্মৃতিচারণার জন্যই স্মর্তব্য থাকবেন জগজ্জনের কাছে। সারা পৃথিবীময় তাঁর যে সমাদরের আসন আজ সুরক্ষিত হয়েছে তার অন্যতম কারণ বোধহয় তিনি উনবিংশ শতাব্দীর

যুগ-স্বপ্নের প্রতিভূ, তিনি একটি তারুণ্যদীপ্ত আধুনিক শক্তির সার্থক স্ফুরণ, একটি মহৎ বিপ্লবের সংগ্রামী ভূমিকাভিনেতা,—আর ১৯০৫ সালের আগে তাঁর গল্প (স্কেচেজ্ অ্যাণ্ড স্টোরিজ), নাটক (লোআর ডেপ্থ্স), উপন্যাস (ফোমা গোরদিয়েভ্)-এ তিনি ঘন ঘনই নীচুতলার মানুষের ক্ষোভ, বেদনা হতাশা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের চেহারাকে বাস্তবানুভূতিতে (কিন্তু নিপুণ কলাবিধিতে নয়) প্রকাশ করেছিলেন আর তাতেই জগতের সাধারণ মানুষ অন্তরে অন্তরে তাঁর প্রতি অধিকতর আত্মীয়তা অনুভব করেছেন। গোর্কির বহুখ্যাত 'মাদার' উপন্যাসটি সমাজের উদ্‌বিগ্ন সংবাদকে যথারীতি প্রচারিত করেছিল এবং কখনো কখনো স্পর্শাতুর হবার অবস্থাও সৃষ্টি করেছিল হয়ত, কিন্তু অন্যদিকে এমনতর বিরক্তিকর, চরিত্রাংকনে এমন অসমঞ্জস (যা তাঁর অধিকাংশ রচনাকেই ক্ষীণজীবি করেছে) উপন্যাস তাঁর তুল্য প্রভাবশালী কথাশিল্পীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হয় নি। আসলে গোর্কি 'টুয়েন্টিসিক্স মেন অ্যাণ্ড এ গার্ল', এবং 'চাইল্‌ডহুড' কিংবা 'ইন্ দি ওআর্ল্ড', 'মাই য়ুনিভার্সিটিজ', এবং 'রেমিনিসেন্সেস্' ইত্যাদি উপন্যাস ও স্মৃতি রোমন্থনে রাশিয়া-বহির্ভূত জগতে নিজের স্থানকে সুনিশ্চিত করেছেন, বিশেষত তাঁর দেখা রাশিয়া এবং আত্মপরিজনের কিংবা তলস্তয় বা অন্যান্য সতীর্থদের প্রতিকৃতি অংকনে তিনি যে বাস্তব প্রতিলিপি নির্মাণ করেছেন তার তুলনা তৎকালীন বিশ্বের অন্য কোন প্রতিভাবান কথা-শিল্পীদের মধ্যে বিস্ময়করভাবে বিরল। গোর্কি সজ্ঞানে কোন বিশেষ শিল্পধারার প্রবর্তন করেন নি তাঁর রচনায়, কিন্তু তাঁর উচ্চাসীন ব্যক্তিত্ব তাঁকে ঘিরে একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল রচনা করেছে, অবলীলাক্রমে যার অনুসারী হয়েছেন, যে কলারীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তরুণতর কথাশিল্পীরা। ভাবতত্ত্বের ক্ষেত্রে গোর্কি রাশিয়ার জনজীবনে একটি পরিপূর্ণ আশ্রয়। একটি অত্যাচারিত জাতির জীবনে অলোকলোক পুরুষ যিনি স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শিল্পকে নিপীড়িত, অবহেলিত ও অপমানিত মনুষ্য-আত্মার বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ দর্পণজ্ঞানে অমিততেজে; বিপুল প্রাণশক্তিতে বিচিত্র চিত্র ও চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। প্রাক্-বিপ্লবের রাশিয়ায় যাঁর ভূমিকা ছিল, অনেকটা ক্লিম সামগিন-এর মতোই, যে ক্লিম-এর প্রকৃতি প্রচণ্ড প্রাতিস্বিকতায় এত উন্নত ও প্রশস্ত 'that society is mirrored in him' আর, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গোর্কি একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছেন, একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যাঁর আদর্শের পদপ্রান্তে বসে নবীনরা পাঠ গ্রহণ করেছেন নীরব শ্রদ্ধায়। দৃশ্যত দৃষ্টবাদী

এবং প্রগতিবাদী গোর্কি ১৯১৭ সালের পর থেকে আর লিখতে পারেন নি, এবং ১৯২১ সালে রাশিয়া পরিত্যাগ করে যখন সাত বছর পরে আবার ফিরে এলেন সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে, তখন জারশাসনমুক্ত নবীন দেশের পুনর্গঠনে তাঁর অনেক দায়িত্ব। সাহিত্যে তিনিই সমাজবাদী বাস্তবতার প্রবর্তন করলেন। গোর্কি সম্পর্কে আধুনিক সোবিয়েৎ মতবাদ হচ্ছে: 'Prior to Gorky nobody in world literature had been able thus to depict the wealth of the spiritual life of ordinary people ; nobody prior to Gorky had been able thus to describe sparks of the ideal in mundane surroundings, the invincible strength of those who carry the banner of ideals, the struggle between the old and the new, the inevitability of the victory of the new over the old.' (Tamara Motyleva)

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে যে-মহাবিপ্লব সংঘটিত হলো রাশিয়ায় তাতে প্রায় এক হাজার বছরের একটা পুঞ্জীভূত গ্লানির অপনোদন হলো এবং জার শাসন-তন্ত্রের অবসানে একটি জাতির অন্ধকার ইতিহাস অধঃপতিত হয়ে জীবনের নতুন সম্ভাবনাকে সূচিত করল। লেনিন ও ট্রটস্কির ক্ষমতারোহনের পর কম্যুনিস্ট যুগের মানুষ নতুন আশায় ও আদর্শে দেশের পুনর্গঠনে হলো নিযুক্ত। নবীন দেশের সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে স্ট্যালিন যে তত্ত্বারোপ করলেন তার মর্মবাণী হলো: লেখকরা হচ্ছেন আত্মার বাস্তুকার এবং সাহিত্য সর্বদাই বলশেভিক সুরে রঞ্জিত হবে, যার মহদোৎকর্ষে জীবন হবে অবধারিত এবং জীবনের ওপর সক্রিয় প্রভাব লেখকদের সর্বদাই সাধারণের সম্মুখে স্থাপনা করবে। গোর্কি দু'টি বিদ্যাপীঠ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়। তার যাঁরা লেখক ছিলেন তাঁদের মধ্যে আইভান বুনিন, আলেকজান্দার কুপরিন এবং আন্দ্রেয়েভ বিশ্বসাহিত্যের ধারায় নিজেদের রচনাকে সম্মিলিত করতে পেরেছেন।

আলেকজান্দার কুপরিন (১৮৭০-১৯৩৮) যদিচ উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন না তবু অসীম জনপ্রিয়তা তাঁর যথার্থ গুণাগুণকে নিঃশেষে ঢেকে রেখেছে পাঠকদের কাছে আর সেই কারণেই তিনি জগতে রাশিয়ার 'জ্যাক লণ্ডন' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। কারণ জ্যাক লণ্ডনও তাঁর রচনা-কৌলিন্যের তুলনায় অনেক

বেশি সম্মান অর্জন করেছেন, পাঠকদের চিত্তে পেয়েছেন সশ্রদ্ধ আসন। চেখভ-এর মতো সুখী-প্রকৃতি কুপরিন-এর অনায়াস কাহিনী-জাল বিস্তারের স্বচ্ছন্দ পারদর্শিতা এবং অনাড়ম্বরে, সরল মানসিকতায় ঘটনাকে বর্ণিত করার কৌশল তাঁকে বহু ভক্ত পাঠকের সমাদর লাভে সহায়তা করেছে। বুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য কিংবা দৃষ্টির গভীরতা তাঁর আদৌ ছিল না, কিন্তু তাঁর চরিত্র ও চিত্রশালায় সংগ্রহের কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল সুচারুরূপে। ক্রীড়াবিদ্, ব্যায়ামবীর, শিকারী, জেলে থেকে সামরিক পুরুষ, বেশ্যালয়, সার্কাস এবং শুঁড়িখানা পর্যন্ত তাঁর গমনাগমন সর্বত্র অবাধ। কিন্তু তিনি প্রধানত ওডেসার সেই গণিকালয়ের বিশদ ঘটনা-বৈচিত্র্যের সস্তা ভাবুকতাকে পাঠক-মনে সঞ্চারিত করে তোলার কলাকৌশলেই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। 'য়ামা দি পিট' জগতের জনপ্রিয় উপন্যাস-গুলির অন্যতম হলেও রূপস্রষ্টা হিসাবে কুপরিন-এর ভবিষ্যত সমাধি-কে প্রতিরোধ করতে পারে না। 'দি ডুয়েল' (১৯০৫) নামক সামরিকতা-বিরোধী উপন্যাস কুপরিন-এর সাফল্যকে অভাবিত উচ্চতায় স্থাপন করল এবং যে-সব পাঠক গল্পের গলিতে গলিতে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার বীজকে সন্ধান করে বেড়ান তাঁরা এই রচনাটিকে তীর্থ মানলেন। কিন্তু তবু কুপরিন উপন্যাসটিতে সৈন্যবাহিনীর শূন্য জীবনকে এবং একটি আদর্শবাদী তরুণের চরিত্রকে গভীর মমতায় ও একনিষ্ঠ আন্তরিকতায় রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কুপরিন স্বদেশ-পলাতক ছিলেন। শুধু মৃত্যুর আগে মাতৃভূমির করুণা পেতে চেয়েছিলেন বলে আবার তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয় কিন্তু সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে কুপরিন বা বুনিন-এর স্থান কোনদিনই গৌরবান্বিত হবার নয়।

আইভান বুনিন (১৮৭০-১৯৫৩) মাতৃভূমির কুৎসা প্রচারে কালাতিপাত করেছিলেন বলেই যেন গোর্কির স্বদেশপ্রীতি এবং রুশ হিসাবে তাঁর উপরিকতা ও বিশুদ্ধতা বেশি করে নজরে পড়ে আমাদের। বুনিন অন্য অনেকের মতোই বলশেভিকদের সহ্য করতে পারেন নি, তাই তাঁকে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। 'For one thing, most of Russia's established writers in the early years were of pre-revolutionary vintage, of upper and middle class origin. These, even the realists, were not prone to view 'facts' and 'tiuth' and 'historical reality' in the light of Marxist theory. Most of them refused to see

the proletariat and the Bolsheviks as anything but savage usurpers and October Revolution as anything but a national catastrophe, Many removed themselves from the scene by joining the white exodus to foreign lands......' (Russian Lliterature Since the Revolution : Joshua Kunitz) কিন্তু বুনিন-এর পক্ষে সেই বিদেশবাস হয়ত শাপে-বরই হয়েছিল, কারণ তিনিই প্রথম রুশ সাহিত্যশিল্পী যিনি নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। তবে কলা-কৈবল্যের সাধনায় তিনি কুপরিন-এর মতো জীবন থেকে পিছলে যান নি, এবং রসিকের মতো মৃত্তিকার সবুজ চুমুকে চুমুকে পান করে তার রসাস্বাদে স্বীয় রচনাকে মাটির গন্ধ দিতে চেয়েছিলেন। রাশিয়ার প্রান্তর, সুবাসিত কানন আর সরল কৃষাণীরা তাঁর রচনায় মুগ্ধ হয়ে আছে। সমাজ ও শ্রেণীর শেষ নিশ্বাসের শব্দ তাঁর কাহিনীতে যেমন শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি যে-দিন আর ফিরে আসবে না তার জন্য তাঁর বিষণ্ণতা, উদ্বেগ-ও টের পেতে দেরি হয় না। তিনি জানেন মানুষের সর্বপ্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাড়ম্বর আয়ুধ সত্ত্বেও এই বস্তুজগৎ একদিন মহাশূন্যতায় বিলীন হয়ে যাবে। এই বুনিন-এর দর্শন, এইখানেই তিনি বিশ্বের হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন। 'জেণ্টলম্যান অফ সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো', 'দি ভিলেজ', 'দি সান্‌স্ট্রোক', 'দি চ্যালিস অফ লাইফ' ইত্যাদি কাহিনীগুলি (১৯১০-১৯২০) তাঁকে আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি দিয়েছে এবং তাঁর একটি বিশেষ কলাভংগীকে ব্যক্ত করেছে। তাঁর গদ্যরচনা সৌন্দর্যে এবং কাব্যিক মাধুর্যে তুর্গেনিভ-এর (The prose of Bunin could be linked to that of Turgenev in its delicacy and lyrical charm'...Marc Slonim.) শিল্পাভাস জাগায়। বুনিন দেশ ত্যাগের পর ফ্রান্সেই তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং ১৯২০ সালের পর তিনি যে ক'টি উপন্যাস রচনার সুযোগ পেয়েছিলেন তার মধ্যে 'মিটিয়াজ লাভ' একটি অন্যতম রচনারূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। বুনিন-এর শূন্যগর্ভ মহদাভাবের কথা বলে যতই হেয় করুন না কেন কেউ, তিনি ইতিমধ্যেই রাশিয়ার সমসাময়িক তরুণ লেখকগোষ্ঠীর চিত্তহরণ করে বসে আছেন।

লিওনিদ আন্দ্রেয়েভ (১৮৭১-১৯১৯) স্বদেশী সমালোচকদের কাছে তেমন আমল পান নি কিন্তু বহির্রাশিয়ায় তাঁর রচনার অন্তর্লোকে আগ্রহীদের প্রবেশ

প্রার্থনা এই স্বল্পখ্যাত লেখকটি সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল একদা। আন্দ্রেয়েভ তাঁর জীবিতকালে লেনিনগ্রাদের বহু ছাত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়েছেন। শোনা যায়, 'দি লাইফ অফ ম্যান' নামক নাটকটির মঞ্চাভিনয় দর্শনে, 'ভয়ংকর বিষণ্ণতা' ছাত্রদের এমন অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে ঘিরে ধরে যে, তারা দলে দলে উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। অবশ্য এই ঘটনা লেখকের লিপি-বলিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত না-হয়েও তৎকালীন রুশ ছাত্রদের মানসিক দুর্বলতার কারণ হতে পারে কিন্তু 'সেভেন হু ওয়্যার হ্যাংড' কাহিনীর অনন্যভংগীর রচয়িতা আন্দ্রেয়েভ বিদেশে বারংবার পঠিত হয়েছেন এবং তাঁর প্রতীকতায় কিংবা আধা মেটাফিজিক্স-এর শিল্প জগতে সেদিন অনেকেই আস্থা স্থাপন করতে চেয়েছেন, আশা করেছেন তাঁর কাছে। কিন্তু অচিরে তিনি সেই প্রত্যাশাকে স্তিমিত করতে ভোলেন নি ; কয়েকটিমাত্র কাহিনী ব্যতীত আন্দ্রেয়েভ-এর সাহিত্যভাণ্ডারে অনটন দেখা দিয়েছে। গোর্কির সংগে তাঁর পার্থক্য হচ্ছে তিনি শুধুই জীবনের সংগে সংগ্রাম করেন নি, বিবেচনা দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন, নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের নির্বেদকে চেয়েছেন প্রতিরোধ করতে। 'দি গভর্নর ল্যাজারাস' ইত্যাদি কাহিনী তাঁকে ১৯০৫ সালের পর থেকে প্রভূত প্রসিদ্ধি প্রদান করেছিল।

দস্তয়ভ্স্কি মৃত্যুর পর যদিও অপ্রতিরোধ্য আবেদনে মানুষের মনে স্থান পাচ্ছিলেন তবুও রাশিয়ায় সরকারীভাবে তাঁর সৃষ্টি কম্যুনিস্ট শাসনতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ বিবেচিত হওয়ায় ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সত্যাসত্যে আলোকপাত করার উপায় ছিল না। এই সেদিন, ১৯৫৬ সালে তিনি সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সদয় অনুমতিতে পুনর্বার মুদ্রিত ও পঠিত হতে পারছেন কিন্তু ১৯১৭ সালের পর যখন ভবিষ্যতবাদীরা ব্যতীত সাহিত্যের বাস্তববিমুখ বিদ্যায়তনগুলি একে একে মিলিয়ে গেল বলশেভিক বিপ্লবের চাপে তখন অতীত ও বর্তমানের রুশ অথবা অরুশীয় বাস্তববাদীরা ক্রমেই জনপ্রিয়তা পেতে লাগলেন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রুশ কথাশিল্পীরাও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব-পন্থীদের শরণ নিতে লাগলেন ঘন ঘন। 'মিখায়েল শোলোকহুব এবং আলেকজান্দার ফাদায়েভ সুনিশ্চিতভাবে তলস্তয়-এর উৎসে আশ্রয় নিলেন আর যাঁদের রচনায় সুতীব্রভাবে দস্তয়ভ্স্কির ছাপ পড়ল তাঁরা হলেন, আর্তজাইবাশেভ, লিওনিদ লিওনিভ, য়ুরি ওলেসা এবং কোন কোন অংশে ইলিয়া এরেনবুর্গ, ফিওডর গ্লাডকহুব ইত্যাদি (জোশুআ কুনিৎজ)।'

মিখায়েল আর্তজাইবাশেভ (১৮৭৮-১৯২৭) বাস্তববাদীরূপে যাত্রা শুরু করে দস্তয়ভ্‌স্কির অমিত শক্তিতে নিজের সৃষ্টিকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিলেন। 'দি ডেথ অফ আইভান লান্দে' কাহিনীটিকে তাঁর প্রতিভার সম্যক্ দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করা যেতে পারে। এতে অখ্রীষ্টিয় জগতে একটি সংলোকের চরম ব্যর্থতা তিনি সংবেদনশীলতায় আঁকতে চেষ্টা পেয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাস বা অন্যান্য কাহিনীতে যৌনকাম, হত্যা এবং নারকীয় আচারের প্রাদুর্ভাব আছে। বস্তুতপক্ষে এই দশকের কথাসাহিত্যিকরা অতিমাত্রায় দেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, হত্যার, আত্মহত্যার রক্তে তাঁরা বাস্তবতার বন্দনা করতে চাইছিলেন কিন্তু দস্তয়ভ্‌স্কির দার্শনিকতা তাদের মধ্যে আশ্চর্যভাবেই অনুপস্থিত ছিল। 'স্যানিন' (১৯০৭) উপন্যাসটিতে আর্তজাইবাশেভ প্রধানত যৌন বিষয়ে তত্ত্বারোপ করতে চেয়েছেন। তিনি যদিও এককালে গুরুত্ব পেয়েছিলেন কিন্তু আসলে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ কথাশিল্পী। তাঁর অগভীরতা এবং রচনা-শৈথিল্য ধরা পড়ে যায় একটু মনোসংযোগের পরেই।

১৯২১ সালে লেনিন তাঁর বিখ্যাত New economic policy-র (N. E. P.) মর্মবার্তা গোচরীভূত করলেন সাধারণ্যে। আন্দ্রে বিয়েলাই (১৮৮০-১৯৩৪) সেই N. E. P.'র এবং রুশ বিপ্লবের বৃহৎ ইতিহাস সম্পাদন করা কালেই দেহত্যাগ করেন। ১৯০১ সালে তরুণ প্রতীকতাবাদীরূপে তিনি তাঁর সাহিত্যারম্ভ করেছিলেন এবং ক্রমে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাহিত্যিকদের অন্যতমরূপে চিহ্নিত হন। তিনি ছিলেন মূলত কবি। কিন্তু রুশ গদ্য সাহিত্যে তাঁর সবিশেষ অবদান আছে বলে কথিত।

ফিওডোর গ্ল্যাডকভ (১৮৮৩-) কৃষক বংশোদ্ভূত কথাশিল্পী। ষোল বছর বয়সেই প্রথম একটি গল্প প্রকাশ করার পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তিনি। এই তরুণ প্রতিভাধরটির ওপর গোর্কির সস্নেহ দৃষ্টি ছিল এবং প্রধানত তাঁরই উৎসাহে গ্ল্যাডকভ তাঁর সাহিত্যজীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন। প্রোলেতারিয়ান সাহিত্য, যার শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা ছিলেন গোর্কি, তার সুষ্ঠু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, গ্ল্যাডকভ-এর রচনায়। 'সিমেণ্ট' (১৯২৬); 'পাওআর' (১৯৩২); 'এ লিটল ট্রিঅলজি' (১৯৩৬) ইত্যাদি কাহিনীগুলিতে তাঁর ক্ষমতার অন্বেষণ আছে। গোর্কি সাহিত্যে সমাজবাদী বাস্তবতার যে রীতি-প্রকরণ প্রচলন করেছিলেন,

১৯১৭ সালের পর সেই ধারানুকারী গ্ল্যাডকভ্ তাঁর 'সিমেন্ট' কাহিনীতে শ্রম ও নির্মাণের (Socialist labour and constrution) প্রথম ভিত্তিস্থাপন করলেন। শ্রম সমস্যায় সোবিয়েৎ লেখকদের এই মনোযোগ বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব (The attention paid by Soviet writers to the problem of labour was in itself something new in the history of world literature'—Tamara Motyleva)। 'সিমেন্ট', গৃহযুদ্ধের বিজয়-বৈজয়ন্তী থেকে শ্রমের বিজয়-বৈজয়ন্তীর উৎক্রান্তিকে সংঘটিত করেছিল।

কম্যুনিস্ট সমালোচকরা যতই বলুন না কেন যে, আধুনিক সোবিয়েৎ লেখকরা অতীতকে তেমন করে আমল না দিয়ে প্রোলেতারিয়েত তত্ত্বের নিরিখেই সাহিত্যসাধনা করছেন,—আসলে প্রায় সব বিংশ-শতকী কবি ও কথাশিল্পীরাই অন্তরে অন্তরে প্রাচীন ঐতিহ্যে আত্মীয়তা অনুভব না করে পারেন নি। আইভান শ্‌মেলেভ (১৮৭৫-১৯৫০) দস্তয়ভ্‌স্কির মতো মানুষের নিপীড়নে বেদনা অনুভব করেছেন এবং পুরনো ঐতিহ্যের সুরে তীব্র প্রক্ষোভকে করেছেন উপন্যাসের বিষয়ীভূত ('ম্যান ফ্রম এ রেস্টুরেণ্ট' ; ১৯১২) তাছাড়া গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তাঁর একটি উপন্যাস ('দি সান অফ দি ডেড' ; ১৯২৩) আছে।

বরিস জাইত্‌সেভ (১৮৮১), চেখভ-এর অনুসরণে ছোটগল্প লেখার জন্য পরিচিত। দেশত্যাগ করে ফ্রান্সে গিয়ে বর্ণহীন নিরুত্তাপ ভাষায় তিনি 'দি গোল্‌ডেন প্যাটার্ন' ও 'গ্লেব্‌স জার্নি' লিখেছেন।

১৯১৭ সালের পর রাশিয়া গৃহযুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় দীর্ণবিদীর্ণ হলো। এবং এর মধ্যে দিয়ে যেমন কম্যুনিস্টদের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, তেমনি সাহিত্যেও এই সময়কার জীবন পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হলো। ১৯১৭-১৯২১ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় যে ভয়ানক অর্থনীতিক সংকট দেখা দিল, তার অনিবার্য পরিণতিরূপে এল কাগজের শিল্পে দারিদ্র্য। সমস্ত দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক কাঠামো একেবারে ভেঙেচুরে গড়বার সেই সন্ধিক্ষণে প্রথমে মনে হলো সাহিত্য ও সংস্কৃতি বুঝি ক্ষীণপ্রাণ হয়ে গেল। বুনিন, কুপরিন, জাইত্‌সেভ, শ্‌মেলেভ, আন্দ্রেয়েভ, রেমিজাভে, সবাই দেশত্যাগী হলেন। তখন—রুশ সাহিত্য প্রাগ, প্যারিস বা বার্লিনের চা, কফি ও

শুঁড়িখানায়, মস্কো ও পেট্রোগ্রাড ছেড়ে ভিড় জমিয়েছে, এমন কথা শোনা যেত। তবু এই গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যে এক নতুন ফসলের উর্বরতা দেখা দিল। যে সব সাহিত্যিকরা এই বিপ্লবের সম্পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, তাঁদের লেখায় এই গৃহযুদ্ধের বর্বরতা, রোমান্টিসিজ্‌ম, আত্মবলিদানের জাঁকজমক ভরা ছবি ধরা পড়লো। এই অ-কম্যুনিস্ট লেখকদের মধ্যে বরিস পিল্‌নিয়াক (১৮৯৪-১৯৩৮ ?) অন্যতম। এই বিপ্লবের আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা আছে, তাকে পিল্‌নিয়াক ও তাঁর সমধর্মীরা চিনতে পারেননি।

নিঃসন্দেহ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী পিল্‌নিয়াক 'দি নেকেড ইআর' (১৯২২), 'রেড উড' এবং অসংখ্য ছোট ও বড় গল্প লেখেন। শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই লেখক তাঁর লেখায় মুক্তকণ্ঠে দেশের শিল্পীকরণ ইত্যাদিকে সমালোচনা করবার জন্য কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। নির্বাসন বা মৃত্যু কিসে তিনি অবলুপ্ত হলেন তা জানা যায় না। 'দি নেটিভ ল্যাণ্ড' (১৯২৭) এবং 'রাশিয়া ওয়াশ্‌ড ইন্‌ ব্লাড' (১৯২৮)-এর লেখক আর্টেম্‌ ভেসেলি-র ভাগ্যেও এমনি ভাবেই শাস্তি নামে।

আইজাক ব্যাবেল (১৮৯৪-) যাঁকে ১৯৩৮-এর পর 'সংশোধিত' করা হয়েছিল, তাঁর লেখায় গৃহযুদ্ধ ও কস্যাকরা, সবটুকু সৌন্দর্য, সবটুকু ভয়ঙ্করতা নিয়ে বিদ্যমান। তাঁর 'রেড ক্যাভেলরি' (১৯২৭) ব্যতীত 'দি লেটার' গল্পের জন্য তিনি সবিশেষ পরিচিত। এতদ্ব্যতীত এই ধারার প্রথম সোবিয়েৎ লেখকদের মধ্যে 'দি ফল অফ দেআর'-এর (১৯১৩) লেখক আলেকজান্দার ম্যালিশ্‌কিন ; 'দি উইণ্ড'-এর (১৯২৫) লেখক বরিস লাভ্‌রেনেভ্‌, ইত্যাদিরা স্মরণীয়।

যাঁরা রাশিয়ার নতুন রূপকে অন্তরে মেনে নিতে পারছিলেন না, তাঁদের ওপর ইউজিন জ্যামিয়াটাইন-এর (১৮৮৪-১৯৩৭) প্রভাব প্রখর হয়। ইউজিনের তীব্র শ্লেষাত্মক সামাজিক বিদ্রূপ 'উই'-তে ভাবী কম্যুনিস্ট সমাজকে যে ভাবে দেখান হয়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—'His social satire 'We', precursor of Huxley's 'Brave New World' and Orwell's '1984' (Marc Slonim.) এই উপন্যাস সোবিয়েতে নিষিদ্ধ হলেও তাঁর

অন্যান্য গল্প, উপন্যাস প্রকাশিত হয়, এবং সরকারের রোষ মাথায় নিয়ে—'Severely persecuted, Zamiatine was forced to leave for Paris, where he died an expatriate.' তাঁর দলভুক্ত, 'Serapion Brethren' নামে খ্যাত, শিল্পীর সর্বাত্মক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তরুণ লেখকদের মধ্যে ক্ষমতাবান লেখক ভ্‌সেভলোদ আইভানোভ তাঁর বলিষ্ঠ ভাষা, চমৎকার কথনভঙ্গী ও জীবনের নগ্নতা উন্মোচনে বিশ্বাস নিয়ে 'কালার্ড উইণ্ড্‌স' ; 'স্কাইব্লু স্যাণ্ড্‌স ; 'পার্টিজান্‌স' (১৯২৩) ; 'আর্মার্ড ট্রেইন নাম্বার ১৪৬৯' (১৯২৩) লিখলেন।

এই দলের আর এক বিদ্রূপ-শিল্পী, মাইকেল জোশেংকো (১৮৯৫) 'দি মেরি লাইফ' (১৯২৪) ; 'হোয়েন দি সান রাইজেস' (১৯৪৩) ইত্যাদি লেখেন।

এতদ্ব্যতীত 'আর্টিস্ট আননোন' ও 'দি ক্যাপ্টেন্‌স'-এর লেখক বেঞ্জামিন কাভেরিন (১৯০২) ; অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে লেখা প্রাচীন ও নবীন ভাবদর্শনের সংঘাতময় বিশিষ্ট উপন্যাস 'এন্‌ভি'-র লেখক য়ুরি ওলেসা (১৮৮৯-) ইত্যাদির নাম স্মর্তব্য।

আলেক্সি তলস্তয়-এর (১৮৮২-১৯৪৫) নামের সংগে রুশ সাহিত্যের দুটি মহৎ নাম যুক্ত। তাঁর পিতা, তলস্তয়ের সংগে এবং মা তুর্গেনিভ-এর সংগে আত্মীয়তায় আবদ্ধ। আলেক্সি ১৯০৯ সালেই রাশিয়ায় সাহিত্যিক-খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। বিপ্লবের পর নতুন রাশিয়ায়, নতুন জীবনের মধ্যে একাত্ম বোধ করে অদম্য প্রাণশক্তিতে আলেক্সি শৈল্পিক ও সাহিত্যিক জীবন-স্ফুরণে প্রতিভাত হলেন। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য যে-সব রাজনীতিক কারণে সোবিয়েৎ দেশ বারবার বিপর্যস্ত হলো তারই মধ্যে আলেক্সি স্বীয় বিশ্বাসে এতখানি স্থির হতে পারলেন যে, তাঁর লেখাতে কোন অস্থৈর্য বিকশিত হলো না। আলেক্সি স্বদেশে তিনবার স্তালিন পুরস্কারের সম্মান পেয়েছেন। সোবিয়েৎ সাহিত্যে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তবু, তাঁর লেখার মধ্যে যা পাঠককে পীড়িত করে, তা হলো জীবননিষ্ঠা, নিপুণ চরিত্র-চিত্রণ, অনবদ্য কথন-ভংগী, সুসাহিত্যিকের এইসব লক্ষাণাক্রান্ত হয়েও ঠিক পরিপুর্ণভাবে কোনটিই তাঁর

মধ্যে দানা বাঁধতে পারে না। একদিকে যেমন তিনি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা-সম্ভারে পাঠককে পরিপ্লুত করেছেন, অপর দিকে তেমনি বহু অপকৃষ্টতায় তিনি ভারাক্রান্ত। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে, গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় 'রোড টু ক্যালভেরি' আলেক্সির মহত্তম সৃষ্টিরূপে পরিচিত। অপরিসীম ধৈর্যে, অগাধ পরিশ্রমে, অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবার পরও তন্নিবিষ্ট হয়ে, ১৯২১-১৯৪১ পর্যন্ত তিনি এর তিনটি খণ্ডকে বারবার লিখে পরিমার্জনা করে তবে প্রকাশ করেন। 'রোড টু ক্যালভেরি' (১৯২১), 'দি ইআর' (১৯১৮-১৯২৬) এবং 'দি গ্রিম মনিং' (১৯৪১) এই তিনটি খণ্ডে বইটি সম্পূর্ণ। নিঃসন্দেহে একটি মহৎ প্রচেষ্টা। তবু এর চেয়ে 'পিটার দি ফার্স্ট' (১ম খণ্ড ১৯২৯ ও ২য় খণ্ড ১৯৩৪) তাঁর শৈল্পিক উৎকর্ষতার দক্ষ পরিচয়। প্রথম পিটারের আনুকূল্যে রাশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির আকাশ পশ্চিমের দিকে প্রসারিত হয়েছিল। সেই সময়ের মানুষ, ইতিহাস, নতুন প্রাণ স্পন্দন, সবই এই উপন্যাসে যথোচিত আবেগ ও নিপুণতায় বর্ণিত। এই উপন্যাসকে পশ্চিমের জগৎ 'Brilliant historical novel' (Marc Slonim) বলেছেন, এবং তাঁর স্বদেশে এর মূল্যায়ন সম্ভবত অন্য কারণে— 'Alexei Tolstoi's Peter I was inspired by great historical changes, the transition from an old qualitative state to a new qualitative state that marked this important period in Russian history.'—Tamara Motyleva. তাঁর অপরাপর লেখার মধ্যে 'নিকিতাজ্ চাইল্ডহুড' (১৯২৩) 'ব্রিড' (১৯৩৭) এবং অন্যান্য গল্প স্মরণীয়।

•

'উইদাউট চেরী ব্লসমস' এবং 'থ্রি পেআর্স অফ সিল্ক স্টকিংস্'-এর লেখক প্যান্টেলেমন রোমানভ্ (১৮৮৪-) প্রাক্-বিপ্লব রুশ সাহিত্যেই পরিচিত হতে পেরেছিলেন। লেনিন প্রবর্তিত N. E. P.-র কালে তাঁর উপরোক্ত বই দুটিতে সোবিয়েতের তৎকালীন তরুণ জীবন সরল হার্দ্যতায় যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে সে সময়কার যুগচিত্রটি চমৎকার মেলে। তেমনি সরল মমতায় রোমানভ্ 'ব্লাকফ্রিটার্স্' গল্পে একটি গ্রাম্য রমণীর ট্রাজেডি বর্ণনা করেছেন। তার স্বামী শহরে নতুন জীবনের প্রয়োজনে একটি সঙ্গিনী বেছে নিয়েছে। স্ত্রীর সংগেও সে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে না। অথচ স্ত্রীটি স্বামী ও তার সঙ্গিনীর সংগে দেখা করে, গ্রামে সন্তানদের কাছে, খামারের জীবনে ফিরতে ফিরতে সে

অনুভব করে স্বামীর সঙ্গিনীর প্রতি সে ঘৃণা অনুভব করতে পারছে না, অথচ নিঃসন্দেহে সে এক অন্ধকার অবস্থার সম্মুখীন।

ভিয়াচেস্‌লাভ শিশ্‌কভ-এর (১৮৭৩-১৯৪২) লেখায় কৌতুকের একটি সুর মিশ্রিত থাকে, যা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'এমেলিআন পুগাচভ্‌'-এও (১৯৪৩) অনুপস্থিত নয়। এতদ্ব্যতীত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি হোর্ড'-ও (১৯২৫) খ্যাতি পেয়েছে। ক্রিমিয়ার যুবা এবং ১৯১৪-১৯১৮-র পটভূমিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে সার্ঝাই সার্ঝিয়েভ্‌ ত্‌সেন্‌স্কি-ও (১৮৭৬) প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

প্রকৃতি, জীবজগৎ, শিকারী ও চাষী এই সব সহজ মানুষকে নিয়ে ভাষার জাদুকর মিখায়েল প্রিশ্‌ভিন (১৮৭৩-১৯৫৪), যে-সব গল্প এবং উপন্যাস ('দি চেইন অফ কাশচে') লিখেছেন, তাতে খোলা মাঠ, রৌদ্রালোকিত আকাশ, সবুজ অরণ্য ও স্তেপভূমিতে তুষারপাতের স্পর্শ পাওয়া যায়। প্রিশ্‌ভিন কিশোর ও বয়স্ক, দুই পাঠক জগৎকেই জয় করতে পেরেছেন।

'তাশকেন্ত্‌ দি সিটি অফ ব্রেড'-এর (১৯২৩) লেখক আলেকজাণ্ডার নেভেরভ (১৮৮৬-১৯২৩) যদিও ১৯০৬ সালেই তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশ করেন, তবু বিপ্লবের পরে গ্রামের চাষীর জীবনকে সমব্যথার সংগে বহু গল্পে চিত্রিত করে তবে তিনি সুনাম অর্জন করতে পারেন।

এফিস জোজুনিয়া (১৮৯১-) যে-সব ছোট ও বড় গল্প লেখেন তার মধ্যে, বিপ্লবের পরে মফঃস্বল শহরে লালফৌজের গতিবিধি নিয়ে লেখা 'এ মেয়ার ট্রিফ্‌ল্‌' উল্লেখ্য।

কোন্‌স্তান্‌তিন ফেদিন (১৮৯২-), গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে 'সিটিজ্‌ অ্যাণ্ড ইয়ার্স্‌' (১৯২৪) লিখে, সোবিয়েৎ সাহিত্যকে অন্যতম প্রথম বৃহৎ উপন্যাস উপহার দিলেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ও প্রাচীন রুশ সাহিত্যে কাহিনীর মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে বিবৃত করবার যে ধারা প্রচলিত ছিল, সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে নিজেকে পরিচিত করলেন ফেদিন। তাঁর 'আর্লি জয়েস্‌' এবং

'নো অর্ডিনারী সামার'-এও (১৯৪৬-৫০) গাথা-ধর্মী উপন্যাস বা 'saga'-র লক্ষণ নিপুণ কৌশলে পরিবেশিত হয়েছিল। ফেদিন প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।

অন্যান্য 'Serapion'দের সংগে যিনি আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ, সেই লিওনিদ্ লিয়নভ্ (১৮৯৯-) সোবিয়েৎ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট এক স্থান পেয়েছেন। ব্যক্তি ও বিপ্লবের মানসিক সংঘর্ষকে তিনি দস্তয়ভ্স্কির প্রভাবে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উদ্ঘাটিত করেছেন 'দি সোবিয়েৎ রিভার'-এ (১৯৩০)। বিপ্লবের পর রক্তস্নাত জন্মভূমিতে যে নতুন জীবন সূচিত হলো, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েও বিপ্লবের ফলে মানুষের জীবন যে ট্রাজিডি নেমে আসে, তাকে তিনি সমান মর্যাদা দিতে ভোলেন না। তাঁর লেখা যদিচ গালভারী শব্দ-ব্যবহার ও পুনরাবৃত্তির দোষে ভারাক্রান্ত, তবু আদর্শের প্রতি আন্তরিক আস্থা, নাটকীয় ভাবে ঘটনাবিন্যাসের কৃতিত্ব, সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের উন্মোচন, তাঁকে এক মহৎ সাহিত্যব্রতী রূপেই চিহ্নিত করেছে। 'দি য়েণ্ড্ অফ্ এ লিট্ল ম্যান' (১৯২৪) ; 'দি ব্যাজার্স'-এর (১৯২৫) লেখক লিয়নভ্ ১৯৪২ সালে তাঁর 'ইন্ভেশন' উপন্যাস-আশ্রিত, উক্ত নামের নাটকটির জন্য স্তালিন পুরস্কার পান।

কোন্স্তানতিন পস্তোভ্স্কি (১৮৯৩-) লেখক জীবনের শুরুতে মিখায়েল প্রিশ্ভিনের অনুসারী ছিলেন। দীর্ঘ দিন বিদ্যাভ্যাস, ব্যাপক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাতে বৈচিত্র্য ও অভিজ্ঞতা এনেছে। সোবিয়েৎ সাহিত্যিকদের মতে 'His Kolkhida is regarded as one of the best works of fiction dealing with the Five-year plan.'—Kunitz. 'ক্রসিং শিপ্স' (১৯২৮), 'ফেট অফ চার্লস লাসেভিল্' (১৯৩১) ; 'কোলখিদা' (১৯৩৪) পস্তোভ্স্কি-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। গভীর দেশপ্রেম, জীবনানুরাগ ও আদর্শের প্রতি প্রবল আস্থা পস্তোভ্স্কির লেখনীতে উজ্জীবিত।

ইলিয়া ইল্ফ (১৮৯৭-১৯৩৭) এবং ইউজেনি পেট্রোভ (১৯০৩-১৯৪২), যাঁরা একসংগে ইল্ফ ও পেট্রোভ্ নামে পরিচিত, তাঁরা N. E. P. যুগের লেখক। যখন ব্যঙ্গ ও শাণিত বিদ্রূপে সোবিয়েৎ সাহিত্যিকে জোশেংকো,

মায়াকোভ্স্কি, কাতায়েভ এই সব খ্যাতনামারা বিভূষিত করেছিলেন। কুনিৎস বলছেন—'A characteristic feature of the writing of the NEP period was the flowering of satire. Much of this was done in a sincere spirit of Bolshevik self-criticism and healthy ebulient fun. But a great deal of it, too, was not without the sharp barbs of malice and ill-concealed gloating over Bolshevik discomfiture.' তখন সোবিয়েৎ সাহিত্য, সাহিত্যিকদের হাতে সমাজের ও রাজনীতির দোষ ত্রুটিকে তীক্ষ্ণভাবে ব্যবচ্ছেদ করে সত্য উদ্‌ঘাটিত করবার ভার দিয়েছে। এই প্রসংগে জোশেংকো-র 'গোল্ড টীথ' স্মরণীয়। একটি কিশোর ভাঙা দাঁতের বদলে সোনার দাঁত পরেছে। তার সহকর্মীরা তাকে ব্যঙ্গ করে। ছেলেটির অবস্থা কুনিৎসের ভাষায় বলা যায়—'The social consciousness of the youth is burlesqued.' সহকর্মীরা 'pokes fun at the early Soviet tendency to stress one's proletarian origin......' ইল্‌ফ ও পেট্রোভ্ তাঁদের উপন্যাস 'ডায়ামণ্ড্স টু সিট অন্' (১৯২৭) ও 'লিট্‌ল গোল্ডেন কাফ'-এ (১৯৩৩) অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় অস্‌টাপ বেন্‌ডার-এর অমর চরিত্র সৃষ্টি করলেন। বেন্‌ডার 'a lovable and ingenious Soviet rogue with a bent for the romantic.' দ্বিতীয় উপন্যাসের কৌতুক, বিদ্রূপ, সোবিয়েতের মানুষের নির্মম বিশ্লেষণ, গোগোল-এর 'ডেড সোল্‌স'কে মনে করিয়ে দেয়। আমেরিকা-ভ্রমণ অবলম্বনে উপন্যাসোপম সুখপাঠ্য 'লিট্‌ল গোল্ডেন আমেরিকা'-তে একদিকে যেমন জীবনাশ্রয়ী কৌতুকের উচ্ছল বন্যা, অন্যদিকে তেমনি আমেরিকার মানুষের অমায়িকতা, কর্মকুশলতা, সময়নিষ্ঠার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে মুখর। এঁদের লেখাতে সোবিয়েতের সাধারণ মানুষ অদ্ভুত সার্থকতায় প্রাণ পায়। 'দি ইম্পর্ট্যান্ট ভিজিটর্স'-এ সম্মানিত অতিথিদের নিজেদের অফিসে টেনে নিয়ে যাবার জন্য দোতলা, তিনতলা ও চারতলার মধ্যে ষড়যন্ত্র, লিফ্‌টের কাছে লুকিয়ে থাকার দৃশ্য কৌতূহলোদ্দীপক। আর, 'কলম্বাস ইন্ আমেরিকা'য় দেশ আবিষ্কার করতে গিয়ে কলম্বাস আমেরিগো ভেসপুচির ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করার প্রস্তাব পেয়ে যেমন হতভম্ব হলেন, ব্রডওয়েের ক্যানক্যান নাচ, কোকাকোলা ও ফোর্ড দেবতার প্রতি নেটিভদের কি সরল আনুগত্য এবং এই অনুন্নত দেশে পায়ের বদলে যারা চারচাকার গাড়ি ব্যবহার করে তাদের মধ্যে স্পেনের মধ্যযুগীয় সভ্যতা বিস্তার

করার স্বর্ণময় সম্ভাবনা নিয়ে যে যুগান্তকারী চিঠি লিখলেন তা পাঠকদের পক্ষে সহজে বিস্মৃত হওয়া মুস্কিল। ইল্‌ফ অসুস্থতায় ও পেট্রোভ সিবাস্তাপোল-এর যুদ্ধে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান।

ভ্যালেন্টিন কাতায়েভ্ (১৮৯৭-) N. E. P. যুগের অন্যতম লেখক যাঁর লেখাতে শাণিত বিদ্রূপ ও মরমী জীবনবোধ একই সংগে প্রবহমান। ন' বছর বয়স থেকে কবিতা লিখে তাঁর সাহিত্যে প্রবেশ। তারপর ক্রমে ক্রমে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক রূপে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। জীবনের সহজ, চিত্রময় বর্ণনা দিতে তিনি পারঙ্গম। আবার, মানুষের ব্যবহারের মূল অনুসন্ধানে মনস্তত্ত্বের গহনে অনুপ্রবেশ, কাতায়েভকে নিঃসংশয়ে উনবিংশ শতকের খ্যাত-নামাদের অনুসারী করেছে। অন্তত, তিনি যে তাঁদেরও ভাবাদর্শে উজ্জীবিত, সে-কথা বুঝতে ভুল হয় না। 'দি এমবেজ্‌লার্স'-এ (১৯২৬) মস্কো ট্রাস্ট্-এর দুই কর্মচারী টাকা ভেঙে রাশিয়ার সর্বত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই কৌতুকপূর্ণ অ্যাভ্‌ভেঞ্চার স্বচ্ছ চিত্রময়তায় বর্ণিত। আবার 'টাইম, ফরওআর্ড'-এ (১৯৩২) তাঁর এক্সপ্রেশনিস্ট দৃষ্টিভংগীটুকু সুপরিস্ফুট। কাতায়েভ্-এর ছোট গল্পও বিখ্যাত।

গত কয়েক বছরের সময়পাতে একটি মানুষের নাম আর একটি বইয়ের নাম জগতের বিস্মিত মানুষের চেতনায় বিদ্যুতের মতো চম্‌কে গেছে বারংবার। আজ বিশ্বের বিশুদ্ধ পাঠকরা যখন সাহিত্যের জঙ্গমতায় বিশ্বাস হারাতে বসেছেন, সনাতনী জীবন্মুক্তির সুর যখন ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে, ইওরোপীয় ধ্রুব সাহিত্যের যাদুঘর থেকে যখন মৃত্যুশীতল নীরবতার থমথমে বিস্ময় ছাড়া আর কোন সংবাদ প্রচার করে না, তখন অকস্মাৎ একটি মানুষের পৌনপুনিক নাম-উচ্চারণে তাঁর সৃষ্টিতে স্বস্তি পাওয়ার দৃষ্টান্ত খুব সহজ কথা নয়। বরিস পাস্টেরনাক (১৮৯০-'৬১) সম্বন্ধে আজ হয়ত প্রথম উত্তেজনার সেই তীব্রতা অনেক থিতিয়ে এসেছে কিন্তু তাতেই তাঁকে আরো বেশি ক'রে চিনতে পারা যাচ্ছে। কারণ তিনি উত্তেজনার লোক নন্। সকল উত্তাপের বাইরেই তাঁর প্রশান্ত জগৎ অপেক্ষা করে আছে। রাশিয়া, যে-রাশিয়া তলস্তয়, দস্তয়ভ্‌স্কির পবিত্র শিল্পাত্মাকে বহন করেছে, সেই রাশিয়া আবার পাস্টেরনাক-এর নিঃসীম জীবন্ময়তার শুদ্ধ বাণীকে ধারণ করে গৌরবান্বিত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি,

গত কয়েক বছরের ইতিহাস কি ভয়ানক কয়েকটি মৃত্যুর সুতীব্র যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেছে। এবং নিঃসংগ পাস্টেরনাক-এর বেলায়ও তা হলো না। মোহভংগের সত্যকে তিনি পরিষ্কার করে বলতে গিয়ে 'জীবন বিমুখ' 'পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন' বলে পুরস্কৃত হলেন। আর কি আশ্চর্যভাবে তাঁর শিল্পীসত্তার লাঞ্ছনা করা হলো, আত্মার স্বাধীনতায় শৃংখল পরিয়ে, মস্কোর দোকান থেকে তাঁর বইকে বিলুপ্ত করে এবং তাঁর বিশাল পরিচয়কে ছোট্ট একটি অনুবাদকের বিন্দুতে নামিয়ে এনে নীতির শৃংখলা রক্ষার কি সুচারু দায়িত্বই না সম্পন্ন হলো! আর তাতে 'ক্ষতি হলো স্বকীয় রচনার—কিন্তু কে জানে ক্ষতি হলো কি না। সোভিয়েট লেখকরা যতক্ষণ জোট বাঁধছেন, দল পাকাচ্ছেন, তৈরি করছেন নতুন সাহিত্যের আইনকানুন, আজ একরকম ফতোয়া জারি করে পরশু সেটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছেন, চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন তাসকন্দ বা হ্রোৎসক্লাভে, যতক্ষণ ফাডাইয়েভ এলিয়ট-প্রমুখ পশ্চিমী লেখকদের রচনাকে শেয়ালের হুক্কাহুয়ার সংগে তুলনা করার কয়েক বছর পরেই আত্মহত্যা করে মরেছেন—ততক্ষণ পাস্টেরনাক নিভৃতে বসে অনবরত তীক্ষ্ণ রাখলেন লেখনী, জাগ্রত রাখলেন চিন্তা—বাস করলেন ভাষার সংগে ভাবনার সংগে, ভাষা ও ভাবনার যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে, শ্রেষ্ঠ কবিদের নিবিড় সাহচর্যে। এই অনুবাদকর্ম অবসন্ন ক'রে দিল না তাঁকে, বরং দিনে-দিনে আরো সুপক্ক করে তুললো, আবার কোন উচ্চারণের জন্য আরো বেশি প্রস্তুত। কিছু তাঁকে বলতেই হ'তো, ভাঙতেই হ'তো মৌনতা একদিন; বহু বছর ধ'রে, সারা জীবন ভ'রে, যা কিছু তাঁর মনের মধ্যে জ'মে উঠছিলো কোনভাবে তাকে নিষ্কৃতি না দিলে তাঁর নিয়তিই বা নিষ্কৃতি দেবে কেন? সেই নিষ্কৃতির নাম ডাক্তার জিভাগো' (বুদ্ধদেব বসু: বরিস পাস্টেরনাক)। পাস্টেরনাক মূলত কবি, মহৎ কবি। 'জিভাগো' উপন্যাসটিতেও তাঁর কাব্যের নির্ঝর নিরন্তু ধারায় বয়েছে, সংলাপের সংগে বেজেছে সংগীত—উপন্যাসের জন্মকে করেছে সম্পূর্ণ। ডাঃ জিভাগোর যন্ত্রণা পাস্টেরনাকের মনে অল্পে অল্পে সঞ্চয় পেয়েছে, তাকে তিনি পবিত্র অনুভবে তাঁর দেবতার কাছে নিয়ে এসেছেন। তাঁর গম্ভীর সমাহিত উদ্‌গতি একটি প্রাচীন দেবালয়ের মতো শুদ্ধ স্তব্ধতা দিয়েছে উপন্যাসটিকে। যে-দেবালয়ের নিস্তব্ধতার সামনে দাঁড়ালে তার শাদা অন্ধকার হৃদয়ের সব পৈশুন্যকে বিবশ করে, তার নির্জন প্রার্থনাগৃহ, দেবতার প্রতিমূর্তির শান্ত বেদনা মানুষকে বলে দেয় তার আসল পরিচয়, যুগ-যুগান্ত ধরে যে-মানুষ বেদনায় তরঙ্গিত হয় অথচ তার চেতনাকে একটা আশ্চর্য

ঔদাসীন্যের তিমির ঢেকে রাখে, শুধু কোন 'বৃহৎ শক্তি'র মুখোমুখী এলে তার বেদনাবোধের মৌনতা ধীরে ধীরে গলতে থাকে, নিঃসীম নিঃসংগতার মিটমিটে প্রদীপ সেই শক্তির ঝড়ে হৃদয়ের গোপনে দপদপ করে ওঠে। মানুষ বোঝে বেদনার গর্ভে, যন্ত্রণার ঔরসে তার জন্ম—তাই তাতে তার আজীবন উত্তরাধিকার। 'ডাঃ জিভাগো'য় মার্ক্সবাদ, রুশ বিপ্লব, যৌথীকরণ সম্পর্কে লেখকের যে-সব উক্তি আছে, তাকে তির্যক দৃষ্টিতে না-দেখলে শুধু একটি মানুষের আশাহত প্রাণের বেদনাসঞ্জাত আত্মদর্শনই পরিস্ফুট হবে। আর, পাস্টেরনাক নিজেও রাজনীতির পংককুণ্ডে শিল্পকে ক্লেদাক্ত করতে চান নি: 'My novel was not intended to be a political statement. I wanted to show life as it is, in all its wealth and intensity. I am not a propagandist!' কিন্তু, রাজনীতির প্রচার থেকে তাঁর সাহিত্যকে সংস্পর্শমুক্ত করতে চাইলেও পাস্টেরনাক মনের সংশয়কে ঘোচাতে পারেন নি। যে-সংশয় তাঁর চেতনার মূলে অনেকদিন ধরে বিন্দুতে বিন্দুতে জমে একটি জমাট আতংকে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক শাসকগোষ্ঠীর অত্যুৎসাহে যে-দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে অন্য সকল 'ব্যবস্থা'কেই একটি মতে কিংবা একটি ছাঁচে ঢেলে ফেলা যায়—সংবেদনশীল, আত্মলীন, ব্যক্তির মুক্তিকামী পাস্টেরনাক-এর আতংকটা সেই অনভিপ্রেত, ব্যবস্থাকে ঘিরেই। তাই, তিনি উপন্যাসটিতে বলেছেন 'Revolutionaries who take the law into their own hands are horrifying not because they are criminals, but because they are like machines that have got out of control like runaway trains'. হাতের বাইরে ছিট্‌কে-পড়া উন্মত্ত যন্ত্রদানবের লাল-চোখ দেখে তাই তাঁর ভয় না-পেয়ে উপায় কী? আর, পাস্টেরনাক তাঁর দেশের মানুষ অপেক্ষা স্বচিন্তাকে এই যে অন্য পথে ধাবিত করেছিলেন, যে চিন্তার শব্দ তিনি ছাড়া আর কেউ শোনে নি, আর কোন আধুনিক রুশ সাহিত্যিকের রচনায় বাজে নি, যে তন্ময় চিন্তা, আশংকা, নৈরাশ্য, 'উন্মীলিত ঘাসের মতো' শুধু তাঁরই হৃদয়ে বর্ধিত হয়েছে তার মূলে আছে একটা ভয়ংকর সত্য। তাই, একালের এক শক্তিধর রুশ সাহিত্যশিল্পী ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর আত্মজীবনীতে পাস্টেরনাককে সপ্রশংস নমস্কার জানাতে গিয়ে সম্প্রতি সেই ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখী হয়েছেন। রুশ লেখক ইউনিয়নের মুখপত্র ওক্তিয়াবার এরেনবুর্গকে পাস্টেরনাক-এর 'অবক্ষয়ী নন্দনতত্ত্ব' নিয়ে মাথা ঘামানোয় এবং

'Prejudiced and mistaken aesthetic Judgement'-এর জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। আক্রমণ রচনার আরো কৌশলের মধ্যে আছে, এরেনবুর্গ 'failing to condemn this withdrawal from society— and even seeking to Justify it.' পাস্টেরনাক দ্বিতীয় রুশ সাহিত্যিক যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং প্রথম যিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সোবিয়েৎ সাহিত্যের তিনটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, এরেনবুর্গ, শোলোকভ্ ও ফাদায়েভ্-এর মধ্যে এরেনবুর্গই বয়োজ্যেষ্ঠ। ইলিয়া এরেনবুর্গ ১৮৯১ সালে মস্কোতে এক সম্পন্ন ইহুদী পরিবারে জন্মান। শৈশব থেকেই তাঁকে শিক্ষা ও ভ্রমণের সবটুকু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য বহু ইহুদী পরিবারের মতো এরেনবুর্গের পরিবারও সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতের অনুরাগী, সংস্কৃতিসম্পন্ন।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, বা 'Socialist realism' কথাটি তৃতীয় দশকের মধ্যমে প্রথম শোনা গেল। এবং শীঘ্রই সোবিয়েৎ শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কথাটি রূপান্তরিত হলো একটি নীতিতে, সে নীতিকে আশ্রয় করে সোবিয়েতের তরুণ লেখকরা জীবনানুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত হলেন। যখন তরুণ লেখকরা তথ্যসংগ্রহের জন্য, জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য কারখানা, যৌথখামার, শ্রমিক কম্যুনে ঘুরছেন—মার্ক্সবাদ পাঠের সংগে সংগে দেশের আমূল পরিবর্তনকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছেন, তখন, যে-সব সাহিত্যিকরা আগে থেকেই লিখছেন, তাঁরাও এগিয়ে এলেন। এই পরিবর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীকে তাঁরাও গ্রহণ করলেন। সোবিয়েতের এই সময়কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে জোশুয়া কুনিৎস্ বলেছেন— 'Wittingly or unwittingly, many of the non-marxist writers, including some of those on the right, men like Ilya Ehrenburg, Leonid Leonov, and Alexei Tolstoy, became gradually imbued with Marxist ideas and attitudes. Their writing underwent a steady change, becoming increasingly less skeptical, less ironical, more positive.' তারপর থেকেই এরেনবুর্গ তাঁর ভূমিকার গুরু দায়িত্ব সগৌরব সার্থকতায় বহন করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা তাঁর প্রোজ্জ্বলন্ত বিশ্বাসকে বহন করে। আদর্শবাদের চাপে তারা রক্তমাংসের মানুষ হতে ভোলে না। 'দি এক্স্‌ট্রাঅর্ডিনারী অ্যাডভেঞ্চার্স অফ জুলিও জুরেনিতো' (১৯২১) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে পরিচিত ছিল। এর আগে ও পরে অন্যান্য বই

বাদ দিয়ে 'আউট অফ কেঅস্' (১৯৩৪) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থকতার পটভূমিকে বিস্তৃত করেছে। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত 'দি স্টর্ম' তাঁর স্বদেশে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। তবে, বহু চরিত্রসমন্বিত, বহু ঘটনাকীর্ণ 'ফল্ অফ প্যারিস'-কেই (১৯৪১) পাঠকসমাজ পৃথিবীর সর্বত্র সুবিপুল অভিনন্দন জানিয়েছে। ফ্রান্সের চরম দুর্যোগের প্রাক্কালে প্যারিসে চিত্রকর আঁদ্রের চিত্রশালায় এক শিল্পরসিক সাদামাটা জর্মান যুবকের সাক্ষাৎ নিয়ে উপন্যাসের শুরু। তারপর বহু চরিত্রের, বহু ঘটনার, বর্ণাঢ্য মিছিলের শেষে উপসংহারে, জর্মান অধিকৃত প্যারিসে, আঁদ্রেকে দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি। ইতিমধ্যে মানবীয় সম্পর্কের বহু বিচিত্র রূপ পাঠককে বিস্মিত করে। লোভী, কামুক, নীতিহীন মন্ত্রী তেসা, তার স্ত্রী আমেলি, তার বয়ে-যাওয়া প্রতিভাবান ছেলে লুসিয়ঁ, মেয়ে দেনিস, দেনিসের কম্যুনিস্ট প্রণয়ী মিশো, স্পেনে যুধ্যমান পিয়ের, তার স্ত্রী আন, ছেলে দুদু, আঁদ্রে ও জিনেৎ-এর নিষ্ফল ভালবাসা, জিনেৎ ও লুসিয়ঁর অদ্ভুত সম্পর্ক, জিনেৎ ও দেসের-এর প্রণয়, দেসের-এর আত্মহত্যা, শ্রমিক ছেলে ক্লদ্ ও তার মা, লুসিয়ঁর পরিত্যক্ত প্রণয়িনী মুস্, এদের প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকের জীবন কি ভাবে জড়িয়ে বয়ে চলেছে। পড়তে পড়তে মনে হয় 'ফল অফ প্যারিস'-এর ভিতরে বৃহত্তর জীবনেরই প্রাণ-প্রবাহ গতিশীলতা পেয়েছে। বন্যার জল যেমন খড় কুটো, গাছ সবই টেনে নিয়ে কল্লোলে বয়ে যায়, তেমনি করে এই সব মানুষদেরও টেনে নিয়ে চলেছে মহাকাল। এরেনবুর্গ এই উপন্যাসে সিদ্ধি পেয়েছেন, এবং একে মহৎ উপন্যাস বললেও ভুল হয় না। কেননা এতে তিনি সেই শিল্পীজনোচিত নিরাসক্তি বজায় রাখতে পেরেছেন যার ফলে কোন চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকেনি। রাজনীতির ছাপ দিয়ে কোন চরিত্রকে বড় বা ছোট করেননি এরেনবুর্গ। মানুষের দোষ, ত্রুটি, স্খলনকে মানবীয় বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাই অকম্যুনিস্ট মন্ত্রী দেসের-এর আত্মহত্যা, লুসিয়ঁর জিনেৎকে স্মরণ করে মৃত্যু-বরণ, জিনেতের প্রতি নিঃসংগ, আত্মকেন্দ্রিক আঁদ্রের মূক ভালবাসা, সবই এই বইয়ে সম্পূর্ণ মানুষের চিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে। শিল্পী স্বীয় সাধনায় একনিষ্ঠ হলে, দেশ-কালের বাধা পেরিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পারেন, সৃষ্টি করতে পারেন, এরেনবুর্গের 'ফল অফ প্যারিস'-ই তার প্রমাণ।

আলেক্জাণ্ডার ফাদায়েভ্-এর (১৯০১-) পিতামাতা কৃষক ঘরে জন্মেও দুজনেই ডাক্তারের সহকারী হবার পরীক্ষা পাশ করে চাকরী করেন। তাঁদের

সংগে সংগে ফাদায়েভ্ জীবনের বহু বিচিত্র পথে হেঁটেছেন। নানা অভিজ্ঞতায় ধনী করেছেন নিজেকে। বাইরের পৃথিবী ফাদায়েভ্-এর নাম শোলোকভের পরেই উচ্চারণ করে। তার অন্যতম কারণ হলো গৃহযুদ্ধের পটভূমিতেই শোলোকভ্-এর এপিক উপন্যাস রচিত। আর ফাদায়েভের অতি বিখ্যাত 'দি নাইন্টিন' (১৯২৫-২৬) গ্রন্থটির পটভূমি ওই গৃহযুদ্ধ এবং কস্যাক চরিত্ররাও ভীড় করেছে সেখানে।

সোবিয়েৎ লেখকদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী সাহিত্যিক ফাদায়েভ্। লিয়নভ বা আলেক্সি তলস্তয় বা এরেনবুর্গের মতো প্রাক্-বিপ্লব যুগের ধ্যান-ধারণা ছেড়ে তিনি নতুন সোবিয়েতের মর্মে প্রবেশ করেন নি। এই নতুন জীবন যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তাঁর যৌবনের সময়। যখন মনের সজীবতা সবচেয়ে প্রখর, আদর্শের জন্য যখন হাসতে হাসতে মরা যায়। বিপ্লবের পর, গৃহযুদ্ধের রক্তাক্ত অধ্যায়ে রক্ত মিশিয়ে যারা নতুন রাশিয়াকে সম্ভব করল, তাদের মধ্যে, আশায়, আনন্দে, সংগ্রামের সাফল্যে যেন এক নতুন আকাশের দিগন্ত বিস্তার হলো। মধ্যযুগের খ্যাত ও অখ্যাত বীর পর্যটকরা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করে, তাঁদের দ্বারা এই মহৎ কাজটি সম্ভব হলো সেইজন্য যেরকম গরীয়ান, বলীয়ান বোধ করেছিলেন, সোবিয়েতের প্রথম যুগের সেইসব যোদ্ধা, লেখক, শিল্পী, শ্রমিক, তাঁরাও হয়তো সেই গৌরব, সেই শক্তিই অনুভব করেছিলেন। তাই, সোবিয়েত সাহিত্য পৃথিবীকে যে দুটি বিখ্যাত উপন্যাস দিয়েছে, তার অন্যতম, এবং উৎকর্ষে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ 'দি নাইন্টিন'—ফাদায়েভ্ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই রচনা করতে পেরেছিলেন। সুদূর প্রাচ্যে জাপানী আক্রমণকারী ও তাদের রুশ সহকারীদের বিরুদ্ধে 'রেড পার্টিজান্'দের একটি দল যুদ্ধ করতে করতে কি ভাবে মারা গেল, 'দি নাইন্টিন' তাই নিয়েই রচিত। এতে প্রত্যেকটি চরিত্রের বিশিষ্টতা আছে। যুদ্ধ এমনই ভাবে মানুষকে মন্থন করে যে, মানুষের আসল স্বরূপটি সেই মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালেই বেরিয়ে পড়ে। তাই, বুদ্ধিজীবি মেচিক, তার ত্রাণকর্তা মোরোজিয়ার স্ত্রী ভেরিয়ার সংগে স্বচ্ছন্দে প্রেমের খেলায় মাতে। এবং মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে তার বীরত্বের আস্ফালন যখন একেবারে চুপসে যায়, তখন সে ভেরিয়াকে কামুক ত্‌চীঝ্-এর হাতে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দেয়। ভেরিয়ার স্বামী মোরোঝ্‌কা স্ত্রীকে যখন তার বিশ্বাসভঙ্গের কথা বলে, ভেরিয়ার মধ্যে তখন কোন দুর্বলতা দেখা যায় না। সে বলে—'তুমি তিনবছরে আমাকে কি একটিও সন্তান দিতে পেরেছ?' মোরোঝ্‌কা ভেরিয়ার প্রেম কামনা না করে

যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যায়। মোরোঝ্‌কার বিক্ষুব্ধ, আহত হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা পায় তার প্রিয় ঘোড়া মিশ্‌কা। ঘোড়া এবং ডন কস্যাকদের অঙ্গাঙ্গী আত্মীয়তা ফাদায়েভের বইতে চমৎকার ভাবে ফুটেছে। দুঃসাহসিক ভেরিয়ার চরিত্র যেন শোলোকভের আক্‌সিনিয়া বা ডারিয়াকে মনে করিয়ে দেয়। সবচেয়ে গম্ভীর মহিমায় বিকীর্ণ হয়েছে নেতা লেভিন্‌সন। কুঁজোপিঠ, বামনাকৃতি এই ইহুদীটি, মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী, যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণে সমর্থ। লেভিন্‌সনের স্থান শোলোকভের পোদ্‌টেল্‌কভ্‌-এর সমতুল্য। এইসব নেতারাই সহস্র সহস্র বিভ্রান্ত মানুষকে সংহত করে, পরিচালিত করে শেষ অবধি সোবিয়েত ভূমি থেকে বিপ্লবের শত্রুদের সরিয়ে দিতে পেরেছিল। উপন্যাসের উপসংহারে, যখন সমস্ত সঙ্গীরা মৃত, তখনও মুষ্টিমেয় আঠারোজনের সহায়তায় লেভিন্‌সন এগিয়ে চলে। ফাদায়েভের উপন্যাসে প্রকৃতিরও এক মহান্‌ ভূমিকা আছে। লেভিন্‌সন দেখছে, নদীর ওপারে আকাশে ঠেলে উঠেছে নীল পাহাড়ের চূড়া। আর গোলাপী সাদা মেঘ থেকে উপত্যকায় ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। লেভিন্‌সনের সিক্ত চোখ অনুভব করে পৃথিবী ও আকাশের বিস্তৃতি কি মহিমময়। আর, দূরে যেসব কৃষকরা তার দিকে চেয়ে আছে, তাদের সে রুটি ও বিশ্রাম এনে দেবে। সেই দূরের মানুষরাও এই আঠারোজনের মতোই তার অন্তরঙ্গ। লেভিন্‌সন চোখ মুছে ফেলে। 'He ceased crying ; it was necessary to live and a man had to do his duty.' ১৯৪৫ সালে রচিত 'ইয়ং গার্ড' ফাদায়েভের অন্যতম বিখ্যাত ও স্তালিন পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস। ফাদায়েভ লেখক-নেতা হয়ে বহু দায়িত্ব হয়ত সার্থকভাবে পালন করেছেন, আরো বই লিখেছেন, কিন্তু 'দি নাইন্টিন'-এর নিকটবর্তী হয়নি কোনটিই। নিঃসন্দেহে ফাদায়েভ তাঁর শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষটুকু চয়ন করে এই উপন্যাসে পরিবেশিত করেছিলেন।

স্তেপ ভূমি ও ডন নদী আশ্রিত ছোটগল্প (অ্যাজিওর স্তেপ্‌স স্টোরিজ ১৯২৬ ; টেল্‌স্‌ অফ দি ডন ১৯৩০) লেখকের অনুল্লেখ্য ভূমিকা ছেড়ে যিনি এক মহৎ ও সার্থক ঔপন্যাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, সেই মিখায়েল শোলোকভ্‌ ডন নদীর জলসিঞ্চিত স্তেপ্‌ ভূমির সন্তান। ডনের তীরে ভোলেন্‌-স্কাইয়া স্তানিৎসা গ্রামে ১৯০৫ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মা আধা কস্যাক, আধা চাষী। পিতা কৃষক, পশু ক্রেতা, ও মিল ম্যানেজার। ডনকস্যাকদের জীবনের সংগে তাঁর আজন্ম পরিচয়। গৃহযুদ্ধে যোগ দেবার আগে সামান্য শিক্ষালাভ।

অতঃপর তিনি ইয়ং কম্যুনিস্ট ম্যাগাজিন-এ লিখতে শুরু করেন। স্বীয় গ্রামেই তিনি আজীবন বাস করেছেন। খামার যৌথীকরণ, চাষীদের মনে সরকারের প্রতি অবিশ্বাস, প্রাচীন রীতিনীতি ত্যাগ করবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তিনি চাক্ষুষ করেছিলেন। তাঁর 'সীড্‌স অফ টুমরো' বা 'ভার্জিন সয়েল আপ্‌টার্নড'-এর (১৯৩৩) বিষয়ই হলো তাই। 'অ্যাণ্ড কোআয়েট ফ্লোজ্‌ দি ডন' এবং 'ডন ফ্লোজ্‌ হোম টু সী' এই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'দি কোআয়েট ডন' উপন্যাস ১৯২৬ থেকে ১৯৪০ চৌদ্দ বছর ধরে রচিত হয়। 'অ্যাণ্ড কোআয়েট ফ্লোজ্‌ দি ডন'-এর ইংরেজী সংস্করণ বহির্বিশ্বে মুক্তি পায় ১৯৩৪ সালে। এবং দ্বিতীয় বইটি, জর্মানী রাশিয়া আক্রমণ করবার ঠিক প্রাক্কালে যখন পাঠকের হাতে পৌঁছল, তখন যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক এই নতুন বইটি সম্পর্কে সারা বিশ্বের পাঠক সমাজ অপেক্ষা করে আছে। সেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পশ্চিম পৃথিবীতে তখন তলস্তয়ের 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'-এর পাঠক বেড়ে গেছে। শোলোকভের ডন-এপিক'এর মধ্যেও পশ্চিমের পাঠক তলস্তয়ের সেই মহৎ উপন্যাসের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করতে পেরেছিল। ১৯৪১-এর এপ্রিলের মধ্যে বইটি সোবিয়েতের আটত্রিশটি ভাষায় অনূদিত হয়ে পঞ্চাশলক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল! তাতার ভাষায় কস্যাক শব্দের মানে হলো স্বাধীন। তাতার সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে দেবার সময়ে রুশ সম্রাটরা কস্যাকদের সীমান্ত প্রহরীর পদ দেন। 'To call a cosscak a peasant was an insult in the old days.' কস্যাকদের জমি দিয়ে বসত করানো হয় ডন ও নীপারের তীরে। কস্যাকরা তাদের দলনেতা আতামানকে এবং পিতৃভূমিকে শ্রদ্ধা করতে শেখে শৈশব থেকে। তারা দক্ষ অশ্বারোহী। শোলোকভ যে লোকসংগীতটি দিয়ে উপন্যাস সূচনা করেছেন, তার ছত্রে ছত্রে কস্যাকদের সংগ্রামী জীবনের বেদনা মূর্ছিত—

> 'আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমিকে কোন লাঙলের ফাল দীর্ণ করেনি
> ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে সে মাটি কর্ষিত
> আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে কস্যাকদের মাথা আছে নিহিত
> ধীরছন্দ ডনের অলঙ্কার হলো তরুণী বিধবারা
> ধীরছন্দ ডনের তীরে অনাথ শিশুদের ভীড়
> ডনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত না পিতা মাতা-র অশ্রু এসে মিশেছে।'

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে, ডন নদীর তীরে তাতারস্ক্‌ গ্রামে এই উপন্যাসের শুরু। সেই বর্বর, প্রাচীন রীতিনীতি-আশ্রিত জীবনে কস্যাকরা শিকার করে,

মাছ ধরে, চাষ করে। তাদের প্রেম যেমন উন্মত্ত, তেমনই নিষ্ঠুর। তাতার মায়ের ছেলে প্যাণ্টেলেমন মেলেখভ্, তার দুই ছেলে পিওট্রা ও গ্রেগর, স্ত্রী ইলিনিচ্না, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ডারিয়া, মেয়ে ডুনিয়া এই পরিবার ও মেলেখভ্ খামারবাড়ি-ই উপন্যাসের কেন্দ্র। গ্রেগর তার প্রতিবেশী স্টিফান অ্যাসটাকোভ্--এর স্ত্রী আক্সিনিয়াকে ভালবাসে। গ্রেগরকে ধনী কোর্শুনভ পরিবারের মেয়ে সুন্দরী নাতালিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। গ্রেগর আক্সিনিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যায় এক ধনী জমিদারবাড়ি। পরে গ্রেগর তাকে ছেড়ে নাতালিয়ার কাছে ফিরে আসে। স্টিফেন ও আক্সিনিয়া আবার একসাথে বসবাস করে। বিপ্লবের প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া ও প্রাচীন জীবনের প্রতি শপথবদ্ধ ডন কস্যাকরা অভিজাত অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আতামান-শাসিত স্বাধীন কস্যাক রাজ্য চেয়ে যুদ্ধ করে। বিপ্লবে তাদের সমর্থন নেই। এদিকে উত্তর দেশের দরিদ্র কস্যাকরা বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারপর কস্যাক ভূমির বুকে মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধ। গ্রেগর মেলেখভ্ এই অভিজ্ঞতায় দীর্ণ বিদীর্ণ হয়। যুদ্ধের নৃশংস দাবী মেটাতে গিয়ে তাতারস্ক্ গ্রাম শ্মশান হয়ে যায়। হোয়াইটদের সঙ্গে যোগ দেবার অপরাধে গ্রামের যারা বলশেভিক, তারা শৈশবের প্রতিবেশীদের নৃশংস ভাবে খুন করে। আবার তারা যখন ধরা পড়ে, তখন বলশেভিকনেতা পোদ্‌টিয়েলকভ্, কম্যুনিস্ট ইলিয়া বান্‌চাক, তার বাগ্‌দত্তা আনা সবাই নিহত হয়। গ্রেগর একবার রেড্ একবার হোয়াইটদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে শেষ অবধি পরাজিত হোয়াইটদেরও ছেড়ে চলে যায়। যুদ্ধের যে নৃশংসতা, যে বীভৎসতা গ্রেগরকে এমনি করে অস্থির করছে, কোথাও স্থির হতে দিচ্ছে না, তাকে শোলোখভ্ কি মর্মন্তুদ ভাবে দেখিয়েছেন তা অকল্পনীয়। কামান্ধ সৈন্যরা দলবেঁধে ফেনিয়ার উপর অত্যাচার করে। ডনভূমি শ্মশান। মেয়েরা যে কোন সৈনিকের সংগেই রাত কাটাতে প্রস্তুত। হত্যার আনন্দে পশু ইউস্থরপিন ঠাণ্ডা মাথায় বন্দীদের কসাইয়ের মতো মারে। গ্রেগরের নিজের পরিবারে ভাই ও বাবা মৃত। স্বামীর মৃত্যুর পর ডারিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের অনিবার্য ফলস্বরূপ যৌন-ব্যাধির আক্রমণে আত্মহত্যা করে। মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোন ডুনিয়াকে মিটিয়া কোশেভয়কে বিয়ে করবার সম্মতি দেয়। মিটিয়া বলশেভিক। সে গ্রেগরের বাল্যবন্ধু হলেও আজ তার শত্রু। মা-ও মারা যায়। তখন গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। হোয়াইটরা পরাজিত, কোণঠাসা। এরই মধ্যে গ্রেগরের ও আক্সিনিয়ার প্রেমের কাহিনী,

ডন যেমন সমুদ্রে যায়, তেমনই ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে চলেছে। ধীর, স্বভাব-শান্ত নাতালিয়া, যখন নিশ্চিত জেনেছে, স্বামীর প্রেম সে কোনদিন পেল না, তখন সে গর্ভের সন্তান নষ্ট করে স্বেচ্ছা-মৃত্যু ডেকে এনেছে। শেষে, যুদ্ধক্লান্ত, পরাজিত, বিধ্বস্ত গ্রেগর আক্‌সিনিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। দুজনেরই তখন চুলে পাক ধরেছে। যৌবনের দিন অতিক্রান্ত। পালিয়ে যাবার সময়ে আক্‌সিনিয়া গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। আক্‌সিনিয়ার মৃত্যুর সংগে সংগেই উপন্যাসের প্রকৃত উপসংহার। গ্রেগরের ক'দিন কাটল বনে বনে, জন্তুর মতো লুকিয়ে। তারপর সে ফিরে এল গ্রামে। রেড্‌দের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। তার মেয়ে মারা গেছে। বালক পুত্রের হাত ধরে গ্রেগর মেলেখভ্‌ খামারের দরজায় দাঁড়াল। পুত্রের হাত নিজের হাতে ধরে তার মনে হলো, মরবার আগে, সে যে তার ছেলের কাছে ফিরে আসতে পেরেছে, এ যেন ভাগ্যের এক মস্ত দাক্ষিণ্য। মানুষের জীবন এই উপন্যাসে পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থিত। কত অসংখ্য চরিত্র, কত ঘটনার মিছিল, কত নরনারীর প্রেম। এবং এই মনুষ্য-মিছিলের সমারোহের সংগে সংগে, ডন নদী ও স্তেপভূমি তার সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে এমন করে উপস্থিত না থাকলে বোধহয়, উপন্যাসটি এত আকাশের বিস্তার, এত দিগন্তলীন প্রান্তরের মুক্তি পেত না। মানুষের সংগে প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী আত্মিকতা বহু জায়গায় ফুটেছে। গ্রেগর সর্বকালের সর্বমানুষের ট্রাজিডীর প্রতীক। 'The portrait of Gregor is remarkable both in itself and in the meanings it suggests beyond itself, as the tragic symbol of the fate of a people. Many Gregors find themselves in the conflicts of our time torn and divided as he is. He has been neither over simplified nor overpsychologized—' Burrell. ডন নদীর প্রবহমানতায় যেমন মানুষের জীবনের চিরন্তনতার ইঙ্গিত আছে, এই উপন্যাসেও তেমনই মানুষের আশা, আনন্দ, প্রেম, সংগ্রাম ও মৃত্যুর চিরন্তনতা বিরাজমান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জর্মানীর রাশিয়া আক্রমণ, রুশ সৈন্যদের সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও বিজয় সোবিয়েৎ সাহিত্যের আর এক স্মরণীয় ঘটনা। সোবিয়েৎ লেখকরা কেউ বা যুদ্ধ করেছেন, কেউ বা যুদ্ধের সংবাদদাতার কাজ করতে লালফৌজের সংগে সংগে ঘুরেছেন। একশো চল্লিশজন লেখক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। তিনশো লেখক শৌর্য ও বীরত্বের জন্য সম্মানিত হন। আলেক্সি তলস্তয়, শোলোকভ্‌,

সিমনভ্, এরেনবুর্গ, এঁরা সাংবাদিকতার কাজেই নিজেদের সবটুকু সময় ও চিন্তা দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময়কার সাহিত্যের মূল উপজীব্য হলো সোবিয়েৎ মানুষের দেশপ্রেম ও অপরাজেয় লালফৌজের শৌর্য। যুদ্ধের সময় ও পরে, এই সাহিত্য নিয়ে সোবিয়েতে যথেষ্ট হৈ চৈ হয়েছিল। দেশপ্রেম যে মহৎ, সে বিষয়ে পাঠকের দ্বিমত থাকতে পারে না। তবু আজ মুখ ফিরিয়ে দেখলে মনে হয়, যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী কালে সোবিয়েতের মানুষের গঠনমূলক প্রচেষ্টা, এই নিয়ে যে সাহিত্য-সম্ভার রচিত হয়েছে, এদের মধ্যে বহুলাংশ হচ্ছে মৌশুমী ফসল। তবু কিছু কিছু গল্প ও উপন্যাস, সময়ের বাধা অতিক্রম করে টিঁকে আছে। এদের মধ্যে কোন্‌স্তান্‌তিন সিমনোভ্-এর 'ডেজ্ অ্যাণ্ড নাইট্‌স', লিয়নভ্-এর 'চ্যারিঅট অফ র‍্যথ' স্মরণীয়। এতদ্ব্যতীত ভান্দাভাসিলেভ্‌স্কার 'রেইন্ বো'; বোরিস গোরবাতভ্এর 'তারাস্ ফ্যামিলি'; ভাসিলি গ্রস্‌ম্যানের 'দি পীপ্‌ল ইমরট্যাল'; ভালেরিয়া জেরাসিসেভার 'দি বাইদার গেট্‌স'; ইউজেনী রাইস্এর 'অ্যাট দি সিটি গেট্‌স'; অ্যানা কারাভাইয়েভার 'দি লাইট্‌স্'; নিনা য়েমেলিয়ানোভার 'দি সার্জন'; ভালেন্টিন ওভেচ্‌কিন এর 'গ্রীটিংস্ ফ্রম দি ফ্রন্ট'; আলেকজাণ্ডার বেক্-এর 'অন্ দি ফরোআর্ড ফ্রিঞ্জ'—এই উপন্যাসগুলি সোবিয়েতের মানুষের বীরত্ব ও সাহসের মহৎ আলেখ্য।

যুদ্ধের পরে আধুনিক সোবিয়েৎ সাহিত্যে যে সব উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচিত হয়েছে, তার মধ্যে বোরিস্ পোলেভয়-এর 'দি স্টোরি অফ এ রিয়াল ম্যান'; ভিক্টর নেক্রাসভ-এর 'ইন্ দি ট্রেঞ্চেস্ অফ স্তালিনগ্রাদ'; ভেরা পানোভা-র 'ট্র্যাভেলিং কম্প্যানিঅনস্'; জর্জি বেরেস্কো-র হ্রস্ব উপন্যাস 'এ নাইট ইন দি লাইফ অফ এ কম্যাণ্ডার'—এদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্থানাভাবে, এদের সম্পর্কে হয়তো বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবু পাঠক এদের মধ্যে সোবিয়েতের মানুষ, সোবিয়েতের জীবনকে জানতে পারবেন। আত্মসমালোচনা এবং নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা যে দুটি উপন্যাসে ধরা পড়েছে, তারা হলো দুদিন্‌ৎসেভএর 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন', এবং তারপরে ভ্‌সেভোলোদ কচেতভ্-এর 'ইয়েরশভ্ ভাইয়েরা'। প্রথম উপন্যাসটির বিজ্ঞানীকে অনেক বাধা, অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। কচেতভ্-এর উপন্যাসে সুবিধাবাদী ক্ষমতাপ্রিয় সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নগ্নভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য, নাট্য ও শিল্পজগতে ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাতে গিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারীকেও সমালোচনার কশাঘাত থেকে কচেতভ্ রেহাই

দেন নি। এই বইটি নিয়ে সোবিয়েতে সমালোচনা ও বাদ প্রতিবাদের ঝড় বয়েছে। তবু বইটির প্রকাশ ও প্রচার ব্যাহত করার কোন চেষ্টা হয় নি। পার্টি তাঁকে নিন্দা করেনি। পাঠকরা পরিহার করেন নি।

আজ সোবিয়েৎ দেশের মুদ্রণযন্ত্র বহুব্যস্ত—অসংখ্য ছাপার কাজ চলেছে সেখানে। এবং শোনা যাচ্ছে জগতের স্ফীততম সংখ্যার বইটি সোবিয়েৎ থেকেই প্রকাশ পায়। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও নাকি শতকরা একশ' জন বলে দাবী করা চলছে বর্তমানে। সাহিত্যকে আশ্রয় করছেন বহু নবীন লেখক। বহু উৎসাহী কথাসাহিত্য জন্মও নিচ্ছে। কিন্তু এ কি দীন ঐশ্বর্য তাঁদের আগামী দীর্ঘ সাহিত্য সফরে? কি সুতীব্র একাত্ময়তা তাঁদের শিল্পকর্মে, বিষয়বস্তুতে? একটি, দু'টি দুদিনৎসেভ কিংবা পাভেল নিলিন যেখানে অসহায় অকিঞ্চিৎকরতায় অবশ হন!

বলশেভিক বিপ্লবের পরে 'বুর্জোয়া অবক্ষয়ী'র জঞ্জাল বিদায় নিয়েছিল রুশ সাহিত্যের অঙ্গন থেকে। মার্ক্স মন্ত্রের সাগর সংগমে সকল চৈতন্যের ধারাই এসে মিলছিল, একটি কেন্দ্রে সমাহিত হচ্ছিল সাহিত্যের দৃষ্টবাদ। নতুন জনসমাজ যে গণসাহিত্যের সংবাদ পেলেন তা গোর্কির সমাজবাদী বাস্তবতা থেকে শুরু করে ক্রমশ সোবিয়েৎ জীবন ও সমাজের শীর্ণ গবাক্ষে আটকে গেল—বাইরের পৃথিবীর দৃশ্যময়তাকে চেষ্টা করেও আর দেখা গেল না। এমন কি দস্তয়ভ্স্কি চেখভকেও নতুন কালের পাঠকরা অনাত্মীয়-জ্ঞানে দূরে দূরেই রাখল। শ্রমিক, কৃষক সম্প্রদায়-উদ্ভূত সেই সব জনমানব ততখানি মানসিক উপযোগ্যতা হয়ত পায় নি, পায়নি কোন ভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার আস্বাদে নিজেদের চিন্তাকে বলবান করার উপযুক্ততা। তাই তারা সেই সাহিত্যের শরণ নিল যাতে 'প্রায় সব লেখকরা কোন কোন বিষয় একমত' হতে পেরেছেন। পশ্চিমী মানুষরা যে নতুন সাহিত্য সম্পর্কে বললেন (যদিও তাতে কিছু স্বার্থপুষ্ট প্রচার ছিল): 'The new fiction seemed crude propagandistic, naively optimistic, machine-worshipping and in all probability written to order under threat of liquidation by artists in uniform.' কিন্তু ধীরে ধীরে আধুনিক সোবিয়েৎ পাঠকসমাজ নানা অনুসন্ধিৎসায় উদ্বর্তিত হয়েছেন। তাঁদের কৌতূহল জগতের ব্যাপক পরিদৃশ্যতায় আশ্রিত হতে চাইছে। কেন আর তলস্তয়-এর মতো মহৎ সাহিত্য জন্ম নিচ্ছে না, এই প্রশ্নের উত্তরে তাই এরেনবুর্গকে আজ কৈফিয়ৎ দিতে হয়। তাই, কনস্তানতিন ফাদিন-কে

(সোবিয়েৎ লেখক সমিতির সভাপতি) আজ তাঁদের সাহিত্য-অধিবেশনে নতুন উন্মুক্ত সাহিত্য-সজ্ঞার ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে। স্ট্যালিন-এর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালীন সোবিয়েৎ সাহিত্য দেশের বাস্তব প্রতিবেশ রচনায় যে প্রকাশ পারঙ্গমতা দেখিয়েছিল, সেইসব সাহিত্য ছাড়াও নবীন পাঠক-গোষ্ঠী পুশকিন, তলস্তয়, চেখভ, দস্তয়ভ্স্কি, তুর্গেনিভ-এর চিরন্তন অমৃতময়তায় নিরুদ্দেশ হতে চাইছেন এখন, বহির্দেশের গ্রন্থসম্পদেও পাঠের আরাম এবং জ্ঞানের আলো খুঁজছেন। এবং সেই কারণে আধুনিক সোবিয়েৎ লেখকসমাজকে পাঠকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি তাঁদের ধ্যান নিবিষ্ট করতে হচ্ছে। তাঁরাও ভাবছেন ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কি সাহিত্যের সম্পদ তাঁরা মানুষকে দিতে পেরেছেন! আর এই আত্মজিজ্ঞাসাটুকুই আশার কথা, ভরসার কথা। 'Literature neither has, nor can have any other interests except those of the people and of the state. Its aim is to educate the youth according to Communist principles. Literature must become party literature and one of its tasks is to portray the Soviet man in full force.—Andrei Zhdanov, 1946—Marc Slonim.' একটি বৃহৎ দেশের সাহিত্য বা শিল্পের এই কি শেষ কথা হতে পারে? একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সীমানায় কি শ্রেষ্ঠ আর্টেরও মুক্তি থাকে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমেরিকান কথাসাহিত্য

Let us be grateful to Adam our benefactor
He cast us out of the 'blessing' of idleness
And won for us the 'curse' of labor.

—MARK TWAIN : Pudd'nhead Wilson's Calendar.

আমেরিকান সাহিত্যের প্রথম পর্বে আছে উপনিবেশীয় অধ্যায় (১৬০৭-১৭৬৩) সেই আদ্যকালে উপনিবেশীয় সাহিত্য সাধারণত ইংরাজ পুরুষদের হাতে তদ্ধারায় ও তদ্ধারণায় উপযোগিতাবাদের মন্ত্রকে প্রচার করত। সাহিত্য কিছু উল্লেখ-যোগ্য হত না বলাই বাহুল্য,—প্রথমত অনুকরণপ্রিয়তা এবং দ্বিতীয়ত চিন্তাদৈন্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির দুর্ভিক্ষ তার হেতুকে স্পষ্টপ্রকট করেছিল। মূলত আমেরিকান জাতীয় সাহিত্যের সূচনা হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যখন নতুন রাষ্ট্রের আত্ম-চেতনার বাতায়ন উন্মুক্ত হয়েছে, যখন জর্জ ওয়াশিংটন গণমতকে একটা সুনির্দিষ্ট আকার দেবার জন্য অবিরাম লিখে চলেছেন। তাঁর ভাষণই ছিল সংবিধান এবং সংবিধানই এক শক্তিশালী সাহিত্য-রূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় চিন্তার সরণি বেয়ে আধুনিক ধারার উদয় হলো। নিউটনীয় বিজ্ঞানের কৃপায় প্রগতিবাদের লক্ষণাক্রান্ত হলো সাহিত্যচিন্তা,—ঈশ্বরবাদের শান্ত দ্যুতি আবছাভাবে এসে পড়ল। কান্তিবিদ্যার আদিমতায় নোব্‌ল-স্যাভেজদের ধারণায় হলো পরিপুষ্ট, যদিচ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য ছিল উপযোগিতাবাদ, তত্রাপি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বৈজ্ঞানিক উপাখ্যান ইত্যাদি নতুন সাহিত্য-বস্তুর আবির্ভাব প্রাচীনত্বকে দূরীভূত করে, যুগোপযোগী

করে তুলতে লাগল গদ্যকে এবং পরিশেষে ফিলাডেলফিয়া ও ন্যুইয়র্ক সাহিত্য-রুচির শ্রীক্ষেত্র হয়ে উঠল।

গোড়ার দিককার আমেরিকান উপন্যাস লিখেছিলেন এক মহিলা—শার্লট লেনক্স। কিন্তু তাঁকে যথার্থ স্বীকৃতি জানান হয় না এই কারণে যে, তিনি জীবনের প্রারম্ভেই উপনিবেশ ত্যাগ করে ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করছিলেন। এবং তাঁর উপন্যাস 'লাইফ অফ হ্যারিয়ট স্টুয়ার্ট' (১৭৫১) ও অন্যান্য যাবতীয় রচনাই ইংলণ্ডে লিখিত ও প্রকাশিত। 'অ্যাডভেঞ্চার্স অফ অ্যালোঞ্জো' (১৭৭৫) উপন্যাসটিও অবশ্য লণ্ডন থেকে প্রকাশিত কিন্তু তার লেখক টমাস অ্যাটউড অধিকতর স্বাদেশিকতার দাবী করতে পারেন, কারণ জীবনের সায়াহ্নে তিনি পুনর্বার আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করে দেশের মাটিতেই দেহরক্ষা করেন। কিন্তু সত্যকার প্রথম আমেরিকান উপন্যাসের (বোস্টনে প্রকাশিত) আখ্যা পেয়ে থাকে 'দি পাওআর অফ সিম্প্যাথী' (১৭৮৯)। উপন্যাসটির মূল রচয়িতা কে তাই নিয়ে অবশ্য প্রচুর মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন মহিলা কবি সারা ওয়েস্ট-ওয়ার্থ মর্টন লিখেছেন গ্রন্থটি কিন্তু ইদানীং উইলিয়াম হিল-ব্রাউনকে বইটির জনকত্ব দেবার আগ্রহ বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যাই হোক না কেন, উপন্যাসটির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কারণ বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় এবং বর্ণনা-বৈগুণ্যে সেটি মুদ্রিত-আকারে কেচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছু নয়। হেনরী ব্রাকেনরিজ (১৭৪৮-১৮১৬) 'দি পাওআর অফ সিম্প্যাথী'-র উন্নতাবস্থা সৃষ্টি করলেন। 'অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন ফারাগো' (১৭৯২-১৮১৬) নামক বিদ্রূপাত্মক রোমান্স-স্বাদ-স্নিগ্ধ রচনায়। যদিও রচনাটিতে ডন কুইক্সট-এর সানুরাগ অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায় তবু ব্রাকেনরিজ-এর নিজস্ব এক বিশেষ মতবাদ ছিল—তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাস করতেন কিন্তু তাঁর ধারণায়, ভবিষ্যৎ ন্যস্ত আছে জনগণের হাতে, ধূয়ার ধোঁয়ায় কিংবা বিশেষ শাসকগোষ্ঠীতে নয়। কোন নীতিরই আধিক্য তিনি সমর্থন করতেন না, ভারসাম্য বজায় রেখে চলাই তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত ছিল। তাই হুইস্কে-বিদ্রোহের সময় তিনি দু' দলকেই খুশি করে সমতা বজায় রাখা সাব্যস্ত করেছিলেন। 'মডার্ন শিভ্যল্রি অর্ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন ফারাগো'-তে তিনি সকৌতুকে মানুষের অজ্ঞতা অহংকার থেকে বিচারপতিদের আধিক্য-দোষের উপর কড়া আক্রমণ চালিয়েছিলেন। 'দি পাওআর অফ সিম্প্যাথী'-র প্রকাশোত্তর কাল থেকেই আবেগ-

প্রধান প্রণয়কাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা এইসব কাহিনীর রচয়িতারা অনেকেই ছিলেন মহিলা, তাঁরা নিজেদের নাম গোপন করে লিখতে বসতেন।

সুসানা হ্যাসওয়েল রওসন (১৭৬২-১৮২৪) তেমনি এক মহিলা কথা-সাহিত্যিক যিনি আপন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রকে করেছিলেন প্রসারিত। রওসন থিয়েটারের অভিনেত্রী হয়েছিলেন, স্কুল পরিচালনা করেছিলেন এবং উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর 'শার্লোট টেম্প্‌ল' (১৭৯১) কিংবা 'ট্রায়াল্‌স্‌ অফ দি হিউম্যান হার্ট' (১৭৯৫), 'দি এক্‌জেম্প্‌লারি ওআইফ' (১৮০৪) তখনকার আমেরিকায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এইসব রচনা মুখ্যত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী উপন্যাসের পরিগমে এবং রসাবেগে প্রতিপালিত—অধিকাংশ আমেরিকান উপন্যাসই তখন অ্যাডভেঞ্চারকে আশ্রয় করে লিখিত হচ্ছিল; তা সে সীমান্ত-সংকটের অ্যাডভেঞ্চার বা আলজিয়ার্স-এর বন্দীশালা অথবা গার্হস্থ্য যুদ্ধের অ্যাডভেঞ্চার যাই হোক না কেন!

চার্লস ব্রোকডেন ব্রাউন (১৭৭১-১৮১০) প্রথম আমেরিকান সাহিত্যপুরুষ যাঁর মধ্যে শিক্ষা ছিল, বৈদগ্ধ্য ছিল এবং সর্বোপরি দেশীয় ভাবনায় সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দীপনা ছিল। তিনি যা পরিকল্পনা করেছিলেন তার সাফল্যলাভে হয়ত তিনি অপারগ হয়েছিলেন, হয়ত তাঁর যত সাধ ছিল সাধ্য তত ছিল না, কিন্তু তিনিই যথার্থ আমেরিকান উপন্যাস লেখায় সচেষ্ট হন—কলম্বাসের মহাদেশ আবিষ্কারের উপর মহা-উপন্যাস সংরচনার বাসনা তাঁরই ছিল। মার্জিত-মনের এই আইন-পড়া মানুষটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, বিজ্ঞানবিষয়ক নানা নিবন্ধ লিখেছেন এবং চারটি উদ্দীপক উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে আমেরিকান ভাবধারা সন্নিবেশ করার যে অদম্য ইচ্ছা ছিল, সংস্থাপনায় তা সাফল্য পেলেও বিন্যাসে এবং কলাকৌশলে সিদ্ধ হয়নি। তিনি কখনো গথিক রোমান্স-এর সাহায্য-পুষ্ট হতে চেয়েছেন, কখনো রিচার্ডসনের প্রলোভনে বেশি স্বস্তিবোধ করেছেন (American literature : Barnes and Noble) কিন্তু মন তাঁর সজাগ ছিল, সমসাময়িক ঘটনাকে রচনার বিষয়ীভূত করার মতো দৃষ্টি ছিল তাঁর পরিচ্ছন্ন। তাই ন্যুইয়র্কের একটি কৃষক যখন 'দেবদূতের'

কাছ থেকে আজ্ঞা পেয়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল এবং উন্মাদ বিবেচনায় পাগলাগারদে গেল—ব্রাউন তখন সেই বাস্তব ঘটনাটিকে তাঁর উপন্যাসের ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করে প্রণয়ের আবরণে জাতীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামির মূলোচ্ছেদে উদ্যত হলেন। কিন্তু ব্রাউনকে পরবর্তী কালেও যে-কারণে জীবিত রেখেছিল, তা হলো 'আর্থার মেরভিন' (১৮০০) নামক উপন্যাসটির অসাধারণ প্রত্যভিজ্ঞা। রচনাটিতে খুন-জখম থেকে শুরু করে ফুসলে নিয়ে যাওয়া অবধি নানা ঘটনাবর্তের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক, কিন্তু অপর পক্ষে ফিলাডেলফিয়ার মহামারীর এত বাস্তবচিত্র অংকিত হয়েছিল যা তৎকালীন আমেরিকান উপন্যাসের বিস্ময়ের বিষয়। ব্রাউনকে নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সালিশীতে বহুসময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে,—এই উপন্যাসেও সে-প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু বিবাহ এবং স্ত্রীর অধিকার নিয়ে তাঁর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ 'অ্যালেনিন' (১৭৯৮) আমেরিকায় বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল, যদিও তিনি তাতে কোন নতুন আলোকপাত করতে পারেননি। স্বপ্নচারিতা ব্রাউন-এর প্রিয় রচনাবস্তু ছিল। 'এডগার হাণ্ট্লি' (১৮০১) সেই স্বপ্নচারিতাকে শিহরণে ও রোমাঞ্চে উদ্ঘাটিত করেছে আর 'ক্লারা হাওআর্ড' ও 'জেন ট্যালবট' (১৮০১) নিষিদ্ধ প্রেমের রহস্যাভাস জানালেও, এপথে ব্রাউন-এর দক্ষতা কোন সময়েই পরিস্ফুট হয়নি ; পক্ষান্তরে তাঁর পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত রচনাকৌশলেই তিনি নিজে স্বস্তি পেতেন এবং পাঠকদের কাছেও সহজবোধ্য থাকতেন। প্রেমের উত্তাপবর্জিত ও ভাবপ্রবণতাবিহীন ব্রাউন-এর উপন্যাস পাঠে আগ্রহান্বিত না হওয়ার বহুতর কারণ থাকবে যদি তাঁর সৃষ্ট মানুষের অন্তর্লোকে ও কল্পনার স্বচ্ছন্দবিহারে সমানানুভূতির অভাব ঘটে। তিনি যথার্থই পো' ও হথোর্ন-এর পূর্বসূরী ছিলেন। (The literature of the American People : Arthur Hobson Quinn)।

অতঃপর আমেরিকান সাহিত্যের রোমাণ্টিক পর্ব (১৮১০-১৮৬৫) শুরু হয়েছে এবং জাতিক ও আন্তর্জাতিক উপাখ্যানের সংমিশ্রণে সাহিত্যশিল্পে প্রাপ্ত-মনস্কতার লক্ষণ হয়েছে পরিস্ফুট। গৃহযুদ্ধের ফলে দেশের সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের স্বর ধ্বনিত হচ্ছিল, সাধারণ মানুষ আপন উপযোগিতায় সচেতন হয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হবার চেষ্টা করছিল। গৃহযুদ্ধের ফলে দেশই শুধু নবোদয়ের মন্ত্রে বেজে ওঠে নি, সাহিত্যের নিরুদ্দেশ তমসায় নব্য চিন্তার

আলোককণিকাও প্রজ্জ্বলিত হলো। কথাসাহিত্যে সেই আলোক প্রথম প্রদীপ্ত করলেন ওয়াশিংটন আরভিং (১৭৮২-১৮৫৯), ইউরোপীয় সমাজ-স্বীকৃত প্রথম আমেরিকান কথাশিল্পী। তাঁর আবির্ভাব-পর্ব সারা হলে থ্যাকারে তাঁকে এই বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন: 'first ambassador, whom the New World of letters sent to the Old.'

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সারা ইওরোপের সাহিত্য রোমান্টিক ভাবনায় বিগলিত হয়েছিল। এদিকে স্কট, ডিকেন্স অন্যদিকে ফরাসীতে আলেকজাণ্ডার ড্যুমা এবং ভিক্টর উগো সেই পথের পথিকরূপে ক্ষিপ্রতায় পদচারণা করছেন। রোমান্টিক আন্দোলনের পীঠস্থান জর্মানী এবং ইংলণ্ডে যখন আন্দোলনের ধারা প্রায় শীর্ণ হয়ে এসেছে তখন রাশিয়ায় গোগোল, পুশকিনরা দেরী করে আসরে নেমেছিলেন। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আমেরিকা তখন নেহাৎই শৈশবাবস্থা পালন করছে, তবু তাদের ভাষা ইংরাজী হওয়াতে এবং গোটা ইওরোপের ভাবধারা তাদের সামনে প্রচিত থাকাতে তারা সেকাল থেকেই বিশ্বের কথাসাহিত্যে উপযুক্ত অংশ নেবার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। (ফেনীমোর কুপার বলেছেন আমেরিকায় সভ্যতার অভাব ঘটে নি কখনো সাহিত্যের সরবরাহেও মন্দা পড়ে নি…'They have never been without the wants of civilization, nor have they ever been entirely without the means of a supply': Literature in America.) আর, ওয়াশিংটন আরভিং সেই নবোদিত মহাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূতের কাজ করলেন, তাঁর ইংলণ্ড-অতিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের উপকরণরূপে ব্যবহার করে তিনি তাঁর রচনাধারায় স্বদেশকে বহির্জগতের সামনে উন্মোচিত করলেন। নিও-ক্লাসিসিস্ট হিসাবে যাত্রারম্ভ করে শেষ পর্যন্ত আরভিং জর্মান গথিকতাবাদ ও স্কটের ভজনায় রোমান্টিকতার দীক্ষা নিতে বাধ্য হন এবং এতদ্বারা আমেরিকান কথাসাহিত্যকে বিশ্বের রোমান্টিক প্রবাহে দেন মিলিয়ে। আরভিং-এর প্রথম ব্যক্তিগত কথাসাহিত্য-প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে 'এ হিস্ট্রী অফ ন্যুইঅর্ক' (১৮০৯) নামক একটি বার্লেস্কে। তিনি নিজে এই রচনাটি সম্পর্কে বলেছিলেন: 'It was written to clothe home scenes and places and familiar names with those imaginative and whimsical associations so seldom met with in our new country, but

which live like charms and spells about the cities of the old world, binding the heart of the native inhabitant to his home.' এই গ্রন্থটিতে শুধু যে আমেরিকান-প্রকৃতির প্রথম রূপনির্ণয় হয়েছিল তা-ই নয়, জনপ্রিয় আমেরিকান কথাসাহিত্যের প্রথম উপযুক্ত পথ্য এতেই সন্নিবেশিত ছিল। আরভিং-এর এই রচনাটির গুরুত্ব হ্রাস করবার উপায় নেই আমেরিকায়, কারণ বইয়ের একটি ওলন্দাজ-চরিত্র বৃদ্ধ নিকারবোকার তাবৎ আমেরিকার এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, একদা সুন্দর প্রাতে আরভিং আবিষ্কার করলেন, নিকারবোকার নামটি জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত হয়েছে, এমন কি ওই নামে বরফ ও রুটিরও হয়েছে প্রচলন। আরভিং-এর রাজনীতি সচেতনতা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে চরিত্র ও নীতির সমালোচনা 'এ হিস্ট্রী অফ ন্যুইঅর্ক'-এর অভাবনীয় সাফল্যকে গৌরবান্বিত করেছিল—তৎকালীন জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে রচনাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংযোজন। কথাশিল্পী, প্রবন্ধকার, ঐতিহাসিক, জীবনীকার ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'দি স্কেচ বুক'টির (১৮১৯-২০) এক বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ তাতেই ছিল সেই জগদ্বিখ্যাত বিষয়মুখ কাহিনীটি—সেই ঘুমকাতুরে অকর্মণ্য রিপ্ ভ্যান উইংক্‌ল, যে বিশ বছর ধরে ক্যাটস্কিল পাহাড়ে একটানা নিদ্রা দিয়েছিল। কাহিনীটি প্রায় রূপকথার মতো আমেজ ছড়িয়ে এসেছে উৎসুক পাঠকের মনে, যদিচ কাহিনীটির মূল পবিকল্পনার ইশারা তাঁর 'এ হিস্ট্রী অফ ন্যু ইয়র্ক'-এ বিদ্যমান ছিল কিন্তু আসলে তিনটি জর্মান লোককথার ভাববস্তু আহরণ করে তিনি নিজের এই রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। 'দি টেল্‌স অফ এ ট্র্যাভেলার' (১৮২৪) কয়েকটি গথিক গল্পের সংকলনমাত্র এবং বিশেষ কয়েকটি গল্প ব্যতীত বইটি আরভিং-এর খ্যাতিতে কোন প্রকার নতুন গৌরব যুক্ত করে নি। অবশ্য ছোট গল্পে তাঁর যথেষ্ট সিদ্ধি ছিল, পক্ষান্তরে আমেরিকান ছোট গল্প তাঁরই হাতে প্রথম জীবন পেয়েছে বলা চলে। প্রাচীনকালের হথোর্ন-পো' থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সাহিত্য-প্রতিনিধি হার্ট-হোআর্টন পর্যন্ত ওই বিশেষ শিল্পরীতির জন্য তাঁর কাছে অন্তরে অন্তরে ঋণ স্বীকার না করে পারবেন না। তবু, আমেরিকান কথাসাহিত্যে ওয়াশিংটন আরভিং-এর কীর্তিকে সর্বসাকুল্যে কোন মহত্তর আখ্যায় ভূষিত করা মুস্কিল, কারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মান, স্পেন ইত্যাদি দেশে তাঁর রচনা অসাধারণ আগ্রহ সৃষ্টি করলেও তিনি এমন কোন স্বকীয়তা দাবী করতে পারেন না, পারেন না এমন কোন নতুন আবিষ্কারের গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করতে যার দ্বারা

তাঁকে অনাদিকাল সালংকারে আলোচনা করা যায়। (অবশ্য ফেনীমোর কুপার তাঁর সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করেছিলেন : 'He is an author distinguished for a quality (humor) that has been denied his country men; and his merit is the more rare, that it has been shown in a state of society so cold and so restrained.' শুধু তিনি একটি ইতিহাসের আরম্ভ বলে, একটি কালের পথিক বলে, সসম্মান উল্লেখেই তাঁর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। নইলে প্রবন্ধকার, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন উপন্যাস, কাহিনী না লিখেও প্রাক্-আরভিং আমেরিকান-পুরুষরূপে জগৎসভায় বেশি ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন। তাঁর বহু রচনাতেই আমেরিকান-কৌতুকের প্রথম রসসঞ্চার ঘটেছে একথা বলে থাকেন কেউ কেউ।

জেমস ফেনীমোর কুপার (১৭৮৯-১৮৫১) মধ্যবিত্তদের অভ্যুত্থানকে সহ্য করতে পারেন নি, তিনি স্পষ্টতই শ্রেণী-বৈষম্যের সমর্থক ছিলেন, কারণ কুপার নিজে আশৈশব প্রায় আধা সামন্ত প্রতিবেশে, প্রাচুর্যের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক হওয়ার বাসনা তাঁর হয়ত বিন্দুমাত্র ছিল না। জেন অস্টেন এবং তৎকালীন অন্যান্য ইংরাজী লেখকের উপন্যাস-পাঠ তাঁর সারা হয়েছিল। একদা একটি সামাজিক উপন্যাস পড়তে পড়তে বিরক্ত কুপারের হঠাৎ ধারণা হয় যে, তিনি তদপেক্ষা উচ্চমানের উপন্যাস-সৃষ্টিতে পারদর্শী। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি লিখতে শুরু করেন 'প্রিকশান' (১৮২০), উপন্যাসটি কুপার-এর প্রথম রচনা-প্রচেষ্টা এবং চরিত্র ও দৃশ্যগুলি তাঁর একান্ত পরিচিত বলেই যেটুকু গুরুত্ব দাবী করতে পারে নচেৎ রচনাটির দুর্বলতা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। 'দি স্পাই' (১৮২১) প্রকাশ পাবার পর ফেনীমোর কুপার-এর অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে—তিনি জনপ্রিয়তার সংগে পঠিত হতে থাকেন এবং প্রায় এক বছরের মধ্যেই বইয়ের আরো তিনটি সংস্করণ করার প্রয়োজন হয়। ফরাসী ও অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় সম্পন্ন হয় তার অনুবাদ, যদিচ স্বদেশী সমালোচকরা তাঁর রচনা-প্রকৃতিতে তখনো খুশি হন না। 'দি পাইওনিঅর্স' (১৮২৩) এবং 'দি পাইলট' (১৮২৪) নামে আরো দু'টি চিত্ত-বিনোদনী উপন্যাস লেখার পর ফেনীমোর কুপার তাঁর পরিবারবর্গসহ ইওরোপে যান বসবাস করতে। প্রথমোক্ত উপন্যাসটি তিনি আপন অভিজ্ঞতার উপকরণে

লিখতে চেয়েছিলেন—ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এবং উত্তর-বিপ্লবের সংমিশ্রিত অবস্থা কাহিনীটির পশ্চাৎপট রচনা করেছিল। দ্বিতীয়টির প্রেরণা ছিলেন স্কট। স্কট-এর 'পাইরেট'কে লক্ষ্য করে এবং একটি সমুদ্র-কাহিনী রচনাকে উপলক্ষ করে কুপার 'পাইলট'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রায় সাত বছর ধরে ফ্রান্স, জর্মানী, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করে এবং স্কট, মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ প্রভৃতির সংগে সাক্ষাৎ সেরে তিনি যখন আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর রচনা-ধারা প্রধানত সমাজ-সচেতন নিবন্ধ এবং ঐতিহাসিক বর্ণনাকে কেন্দ্র করেই অক্ষুণ্ণ থাকে। ফেনীমোর কুপার যাবজ্জীবনে প্রায় এগারখানি উপন্যাস লেখার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন কিন্তু মাত্র পাঁচ খানিতেই তাঁর ক্ষমতার কিছু হদিশ আছে। এই সব রচনার পশ্চাতে রুশোর প্রিমিটিভিজ্‌ম, প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য, সহজ মানুষ হবার দাবী এবং প্রকৃত আমেরিকান মানসিকতার আদর্শীকৃত ধ্যানধারণা ব্যালোলিত থাকত। 'দি ফাইণ্ডার' (১৮৪০) তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম। তাঁর পরিণত চিন্তার প্রেমকাহিনী। 'পাথ ফাইণ্ডার' পড়ে ব্যালজাক যে প্রশংসাকীর্ণ বাণী লিখে দিয়েছিলেন তা কুপারের ক্ষমতার বিজ্ঞাপনকল্পে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে ; তিনি বলেছিলেন, 'Never did the art of writing tread closer upon the art of the pencil,—If Cooper had succeeded in the painting of character to the same extent that he did in the phenomena of Nature, he would have uttered the last word of our art.' কিন্তু স্যাটানস্টো (১৮৪৫) বোধ হয় কুপারের শ্রেষ্ঠ শক্তির নিদর্শন। ন্যুইঅর্ক শহরের সমাজ-জীবন, তার থিয়েটার, তার অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের বিচিত্র জগৎ অত্যন্ত দক্ষ শিল্পীর মতো অংকিত হয়েছিল এই উপন্যাসে। চরিত্রগুলিকেও জীবনী-শক্তিতে তীক্ষ্ণ করতে বিস্মৃত হন নি লেখক। ফেনীমোর কুপার ঘটনার জাল-বিস্তারে, রহস্য-উৎপাদনের অপার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন, অরণ্যের ছায়া এবং সমুদ্রের মায়া তাঁর হাতে এক বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল। তিনি ইওরোপ ও আমেরিকার গণতন্ত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সচকিত সমালোচনার ব্যত্যয় ঘটেনি কদাপি ; তথাপি তিনি মার্ক টোয়েন-এর করুণালাভ করেন নি ; টোয়েন তাঁকে নির্দয় মন্তব্যে নাস্তানাবুদ করেছেন। 'Mark Twain, who disliked all Cooper's fiction, revealed all its weaknesses

in a Savage attack on him, and every thing he says is true.'

কবি, প্রবন্ধকার ও ছোট গল্প রচয়িতা এডগার এলেন পো (১৮০৯-৪৯) সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ কিংবা ব্যক্তির শোধনকল্পে উদ্‌বুদ্ধ হন নি, তিনি মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর যাবতীয় রচনা কোমল, কমনীয় ইন্দ্রিয়রম্য আবেদনকে পরিস্ফুট করা ব্যতীত অন্য কোন গভীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে নি। কিন্তু তাঁর একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান আছে বিশ্বসাহিত্যে, এক কারণে। অন্তত সেই কারণে তাঁর আবির্ভাব আমেরিকান কথাসাহিত্যকেই শুধু স্মরণীয় করে নি, বিশ্বের কথাসাহিত্যকেও ঋণবদ্ধ করেছে। পৃথিবীর 'ছোট গল্প'-র তিনি আরম্ভ ; ছোটগল্প তাঁরই অনুশাসনে প্রতিপালিত। একদা কাহিনীতে তিনি যে ফর্ম সৃষ্টি করেছেন, উত্তরকালে তা-ই একদিন ছোটগল্পের ফর্মুলায় দাঁড়িয়েছে। আর আজ, এই শতাব্দীতেও তাঁর সৃষ্ট 'ছোট গল্প'র আকার ও প্রকারকে অনুসরণ করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নেই। যদিও আধুনিক-কালের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর লেখকরাও গল্প লেখার শিল্পকে তাঁর চেয়ে অধিক কৌশলে আয়ত্ত করতে পেরেছেন। পো' ছিলেন ফেনীমোর কুপার অপেক্ষা কুড়ি বছরের বয়োকনিষ্ঠ। তাঁর বাবা-মা ছিলেন অভিনেতা-অভিনেত্রী। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষোভ ও বিপর্যয় তাঁর চরিত্রকে অস্থিরতায় ও অস্থায়ী আচরণে করে তুলেছিল বিষময় এবং সেই অস্থির চরিত্রাচার তাঁর সাহিত্যেও ছায়াপাত ঘটিয়েছিল বিষমভাবে। অপরিমিত সুরাসক্তি তাঁর ছিল না কিন্তু নিজের বহুবিধ দুর্ঘটনার বিভীষিকাকে কিয়ৎকালের জন্য বিস্মৃত হতে সুরা-দাস হতেন তিনি। 'Poe, indeed was not a drunkard. To relieve for a brief time the ever present apprehension of Virginia's death, or to forget the fear inspired by the early death of his brother through mental exhaustion and by his sister's lack of mental growth, he would take a drink and become unable ro resist for a short time further indulgence in liquor.' পো'র তিন শ্রেণীর (১) Tales of terror ; (২) Tales of beauty in colour and rhythm ; (৩) Tales of ratiocination. গল্পের মধ্যে বীভৎস রসের গল্পগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর সেই দুর্ঘটনাক্রান্ত, বিপর্যস্ত মনের সহজ অনুমোদন

পেয়েছে ; সেই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মনের অপচেতনার প্রকোষ্ঠেই তিনি গথিকতাবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন—আসলে বোধ হয় জর্মান গথিকতায় নয়, তাঁর অন্তরেই একটা 'ভয়ংকর সত্য' তার বিরাট বাহু মেলেছিল। পো' রোমান্টিক আন্দোলনের সভায় বিলম্বিত অতিথি কিন্তু তা সত্বেও তাঁর রচনা ওই নতুন তরঙ্গে সতত সচকিত থাকে। গোড়ায় যদিচ তাঁকে ভুল বুঝবার অবকাশ ছিল প্রচুর, কিন্তু বোদলেয়র, মালার্মে এবং পরিশেষে পল ভ্যালেরি তাঁকে অনূদিত করে করে স্পষ্টতই ঘোষণা করলেন যে, পো' অন্যায়ভাবে অনাদৃত হয়েছেন, তাঁর দক্ষ শিল্পীসুলভ ব্যঞ্জনায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবসর নেই এবং আসলে তিনিই সিম্বলিস্ট মুভমেণ্ট-এর উদ্গাতা। পো'র আটষট্টিটি গল্পের মধ্যে প্রায় ছত্রিশটি গল্পই আরব্য-বৈচিত্রের শোভায়, বর্ণে ও বিস্ময়ে বিস্তৃত (১৮৪০ সালে প্রকাশিত 'আরবেস্ক্' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ)—মানুষ তাতে কখনো অতীন্দ্রিয়তার রোমাঞ্চ অনুভব করে, কখনো ভয়ংকরতায় ভেসে যায় আবার কখনো পুলকে বিস্ময়ে হতবাক হয়। অতীন্দ্রিয়তা এবং মৃত্যু তাঁর প্রিয় বস্তু। কাব্যে তিনি মৃত্যু ও অতীন্দ্রিয়তার যে ভাববিম্ব রচনা করেছিলেন সাগ্রহে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার অনেকাংশই কাহিনীর অঙ্গে ও আস্তরণে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'শ্যাডো', 'মনোস্ অ্যাণ্ড উনা', 'দি ব্ল্যাক ক্যাট' এবং 'লাইজিআ' ইত্যাদি কাহিনীর বিবরণ প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে অতিপ্রাকৃত পরিগম সৃষ্টির সহায়তা করেছে। 'বেরেনিসে', 'দি টেল টেইল হার্ট', 'দি ফল্ অফ্ দি হাউস অফ আশার' প্রভৃতি গল্পে অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবেশ রচনা করার দুর্লভ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পো'। তাঁর যুক্তি-সম্বল গল্পগুলির মধ্যে 'দি গোল্ড বাগ্' সর্বভয়মুক্ত জনপ্রিয় রচনা, - গুপ্ত ধনের রহস্যকে বিবৃত করেছে। আর, 'পার্লয়েণ্ড্ লেটার' ইত্যাদি গোয়েন্দা কাহিনাগুলিই উত্তরকালে কোনান ডয়েলকে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা সুনিশ্চিত। মৃত্যুকে পো' অত্যন্ত আপনজ্ঞানে তাঁর সাহিত্যের অন্তর্গত করেছেন বারংবার। 'লাইজিআ' একটি সুন্দরী নারী,—মৃত্যুর পর পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে তার জীবনের জন্য আকুতি অত্যন্ত দৃঢ়সন্নধ্য শিল্প প্রক্রিয়ায়, অতিপ্রাকৃত ভাব-সন্নিবেশে বর্ণিত করেছিলেন পো'। তাঁর মৃত্যুচেতনা সৌন্দর্য উপাসনার সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি জানতেন যে, একটি সুন্দরী রমণীর মৃত্যু মানুষের মনে যে কাব্যিক সৌন্দর্যের আলোকপাত করে তা-ই সার্থক শিল্প। 'I ask myself of all melancholy topics what according to the universal

understanding of mankind, is the most melancholy' ? Death—was the obvious reply. 'And when,' I said 'is this most melancholy of topics most poetical' ? From what I have already explained the answer is obvious—'when it most closely allies itself to Beauty : the death, then of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world—and equally is it beyond doubt that the lips best suited for such topic are those of a bereaved lover.' ধ্বনির অনুরাগী (এমারসন তাঁকে Jingle man আখ্যা দিয়েছিলেন) পো' স্পেন ও রাশিয়ায় (দস্তয়ভ্‌স্কি তাঁর পত্রিকায় 'দি ব্ল্যাক ক্যাট', 'দি টেল টেইল হার্ট' ইত্যাদি কাহিনীগুলির অনুবাদ করেছিলেন) প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর সারা জগতে তাঁর সাহিত্যকর্মে নতুন মূল্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালান হয়েছে। শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকার ডাকঘর পো'-প্রমুদ্রার প্রচলন করে অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেন নি। এডগার এলেন পো সম্পর্কে সুইনবার্ন একদা বলেছিলেন : 'the complete man of genius' এবং 'who always worked out his ideas thoroughly and made something solid, rounded and durable of them.' কিন্তু তিনি যে অনতিপ্রশস্ত পৃথিবীতে অল্প কয়েকটি লোকের মধ্যে বাস করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। যেখানে স্বাভাবিক মানুষের চলাচল কম, অন্ধকার বেশি। যেখানে ভয়ংকর নামে একটা শব্দ প্রায়ই শিউরে দিয়ে যায় পাঠককে। আর, তাই তাঁর সাহিত্যের সীমানা ছোট হয়ে তাঁকেই এখন ভয় দেখায়—একদিন গ্রাস করবে বলে।

তবু অধস্তন সাহিত্যপুরুষদের কাছে পো'র প্রভাব এবং আবেদন হয়ত কিঞ্চিৎ বেশি—সেক্ষেত্রে নাথানিয়েল হথোর্ন-এর (১৮০৪-৬৪) সূক্ষ্মতর এবং গভীরতর শিল্পরীতি অনুচিকীর্ষিত হয়েও অনুশীলিত হয়নি। হেনরী জেমস্‌ এবং জনৈক ইংরাজ ঔপন্যাসিক হথোর্ন-এর অতিপ্রাকৃত রচনা-প্রযুক্তির অনুকারী হতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা (অন্তত হেনরী জেমস্‌) অন্য পথে বিবিক্ত হন। ছোটগল্পের বিবর্ধনে হথোর্ন-এর অবদানও অনুল্লেখযোগ্য নয়। তিনি ছিলেন শিল্পের কারণে উৎসৃষ্ট-প্রাণ। (Memories of Hawthorne গ্রন্থে তাঁর কন্যা লিখেছিলেন : 'He loved his art, more than his time,

and could thrust into the flames an armful of manuscript because he suspected the pages of weakness and exaggaration.') আজন্ম গোঁড়া, রক্ষণশীল পরিবারে কঠোর অভিভাবকীয় তত্ত্বাবধানে লালিত হওয়াতে তাঁর মনে সর্বদাই ন্যায় অন্যায়বোধ অত্যন্ত প্রখরভাবে বিদ্যমান থেকেছে। আর, সেই কারণেই বোধহয় তাঁর রচনার উপাখ্যান অন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। একটা অস্পষ্ট আধ্যাত্মচেতনার শান্তবোধে তাঁর মানসিক গতি উদ্‌গত হয়েছে। তিনি জীবনকে কোন সময় সচেতনে, কোন সময় অবচেতনে আত্যন্তিক বিশদতায় বহু প্রতীকাশ্রয়ে এবং রূপক রূপ-ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করতে চেয়েছেন, তাঁর বর্ণনায় অভিলষিত ফল একটি সার্থক পরিণতি চেয়েছে। তিনি একই সংগে যেন আয়নার দেহে অনেক ছায়ার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, হয়ত কয়েকক্ষেত্রে সেগুলি ধূসর, নিজের অপরিমিত সংস্কারবোধে অস্বচ্ছ কিন্তু তবু সব সময়েই তাঁর চেষ্টা থেকেছে, সকল আয়োজনকে একটিমাত্র পরিণতিতে, একক রূপে সার্থক করে তুলতে। হথোর্ন যখন সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন তখন আমেরিকান ইতিহাস তাঁর বিচিত্র প্রতিভাকে প্রতিপালন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে, যখন নতুন ইংলণ্ডের নীতির ধারণা বিবেক থেকে কল্পনায় হচ্ছে উৎসারিত, যখন অবক্ষয় গোধূলিবেলার পান্থের মতো ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে —ঠিক তার আগে। হথোর্ন চিরকালের নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ—একাকী, সংগোপনে বহন করেছেন জীবনের সব প্রতিকূলতার ব্যথা। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'I am disposed to thank God for the gloom and chill of my early life, in the hope that my share of adversity came then when I bore it alone.' কিন্তু হেনরী জেমস্ ১৮৭৯ সালে হথোর্ন সম্পর্কিত এক নিবন্ধে (Philip Rahv : Literature in America) বলেছেন যে, আমরা যদি হথোর্ন-এর ছয়খণ্ড বিশিষ্ট 'নোটবই'গুলি পড়ি তবে তাতেই তাঁর চিদ্‌বৃত্তির স্বচ্ছ প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করতে পারব আর তদ্দ্বারা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে প্রতিভাত—যে-চরিত্র তাঁর মনের ধর্ষকামিতার পরিচয় দেয় না, দেয় না বিষাদ-বিমর্ষতার পরিচয়, বরং আশ্চর্য একটা শিশুসুলভ সারল্য, একটা প্রশান্ত মাধুর্যকে ব্যক্ত করে। ১৮২৫ সালে কলেজ থেকে বেরোবার পর হথোর্ন-এর প্রথম রচনা প্রকাশিত হলো। 'ফ্যান্‌শ' (১৮২৮) বইটি এক উদ্‌ভ্রান্ত রোমান্টিক মেলোড্রামা,—তাঁর দুর্বলতার স্বাক্ষর। পরবর্তীকালে হথোর্ন তাঁর এই প্রথম প্রচেষ্টার লজ্জা ও দীনতাকে চিরতরে গোপন

করতে চেয়েছিলেন। হথোর্ন-এর যখন তেত্রিশ বছর বয়স তখন তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা সংগ্রহ 'টোয়াইস্ টোল্ড টেল্স'-এর প্রথম সংকলন (১৮৩৭) প্রকাশিত হয়। সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ পায় ১৮৪২ সনে। হেনরী জেমস্ বলেছেন: 'The Twice Told Tales charming as they are, do not constitute a very massive literary pedestal.' ১৮৫০ সালের ফেব্রুআরি মাসে 'দি স্কার্লেট লেটার' উপন্যাস লেখা শেষ হলো এবং এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করল বইটি। হথোর্ন তখন পঞ্চাশের দিকে পা বাড়াবেন বলে স্থির হয়েছেন—সম্যক খ্যাতি তখনই এলো তাঁর জীবনে, অত বেলা করে। 'দি স্কার্লেট লেটার'-এর মূল অনুপ্রেরণাটুকু তিনি পেয়েছিলেন অন্যত্র এবং অতীতে তাঁর ছোট একটি গল্পের অঙ্গে ('দি রেড ক্রশ'; ১৮৩৭) সেই উপাখ্যানটিকে সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত করেছিলেন। তথাকথিত প্রেম এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, বিবেকের সংবাদ এবং একটি পাপের নিখুঁত আয়োজনকে নিপুণ বর্ণনায়, চরিত্র বিশ্লেষণে লিপিবদ্ধ করেছিলেন হথোর্ন। কাহিনীর শুরু অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে, একটি নারী পাপের সাজা ভোগ করতে এসেছে জনসাধারণের সামনে। হথোর্ন হয়ত বজ্রনির্ঘোষে তাঁর বিচারের রায় দেন নি উপন্যাসটিতে কিন্তু বিবেকের পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। কামনা, বাসনা, পাপ, পুণ্য এখানে কখনোই পিউরিটান রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেনি। হথোর্ন সম্পর্কে কেউ কেউ এমন অনুযোগ করে থাকেন যে, তিনি তাঁর রচনায় ক্যালভিনিজ্‌ম-এর আরাধনা করেছেন কিন্তু সেকথা বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ হয়, কারণ তাঁর সার্থক, সংবেদ্য রচনা-প্রতিভাস 'স্কার্লেট লেটার'-এ তাহলে তিনি নায়িকার পরিণতিতে ক্যালভিনিজ্‌ম-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতেন না। আঁদ্রে জীদ্-এর সাহিত্য-জীবনে যেমন তাঁর স্ত্রী এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন, তেমনি হথোর্ন-এর সাহিত্য জীবনকেও গুরুতর প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন তাঁর সহধর্মিনী সোফিয়া হথোর্ন। চিত্রকলায় পারদর্শিনী সেই মহিলাটি স্বামীর নির্বোধ সাহিত্যসঙ্গিনী ছিলেন না, হথোর্ন-এর রচনার গুণাগুণ কী তীক্ষ্ণতায় অনুধাবন করতে পারতেন তিনি তার প্রমাণ আছে একটি চিঠির কয়েকটি পংক্তিতে: 'He waits upon the light in such a purely simple way that I do not wonder at the perfection of each of his stories. Of several sketches, first one and then another come up to be clothed with language, after their

own will and pleasure......I think it is in this way that he comes to be so void of extravagance in his style and material. He does not meddle with the clear true picture that is painted on his mind. He lifts the curtain, and we see a microcosm of nature, so cunningly portrayed that truth itself seems to have been the agent of its appearence.' আর এই হলো হথোর্ন-এর সমগ্র সাহিত্যের রীতি ও প্রকৃতি; তাঁর জীবনার্জিত শিল্পজগৎ। 'দি হাউস অফ সেভেন গেবলস্' (১৮৫২) একটি পরিবারের ইতিবৃত্ত। ডাইনীবিদ্যার অভিশাপ কেমন করে একটি পরিবারের উপর ধীরে ধীরে নেমে এল তারই নাটকীয়, ঘটনাসমাকীর্ণ কাহিনী। 'God will give him blood to drink' এই ভয়ংকর অভিশাপ উচ্চারণের সংগে সংগেই মূল কাহিনীটি প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু 'দি হাউস অফ সেভেন গেবলস্' বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্যে নয়, চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যেই স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। আর, এই চরিত্র উন্মোচনকালে হথোর্ন অনেক জায়গায় গথিক রচনারীতির স্বাদ ও স্পর্শ দিয়েছেন। 'দি ব্লাইদডেল রোমান্স' (১৮৫২) নামে হথোর্ন অতঃপর যে উপন্যাসটি রচনা করলেন তা যদিও হেনরী জেমস্ দ্বারা 'the lightest, the brightest, the liveliest' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হলো কিন্তু বস্তুতপক্ষে বইটি হথোর্ন-এর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাতে কাহিনী কষ্টকল্পনার গুরুভারে নিগৃহীত হয়েছে আদ্যন্ত এবং সংলাপগুলির পিছনে প্রচুর স্বেদসিক্ত পরিশ্রমেরই আভাস ছিল; স্বতস্ফূর্ততার নয়। তাছাড়া যদিও তিনি স্বীকার করেন নি, তবু গ্রন্থের চরিত্রগুলির অন্তরঙ্গে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাই উপস্থিত ছিলেন; তাঁর কল্পনাসঞ্জাত চরিত্রাংকন প্রায়শই ছিল না। 'দি মার্ব্‌ল ফন্' (১৮৬০) হথোর্ন-এর শেষ, সুদীর্ঘ এবং বোধহয় শ্রেষ্ঠ রচনা। বইটি এক ইতালীয় ভাস্করের কাহিনী, যে ভাস্কর পরিপূর্ণ এক রক্ত-মাংসের জীব, মানুষোচিত সাধারণ প্রবৃত্তিতে, বিবেকের প্রতি অপরাধবোধে যে মানুষ স্বাভাবিক, ঘটনার দাস। বিশ্বের ছোটগল্প হথোর্ন-এর হাতে পরীক্ষিত হয়েছে। উপনিবেশীয় ইতিহাসের ঘটনা থেকে শুরু করে মানুষের গোপন পাপাচরণ এবং বিশুদ্ধ ফ্যাণ্টাসি পর্যন্ত নানা বিষয়কে তিনি অঙ্গীভূত করেছেন তাঁর গল্পে। 'দি সিলেস্‌টিয়াল রেলরোড' (১৮৪৬); 'র‍্যাপেসিনিজ ডটার' (১৮৪৬); 'দি গ্রে চ্যাম্পিয়ন' (১৮৩৭); 'দি গ্রেট স্টোন ফেস' (১৮৫১) ইত্যাদি কাহিনীগুলি হথোর্নকে বিশ্ব কথা-

সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছে। হথোর্ন-এর কল্পনার সীমিতি এবং বিবেকের উদ্‌গতি তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মকে অপরিসর সরণিতে ঠেলে দিলেও, বিশ্বজনীনতা দিয়েছে। কারণ মনুষ্যত্বের স্থায়ী ও মৌল প্রশ্নগুলিকে তিনি অন্তত নিপাতনে সিদ্ধ করতে চেয়েছেন তাঁর রচনায়।

'Herman Melville, with his books about the South Seas, which Robert Louis Stevenson is said to have declared the best ever written, and with his novels of maritime adventure, began a career of literary promise, which never came to fruition.' (Barrett Wendell). হার্ম্যান মেলভিলে (১৮১৯-৯১) সমসাময়িক আমেরিকান জীবন থেকে সর্বদাই সরে থেকেছেন। তাঁর উপন্যাস-কাহিনীর বিষয়বস্তুতে একটা আবিষ্কারের বিস্ময়, একটা রোমাঞ্চের অভিনব স্পর্শ অনুভূত হলেও জীবনের পরম পিপাসা, কিংবা চিত্তচারণার গভীরতা প্রবুদ্ধ হয় নি। হথোর্ন যেমন মানুষের প্রকৃতিতে, বিভিন্ন প্রবৃত্তিতে নিজের ভাবনা ও ধারণাকে মেলে দিয়ে একটি নিজস্ব পরিবেশ রচনা করতে পেরেছিলেন, মেলভিলে তাঁর সমসময়ে বাস করেও তা পারেন নি, আশ্চর্যভাবে উদাসীন থেকেছেন। তাঁর রচনার চরম বিকাশ ও পরম পরিণতি ঘটেছিল 'মোবি ডিক' (১৮৫১) নামক গ্রন্থে। তারপরই তাঁকে হতপ্রভ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কেরানীবৃত্তি ছেড়ে তিনি যখন জলে জলে ভবঘুরের পেশা গ্রহণ করলেন তখন থেকেই তাঁর মধ্যে কাহিনীর উপকরণ সঞ্চিত হয়েছিল। সামান্য কেবিনবয় হয়ে তাঁর সেই সাগরযাত্রার অভিজ্ঞতা 'রেডবার্ন' (১৮৪৯) উপন্যাসটিতে সর্বপ্রথম বর্ণনা পেয়েছে। মেলভিলে তাঁর কথাসাহিত্যে ভূগোলকে বিস্তৃত করেছিলেন এবং একটা অভিনব প্রতিবেশের উত্তেজনাকে কাহিনী-উপন্যাসে সঞ্চারিত করেছিলেন বলেই তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। যদিচ তাঁর একটিমাত্র রচনার খোঁজ রাখলেই মেলভিল-এর সমগ্র সাহিত্যজগৎকে প্রত্যক্ষ করা যায়। 'ওমূ' (১৮৪৭) রচনাটি তাহিতি দ্বীপকে আশ্রয় করে লিখিত। আবেগের বাহুল্য-বর্জিত অথচ চরিত্রসৃজনে এবং পাঠকের আগ্রহকে অটুট রাখার কৌশলে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পো'র বন্ধু রেনল্ডস-এর একটি নিবন্ধে অনুপ্রাণিত হয়ে মেলভিলে যখন 'মোবি ডিক' রচনা করলেন তখনই আমেরিকান কথাসাহিত্যে একটি চিরায়ত গ্রন্থের জন্ম হলো। সমুদ্রের তরঙ্গে

তরঙ্গে এক ভয়ংকর জলজীবের বাস্তবসম্মত বর্ণনা, ঘটনার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন রোমাঞ্চময় সামুদ্রিক অভিযান এই প্রতীকধর্মী কথাসাহিত্যকে দিল বন্ধনহীন জীবনীশক্তি। 'মোবি ডিক'-এর কারণে মেলভিলে অধিক গুরুত্ব পাচ্ছেন বলে ইদানীং মৃদু প্রতিবাদের রব উঠেছে কিন্তু 'মোবি ডিক' আপন অপ্রতিরোধ্য আবেদনেই অধ্যাসিত। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম এত নিপুণ বর্ণনায় রূপ পেয়েছে বিশ্বের খুব কম কথাসাহিত্যে। জগতের দুর্ঘটনাজনিত পৈশুন্য এবং মানুষের দ্বৈত অস্মিতার দ্বন্দ্ব মেলভিলে পরিস্ফুট করেছেন সুদক্ষ শিল্পীর মতো, অথচ কোন আত্মিক আসক্তি রচনাকে ভারগ্রস্ত করে নি। 'মোবি ডিক' বিশ্ব কথাসাহিত্যে নিশ্চিত অবদান আমেরিকার। 'It has towering faults of taste, it is often wilful and obscure, but it will remain, I think, America's unarguable contribution to world-literature, so many-levelled is it, so wideranging in that nether world which is the tortured, defiant, but secretly terror-stricken soul of man, alone and apalled by his aloneness'. (Clifton Fadiman)

ফেনীমোর কুপার রোমান্টিকতার যে মায়া ও মোহ বিস্তার করেছিলেন তাঁর রচনায়, তার দুর্বার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি উত্তরকালের অনেক কথাসাহিত্যিকই। কিন্তু রবার্ট মণ্টগোমারী বার্ড (১৮০৬-১৮৫৪) সেই প্রভাব অতিক্রম করে বাস্তবানুসারী হবার ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। 'এ ট্র্যাডিশান অফ পেন্‌সিলভ্যানিয়া' (১৮৩৫) একটি পরিবারের গার্হস্থ্য কাহিনী। বিপ্লবের পর থেকে যে-পরিবারে অবক্ষয়ের ধূসর পর্দা একটু একটু করে ঢেকে দিচ্ছিল তাদের। কিন্তু বার্ড আজও যে উপন্যাসটির জন্য স্মর্তব্য রয়েছেন সেই 'নিক্ অফ দি উড্‌স' (১৮৩৭) নাথান স্ল্যটার নামে একটি মানুষের ভয়ংকর প্রতিশোধ-স্পৃহার কাহিনী। উপন্যাসটি বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হ্যারিয়েট বীচার স্টোয়ে (১৮১১-৯৬) তাঁর আত্মপ্রকাশকে স্মরণীয় করেছিলেন একটি মাত্র উপন্যাসের জনপ্রিয়তায়। 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন' (১৮৫২) যখন এক সাময়িক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ

হচ্ছিল তখন নিছক প্রচার ভেবে অনেকেই রচনাটির প্রতি দৃষ্টিদান করেন নি। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশ পাওয়ার সংগে সংগে হাজারে হাজারে বইটির বিক্রয় শ্রীমতী স্টোয়েকেই শুধু জনপ্রিয়তা দেয় নি, দাসপ্রথার প্রতি দেশের মনোযোগ-আকর্ষণের ইতিহাসরূপে কথাসাহিত্যে বিশেষ সম্মানিত স্থান পেয়েছে। যদিও শ্রীমতী স্টোয়ে এই উপন্যাসে শিল্পের সার্থকতায় পৌছতে পারেন নি, অতিনাটকীয়তার গুরুভার স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর অধিকাংশ চরিত্রই অতি গুণে গুণান্বিত অথবা অতি দোষে দুষ্ট। লিংকন এই মহিলার অকুতোভয়তায় চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেন : 'the little lady who caused this great war!' কথাসাহিত্যে সংযমের সন্ধানী তলস্তয়ও উপন্যাসটিকে সম্মানজনক স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্ (১৮০৯-১৮৯৪) প্রথমে যদিও সর্বান্তঃকরণে প্রবন্ধকাররূপে সাহিত্যসাধনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তবু শিক্ষার মহিমায় তিনি কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। হোমস্-এর 'দি গার্ডিয়ান এঞ্জেল' (১৮৬৭), 'এ মর্টাল অ্যান্টিপ্যাথি' (১৮৮৫) ইত্যাদি উপন্যাস গঠনরীতিতে দুর্বল মনে হওয়া স্বাভাবিক। এবং কাহিনীগুলি সর্বদাই যেন পরিণতিতে একটি পরিতৃপ্তির নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজেছে। কিন্তু তবু হোমস্-এর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য-বোধের অভাব ঘটে না, কারণ, আমেরিকান কথাসাহিত্যে প্রথম প্রথম যাঁরা বিজ্ঞানের ধারণাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, হোমস্ তাঁদের অন্যতম।

গৃহযুদ্ধ ইওরোপের বহু জায়গায় সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হেনেছিল। আমেরিকার সাহিত্য তার চোখ থেকে পরস্ব পরকলা খুলে ফেলল। বহুসংখ্যক সংবাদপত্রের জন্ম হলো। এবং রোমান্স-এর বিষয়াশ্রিত কথা-সাহিত্যের পরিবর্তে বাস্তববাদী কথাসাহিত্য প্রবল হতে লাগল ক্রমশ। সাহিত্যের সীমা বর্ধিত হলো, উদ্ভাসিত হতে লাগল নতুন দিগন্তে। হথোর্ন, মেলভিলে, হুইটম্যান, থোরো, এমার্সন তাঁদের কাব্যে, কাহিনীতে, প্রবন্ধে ও চিন্তৈশ্বর্যে শক্তিশালী পশ্চাৎপটরূপে নতুন দিনের সম্ভাবনাকে সুরক্ষিত করলেন, প্রেরণা দিলেন। আর, এই সময় চিন্তা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-৬৫)। ধীরে ধীরে জর্জ ওয়াশিংটন-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমেরিকার সমাজ ও জীবনকে দিলেন নতুন নায়কত্বের গৌরব। পুরনো

ঐতিহ্যের বনিয়াদে একটি নতুন সংস্কৃতি অভিব্যক্ত হলো লিংকন-এর আনুকূল্যে। আর এই সময় সাহিত্যের বাস্তবতা প্রাণলাভ করল একটি বিস্ময়ের উদয়ে—সেই বিস্ময়ের নাম মার্ক টোয়েন।

মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১০), যাঁর আসল নাম স্যামুয়েল ল্যাংগহর্ন ক্লিমেন্স, উত্তর গৃহযুদ্ধের সাহিত্যশিল্পী,—আমেরিকান সাহিত্যের এক প্রতাপশালী আবির্ভাব এবং বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহ অবদান। যদিও নবীন সমালোচকরা ইদানীং তাঁর কৌতুককর রচনার আবেদন তাঁর সমসময়েই নিঃশেষিত বলে ঘোষণা করছেন, বলছেন, তাঁর মধ্যে সমাজবোধের গভীরতা ছিল না, ছিল না বিজ্ঞান ও দর্শনের কোন নিয়ম-নিরূপিত প্রজ্ঞা-পরিশীলিত জ্যোতির্ময়তা, এবং তাঁর কাঠামোহীন কাহিনী প্রায়শই বিরক্তির উদ্রেক করে থাকে। "Briefly, he was more of a petit-bourgeous 'debunker' than a creator ; he is memorable, as Kipling said, 'in his indirect influence as a protesting force in an age of iron philistinism '" তাঁর সাফল্য তাঁর সারল্যে, স্নিগ্ধ কৌতুকে এবং খণ্ড খণ্ড চিত্রে একটি অখণ্ড চিত্রশালা নির্মাণে। সমাজের ভণ্ডামি, ধর্মের প্রতারণা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ক্ষমা পেত না আর অন্তর্লীন একটি শীর্ণ দর্শনাভাস তাঁর হৃদয়ের প্রসাদ-মাধুর্যে উদ্বেল হতে চাইত। মার্ক টোয়েন-এর নতুন প্রাক্‌কলনে ও মূল্যায়নে যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরা জানান যে, আজ মার্ক টোয়েন-এর রচনাকর্মে ছিদ্রান্বেষণ-প্রচেষ্টা ১৮৬০ সালে কবি লংফেলোর প্রতি সন্দেহ পোষণ করার মতোই কৃতঘ্নতার পরিচায়ক। আর, আজ যখন সারা জগৎ তাঁর কৌতুককে ভালবাসতে শিখেছে, শ্রদ্ধা করতে শিখেছে তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক ঔৎকর্ষের। যখন, ইংলণ্ড ও জর্মানীতে তাঁর বই বারংবার ছাপা হচ্ছে এবং রাশিয়ায় তিনি যখন সৌহার্দ্য স্থাপন করতে পেরেছেন—'Like Emerson and Whitman, he seems to reflect the qualities of his country with unusual fullness, and he trancsends all other American writers in exhibiting the cheerful irreverence which may be charecteristic of us as a people.' টোয়েন নিজেও জানতেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে একটা ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ প্রধূমিত হচ্ছে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, স্বদেশে এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তীতে তিনি পুজিত হচ্ছেন এবং বিদেশে নিছক কৌতূহলে। তাঁর পরিচয়

প্রধানত দুটি (দি অ্যাডভেঞ্চার অফ হাক্‌ল বেরি ফিন্‌ এবং লাইফ অন্‌ দি মিসিসিপি) গ্রন্থকে আশ্রয় করেই জীবিত আছে। মিসিসিপি। মিসিসিপি তাঁর জীবনের প্রভাতে ও অপরাহ্ণে বিচিত্র মায়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল দু'বার। শৈশবে তিনি সেই নদীর বুকে স্টীমবোট পাইলট হয়ে নিয়ত জলের ডাক শুনতেন আর সেই ডাক তিনি আরেকবার শুনেছিলেন জীবনের প্রান্তবেলায়, শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যে গ্রন্থ দুটি রচনা করেছিলেন তাই তাঁর কলাকৈবল্যের সাধনায় শ্রেষ্ঠ নিবেদন হয়ে আছে। 'দি অ্যাডভেঞ্চার অফ হাক্‌লবেরি ফিন্‌' (১৮৮৪) সব মহৎ উপন্যাসের মতো তাৎপর্যের বিভিন্ন পন্থায় আরোহণ করেছে এবং মানুষের মুক্তির সংগ্রাম ও অভিযানকে বর্ণনা করতঃ পরিশেষে একটি নীতির প্রশ্নকে করেছে পরিস্ফুট। নৈসর্গিক শোভা, একটি বিশেষ বয়সের রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতা, নদীর ঢেউয়ের মতো যাতে বৈচিত্র্যের স্বাদ আর নিগ্রো জিম, হাক, টম এবং আরো কত চরিত্রের মেলা বইটিকে সার্বজনীনতা দিয়েছে। এই উপন্যাসটি আসলে তাঁর পুর্বের একটি রচনার পুর্ণ পরিণতি, তার পরিসমাপ্তি বলা যায়। 'দি অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সয়ার' (১৮৭৬) যদিচ টোয়েনের মাত্রাহীন কৌতুকবোধ, প্রক্ষিপ্ত ঘটনাবিন্যাস এবং প্রক্ষোভের যথেচ্ছাচারকে প্রকট করেছে কিন্তু তাতে কৈশোরের সজীব অভিজ্ঞতা বাস্তবতার স্পর্শে ধৃত হয়েছিল এবং হার্দ্য ভংগীতে ফেলে আসা জীবনের ও বহু স্বপ্ন-বিজড়িত একটি রহস্যময় স্থানের রোমান্টিকতা হয়েছিল ব্যক্ত। বাল্যকাল এবং বাল্যকালের মিসিসিপি ও হ্যানিবালকে টোয়েন এত গভীর ভালবেসেছিলেন যে, তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে তারা জুড়ে বসে আছে অবিচল নিষ্ঠায়। তিনি নিজেও সেকথা অবগত ছিলেন : 'And yet I can't go away from the boyhood period and write novels because capital (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা) is not sufficient by itself and I lack the other essential: intrest in handling the men and experiences of later times.' টোয়েন-এর অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত নয়, মিসিসিপিকে সামনে উন্মুক্ত রেখে আত্মজীবনীমূলক বর্ণনা। 'লাইফ অন্‌ দি মিসিসিপি'-র (১৮৮৩) অনেক পরিচ্ছেদেই টোয়েন-এর শিল্প-প্রকরণ একটা উচ্চতার আশ্রয়ী বটে, স্মৃতিচারণার বৈশিষ্ট্যে কাব্যিক সৌন্দর্যে, কৌতুকের প্রবাহে তাঁর সাহিত্যশক্তির নিদর্শন, কিন্তু রচনাটি পরিষ্কার দুটি অংশে বিভক্ত। দীর্ঘ আট বছরের ব্যবধান টোয়েন-এর আন্তরিক প্রযত্ন সত্ত্বেও প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশের দুস্তর শূন্যতাকে

পুর্ণ করতে পারে নি ফলে রচনাটিতে সুরের মিল নেই, ছন্দের পতন আছে। তাঁর অন্যান্য ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক আত্মস্মৃতির মধ্যে 'দি ইনোসেন্ট্‌স অ্যাব্রড' (১৮৬৯) 'এ ট্র্যাম্প অ্যাব্রড' (১৮৮০) ইওরোপীয় সফরের বিশ্বস্ত বর্ণনা, টোয়েন-এর স্বভাবজাত লঘুতায় উজ্জ্বল। 'দি গিল্ডেড এজ' (১৮৭৩) উপন্যাসটি টোয়েন সি ডি. ওয়ার্নার-এর সহযোগিতায় সম্পূর্ণ করেছিলেন। আমেরিকান কৌতুক অপর্যাপ্তভাবে তরলিত হয়েছিল এই উপন্যাসে। উত্তর গৃহযুদ্ধের যুগকে, মানুষের উদ্‌ভ্রান্ত প্রাতিস্বিকতাকে এবং রাজনৈতিক দুর্নীতির উচ্চণ্ডতাকে শ্লেষের শেলাঘাত করতে চেয়েছিলেন টোয়েন, যদিচ অভিলষিত ফল শেষ পর্যন্ত সার্থকতার চরম লক্ষ্যটিতে পৌঁছতে পারে নি। খুব কম আমেরিকান সাহিত্যপুরুষই টোয়েন-এর মতো এত প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে অসংখ্য সাহিত্যসৃষ্টি করে যেতে পেরেছেন। টোয়েন তাঁর এই বিপুল সাহিত্যকর্মের বিস্তৃতি থেকে দুটি মাত্র রচনাকে চয়ন করেছিলেন, স্বনির্বাচনে সেই দুটিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে গেছেন। ঔৎকর্ষের দিক থেকে আসলে সেই দুটি ঐতিহাসিক রোমান্সকে (দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার ১৮৮২ ; জোআন অফ আর্ক ১৮৯৬) দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাই দেওয়া যায়। 'He thought the mawkish Joan of Arc and the second-rate The Prince and the Pauper his best work' (Literature in America)। মার্ক টোয়েন প্রথম আমেরিকান সাহিত্যশিল্পী যাঁর রচনায় গণজীবনের ভাব পেয়েছিল ভাষা। তাঁর সহজ, সরল অথচ অপ্রতিরোধ্য গণতন্ত্রবোধ মানুষকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করেছে, অপর পক্ষে হুইটম্যান-এর রাজসিক গণতন্ত্রের সাধনা তাঁকে সাধারণ মানুষের নিকটবর্তী করতে পারে নি, কোথায় যেন একটা বাধা থেকে গেছে, সম্পর্ককে সহজ করে নি। কিন্তু টোয়েন একান্তভাবেই সাধারণের লেখক হয়েও অসাধারণ লেখক। প্রেয় হয়েও শ্রেয়।

ব্রেট হার্ট (১৮৩৬-১৯০২) প্রথম যখন কালিফোর্নিআর গল্পগুচ্ছ 'দি লাক্ অফ্ রোরিং ক্যাম্প অ্যাণ্ড আদার স্কেচেস' (১৮৭০) নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখনই তার সম্পন্ন বিস্ময়ে এবং সজীব উপকরণের অভিনবত্বে আমেরিকার পাঠকসমাজে একটি সুনিশ্চিত আশা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ওষুধের দোকানের কেরানী, শিক্ষকতা, কালিফোর্নিআ-টাঁকশালের সেক্রেটারি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় পরিক্রমা করতে করতেই তিনি কাব্যে আত্মপ্রকাশ

করেন। কিন্তু কালিফোনিআর গল্পগুচ্ছ প্রকাশ না-পাওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রতি সম্যক দৃষ্টি স্থাপনের অবসর হয়নি কারো। অবশ্য ইতিপূর্বে একটি গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব তিনি পেয়েছিলেন। 'কন্‌ডেন্স্‌ড নভেল্‌স অ্যাণ্ড আদার পেপার্স' (১৮৬৭) কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত কতকগুলি কাহিনীর সংকলন। কাহিনীগুলির কতিপয় ড্যুমা, উগো, ডিকেন্স-এর অনুকরণে রচিত। কোন কোনটি ফেনীমোর কুপার, ওয়াশিংটন আরভিং আর হথোর্নকে স্মরণ করে লেখা। 'দি লাক অফ রোরিং ক্যাম্প অ্যাণ্ড আদার স্কেচেস' গ্রন্থতেও হার্ট স্থানে স্থানে ডিকেন্স-এর মতো মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিলেন এবং থ্যাকারের শিল্প-রীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। হার্ট তাঁর রচনায় আঞ্চলিক রঙের প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, প্রাদেশিক ভাষার কথ্যরূপ তাঁর ঔদার্যে স্থান পেয়েছিল সাহিত্যে। তিনি অপার কৌশলে নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ করতে পারতেন, ঘনীভূত কৌতূহলে চরিত্রকে পারতেন তীক্ষ্ণ করতে। এবং খনি ও খনির মানুষকে তিনিই প্রথম মর্যাদা দেন আমেরিকান কথাসাহিত্যে। 'Bret Harte was the most successful purveyor of these meretricious sentimentalities, turning coast pioneers into good copy for distant romantic readers : dealing with mining camps in which no one ever worked ;' ...(P. H. Boynton : Literature and American Life) তবু হার্ট-এর ক্ষমতা একান্তভাবেই একটি সীমায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। তাঁর গল্প, যে-গল্পের পরিকল্পনায় যত্নের অন্ত থাকত না, তা-ও বহুক্ষেত্রে বেসুরো মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর গল্পের আয়োজন বহুক্ষেত্রেই ডিকেন্স-এর বৃথা অনুসরণে পথ হারিয়েছে।

'File-leader of the procession of American dialect novels' নামে যিনি প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন সেই এডওয়ার্ড এগ্‌লস্টন-এর (১৮৩৭-১৯০২) জনপ্রিয়তা প্রধানত একটি উপন্যাসেই উত্তুঙ্গ হয়ে আছে। অবশ্য ছোটগল্প এবং ইতিহাসও তিনি লিখেছেন কিন্তু 'হুসিয়ার স্কুলমাস্টার'-এর (১৮৭১) মতো পাঠকের এমন বিপুল সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়নি তাঁর অন্য কোন রচনার। শুধু তাঁর কেন, মধ্যপাশ্চাত্যকে নিয়ে আঞ্চলিক সাহিত্যসাধনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন (মিসেস কার্কল্যাণ্ড, এলিস কেরী ইত্যাদি) তাঁরা কেউই এত ব্যাপক খ্যাতির সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন না। উপন্যাসটি তাঁর নিজের স্মৃতি

দিয়ে ঘেরা চতুর্থ দশকের সমাজ ও জীবনের বিশ্বস্ত ছবিকে পরিস্ফুট করেছিল, এবং তাঁর ভাইয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় সুখ-দুঃখ, বেদনা-আনন্দের অভিব্যক্তি মানুষের হৃদয়কে এত গভীর আবেগে স্পর্শ করে যে, দু'মাসের মধ্যেই দশহাজার বই অনায়াসে বিক্রী হয়ে যায় (...proved so fascinating that in book form it sold ten thousand copies in six months,') 'দি য়েণ্ড অফ দি ওয়ার্লড' (১৮৭২) এবং 'রক্সি' (১৮৭৮) এগ্‌লস্টন-এর অপর দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

জর্জ ওয়াশিংটন কেব্‌ল (১৮৪৪-১৯২৫) দক্ষিণাঞ্চলের জীবন ও মানুষকে তাঁর রচনায় আগ্রহের সংগে স্থান দিয়েছেন প্রধানত। আর, দাসপ্রথা, নিগ্রোসমস্যাকে কেন্দ্র করেও তাঁর চিন্তা নির্বাধ হয়েছে গল্প-কাহিনীতে। উনবিংশ শতাব্দীর নিউ অর্লিয়ানসের চেহারা তিনি আন্তরিকতায় পরিস্ফুট করেছিলেন। 'ওল্ড ক্রিয়োল ডে'জ' (১৮৭৯) তাঁর ছোটগল্পের গ্রন্থ এবং 'দি গ্র্যাণ্ডিস্‌মেস' (১৮৮০), 'ডক্টর সেভিয়ার' (১৮৮৫) তাঁর উপন্যাস। আমেরিকান কথাসাহিত্যে কেব্‌ল-এর সম্মানজনক স্থান আছে। কেউ মনে করেন, পো'-হথোর্ন-এর পর তাঁর মতো এমন নির্ভরযোগ্য কথাশিল্পীর আগমন আর ঘটে নি। তাঁর কলারীতি, নারীদের প্রতি বিশেষ বিবেচনা, কল্পনার প্রশস্ততা এবং দৃঢ় ও ঋজু ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কেব্‌লকে ভিন্নতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আরেক আঞ্চলিক লেখক জেমস্ লেন অ্যালেন (১৮৪৯-১৯২৫) ধর্মকামের অন্তর্লীন বেদনায় ভারাক্রান্ত করেছিলেন স্বীয় রচনাকে। অ্যালেন-এর বিপুল সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ শিল্পচর্চার প্রচেষ্টা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হবে না। 'ফ্ল্যুট অ্যাণ্ড ভায়োলিন' (১৮৯১) তাঁর কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলিতে মূলত ভাবালুতার যথেচ্ছ-বিহার অছে, আছে মনুষ্য-মনের কোমলতম, দুর্বলতম স্থানে আবেদনের প্রচেষ্টা। 'এ কেনটাকি কাডিনাল' (১৮৯৪) কাব্যিক ভাষায় লেখা উপন্যাসোপম বড় গল্প, সংযত অনুভূতিতে এবং সজীবতায় একটি রমণীয় পাঠের তৃপ্তি দেয়। রচনাটিতে ব্যালজাক-এর একটি উপন্যাসের তুলনা আবিষ্কার করাও আশ্চর্যের নয়। 'দি রেন অফ ল' (১৯০০) কাহিনীর ঘটনাস্থল গ্রাম, গ্রাম্য প্রেমই তার মূল উপাস্য। যদিও তাতে বাস্তবতা অধিকতর যত্নে অনুশীলিত হয়েছিল, তবু অ্যালেন বুদ্ধিবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় তাঁর

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে বিমর্বতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর রচনাকে বিমর্বতা ও প্রতীকতায় কণ্টকিত করলেন, ফলে তিনি অচিরেই তাঁর ভূরি ভূরি সৃষ্টির ভারে নিমজ্জিত হন।

আমেরিকান বিদগ্ধ সমাজে হুইটম্যান যেমন নিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালে উইলিয়াম ডীন হাওয়েলস্‌কে (১৮৩৭-১৯২০) কেন্দ্র করেও কথাসাহিত্যের তেমনি একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে বাস্তবতার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, অভ্যস্ত ধারাকে বিসর্জন দিয়ে নতুন ভাবনা আনয়ন করেছিলেন। যাঁরা তাঁর সাহিত্য-ধারণা অন্তরের সংগে গ্রহণ করতে পারেন নি, তাঁরাও আমেরিকান সাহিত্যে হাওয়েলস-এর বিস্ময়কর আভির্ভাবকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। হাওয়েলস মার্ক টোয়েন-এর একান্ত সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। তিনিই টোয়েনকে 'Lincoln of our literature' বলে অভিহিত করেন। স্বভাব-সপ্রতিভ হাওয়েলস রচনা-ভংগীতে বিন্যস্ত রূপ-সৃষ্টি কবার জন্য শ্রম স্বীকার করেছেন আশৈশব, এবং তিনি তা আয়ত্তও করতে পেরেছিলেন অবলীলাক্রমে। তাঁর লেখায় শব্দের একটিও অপপ্রয়োগ খুঁজে বার করার সুযোগ নেই এবং তিনিও ফ্লবের আনাতোল ফ্রাঁস-এর মতো নিজের প্রকৃতিকে খুঁতখুঁতে করে তুলতে পেরেছিলেন, সহজে সন্তুষ্ট হবার স্বস্তি তাঁরও ছিল না। সত্যের প্রতি তাঁর উত্তেজিত অনুরাগ ছিল আর এই সত্য তাঁর আস্তিকতায়, তাঁর বাস্তবতায় গভীরভাবে প্রোথিত। উপন্যাস, তাঁর মতে একটি ক্ষুরধার অস্ত্র,—সামাজিক ব্যভিচার আর অর্থনৈতিক অনাচারকে যে-অস্ত্র আঘাতে আঘাতে নির্মূল করে। কবি হাওয়েলস উপন্যাসে উৎক্রমিত হয়েছিলেন ধীরে ধীরে, কিছু ছোটগল্প, ভ্রমণবৃত্তান্ত আর স্কেচকে আশ্রয় করে। 'সুবার্বন স্কেচেজ' (১৮৭০) কেমব্রিজ এবং বোস্টনের কিছু প্রাচীন দৃশ্যকে চাক্ষুষ করিয়েছিল, সেই যখন ঘোড়ায়-টানা-গাড়ির ব্যবহার ছিল, যখন কেরোসিন কুপির টিমটিমে আলোয় মানুষের অনাড়ম্বর জীবনের স্নিগ্ধ সৌষ্ঠব ছিল স্তব্ধ। 'দেআঁর ওয়েডিং জার্নি' (১৮৭১) অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের স্কেচ কিন্তু অনেকেই এই রচনাটিকে হাওয়েলস্‌-এর প্রথম উপন্যাসের প্রচেষ্টা বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বহুলাংশে আত্মজীবনী-মূলক এই কাহিনীতে ভ্রমণবৃত্তান্তের রোমাঞ্চ আবিষ্কার করা যায় অনায়াসে—নায়াগ্রা জলপ্রপাতের শব্দ শোনা যায় লেখকের বিচক্ষণ ও বিশদ বিবরণীতে,

বেসিল ও ইসাবেল মার্চ-এর মধুচন্দ্রিমার আবেশ পাঠক-মনে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু 'দেআর ওয়েডিং জার্নি' হাওয়েলস্-এর শিল্প-নৈপুণ্য উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করে না। হাওয়েলস্ আপন দীনতা হয়ত অবগত ছিলেন, তাই সপ্তম দশক থেকে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। শাণিত করছিলেন ফরাসী বাস্তবতার অধ্যয়নে। ব্যালজাক, ফ্লবের-এর শিল্পরীতিকে গভীর অনুরাগে নিজের রচনায় পরীক্ষা করছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তুর্গেনিভ-এর কলাপ্রকরণই বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার চরম অভিব্যক্তি। তাই, 'এ চান্স্ অ্যাকোয়েনটেন্স' (১৮৭৩), 'দি লেডী অফ দি আরুস্টুক' (১৮৭৯) ইত্যাদি কয়েকটি উপন্যাসের ব্যর্থ পরিক্রমা সেরে হাওয়েলস্ যখন আত্মস্থ হলেন, তাঁর অনুশীলন, অভিজ্ঞতা আর উপজ্ঞাকে যখন তীক্ষ্ণ দক্ষতায় ব্যবহার করতে পারলেন, তখনই সৃষ্টি হলো 'এ মডার্ন ইনস্ট্যান্স' (১৮৮১)···হাওয়েলস্-এর সক্ষম সাহিত্যচর্চার একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত। উপন্যাসটি এক সাময়িক-পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সর্বপ্রথম। হাওয়েলস্ যথাসম্ভব আন্তরিকতায় বাস্তবতার পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এ-রচনায় কিন্তু সিদ্ধির সন্নিকর্ষে উপনীত হয়েও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। জীবনের তন্ময় রূপ অনুক্ত থেকে গেছে। একটি তারুণ্যদীপ্ত ভালবাসার মর্মান্তিক পরিণতি উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিবাহের বন্ধনে নয়, তার বিচ্ছেদেই যেখানে দুটি নর-নারী মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছিল। 'দি রাইজ অফ সাইলাস লাফাম' (১৮৮৫) হাওয়েলস্-এর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়ে থাকে সাধারণত। কেউ কেউ মনে করেছেন সমসাময়িক আমেরিকান কথাসাহিত্যে হাওয়েলস্-এর এই উপন্যাস অপেক্ষা মহার্ঘ আর কিছু ছিল না, কেউ বলেছেন এই উপন্যাসে হাওয়েলস্ ব্যালজাক-এর শিল্প-সাফল্যের নিকটবর্তী হতে পেরেছেন। ভাগ্যের দাক্ষিণ্যে যে ধনিক সম্প্রদায়ের ব্যাপক উদ্ভব হচ্ছিল, বুদ্ধিজীবি সমাজেও যাদের প্রতিপত্তি ছিল অনতুল, তাদেরই এক প্রতিনিধিকে নিয়ে লেখা এই মৃদু ও শান্ত বর্ণনা-ভংগীর উপন্যাসটিতে মানবিক সদ্‌গুণের অভাব ছিল না, নির্মাণ-কৌশলেও একটি সুগঠিত কলা-নৈপুণ্যের আভাস ছিল। প্রধান চরিত্রটি, যে বস্তুজগতের সামূহিক ক্ষতি স্বীকার করেও আত্মোপলব্ধির আশ্চর্য জগৎকে লাভ করেছিল, তার চরিত্রকে হাওয়েলস্ বিশ্বাসযোগ্য কৃতিত্বে অংকিত করতে পেরেছিলেন। 'ইণ্ডিআন সামার' (১৮৮৬) দুই মধ্যবয়সী নর-নারীর প্রণয় কাহিনী। ইতালীর পৃষ্ঠভূমিতে রচিত এই উপন্যাসের চরিত্র-সমাবেশ, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, মনস্তত্ত্বের

ব্যাখ্যা হাওয়েলস্‌কে বিদগ্ধ সমাজে সসম্মান প্রতিষ্ঠা দিলেও উৎকর্ষতা অনুযায়ী বইটি তেমন খ্যাতি পায় নি,—কোন অজ্ঞাত কারণে। কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, সমালোচক হাওয়েলস্‌-এর শেষ জীবনেও অধ্যবসায়ের অভাব হয় নি, সেই শ্রম, সেই বুদ্ধি তাঁকে সংগদান করেছে। তিনি চূড়ান্ত খ্যাতি পেয়েছেন, মানুষের চরম শ্রদ্ধা পেয়েছেন। কিন্তু সশ্রম, চিন্তান্যস্ত লেখা সত্ত্বেও হাওয়েলস্‌কে একটি সম্পূর্ণ-সার্থক কথাশিল্পীর মর্যাদা দেওয়া যায় না। শুধু তাঁর ঈর্ষাযোগ্য অধ্যবসায়কে সশ্রদ্ধ বিস্ময় জানিয়েই ক্ষান্ত হতে হয়।

আঞ্চলিক সাহিত্য-সাধনায় নিয়োজিত হয়ে যাঁরা আমেরিকান কথা-সাহিত্যে কিছু সুনাম ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন, সারা ওর্নে জুয়েট (১৮৪৯-১৯০৯) তাঁদের অন্যতমা। সমাজের সমস্যাকে তিনি নিরাসক্তিতে অবলোকন করেছিলেন, প্রাতিস্বিক অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায়, সবাস্তব অনভূতিতে তিনি ঘটনা-সংস্থাপন ও চরিত্র-চিত্রণ করেছেন। তাঁর বাবা ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। জুয়েট বাবার সংগে বহু গ্রাম ও অঞ্চল পরিভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার শোভা, তার মানুষ একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে দেখেছিলেন তিনি। শ্রীমতী স্টোয়ে তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং হাওয়েলস্‌-এর কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন অনুপ্রেরণা। তাঁর প্রথম কাহিনী-সংকলন 'ডীপ হেভ্‌ন' (১৮৭৭) হাওয়েলস্‌-এরই উপদেশে পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। প্রায় তেরটি কাহিনীর এই সংকলন আঞ্চলিক জীবনকে নানা বৈচিত্র্যে ব্যক্ত করেছে। জুয়েট কাহিনী ও স্কেচে যত স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন উপন্যাস-রচনার সাবলীল কৌশলকে ততখানি অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারেন নি। 'এ কান্ট্রি-ডক্‌টর' (১৮৮৪) একটি উপন্যাসের সদিচ্ছা প্রকাশ করলেও আসলে ছোটগল্পের রূপকর্মেই আবদ্ধ থেকেছে। তাতে তিনি এক মহিলা চিকিৎসকের চরিত্রকে পরিকল্পিত করে নিজের বাবার স্বভাবটি জুড়ে দিয়েছিলেন। 'দি টোরী লাভার'-এ (১৯০১) জুয়েট অভ্যস্ত পথ ছেড়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে নির্বাচন করেছিলেন। ঐতিহাসিক রোমান্স ছিল উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। কিন্তু জুয়েট নিতান্তই ক্ষুদ্র এক প্রতিবেশে বসবাস করেছেন, তাঁর চিন্তা বা দৃষ্টিকে কখনোই মহৎ ভাবনায় বিস্তৃত করতে পারেন নি। তাই তাঁর সাহিত্য অনতিপ্রশস্ত এক জগতে স্তব্ধ হয়ে আছে।

মেরী উইলকিন্স ফ্রীম্যান (১৮৫২-১৯৩০) জুয়েট-এর তুলনায় দক্ষ শিল্পী না হলেও আঞ্চলিক সাহিত্যসেবী হিসাবে অধিকতর সাবলীলতা ও বহুমুখী পারঙ্গমতা দেখিয়েছিলেন। 'এ হাম্বল রোমান্স অ্যাণ্ড আদার স্টোরীজ্' (১৮৮৭) তাঁর প্রায় চব্বিশটি গল্পের একত্রীকরণ—প্রথম গ্রন্থ। গল্পগুলি অস্বস্তিকর গম্ভীর ও বিমর্ষ,—'নতুন ইংলণ্ডীয়' চরিত্রকে নিরূপিত করেছে। উপন্যাসে 'পেমব্রোক' (১৮৯৪) তাঁর ক্ষমতার সম্যক দৃষ্টান্ত, যদিচ 'পোরসন অফ লেবর' (১৯০১), 'দি হার্টস হাইওয়ে' (১৯০০) ইত্যাদি উপন্যাস তিনি পরে লিখেছিলেন কিন্তু কোনটিই 'পেমব্রোক'-এর ক্ষমতাকে ম্লান করতে পারে নি। এতেও নতুন ইংলণ্ডীয় মানুষ তাঁর আগ্রহের প্রধান কেন্দ্রস্থল এবং এতেও একটি নারীর বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে তাঁর ব্যগ্রতার অন্ত ছিল না। উপন্যাসটির শিল্পকর্মেও সন্দেহের অবকাশ থাকত না যদি শ্রীমতী উইলকিন্স উপসংহারে একটি পরিতৃপ্তির আমেজ ছড়িয়ে না দিতেন। তবু, জনৈক সমালোচক বইটিকে এইভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন : 'treatise on the Divine will manifested as the New England won't'. শ্রীমতী উইলকিন্স গভীর সততায় ইয়াংকী সমাজের একটি অধ্যায়কে জীবিত করেছেন, নতুন ইংলণ্ডীয় কালের জরিষ্ণুতাকে প্রাঞ্জল করেছেন আর তা করতে গিয়ে তাঁর বাস্তবতায় ব্যালজাক-এর রঙ লেগেছে সময় সময়।

টি. এস. এলিয়ট বলেছেন, হেনরী জেমস্‌কে (১৮৪৩-১৯১৬) সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে হলে, তাঁর সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করতে গেলে মনে-প্রাণে আমেরিকান হওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ, 'James's best American figures in the novels, inspite of their trim, definite outlines, the economy of strokes, have a fullness of existence and an external ramification of relationship which a European reader might not easily suspect'—Philip Rahv. অথচ জেমস্ নিজে জাতেই কেবল আমেরিকান ছিলেন ; চরিত্রে এবং অভিজ্ঞতায় নয়। তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষের দেহে আইরিশ রক্ত এসে মিশেছিল। তিনি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু সমগ্র ইওরোপ সফর করে বেড়িয়েছেন এবং শিক্ষার আলোক তাঁর দৃষ্টিতে স্বাদেশিকতার সংকীর্ণতামুক্ত স্বচ্ছতা দিয়েছিল। ঔপন্যাসিক, সমালোচক, নাট্যকার মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের লেখক হেনরী জেমস্

হথোর্ন-এর মতোই আমেরিকান কথাসাহিত্যের এক সম্মানিত শিল্পী এবং হথোর্ন-এর মতোই তাঁর প্রাপ্ত সম্মানকে সময় সময় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সাহিত্যে তাঁর স্থান ও অবদান সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেছেন। জেমস্ যদিও ব্যালজাক, তুর্গেনিভ-এর আত্মীয়তায় কৌতূহল প্রদর্শন করেছেন, ভিক্টোরীয় উপন্যাসের সংগে হয়ত প্রয়োজনীয় সম্পর্কসূত্রও গড়ে উঠেছে তাঁর কিন্তু আসলে তিনি কারো কাছেই বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন না। কিছু কিছু লেখকের সৃষ্টি তিনি অনুরাগে অধ্যয়ন করেছিলেন কিন্তু সেই পাঠতালিকায় হথোর্ন ছিলেন না একথা সুনিশ্চিত। তবু, হথোর্ন-এর সংগে তাঁর আত্মীয়তা অন্য স্তরের, ঠিক ব্যালজাক-এর মতো নয়—এলিয়ট এই তথ্যই আরোপ করেছেন। এলিয়ট আরো বলেছেন যে, জেমস্-এর প্রাথমিক রচনায় হয়ত ব্যালজাক-এর প্রভাবকে আবিষ্কার করা যাবে, যা তাঁর পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নি। তুর্গেনিভ-এর প্রভাব আরো বেশি ফলপ্রসূ হয়েছিল কিন্তু তার পরিমাণ অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট। ব্যালজাককে কোন এক সময় তিনি মনোযোগে ও প্রশংসায় অনুসরণ করেছিলেন, আপন কক্ষ থেকে করেছেন আকর্ষণ। কিন্তু হথোর্ন-এর প্রতি তাঁর মমতা ভিন্ন প্রকৃতির, অন্যান্য সকলের সংগে তার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। অন্তত একটা বিষয়ে হথোন জেমস্ অপেক্ষা দৃঢ়সন্নধ্য। তাঁর ইতিহাস-চেতনা ছিল সূক্ষ্ম। আমেরিকার ঔপনিবেশিক ইতিহাসে তাঁর প্রজ্ঞা ছিল প্রশস্ত। দু'জনেই অতীতকে ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনায়, ব্যবহার করেছেন একান্তভাবেই আমেরিকান স্বভাবে। কিন্তু হথোর্ন-এ সেই অতীত যেন আপনা থেকে তার সকল রূপেই ধৃত হয়েছিল, অপর পক্ষে জেমস্ অতীত-চেতনার একটা ম্লান চেতনা লাভ করেছিলেন মাত্র (...'but in Hawthorne this sense exercised itself in a grip on the past itself ; in James it is a sense of the sense'), হথোর্ন-এর মনস্তত্ত্ব ছিল গভীরাশ্রয়ী, যা'র উপরিকতা জেমস্ নিজেই ব্যক্ত করে গেছেন : 'the fine thing in Hawthorne is that he cared for the deeper psychology, and that, in his way, he tried to become familiar with it.' এলিয়ট-এর ধারণায় অবশ্য হথোর্ন-এর ওই গভীরতর মনস্তত্ত্বের প্রতি পক্ষপাত তাঁর অনেক রচনাকে অবিশ্বাস্য অলীকতায় পর্যবসিত করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে জেমস্-এর 'দি টার্ন অফ দি স্ক্রু' (১৮৯৮) গল্পটির রূপকর্ম এবং শিল্প পদ্ধতি কিছু স্বতন্ত্র পথের ইশারা জানায়। দু'জনেই পরিবেশ সৃষ্টিতে স্ব-স্ব রীতিতে পটু—

একজন নতুন ইংলণ্ডকে অংকিত করেছেন, অপরজন আমেরিকার বহুলাংশ অলংকৃত করেছেন রচনায়। সংস্থানের প্রতি উভয়েই সংবেদনশীল, দুই বা ততোধিক চরিত্রের সহায়তায় ঘটনা বা সংস্থানকে একটি তীক্ষ্ণ পরিণতি দিতে উভয়েই পারঙ্গম। এলিয়ট আরো বলেছেন যে, জেমস্-এর শেষ উপন্যাস 'দি সেন্স অফ দি পাস্ট'-এ হথোর্ন-এর প্রতি সহানুভূতি বেশি করে অভিভূত করেছিল তাঁকে। হথোর্ন-এর 'দি হাউস অফ্ দি সেভন গেব্লস' চরিত্রে ও রচনারীতিতে ভিন্নতর মার্গারূঢ় হলেও, জেমস্ তাঁর উল্লিখিত শেষ গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত চেতনাটুকু হথোর্ন-এর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

হেনরী জেমস্ তাঁর পাঠকগোষ্ঠীর কৃপা লাভ করেন নি, তাই তাঁর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংখ্যাকে আশ্রয় করে থেকেছে। তার হেতু বোধহয়, প্রথম আরম্ভের দুর্বলতা ও অস্বস্তিকে অতিক্রম করেই তিনি তাঁর কাহিনী ও উপন্যাসে প্লট-এর মোহ ও মায়া বিস্তারের পরীক্ষিত কৌশল ত্যাগ করেছিলেন। বুদ্ধির দীপ্তি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর সাহিত্যের আধেয়কে। চেতনার চলোর্মি প্রত্যুৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু সর্বতোভাবে তা চলোর্মিই, কারণ জীবনের চেতনাকে উপযুক্ত মর্যাদায় অংকিত করতে গেলে চেতনা ও বাস্তবতার প্রতি যে একনিষ্ঠ ও সধৈর্য ধ্যান ও মনোযোগ প্রয়োজন হয় জেমস্-এর চরিত্রে সেই অখণ্ড স্থৈর্য ও সংহতির অভাব ছিল একান্ত। বাস্তবতাবোধ চঞ্চল তরংগের মতোই তাঁর সাহিত্যে আপন খুশিতে উদ্গত হয়েছে, অকস্মাৎ তা মিলিয়ে যেতেও দেরী হয় নি। শুধু বুদ্ধির প্রতি তাঁর সততা ও আন্তরিকতা জাজ্বল্যমান থেকেছে, আর তাই পাঠকরা তাঁর গ্রন্থে বুদ্ধির বাধায় অস্বস্তিবোধ করে ক্লান্ত হয়েছেন। 'As a result, his readers have been forced to appreciate his fiction on intellectual grounds—a sure means of reducing an audience to the fit but few'—Arthur Hobson Quinn : A literature of the American people. কিন্তু জেমস্ সম্পর্কে পাঠকের এই অনাগ্রহে এজরা পাউণ্ড ক্ষুব্ধচিত্তে বলেছেন যে, জেমস্ পাঠে অধিকতর মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন আছে। তিনি বলেছেন, জেমস্-এর মৃত্যুতে একটি কালের অবসান ঘটেছে বলা চলে। আমেরিকানরা তাঁকে কোনদিন চেনে নি, পরিপূর্ণভাবে বুঝবার ঔৎসুক্য হয়নি তাদের। তারা জানেও না, কী তারা হারিয়েছে। শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি নিরলস পরিশ্রমে বর্বরতার ধ্বান্ত থেকে আমেরিকাকে সভ্যতার আলোকে উৎক্রান্ত করার চেষ্টা

চালিয়ে গেছেন। ইউটোপিয়া নয় সভ্যতা। আর, শেষ পর্যন্ত তাঁকে গভীর লজ্জায় আমেরিকার নাগরিকত্ব বর্জন করতে হয়েছে, অনন্যোপায় হয়ে। তিনি আজীবন একটি জাতির কারণে তাঁর সকল ভাবনাকে উৎসর্গ করেছেন, আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেশগত ও জাতিগত বিভেদের উৎস সন্ধান করে তার আশ্চর্য শিল্পসম্মত বিচার করেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যের গবেষণাগারে মানুষের গুণাগুণের মৌল পদার্থের পরীক্ষা চালিয়েছেন, যে আবশ্যকীয় পদার্থ মানুষকে জাতীয়তার ঔৎকর্ষ দেয়। কোন লেখকই তিনটি দেশ-কে (ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স) নিয়ে তাঁর মতো এমন নিষ্ঠায় নিরীক্ষার দুঃসাহসিক ইচ্ছা পোষণ করেন নি। তিনি জানতেন, শান্তি আসে সমাযোজনে; সমাযোজনেই আছে শান্তি। হেনরী জেমস্-এর মতো আর কোন সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের মাধ্যমে শান্তির সেই সমাযোজন রক্ষার মহান চেষ্টায় ব্যাপৃত হন নি। তাঁর মহান শিল্পের সবটুকুই সমাযোজনের জন্য সংগ্রাম। 'রডেরিক হাডসন' (১৮৭৬) জেমস্-এর প্রাথমিক উপন্যাস। একটি আমেরিকান ভাস্করের কাহিনী। যদিচ উপন্যাসটি অপরিণত তবু, এলিয়ট বলেছেন, 'এতে আত্ম-চেতনার যে উন্মেষ হয়েছে, হথোর্ন কোনদিন সেই চেতনার স্তরে উপনীত হতে পারেন নি।' 'দি পোরট্রেট অফ এ লেডী' (১৮৮১) সাধারণত জেমস্-এর সৎ শিল্পকর্মরূপে বিবেচনা পেয়ে থাকে। এক আমেরিকান মহিলা এই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। তাকে নিয়েই একটি উজ্জ্বল প্রতিকৃতি রচনা। এই উপন্যাস থেকেই জেমস্ প্রথম আন্তর্জাতিকতায় উন্নত হয়েছেন। ইসাবেলা আর্চারের চরিত্রে যে নীতি ও বৈদগ্ধ্য উদ্‌গমিত হয়েছে, জেমস্ তাকে এত সুন্দরভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন যে, গ্রন্থটি শুধুই তাঁর এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মরূপে আবদ্ধ থাকে নি, আমেরিকান কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট সংযোজনরূপে সম্মানিত হয়েছে। 'দি প্রিন্সেস ক্যাসাম্যাসিমা'-র (১৮৮৬) নায়ক রবিনসন এক ইংরাজ পুরুষ ও ফরাসী নর্মসঙ্গিনীর জারজ সন্তান। লণ্ডনের আবর্জনাময় বস্তীতে তার বসবাস। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের সংগে যুক্ত সে এবং সমাজের চরম শত্রু। জেমস্ তাকে আপন মর্মের ও ধর্মের আদর্শে অংকিত করেছিলেন, তেমনি বুদ্ধিবাদী ভদ্রলোক করে। জাগ্রত চেতনার এই উপন্যাসটি তুর্গেনিভ-এর 'ভার্জিন সয়েল'-এর সংগে সহজেই তুলনীয়। কিন্তু সর্বসাকুল্যে 'দি প্রিন্সেস্ ক্যাসা-ম্যাসিমা' রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধনের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টামাত্র। 'দি ট্রাজিক মিউজ'-এর (১৮৯০) ঘটনাস্থল ইংলণ্ড। প্রধান চরিত্র নিক্ ডরমার

অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত। কোন্ দাবীকে স্বীকার করে সে জীবন ধারণ করবে? শিল্প না রাজনীতি? শেষ পর্যন্ত রাজনীতিকে পরিত্যাগ ক'রে নিক্ একটি বিত্তশালিনী তরুণীকে বিয়ে করল, ফলে শিল্পের সাধনায় প্রতিষ্ঠ হতে পারল সে। বইটি চিত্রময়তার অভিভাবে এবং প্লটের একতায় জেমস্-এর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য বলে অভিহিত হয়ে থাকে। 'হোআট মেইজী নিউ' (১৮৯৭) একটি তরুণীর হৃদয়ে উদ্গত নীতি-চেতনার কাহিনী—গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের একটি রচনার উন্নত অনুসরণ। কিন্তু বইটি জেমস্-এর আরেক অপ্রীতিকর সাহিত্যকর্মরূপে আখ্যাত হয়েছিল। 'দি গোল্ডেন বাওল'-এর (১৯০৪) নায়িকা আবার এক আমেরিকান মহিলা। সে বিয়ে করল এক ইতালীয় অভিজাত পুরুষকে। উপাখ্যানটিতে সাবলীলতা ছিল আশানুরূপ কিন্তু দু'টি চরিত্রের বিশ্লেষণে জেমস্ প্রয়োজনীয় তীক্ষ্ণতা দেখাতে পারেন নি এবং যে-প্রক্রিয়ায় তিনি কাহিনীব বর্ণনা করেছিলেন তা প্রায়শই অস্পষ্টতায় বিলীন হয়েছে। যদিচ কারো কারো অভিমত যে, জেমস্ উপন্যাস অপেক্ষা সাহিত্যসন্দর্ভে যদি অধিকতর মনোযোগী হতেন, তাহলে বিশ্বসাহিত্য কিছু বেশি উপকৃত হত কিন্তু এজরা পাউণ্ড তাঁর রচনার (১৯১৮) পরিশেষে বলেছেন, 'জেমস্ হয়ত ফ্লবের-এর মতো তেমন গভীরভাবে 'অনুভব' করেন না; তিনি আমাদের উপহার দেন না প্রত্যেক মানুষ (Every man) কিন্তু অপরপক্ষে তিনি এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে সজাগ থাকেন যা ফ্লবের অবহিত হন নি আর তাতেই 'মাদাম বোভারী'র রচয়িতাকে তিনি পশ্চাতে ফেলে যান।'

উইলিআম ডীন হাওয়েল্সের অনতিক্রম্য প্রভাবে যাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম সূচনা, সেই হ্যানিবল হ্যাম্লিন গারল্যাণ্ড (১৮৬০-১৯৪০) আইওয়াতে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকার মিড্লওয়েস্ট্, যার সুবিস্তীর্ণ তৃণভূমি, অশ্বারোহী যোদ্ধা 'কাউবয়ের' দল, হত্যা, প্রেম ও উত্তেজনায় রোমাঞ্চকর জীবন, যা তৎকালীন সাহিত্যে এবং একালীন চলচ্চিত্রে এখনকার মানুষের কাছে একান্ত পরিচিত,—হ্যামলিন গারল্যাণ্ড-এর লেখা পড়লে বোঝা যায় তার অনেকটাই কল্পনার রঙীন আবরণে ঢাকা। সেসব বর্ণনায় বা রূপায়ণে সত্য অনুপস্থিত। আসলে হ্যামলিন গারল্যাণ্ড র‍্যাঞ্চ ও খামার-এর কৃষকজীবনের অসাধারণ দারিদ্র্যের সংগে শৈশবেই পরিচিত হয়েছিলেন। রাজনীতিক দলগুলির নির্লজ্জ অপপ্রচারের চেহারাও তাঁর দেখা। আর, তেমনি করেই তিনি দেখেছিলেন শ্বেতাঙ্গদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির জন্য কেমন করে

সিয়ুক্স ইণ্ডিআনরা তাদের বসতি ছেড়ে, অরণ্য ও তৃণভূমি ছেড়ে, একটু একটু করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। নতুন, বর্বর এক বিজয়ী সভ্যতার কাছে এক প্রাচীন সভ্যতার শোচনীয় পরাজয় গারল্যাণ্ড-এর মনকে কশাঘাতে জাগ্রত করেছিল। সমাজসংস্কার করবার দায় নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন গারল্যাণ্ড। তাই তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস, 'এ মেম্বার অফ দি থার্ড হাউস' (১৮৯২) বা 'এ লিট্ল্ নর্স্ক' (১৮৯২) প্রভৃতি গালভরা নীতিবাক্যে ভারাক্রান্ত। কৃষক পরিবার-গুলির জীবনযাত্রার বর্ণনায় গারল্যাণ্ডের তথ্যনিষ্ঠা, বাস্তবানুগতা প্রশংসনীয়। কিন্তু জীবনকে নগ্নভাবে উন্মোচন করতে গিয়ে শেষ অবধি গারল্যাণ্ডের লেখা ব্যাধিতিতে পর্যবসিত হয়। তাঁর শুভানুধ্যায়ী হাওয়েল্সের পুনঃপুনঃ সমালোচনার পর, গারল্যাণ্ড নতুন চিন্তা-চৈতন্যে সিয়ুক্স ইণ্ডিআনদের নিয়ে যে-সব উপন্যাস লিখলেন, সেই 'ক্যাপ্টেন অফ্ দি গ্রে হর্স্ ট্রুপ' (১৯০২), 'হেস্পার' (১৯০৩) 'ক্যাভানা ফরেস্ট রেঞ্জার' (১৯১০) এবং গল্পগ্রন্থ 'আদার মেইন ট্রাভেল্ড রোড্স' (১৯১০) অদ্যাবধি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা বলে পরিচিত। বস্তুত, শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার চাপে ইণ্ডিআনদের অস্তিত্ব হারাবার মর্মন্তুদ সত্য তাঁর উপন্যাসে এমন বাস্তবতায় উদ্ঘাটিত হয়েছিল যে, পরে ১৯৩৬ সালে তাঁকে এই বিষয়ে একটি গবেষণাগ্রন্থ 'ফর্টি ইআর্স অফ্ সাইকিক রিসার্চ' প্রকাশ করতে হয়। স্বয়ং রুজভেল্ট গারল্যাণ্ডের কাছে অবশিষ্ট ইণ্ডিআনদের সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। গারল্যাণ্ডের সাহিত্যের যশ আজ ম্রিয়মাণ। তবু, পরবর্তী যুগের কোন কোন লেখককে তিনি প্রভাবান্বিত করেছেন। অন্তত হাওআর্ড ফাস্ট-এর 'লাস্ট ফ্রন্টিয়ার' হ্যাম্লিন গারল্যাণ্ডের উপন্যাস ও প্রবন্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবান্বিত।

অতঃপর আমেরিকান কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগে কয়েকটি নিশ্চিত প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেল। যাঁরা সাহিত্যের বাস্তবতাকে শিল্পের পরম ধর্ম-জ্ঞানে উপাসনা করতে প্রচেষ্ট হয়েছিলেন, স্টীফেন ক্রেন (১৮৭১-১৯০০) সেই বিরল সাহিত্যসাধকদের একজন। তাঁর জীবন উনবিংশ শতাব্দীতেই অবসিত হওয়ায় আমেরিকান কথাশিল্প তার এক বলিষ্ঠ মশালচীর শোচনীয় নিরুদ্দেশ সংবাদ জ্ঞাপন করল। তিনি যে উদ্‌বোধিত ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন তা তাঁর একটিমাত্র বই 'দি রেড ব্যাজ অফ্ করেজ'-এ (১৮৯৫) সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। উপন্যাসটির আবেদন আপাতদৃষ্টিতে অস্থায়ী মনে হতে পারে।

কেননা, আমেরিকান গৃহযুদ্ধ রচনাটির পশ্চাৎপট। পৃথিবী তার চেয়েও ভয়ংকর সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছে এবং সাহিত্যে তার আলোকপাত ঘটেছে। কিন্তু স্টীফেন ক্রেন-এর শৈল্পিক প্রকর্ষতা লেখাটি থেকে মুছে যায় না, আখ্যানবস্তুর সসীমতাকে লঙ্ঘন করেও টিঁকে থাকে। মনে-প্রাণে বোহেমিয়ান ক্রেন যদিচ কলেজে যোগদান করেছিলেন কিন্তু কোনদিনই পাঠ্যপুস্তকের শাসনকে মানতে পারেন নি, সাহিত্য ও শিল্পের দুর্বার উন্মাদনায় উদ্দীপিত হয়েছেন। বাবা মারা যাবার পর কঠোর দারিদ্র্যকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা তাঁকে জীবন সম্পর্কে কিছু অবশ্য-জ্ঞাতব্য শিক্ষা দিয়েছিল। সাংবাদিকতার জীবিকা সেই শিক্ষাকে আরো যত্নে বর্ধিত করে। ফ্লবের, জোলার কাছে তাঁর ঋণ-স্বীকারের তেমন প্রশ্ন ছিল না, কারণ তিনি তাঁদের রচনাপ্রকৃতিতে বিশেষ অভিভূত হন নি। তবু ন্যাচারালিস্টিক রীতির ব্যবহার ও পরীক্ষা তিনি যা করেছেন আপন রচনায়, বাস্তবতার বিশ্বাসকে যত সুদৃঢ়-কৌশলে করেছেন সঞ্চারিত—তার মূল উৎস ছিল তাঁর আপন জীবন, আপন স্বাদেশিকতাবোধ। যে অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ক্রেন, তার জরিষ্ণুতার ভয়াবহ প্রতিবেশকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি, তাছাড়া তাঁর দুর্দম জীবনাসক্তি, যে আসক্তি তাঁকে অপরিমিত, শৃঙ্খলাহীন জীবনযাত্রায় প্রলুব্ধ করেছিল, তা তাঁর সাহিত্যকেও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতায় সম্পুষ্ট করে। তিনি ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক, তিনি জীবনের দুরন্ত ভোক্তা, তিনি আমেরিকান কথাসাহিত্যের একটি নব্য-আন্দোলনের অস্থির নায়ক। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাবার পর থেকে তাঁর সংক্ষিপ্ত আয়ুর শেষ সময়টি পর্যন্ত তাঁকে কেন্দ্র করে একটি সচল উত্তেজনা সর্বসময় অটুট থেকেছে, যাকে সমাদর বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি দীর্ঘজীবি হলে তার কতটুকু অবশিষ্ট থাকত তা হয়ত বলা কঠিন, তবে অন্তত একটি উপন্যাস এবং কিছু অসাধারণ ছোট গল্প তাঁকে ইতিমধ্যেই আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়েছে। 'No man of that movement was more vastly admired, and none has survived with less damage. How far would he have got if he had lived ? It is useless to speculate. He died, like Schubert, at thirty. He left behind him one superlatively excellent book, four or five magnificent short stories, some indifferent poems and a great mass of journalistic trash.' স্টীফেন ক্রেন-এর প্রথম উপন্যাসোপম কাহিনী 'ম্যাগী'-তে

(১৮৯৩) ন্যাচারালিজম ও ইমপ্রেসনিজ্‌ম-এর সদ্‌ব্যবহার হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে এবং জোলার সহৃদয় অনুগামী হবার লোভ সামলাতে পারেন নি ক্রেন। কিন্তু বইটিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। আইরিশ জীবনকে তিনি এমন নগ্ন সত্যে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন যে, প্রকাশকরা বইটি মুদ্রিত করার ঝুঁকি নিতে চান নি। শেষ পর্যন্ত ক্রেনকেই উদ্যমী হতে হয়েছিল এবং পরে কাহিনীটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন: 'আমার নিজের যেমন মনে হয়েছিল, ঠিক সেইরকমভাবে লোকের সামনে লোককে তুলে ধরা ছাড়া 'ম্যাগী' লেখার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।' ১৮৯৪ সালের মধ্যে স্টীফেন ক্রেন 'রেড ব্যাজ অফ করেজ'-এর পাণ্ডুলিপি শেষ করে ফেলেছিলেন। বিশদ এবং বিন্যস্ত বর্ণনা, তাঁর জাগ্রত অনুভূতি, যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ব্যবচ্ছেদ, গ্রন্থটিকে অসাধারণতা দিয়েছিল। অনেকেই বইটিতে তলস্তয়ের 'সেবাস্তপোল' এবং 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস্'-এর ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন আর হেনরী জেমস্ বলেছিলেন, 'জোলার ভাল অনুকরণ'। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে 'দি মনস্টার', 'দি ব্রাইড কামস টু ইয়েলো স্কাই', 'দি ব্লু হোটেল' ইত্যাদি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। স্টীফেন ক্রেন-এর সাহিত্য ডীন হাওয়েলস্‌কে সচকিত করেছিল আর গিল্‌ডারকে করেছিল মর্মাহত। কিন্তু তাঁকে ঘিরে ধীরে ধীরে তরুণদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, এবং ক্রেন তাদের উগ্র সমর্থনে প্রায় আমেরিকান কিপলিং-এর মতো বিরাজ করেছেন স্বদেশে।…'a gang of younger men gathered around him, and before he died he was a national celebrity—in fact, a sort of American Kipling (H. L. Mencken).

থিওডোর ড্রেজার-এর (১৮৭১-১৯৪৬) দুর্মদ আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত ছিল না আমেরিকান কথাসাহিত্য। তাঁর অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতার তীক্ষ্ণতাকে বরদাস্ত করতে তাই সমালোচক ও পাঠককে বহু অস্বস্তিকর সময়ক্ষেপ করতে হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত আমেরিকান উপন্যাসে রমণীয়তার আবেশকে প্রশ্রয় দিয়ে যদিও বা জীবন থেকে পলায়ন চলছিল কিন্তু ড্রেজার-এর আগমনে একটা প্রবল প্রভঞ্জন সৃষ্টির মূলকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। মাত্র একক প্রচেষ্টায় তিনি কথাসাহিত্যের কণ্ঠস্বরে নিদারুণ পরিবর্তন আনলেন। তিনি

যেন মানুষের উপরস্থ সকল বর্মকে ভেদ ক'রে স্পর্শ করলেন মর্ম। তাঁর রচনা-প্রকরণে সুবিন্যস্ত ও সুমার্জিত শিল্পরীতি হয়ত রইল না কিন্তু রচনার ছত্রে ছত্রে আঘাতের বিস্ময় রইল, রইল নগ্ন সত্য উপলব্ধির সুতীব্র যন্ত্রণা। তিনি কোন শক্তিমান প্রচেষ্টায় মানুষের উপর বিশ্বাসারোপ করতে চাইলেন না, জোর খাটালেন না কিছু, শুধু নির্বিকার চিত্তে মনুষ্যত্বের অতলবিহারী অন্ধকারকে স্বতোৎসারিত করে তুললেন। তিনি আমেরিকান সমাজের অতি-নৈতিকতা, অর্থানুগত্য ভিক্টোরীয় মনোভাব এবং শৌখিন ভদ্রতার পর্বতপ্রমাণ মিথ্যাচারকে একটি একটি ক'রে সরাতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর এই সংগ্রামমুখর 'বর্বরোচিত' সাহিত্য সাধনা অনেকের পক্ষেই বরদাস্ত করা মুস্কিল হলো। তাই অনেকেই বললেন, হ্যাঁ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিশদ বিবরণে তাঁর ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই যথার্থ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেতে পারেন না। ডিটেইলস্‌কে প্রত্যক্ষ করায় তাঁর পটুতা ছিল কিন্তু তা বাছ-বিচার করতে পারার অপারদর্শিতা তাঁকে শিল্পী হিসাবে এবং প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হিসাবে সম্মানিত করে নি। 'His defect as an artist lies in his piling up of detail without that selectivity which marks the first-rate writer.'

ড্রেজার-এর জর্মান পিতা-মাতা ছিলেন অত্যন্ত নিঃস্ব। জীবিকার জন্য এবং দেনার তাড়নায় তাঁরা নানা স্থানে বেদেদের মতো বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, নীতিবান এবং সৎ জীবনযাপনের উপক্রন্তা। যথেষ্ট চৈতন্যপ্রাপ্তির পর ড্রেজার দেখলেন, তিনি জীবন সম্পর্কে যে-শিক্ষা পেয়েছেন তার সংগে বহির্জগতের, ব্যবহারিক জীবনের প্রভূত বৈষম্য, প্রচুর পার্থক্য। মানুষের এই ছলনাটুকু তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর দাদা যে-নর্মসঙ্গিনীটির সংগে বসবাস করে, সে তার পরিবারের চরম দুর্দিনে, অভাবের কালে পালিয়ে এসেছিল। তিনি দেখেছিলেন, কোন পুরুষকে বিবাহিত জেনেও একটি মেয়ে তার ভোগতৃপ্তি চরিতার্থ করার জন্য কত সহজে এবং সাফল্যের সংগে বাস করতে পারে তার সংগে আর 'সিস্টার ক্যারী' তাঁরই সহোদরা। 'সিস্টার ক্যারী'ই (১৯০০) ড্রেজার-এর প্রথম উপন্যাস। তিনি বইটিতে কোনরকম স্বজ্ঞালব্ধ ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে জীবনকে, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু উপন্যাসটি প্রকাশকের অপরিণামদর্শিতায় বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ্যে প্রচারিত হবার সুযোগ

পায় নি। যখন বেরোল তখন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটি প্রকাশ পেয়েছে। শোনা যায়, প্রকাশকের স্ত্রী-ই নাকি 'সিস্টার ক্যারী'র নিরোধ এবং বিলম্বের হেতু। ড্রেজার এই উপন্যাসের মাধ্যমে আমেরিকান জনগণকে কোন শোচনীয় মর্মাঘাত পৌঁছে দিতে চান নি। শুধু নিরাসক্ত প্রত্যয়ে সমসাময়িক জীবনের নিখুঁত এবং আন্তরিক হিসাব পেশ করেছিলেন। তবু, সংবাদপত্র থেকে সাধারণ পাঠক এই বিস্ময়কর স্পষ্টবাদিতায় নিদারুণ আহত হয়েছিলেন, অসহায় বোধ করেছিলেন। 'It hurts because you never get free enough of anything to ask what a character or a situation 'really" means ; it hurts because Dreiser is not trying to prove anything by it or to change what he sees ; it hurts even when you are trying to tell yourself that all this happened in another time, that we are cleverer about life than Dreiser was. It hurts because it is all too much like "reality" to be "art". তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'জেনী গারহার্ডট্' (১৯১১) সমাজগত সংস্কারের দ্বন্দ্বে অস্থির। জেনী তার প্রথম প্রণয়ীর মৃত্যুর পর লিস্টার কেন্ নামে একটি পুরুষকে ভালবাসল। কিন্তু তারা বিবাহের আশ্রয় না নিয়েও তাদের সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিল। তাদের সামনে এসে দাঁড়াল চিরাচরিত নীতি ও সংস্কারের প্রশ্ন। ছেলেটির বাড়ি থেকে প্রবল বাধা এল। তাছাড়া, জেনী যখন জানল যে, কেন্-এর ভবিষ্যত-মঙ্গল নিহিত আছে তাদের বিচ্ছেদে, তখন সে নিজের কথা না ভেবে তার জীবন থেকে সরে দাঁড়াল। এই বইটি ড্রেজার-এর অন্যান্য বইয়ের মতো সুপরিচিত না হলেও রচনার প্রসাদগুণে বিভূষিত। 'দি ফাইনেনসিআর' (১৯১২) এবং 'দি টাইটান' (১৯১৪) একটি মানুষের সকৌশলে ব্যবসায়িক সাফল্য এবং পরিশেষে একটি সম্পদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রয়াস বিবৃত করেছে। 'দি জিনিআস' (১৯১৫) উপন্যাসে ড্রেজার একটি প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর ভাবচ্ছবি এঁকেছিলেন। বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু উদারনৈতিক, আধুনিক থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা তার প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেন। কারণ এতে 'সত্য কথা বলা হয়েছিল'। অতঃপর ড্রেজার দীর্ঘ কয়েক বছর আর উপন্যাস লিখলেন না। নানাবিধ ছোটগল্প, নাটক এবং আত্মজীবনীমূলক স্কেচ ইত্যাদিতে সময়ক্ষেপ করার পর তিনি যে উপন্যাসটি লিখলেন তা আমেরিকার জনমানসে আবার নতুন করে

উত্তেজনার সঞ্চার করল। সকলেই নতুন ক'রে উপলব্ধি করল যে, ড্রেজার আদিম মানুষের মতো কিংবা একটি বৃহৎ প্রাকৃতিক শক্তির মতো সাহিত্যের পৃথিবীতে এক দুর্বার আবির্ভাব। 'অ্যান আমেরিকান ট্রাজেডী' (১৯২৫) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকর্ম। তিনি এতে আমেরিকান মানুষের অর্থানুগত্য এবং সামাজিক অবস্থাগ্রহের আকাঙ্ক্ষা কত তীব্র তা ভয়ংকরভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। ক্লাইড গ্রিফিথ সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নীত হবার স্বপ্ন দেখত। অর্থ, বৈভবকে আয়ত্ত করার জন্য তার বাসনার অন্ত ছিল না যদিচ সে জানত না, কোন উপায়ে তার সেই ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু তার এই নিয়মহীন, শৃঙ্খলাহীন, উৎকট বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে সে দু'টি মেয়ের সংস্পর্শে এল এবং একজনকে হত্যা করার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হলো। আমেরিকার রক্তে আছে সম্পদের নেশা এবং আধুনিক জড়বাদের মিথ্যা মূল্যের স্বপ্নচারিতায় কি ভয়াবহ পরিণতি ত্বরান্বিত হয় 'অ্যান আমেরিকান ট্রাজেডী'তে তার সুবেদী যুক্ত্যাভাস আছে। আমেরিকান ধনতন্ত্রবাদের প্রামানিক নিদর্শনরূপে বইটি রাশিয়ায় অভ্যর্থিত হয়েছিল এবং আইজেনস্টাইন এটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। থিওডোর ড্রেজার জীবনের অপরাহ্ণে মার্কস্‌বাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পর থেকে আস্তে আস্তে তাঁর প্রতিপত্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে। অকস্মাৎ তিনি অনুভব করেন, আমেরিকার জনসমাজে তাঁর উন্মুখর ভূমিকাটি ফুরিয়েছে। নতুন একটি ঐতিহ্য তাঁর সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে উন্মীলিত হচ্ছে, যার সংগে তাঁর কোন আত্মিক মিল নেই। নতুন এই সাহিত্যসেবীরা রচনার সৌন্দর্য, শব্দের মাধুর্য সম্পর্কে সচেতন; পৃষ্ঠার বুকে সেগুলি যেন সুন্দরভাবে ছড়িয়ে থাকে। 'Writing in America had suddenly become very conscious that literature is made with words, and that these words should look nice on the page.' তাই তাঁর মৃত্যুর পর বলা হলো, আমেরিকান কথাসাহিত্যের বিবর্তনে থিওডোর ড্রেজার-এর গুরুত্ব ছিল বটে তবে একথাও ঠিক যে, যাঁরা তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন তাঁদের চেয়ে ড্রেজার-এর অবদান অনেক নিকৃষ্ট। তাঁরা পূর্বপুরুষের প্রতি আনুগত্যেই ড্রেজারকে অনুসরণ করেছিলেন। কেননা, ড্রেজার মহৎ ঔপন্যাসিক ছিলেন না যদিচ তিনি উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক…'He was not a great novelist, though a considerable one.'

এড্‌গার অ্যালেন পো'র প্রত্যক্ষ অনুসারী অ্যাম্ব্রোজ বিআর্স-কে (১৮৪২-১৯১৪ ?) একদা 'the one commanding figure in America in our time'—(Percival Pollard.) বলা হয়েছিল। প্রশংসার এই আতিশয্য বিআর্স দাবী করতে পারেন না। অতিলৌকিক, রোমাঞ্চকর, আধিভৌতিক বিষয়বস্তু দ্বারা রচনাকে চমকপ্রদ করবার কাজেই তাঁর চেষ্টা ব্যয়িত হয়েছে এবং তাঁর নিজের জীবনের সমাপ্তিও রহস্যময়। বহু পেশায় ব্যস্ত এবং ব্যর্থ বিআর্স ১৯১৩ সালে মেক্সিকোয় নিরুদ্দিষ্ট হন। তাঁর গল্প সংগ্রহের মধ্যে 'ইন্ দি মিড্‌স্ট্ অফ লাইফ' (১৮৯২) ; 'ক্যান সাচ থিংস বী ?' (১৮৯৩) এবং আলাদা গল্প হিসাবে 'এ হর্সম্যান ইন্ দি স্কাই', 'দি বোর্ডেড উইন্‌ডো', 'দি আইজ্ অফ দি প্যান্‌থার' পাঠককে আজও আনন্দ দিয়ে থাকে।

এড্‌ওয়ার্ড বেলামি (১৮৫০-১৮৯৮) ইউটোপিয়ান সমাজ নিয়ে একটি কাল্পনিক ও আষাঢ়ে গল্প লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল না 'লুকিং ব্যাকওআর্ড, অর ২০০০—১৮৮৭' (১৮৮৮) বইটি, ন্যাশনালিস্ট আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে তাঁর ইচ্ছার ব্যতিরেকে তাঁকে এক সমাজ সংস্কারক প্রবক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ করবে। ইতিপুর্বে তিনি 'ডক্টর হেইডেনহফ্‌স প্রোসেস' (১৮৮০) এবং 'দি ডিউক অফ স্টকব্রিজ' (১৮৭৯-১৯০০) লিখে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু 'লুকিং ব্যাকওআর্ড' বইটি পড়ে স্বয়ং ডীন হাওয়েলস্ একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠির প্রতিভূ হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এই বইয়ের নায়ক ১৮৮৭ সালে সম্মোহন নিদ্রায় অভিভূত হয়ে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে জেগে উঠে বোস্টন নগরীতে যে আদর্শ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে, তারই মধ্যে নাকি আমেরিকার মানুষের চরম পুর্ণতার ভবিষ্যৎচিত্র অংকিত হয়ে সরকারকে পথ নির্দেশ করেছে। বেলামি যদিও বিভ্রান্ত হয়ে বলেন 'সমাজসংস্কার-আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না, আমি শুধু একটি রূপকথা, একটি ফ্যাণ্টাসি লিখতে চেয়েছিলাম,' তবু তাঁর কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়। পৃথিবীর বহু ভাষা এমন কি আরবীতেও বইটি অনূদিত হয়। বেলামিকে রাজনীতিতে টেনে নামানো হয় এবং ভগ্নহৃদয় বেলামি অতঃপর তাঁর নতুন দায়িত্বসমূহ পালনের চেষ্টায় ব্যস্ত থেকে ক্ষয়রোগে প্রাণ হারান।

ইউটোপিয়া সম্পর্কে পাঠকসমাজ মোহমুক্ত হবার পর, বইটি অধুনা তার সাহিত্য-গুণে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

ফ্রান্সিস্ মারিঅন ক্রফোর্ড (১৮৫৪-১৯০৯) এক উদ্যমী ব্যক্তিত্ব যিনি বহু রোমাঞ্চকর বৃত্তিতে ভ্রমণ করে নিজের জীবনকেই আকর্ষণীয় করে তোলেন। সংস্কৃত শিখতে ভারতে এসে তিনি দুই বছর এলাহাবাদে 'ইণ্ডিআন হেরাল্ড' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পনেরোটি ভাষাবিদ্ ক্রফোর্ড অতঃপর ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করবার সংকল্প ত্যাগ করে প্রভূত বিত্ত আহরণের নেশায় উপন্যাস লিখতে ব্যাপৃত হন। ইতালী, জর্মানী, ভারতবর্ষ, মিশর, পারস্য ও আরবের ইতিহাসে ও আধ্যাত্ম-জগতে তিনি নির্দ্বিধায়, যথেচ্ছ ভ্রমণ করে পঁয়তাল্লিশটি উপন্যাস লেখেন। আদর্শবীর নায়ক ও অনিন্দ্যসুন্দরী ভাগ্য-লাঞ্ছিতা নায়িকার আদর্শীকৃত প্রেম-সমন্বিত উপন্যাসগুলি যদ্যপি সাহিত্য বিচারে নীরস, তবু তাঁর 'জোরোআস্টার' (১৮৮৫) এবং 'মার্জিওজ্ ক্রুসিফিক্স্' (১৮৮৭) ফ্রেঞ্চ-আকাদেমি দ্বারা সম্মানিত হয় এবং আমেরিকার গল্প-বুভুক্ষু পাঠকসমাজ সাগ্রহে তাঁর বইয়ের সংস্করণগুলি নিঃশেষে পড়ে তাঁকে ধনী হতে সাহায্য করে।

ডীন হাওয়েলস্, বেলামি, এঁদের কথা স্মরণ ক'রে যাঁরা সাহিত্যে বাস্তবতা আনতে আগ্রহী হলেন তাঁদের মধ্যে জন উইলিআম ডি ফরেস্ট (১৮২৬-১৯০৬) স্মর্তব্য। তাঁর 'মিস্ রাভেনেলস কন্ভারশান ফ্রম সেশেসান টু লয়্যালটি'-কে (১৮৬৭) 'প্রথম বাস্তব চরিত্রে'র উপস্থাপক বলে প্রশংসা করা হয়। এর নায়িকা মিসেস ল্যারিউ তথাকথিত 'আদর্শ রমণী' নন। তিনি আমেরিকার সাহিত্যের অন্যান্য 'ভিক্টোরীয় ও আদর্শীকৃত' কৃত্রিম চরিত্রদের চেয়ে ব্যতিক্রম। তিনি একজন 'bold wicked woman'. গৃহযুদ্ধে, ফরেস্টের চরিত্ররা নীতি ও আদর্শের নিষ্প্রাণ বাহক হতে চায় না, তারা যুদ্ধকে ঘৃণা করে। স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ককে তারা সহজে গ্রহণ করে। ফরেস্ট যেদিন এই উপন্যাস লেখেন, সেদিন তাঁকে সংরক্ষক দলের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। তাঁর লেখায় স্বাভাবিকতা ছিল, ছিল মানবচরিত্রের প্রতি সহানুভূতি এবং চরিত্র-চিত্রণে সহজ দক্ষতা। সমালোচকদের নিন্দায় অগত্যা তিনি স্বীয় ক্ষমতাকে জনপ্রিয় উপন্যাস রচনার কাজে অপব্যয় করেন। বাহাত্তর বছর বাদে তাঁর

উপন্যাসটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৯৩৯)। আমেরিকার পাঠক সমালোচকদের কাছে উত্তরোত্তর এর সাহিত্য মূল্য বর্ধিত হয়েছে এবং স্বীকৃতি পেয়েছে।

এড্‌গার অ্যালেন পো'র দুরতিক্রম্য প্রভাব থেকে আমেরিকার সাহিত্যিকরা মুক্ত হতে পারেননি। তাঁর অন্যতম অনুসারী ফিট্‌জ-জেম্‌স ও' ব্রায়েন (১৮২৮-১৮৬২) অতিপ্রাকৃতের রহস্যময়তাকে তাঁর ছোটগল্পে বিস্তীর্ণ করেন। 'দি লস্ট রুম', 'মাদার অফ পার্ল', 'হোআট ওয়াজ ইট' ইত্যাদি গল্পসমূহ আজও বিভিন্ন গল্প-সঞ্চয়ে সাগ্রহে সন্নিবেশিত হয়।

লুইস ওয়ালেস-কে (১৮২৭-১৯০৫) এ. জে. বিভারিজ 'মহান্ স্বপ্নদ্রষ্টা' বলে সম্মানিত করেন। সৈনিক ও আইনজীবি, রাজনীতিক এবং কবি-শিল্পী ল্যু ওয়ালেস ভ্রাম্যমান ইহুদীর অভিশপ্ত জীবনাশ্রিত 'দি প্রিন্স অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৯৩) উপন্যাস লিখে সাহিত্যের আসরে সম্মান পান। কিন্তু জগজ্জন তাঁকে 'বেনহুর : এ টেল অফ ক্রাইস্ট'-এর (১৮৮০) লেখক হিসাবেই চিনতে অভ্যস্ত। ধর্ম ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক এই রোমান্টিক উপন্যাসটি বহুদিন ধরে পৃথিবীর পাঠক সমাজকে আনন্দ দিয়েছে। বস্তুত, নিরাশ হৃদয়ে আশা সঞ্চার করবার কাজে 'বেনহুর'-এর আশ্চর্য সাফল্য দেখে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পৃথিবীর সকল লেখ্য ভাষায় অনুবাদ করেই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি ; 'ব্রেইল্'-এ অনুবাদ করে দৃষ্টিহীন পাঠক সমাজকেও 'বেনহুর' উপহার দেওয়া হয়েছে।

স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ সাইলাস উয়্যের মিচেল (১৮২৯-১৯১৪) মানুষের অবচেতন মনোজগৎকে 'ইন ওআর টাইম' (১৮৮৫) প্রমুখ উপন্যাসসমূহে উদ্‌ঘাটিত করেন। অতঃপর 'হিউ উইন : ফ্রি কোয়েকার' (১৮৯৭) নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি সম্যক খ্যাতি অর্জন করেন।

স্নিগ্ধ কৌতুকরসের স্রষ্টা ফ্রান্সিস্ রিচার্ড স্টকটন (১৮৩৪-১৯০২) প্রথমে প্রচার-শিল্পী এবং পরে শিশুসাহিত্যিকের ভূমিকায় ব্যস্ত থাকেন। বহু পরে প্রৌঢ় বয়সে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন এবং তাঁর লেখনীতে নির্মল কৌতুকরসের নির্ঝর প্রবাহিত হলো। একটি তরুণ দম্পতির নৌকাভ্রমণের

কাহিনী 'রাডার গ্রেঞ্জ' (১৮৭৯) এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজডুবির পর এক নির্জন দ্বীপে দুই মধ্যবয়স্কা মহিলার জীবনচিত্র 'দি কাষ্টিং অ্যাওয়ে অফ মিসেস লেস অ্যাণ্ড মিসেস অ্যালেশাইন' (১৮৮৬) স্টকটনকে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা দেয়। স্টকটনের উপন্যাস আজ আর তেমন সমাদর পায় না, তবে তাঁর সুবিখ্যাত 'দি লেডি অর দি টাইগার' (১৮৮২) ; 'দি ট্রান্সফার্ড ঘোসট্' ; 'লস্ট ড্রায়াড' প্রভৃতি কাহিনী আজও সমাদরের সংগে পঠিত হয়ে থাকে।

আমেরিকার সাহিত্যিকদের মধ্যে সাংবাদিকতা করেননি এমন ব্যক্তি বিরল। অ্যালবিঅন তুরজি (১৮৩৮-১৯০৫) সাংবাদিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর। দক্ষিণ স্টেট সমূহে বর্ণবৈষম্যনীতির ফলে নিগ্রোদের লাঞ্ছিত জীবন এবং ঘৃণ্য 'কু ক্লাক্স-ক্ল্যান্'-এর কার্যকলাপ, এই দুটিকে যুগপৎ উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছিলেন তুরজি। বর্ণবৈষম্যনীতির ভয়াবহতার দিকে সুধী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কাজটি উপন্যাসের মধ্য দিয়েই সহজ হবে এবম্বিধ বিভ্রান্তিতে ভুলেছিলেন তিনি। 'এ রয়্যাল জেন্ট্‌লম্যান' (১৮৮১), 'ব্রিক্‌স উইদাউট স্ট্র' (১৮৮০) এই সব উপন্যাসের উদ্দেশ্য মহান, কিন্তু লেখক মূলতঃ সাংবাদিক হবার ফলে বই দুটি নীরস বর্ণনা এবং উচ্চ বাদ-প্রতিবাদ সম্বলিত কথোপকথনে ভারাক্রান্ত হয়। পরে 'দি কন্টিনেণ্ট' (১৮৮২-১৮৮৪) নামক সাহিত্য সাপ্তাহিকে যোগ দিয়ে তুরজি বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে সাহসিক অভিযান চালনা করেন। এই শতকে সাংবাদিকতা-ধর্মী উপন্যাস বা 'ডকুমেণ্টারী নভেল'-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলায় এই শ্রেণীর উপন্যাসের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে এবং তুরজির উপন্যাস সমূহের প্রতি নতুন করে পাঠকের আগ্রহ আকৃষ্ট হয়েছে।

জীবনের রূঢ় ও নগ্ন সংবাদ পাঠককে জানাবার প্রয়োজন নেই, বরং ভাব-প্রবণতা, কৌতুক ও রোমান্সের উপহারেই পাঠকের প্রীতি সাধন করা প্রয়োজন এই বিশ্বাসে রিচার্ড হার্ডিং ডেভিস (১৮৬৪-১৯১৬) কথা-সাহিত্যের সকল দপ্তরেই গতায়াত করেন। জীবজগৎ নিয়ে লেখা 'দি বার সিনিস্টার' (১৯০২) এবং 'ভ্যান বিবার অ্যাণ্ড আদার্স' (১৮৯২) প্রমুখ কয়েকটি গল্প-সঞ্চয় আজও সন্ধানী পাঠকের কাছে ডেভিসকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

জীবনযাত্রাকে সুগম করতে আমেরিকার সাহিত্যিকরা জীবিকা থেকে

জীবিকান্তরে আন্দোলিত হয়েছেন এবং সাংবাদিকতায় প্রায় সকলকেই হাতে-খড়ি নিতে হয়েছে। জীবনধারণের জন্য নানা কাজে ব্যাপৃত থেকে হ্যারল্ড ফ্রেডরিক (১৮৫৬-১৮৯৮) জীবনের নগ্ন ও কুশ্রী রূপকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলেন। তিনি কাগজের সংবাদদাতা হয়ে লণ্ডনে যান, এবং সেখানে স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর প্রতি অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হন তিনি। প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তানদের প্রতিপালন করবার দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়। অগত্যা অর্থোপার্জনের জন্য তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসেন। 'শেথ'স ব্রাদার্স ওআইফ' (১৮৮৭) পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। অতঃপর, দীর্ঘদিন বাদে তিনি 'দি ড্যাম্‌নেশান অফ থেরণ ওয়্যার' (১৮৯৬) প্রকাশ করেন। ফ্রেডরিক জীবনেও বুঝতে পারেননি যে তিনি সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করবার মন-মেজাজ নিয়ে জন্মেছেন। জীবনের ব্যাধিগ্রস্ত রূপ তাঁকে ক্লিষ্ট করত। অগত্যা তিনি নারী ও সুরায় সান্ত্বনা খোঁজবার চিরন্তন প্রমাদ করেন। তাঁর অনুভূতি-কাতর সংবেদী মনের সবটুকু সঞ্চয় নিয়ে তিনি থেরণ-এর জীবনী লেখেন। এবং ন্যুইঅর্ক নগরীর তরুণ ধর্মযাজক থেরণ ওয়্যার-এর প্রেম, প্রলোভন ও অধঃপতনের হৃদয়গ্রাহী সংবাদ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার পাঠক-সমাজ সাগ্রহে শ্রবণ করে। চারবছর ধরে বইটির পঞ্চাশ হাজার কপি (তখনকার দিনে আশাতীত) বিক্রী হয় এবং ফ্রেডরিকের প্রতি পাঠকদের সাগ্রহ মনোযোগ সন্নিবিষ্ট হয়। 'আমি নিজেকে চিনতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি' সবিস্ময়ে বলেন ফ্রেডরিক। এবার থেকে সাহিত্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে স্থিতসংকল্প হন, কিন্তু তৃতীয় উপন্যাস শুরু করবার আগেই অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। সুস্থির চিন্তা-প্রয়োগের অভাব, দ্রুত ও অমনোযোগী লেখনী, ইত্যকার ত্রুটি ব্যতিরেকে 'থেরণ ওয়্যার' তার বিষয়বস্তুর গুরুত্বে এবং লেখকের প্রসাধন বর্জিত, সহজ, আবেগপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভাষার জন্য একটি বিশেষ স্থান পাবে। 'ধর্মযাজকের প্রেম ও পতনের কাহিনী যতবারই লেখা হবে, ক্ষমতাসম্পন্ন অস্থিরমতি ফ্রেডরিককে ততবারই স্মরণ করতে হবে এবং সেই স্মৃতিতে সর্বদাই বেদনা জড়িত থাকবে।'

হেনরী ব্লেক ফুলার (১৮৫৭-১৯২৯) রোমান্টিক এবং বাস্তববাদী, দু'ধরনের উপন্যাসেই শিক্ষানবিশী করেন। তাঁর রোমান্টিক উপন্যাস সমূহের নাম কেউ মনে রাখেনি। সমাজের ধনী শিল্পপতিদের জীবনের বাস্তব-সংবাদ পরিবেশনেই ফুলারের দক্ষতা সম্যক পরিস্ফুট। শিকাগোর ধনী শিল্পপতিদের মূঢ় দাম্ভিকতা

টাকার জোরে সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হবার বাসনা, তাদের ভৃঙ্গ-স্বভাব পুরুষ এবং প্রজাপতি-চরিত্রা রমণীদের অসার জীবনযাত্রা—এইগুলি ফুলার-এর 'ক্লিফ ডুয়েলার্স' (১৮৯৩) উপন্যাসে জীবন পরিগ্রহ করে এবং ফুলার সম্যক প্রশংসিত হন। দীর্ঘদিন বাদে, হলিউডের অন্তঃসারশূন্য রঙীন জীবন নিয়ে তিনি 'নট অন দি স্ক্রীন' (১৯৩০) লেখেন। ফুলারের খ্যাতি প্রধানত এই দু'খানি বইকে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে।

বিপদবহুল রোমাঞ্চকর জীবনের পথে আমেরিকার সাহিত্যিকরা নিত্য পথিক। জ্যাক লণ্ডন-এর (১৮৭৬-১৯১৬) জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানলে তাঁকে হেমিংওয়ে প্রমুখদের পূর্বসুরী মনে হবে—বিপজ্জনক জীবন-প্রেমী হেমিংওয়ে। জ্যাক লণ্ডনের প্রথম এবং বিখ্যাততম বই 'দি কল অফ দি ওআইল্ড্' প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। 'বাক' নামক কুকুর এর নায়ক। সে বন্য কুকুর। মানুষের সংস্পর্শে এসে সে দেখে মানুষের সভ্যতার আবরণের নিচে 'রক্তের বদলে রক্ত'র চিরন্তন নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। অতএব সে বন্য নেকড়ে দলের সংগে অরণ্যে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে। এই উপন্যাস লেখবার আগেই জ্যাক লণ্ডন নাবিক, অয়স্টার সংগ্রাহক, নিঃসম্বল স্বর্ণান্বেষী—একটির পর একটি কাজে দশহাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করেছেন। বন্যজন্তু এবং বন্য প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সংগ্রহ-শালাকে তিনি সমৃদ্ধ করেন। প্রকৃতির বন্য ও আদিম রূপের জয়গানে তিনি মেলভিলের আত্মিক অনুসারী। নিজে সুরাশক্তিতে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে তিনি অ্যাল্‌কোহলিজম নিয়ে 'জন বার্লিকর্ন' (১৯১৩) উপন্যাস রচনা ক'রে এই বিষয়ক উপন্যাস-সমূহের প্রথম ঔপন্যাসিক হবার খ্যাতি অর্জন করেন। নিপীড়িত মানবের প্রবক্তারূপে প্রচারধর্মী উপন্যাসগুলি তাঁর বিফল হয়। অতঃপর 'জেরি অফ দি আইল্যাণ্ডস'-এ (১৯১৭) তিনি একটি গৃহপালিত কুকুরের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। জীবিতকালে সুবিপুল জনপ্রিয়তা তাঁকে আশ্রয় করে কিন্তু তারপর তিনি ক্রমে পাঠকের অনুগ্রহ থেকে দূরে সরে যান। অদ্যাবধি জ্যাক লণ্ডনকে 'বন্য প্রাণী' জগতের এক আশ্চর্য লিপিকার রূপে প্রশংসা করা হয়। 'হোয়াইট ফ্যাঙ' (১৯০৬) তাঁর অন্যতম সুবিখ্যাত উপন্যাস।

ডেভিড গ্রেহাম ফিলিপস (১৮৬৭-১৯১১) জীবিতকালে যে সব উপন্যাসের

জন্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তাদের নাম আজ পুঁথির পাতায় নির্বাসিত। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'সুজান লেনক্স : হার ফল অ্যাণ্ড রাইজ' (১৯১৭) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। দেহোপজীবিনী সুজান লেনক্স তার প্রণয়ীদের সাহায্যে কেমন নিচু থেকে উপরে উঠল, উপন্যাসের বিষয়বস্তু তা-ই। পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে ফিলিপস বিচারকের মতো কঠোর ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে তথ্যসম্ভারের অপ্রতুলতা নেই কিন্তু অগভীর দৃষ্টিভংগী এবং অসংবদ্ধ চিন্তাধারা তাঁর রচনাকে খর্ব করেছে। বস্তী-জীবনের ভয়াবহতা, রাজনীতিক জুয়াচুরীর স্বরূপ এবং গণিকাজীবনের শোচনীয়তার যথাযথ চিত্র হিসাবে 'সুজান লেনক্স' সম্মান পেয়ে থাকে, যদিও নায়িকার চরিত্রটি বাস্তবানুগ নয়।

'কাউবয়'দের জীবনের চলচ্চিত্রায়ন এবং সাহিত্য-সংস্করণ দেখলে এই মনে হয়, ঘন ঘন গুলীচালনা করা, অপরূপ সুন্দরী নায়িকার কাছে শৌর্যের অবতার প্রতীয়মান হওয়া এবং সম্পূর্ণ বিনাকারণে অশ্বারোহণে দীর্ঘপথ অতিক্রম ব্যতীত উক্ত বীরদের জীবনে অন্য কোন কাজ নেই। আওয়েন উইস্টার-এর (১৮৬০-১৯৩৮) 'দি ভার্জিনিআন' উপন্যাস 'কাউবয়'দের সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য পরিবেশন করে না। তবে রোমান্স ও রোমাঞ্চের অকৃপণ ছড়াছড়ি বইটির পাতায় পাতায় এবং উইস্টারের গল্প-কথকতা মনোরম।

হেনরী জেমসের পরিশীলিত মানসিকতা, মার্জিত ব্যক্তিত্ব এবং অভিজাত স্বাতন্ত্র্য দ্বারা এডিথ হোআর্টন (১৮৬২-১৯৩৭) প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। হেনরী জেমসের অনুসরণে তাঁর লেখাতেও আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, তিনটি দেশের মানুষই ভীড় করেছে। তাঁর চরিত্ররাও মার্জিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। শ্রীমতী হোআর্টন নিজেও প্যারিসেই বসবাস করতেন এবং মাতৃভূমি আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত। 'ভ্যালি অফ ডিসিশান' (১৯০২) উপন্যাসে তাঁর অভিজ্ঞতার স্বল্পতার জন্য চরিত্রগুলিকে আদর্শীকৃত এবং কৃত্রিম বোধ হয় ; যদিও দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এই উপন্যাসটি পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল। 'ইথান ফ্রোম' (১৯১১) শ্রীমতী হোআর্টনকে সাহিত্যে চিরস্থায়িত্বের ছাড়পত্র দেয় এবং আমেরিকান সাহিত্যে 'স্কারলেট লেটার'-এর সমতুল্য আর এক ধ্রুপদী উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'ইথান ফ্রোম'-এর পটভূমি আমেরিকার মফঃস্বল শহর বা আধা-গ্রাম। যদিও

শ্রীমতী হোআর্টনের গ্রাম বা গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম, তবুও তিনি এই বইয়ে নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ রেখেছেন যে, প্রকৃত শিল্পীর পক্ষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকবে; কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব সেখানে তাঁর অন্তরের তৃতীয়নেত্রের অবলোকনে কল্পনাতেও আর এক জগৎ সৃষ্ট হতে পারে—এবং সে জগৎ সম্পর্কে সত্যাসত্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। শিল্পী নিজেই সে-জগৎ এবং সে-জগতের পাত্রপাত্রীকে নিজের অন্তরের অংশ দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলেন। অতএব তারা জীবনের চক্ষুগোচর-সত্য না হোক, শিল্পের সত্য প্রাপ্ত হয়। 'ইথান ফ্রোম'-এর বিষয়বস্তু, এডিথ হোআর্টনের লেখনীর অভ্যস্ত বিষয়বস্তু থেকে সুদূর এবং দুঃসাহসী পদক্ষেপ। গ্রামীণ যুবক ইথানফ্রোম তার বিবাহিতা স্ত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও তার পরিচারিকার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বে দ্বিধাদীর্ণ হয়। অবশেষে প্রণয়িনীর সংগে গৃহত্যাগের পর তুষার ঝটিকায় সে নিহত হয়। দুইটি রমণীই বেঁচে থাকে এবং এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, যা মৃত্যুরই সমতুল্য, তাকে হৃদয়ে বহন করে। শ্রীমতী হোআর্টন বলেন 'তারা চিরদিনের জন্য শবাধার হয়ে রইল, কেননা সেই প্রেমের মৃত স্মৃতিকে তারা হৃদয় থেকে উৎপাটিত করতে পারবে না, আমৃত্যু তাদের হৃদয় সেই স্মৃতিতে অন্ধকার ও তুষার-কঠিন হয়ে থাকবে।' এলিজাবেথীয় ট্রাজিডীর সমতুল্য এই বিয়োগান্ত কাহিনীটিতে মানবহৃদয়ের মৌলবৃত্তি সমূহের ঘাত-প্রতিঘাত সমুজ্জ্বল দৃঢ়তায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। ইথানফ্রোম ধর্মবিশ্বাসী ও শুচি-চিত্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি এবং সে সংশয়ের যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়ে ঈশ্বরকেই প্রশ্ন করে 'Thou, Thou givest this love, then why makest it a torment, a pain!' 'ইথানফ্রোম'-এর পটভূমি শহর থেকে দূরে প্রকৃতির আশ্রয়ে নির্বাচিত করবার স্বপক্ষে শ্রীমতী হোআর্টনের যুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ—'প্রকৃতির নির্জনতা ব্যতীত অন্য কোথাও, অন্য কোন পরিবেশে ইথানের চরিত্রের সমগ্র চেহারাটি পাঠকের চোখে প্রতিভাসিত হতো না—শিল্পী যদি ঝড়ে আন্দোলিত বনস্পতিকে আঁকতে চায়, সে যে যুক্তিতে আকাশের পটভূমি নির্বাচিত করে, আমিও সেই যুক্তিকেই অনুসরণ করেছি।' 'দি ওলড্ মেইড'-এ (১৯২৪) এবং 'বানার সিস্টার্স' (১৯১৬) এডিথ হোআর্টনের উল্লেখযোগ্য রচনা। শেষ বইটি 'হ্রস্ব উপন্যাস' তালিকাভুক্ত। 'দি ওলড্‌মেইড'-এ দুই অবিবাহিতা প্রৌঢ়া একই পুরুষে আসক্ত এবং একজন সেই পুরুষের ঔরসজাত কন্যার জননী। এই

বইয়েও পাপ, পুণ্য, প্রেম ও প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব লেখিকার উপজীব্য। ইতিমধ্যে বহু উপন্যাসে—এডিথ হোআর্টন পুনর্বার ধনী ও অভিজাত বুদ্ধিজীবি সমাজের নিরাপদ ও অভ্যস্ত বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। 'বানার সিস্টার্স' (১৯১৬) অন্যতম ব্যতিক্রম, যেখানে পোশাকের দোকানের মালিক দুটি দুঃস্থ মেয়ে এবং একটি অখ্যাত নোংরা গলির প্রতিবেশকে আশ্রয় করে তিনি একটি হার্দ্য ও মনোরম কাহিনী রচনা করেন। বিষয়বস্তু নির্বাচন কালে, স্বীয় আভিজাত্য এবং উচ্চ-রুচির দ্বারা পরিচালিত হবার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারলে এডিথ হোআর্টন আরো বড়, আরো মহৎ কিছু লিখতে পারতেন বলেই সমালোচকদের বিশ্বাস। এলিজাবেথীয় প্যাশন এবং বলিষ্ঠ লেখনী নিয়ে এডিথ হোআর্টন ড্রয়িংরুম বাসিন্দাদের জীবন লিখে নিজেকে অপব্যয়িত করেছিলেন। হেনরী জেমস্‌কে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের প্রতিভার প্রতি তিনি সুবিচার করেননি, এমন কি বহু গল্পের রচয়িত্রী এই লেখিকা 'রোমান ফিভার'-এর মতো ছোটগল্পও আর লিখতে পারেননি। যদিও এই গল্পে জেমসের ধারাকে তিনি খুব সার্থক ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, তবু গল্পের উপসংহারে যে নিষ্ঠুর উদ্‌ঘাটন আছে, তা জেমস্‌ অনুমোদন করতেন কি না সন্দেহ।

উইলিআম সিড্‌নী পোর্টার (১৮৬২-১৯১০) তাঁর ছদ্মনাম ও' হেনরীতে-ই পৃথিবীর পাঠক সমাজে সুপরিচিত। ঘটনা সন্নিবেশের চাতুর্য এবং নাটকীয়তা, সুবিধা মতো নিয়তির প্রবেশ ও প্রস্থান, সরল ও বৈশিষ্ট্যহীন চরিত্রসমূহের ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবার অভ্যাস, এই সব উপকরণ নিয়ে ও' হেনরী জনপ্রিয় গল্প লেখবার একটি 'ফর্মুলা' উদ্ভাবন করেন। এবং এই 'ফর্মুলা' তাঁকে জীবদ্দশায় জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে স্থাপিত করে। যদিও মৃত্যুর পরই তাঁকে সেই উচ্চসম্মানের আসন থেকে নামিয়ে এনে বিস্মৃতির অতলে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর চরিত্রসমূহের মধ্যে কোন গভীরতা নেই। তাঁর প্রায় সকল গল্পই নাটকীয় উপসংহারে শেষ হয়েছে। তাঁর গল্পে কোন গভীর চিন্তা বা দার্শনিকতা নেই এবং কষ্টকল্পিত সমাপাতন ও দুর্ঘটনার ঘন ঘন উপস্থিতি ব্যতীত তিনি গল্প লিখতে পারেন না। ম্যাগী যেদিন তার চুল বিক্রী ক'রে স্বামীর ঘড়ির চেন কেনে, স্বামী সেদিনই ঘড়ি বিক্রী করে স্ত্রীর চিরুনি কেনে (গিফ্‌ট অফ দি ম্যাগী)—যদিও সেদিন রুটি, কয়লা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনলেই তারা সুবুদ্ধির পরিচয় দিত। ভবঘুরে ভিক্ষুক (সোপী) শীতকালে জেলে যাবার

চেষ্টা ক'রে বিফল হয়—জেলের গরম কামরা ও পেটভরা খাবারের সম্ভাবনা তার জীবনে দূরেই থেকে যায়, কিন্তু চার্চের বাজনা শুনে সে যেই সৎ হবার সংকল্প করে, তখনি তাকে পুলিশ ভবঘুরে বৃত্তির জন্য ধরে। আমেরিকার সকল পেশা, সকল নেশার নরনারীকে নিয়ে এত লিখেছেন ও' হেনরী যে, তাঁর ক'টি কাহিনী তবু রসোত্তীর্ণ হয়েছে—তাতেই আশ্চর্য হতে হয়। এবং এই মুষ্টিমেয় কাহিনীর মধ্যে 'রোড্‌স অফ ডেস্টিনি'; 'এ ম্যুনিসিপ্যাল রিপোর্ট' ইত্যাদি স্মরণীয়। সমালোচকরা ও' হেনরীকে কোন শ্রেণীতেই ফেলতে চান না। তাঁরা বলেন 'Mechanised novelty'র এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায়নি; 'The world of O' Henry is an intellectual sahara'; এবং 'Not more than a dozen of his stories at most are memorable' তবু, জগতের চিন্তা-বিমুখ ও গল্প-সন্ধানী পাঠক ও' হেনরী পাঠে এখনো আনন্দ পেয়ে থাকেন।

বুথ টার্কিংটন (১৮৬৯-১৯৪৬) স্বল্প দিনের জন্যই উপন্যাস-সাহিত্যে মনোনিয়োগ করেন, 'পেন্‌রড' নামক দুষ্টু কিশোরের কার্যকলাপ বিবরণেই তাঁর খ্যাতি অধিক। তবু, ও' হেনরী অনুসরণে জনপ্রিয় সাহিত্যের দিকে না ঝুঁকে তিনি দুটি উপন্যাসে তাঁর আন্তরিকতার স্বাক্ষর রাখেন। 'দি ম্যাগনিফিসেণ্ট অ্যাম্বারসন্স' (১৯১৮), 'অ্যালিস্ অ্যাডামস'-এ (১৯২১) তিনি আমেরিকার যুবশক্তিকে আভিজাত্য বা মিথ্যা উচ্চাশার মোহমুক্ত হয়ে বাস্তবকে আলিঙ্গন করতে উপদেশ দেন। প্রথম উপন্যাসের নায়ক আভিজাত্যের অহমিকা বিস্মৃত হয়ে সমাজের নতুন-অভিজাত শিল্পপতির কন্যাকে বিবাহ করে এবং এই রূপকথা জাতীয় পরিশেষ কাহিনীটিকে জনপ্রিয়তা দিতে সমর্থ হয়।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্ক নরিস (১৮৭০-১৯০২) ধনী পিতা-মাতার সন্তান ছিলেন তাই বিভিন্ন পেশায় চংক্রমিত হবার প্রয়োজন তাঁর ছিল না, শুধু তাঁর নিজের মনে যে অতৃপ্তি ও অস্থিরতার রণাঙ্গন তৈরি হয়েছিল তাকে সাহিত্যে বা শিল্পে উপযুক্ত প্রকাশের পথ দেওয়ার জন্য তাঁকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্সের ছবি আঁকার স্টুডিও, আফ্রিকার বুঅর রণক্ষেত্র ইত্যাদিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছিল। পরিশেষে, সকল পরিক্রমার শেষে তিনি এক প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত হন। থিওডোর ড্রেজার-এর 'সিসটার ক্যারী'র

পাণ্ডুলিপিকে মুদ্রিত গ্রন্থে মুক্তি দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি নিজেও লিখতে শুরু ক'রে 'মোরান' (১৮৯৮), 'ম্যাকটীগ' (১৮৯৯), 'ব্লিক্স' (১৮৯৯), 'এ ম্যানস্ উওম্যান' (১৯০০), 'দি অক্টোপাস' (১৯০১) ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে ফেললেন এবং শেষ বইটি প্রকাশের সংগে সংগেই তাঁর চূড়ান্ত সাহিত্যিক স্বীকৃতি লাভ ঘটে। অচিরেই তিনি আমেরিকার জনমানসে তারুণ্যের প্রতীক এবং বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকরূপে চিহ্নিত ও সম্মানিত হতে থাকেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় মৃত্যু এসে পড়ায় সাহিত্যকে আর আপন জীবনের সত্য করে তোলা হয় না তাঁর। সহসা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয় এবং তার অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে নরিসের জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুর পর তাঁর শেষ বই বেরোয় 'দি পিট' (১৯০৩)। অস্থির, সততচঞ্চল নরিস জোলা, উগো এবং ডিকেন্স-এর প্রতি অনুরাগ পোষণ করতেন। এমন কি, তিনি একটি নিবন্ধে দ্যুমা, জর্জ এলিয়ট ও উগোর অনুকরণে উপন্যাসের প্রক্রিয়া পর্যন্ত প্রচার করেছিলেন। নিজেকে কিংবা সাহিত্যকে তিনি কখনোই খুব ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করেন নি, স্ব-ইচ্ছায়, আপনাকে অভিব্যক্ত করার জন্যই তাঁকে লিখতে হতো। বালকের মতোই তরল স্বভাবাপন্ন নরিস 'বয় জোলা' নামে সম্বোধিত হতে ভালবাসতেন। তার কারণ, জোলার ন্যাচারালিজম তাঁর রচনাকর্মেরও লক্ষ্যবস্তু ছিল।

নরিস-এর দ্বিতীয় উপন্যাসের নায়ক ম্যাকটীগ এক বিমর্ষ দন্ত চিকিৎসক। পোল্‌ক স্ট্রীটে এক ঘিঞ্জি বাড়িতে বহুজনের সংগে তার বসবাস। সে থাকে আর গিল্টি করা খাঁচায় থাকে একটি ক্যানারি পাখী। সে-ই তার শ্রেষ্ঠ সংগী। ট্রিনা সিয়েপ্পেকে বিয়ে করল ম্যাকটীগ। ভাবল, বিয়ের পর তার ধর্ষকাম মনের অনেক অন্ধকার ইচ্ছাই অতঃপর দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না, ভাগ্য বিরূপ। লাইসেন্স না থাকায় সে চিকিৎসা করার অধিকার হারায় এবং ট্রিনা ক্রমে অর্থের প্রতি আসক্তি দেখিয়ে যখন মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে বসেছে তখন ম্যাকটীগ তাকে খুন করে স্বর্ণখনি অঞ্চলে পালিয়ে যায়। সংগে থাকে তার প্রিয় পাখীর খাঁচাটি। সেখানে ট্রিনার ভাই ও সে পরস্পর মারামারি করে। তারপর নির্জন মরুভূমিতে জলাভাবে সে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু মৃত্যুর দিকে এগোতে এগোতে, সেই সব ভয়ংকর মুহূর্তে ম্যাকটীগ গান শোনে, ক্যানারি পাখির গান। যদিচ তাঁর রচনা জোলার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং 'ম্যাকটীগ'-এর বহু চরিত্রই ডিকেন্স-এর চরিত্রদের

সংগে একাসনে মদ্যপানে বসতে পারে, তবু তাঁর তীব্র এবং তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ, অন্ধ আদিম প্রবৃত্তির প্রতি মানুষের স্বভাবজ ঝোঁককে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করতে পারার বিশেষ ভংগী, 'ম্যাকটীগ' উপন্যাসটিকে নগ্ন বাস্তবতার এক বিশেষ দৃষ্টান্তরূপে তৎকালীন আমেরিকান কথাসাহিত্যে গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পরিণত রচনা 'অক্টোপাস' অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক সম্পূর্ণ। ক্যালিফোর্নিআর চাষীরা যোজনব্যাপী প্রান্তরে সোনালী গম ফলায়। কিন্তু প্যাসিফিক ও সাদার্ন রেলরোড অক্টোপাসের মতো ক্ষুধার্ত হাত প্রসারিত করে সেই গমকে চালান দেয় এসিয়ায়। কৃষকরা তাতে বিক্ষুব্ধ হয়। প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন উন্মাদ হয়ে যায়। একজন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। একজন প্রাণ হারায়। এক কর্মচ্যুত ইঞ্জিনিঅর দস্যুবৃত্তি নেয় এবং দারিদ্র্যের ফলে এক কৃষকের মেয়ে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। অসংখ্য ঘটনা-সমাকীর্ণ এই উপন্যাসের কোথাও, নরিস-এর রচনার প্রসাদগুণে কাব্যিক সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়েছে, কোথাও বাস্তবতা বিভূষিত হয়েছে। নরিস দ্রষ্টার মতো প্রত্যয়ে এই উপন্যাসে শিল্প ও যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির ফলে প্রাতিস্বিক মানুষের দুর্গতির আভাস দিতে চেয়েছিলেন, তিনি জানতেন যন্ত্র মানুষকে একদিন বিপন্ন করবে। 'দি অক্টোপাস'-এর নায়ক কবি প্রেস্‌লির মুখে তিনি আপন ধারণাকে বিতীর্ণ করেছিলেন, 'the individual suffers, but the race goes on.' নরিস ধনতন্ত্রের স্বরূপ বোঝেন না, এমন অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছিল। কারণ সমালোচকদের মতে 'দি অক্টোপাস'-এর কোন কোন চরিত্র আপাত-বিরোধী। যে রেলরোডের উন্নতি কৃষকদের জীবনে অভিশাপ আনল, তার প্রেসিডেণ্ট এক পরম দয়ালু চরিত্র হন কি করে? কিন্তু নরিস প্রচারধর্মকে জয়যুক্ত করতে চান নি, তিনি মানুষের ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। কারণ, ব্যক্তিক মানুষই তাঁর কাছে প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল। প্রাতিস্বিকতার দুঃসহ যন্ত্রণা ও বেদনা তিনি বুঝতেন, তাঁকে তা পীড়িত করত। স্বল্প জীবনের অন্তকালে তাঁর লেখায় যে জীবননিষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয়েছিল, সেই জাতীয় জীবননিষ্ঠাই সাহিত্যে প্রকৃত সৌন্দর্যদান করে, একথা ডীন হাওয়েল্‌সও বিশ্বাস করতেন। তাই, ডীন হাওয়েল্‌স মন্তব্য করেছিলেন, নরিস হচ্ছেন সেই জীবনরসিক সাহিত্যশিল্পী, যাঁরা 'সকল প্রকার মানুষের সংগেই সমান আত্মীয়তা অনুভব করেন, এবং যেখানে অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণা, যেখানে নিষ্ঠুর ভাগ্যের সংগে আত্মার সংগ্রাম—সেখানে তাঁরা মানুষের মধ্যে উঁচু বা নিচুর পার্থক্য করেন না।' নরিস

তাঁর সময়কালে সমালোচকদের কৃপালাভ করেন নি, তাঁর বাস্তবতার অভিলাষকে বরদাস্ত করেন নি তাঁরা। কিন্তু পরে, আমেরিকার কথাসাহিত্যে নরিস-এর জন্য এক প্রশস্ত ও সম্মানিত স্থান রচিত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিআর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নিয়ে 'দি পিট' ব্যতীত আর একটি বই লেখার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু মৃত্যু ত্বরান্বিত হওয়ায় তিনি আর সময় পান নি। 'দি পিট'-এর গুণগত স্বল্পতা হতাশ করে না পাঠককে, কারণ ফ্র্যাঙ্ক নরিস তাঁর অপরিমেয় শিল্পবোধ দিয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন।

উইন্স্টন চার্চিল (১৮৭১-১৯৪৭) আর এক জনপ্রিয় লেখক, যাঁর 'রিচার্ড কারভেল' (১৮৯৯) এবং 'দি ক্রসিং' (১৯০৪) প্রমুখ রোমান্স বিগত একদিনের গল্প-সন্ধানী পাঠকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

দক্ষিণ থেকে যে সব লেখক ও শিল্পীর উদ্ভব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এলেন গ্লাসগো (১৮৭৪-১৯৪৭) অন্যতম জীবনশিল্পী, যাঁর রচনা সমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। দক্ষিণের অতীত ইতিহাসের রোমন্থনেই এলেন গ্লাসগো তৃপ্তি অনুভব করেন। কিন্তু তিনি সচেতন শিল্পী। তিনি বোঝেন যে, অতীতের সব কিছুকে গৌরব ও রোমান্সে বর্ণোজ্জ্বল করলে বাস্তব-বিমুখিতার পরিচয় দেওয়া হবে। তাই তাঁর লেখায় স্মিত কৌতুক এবং পরিচ্ছন্ন বিদ্রূপ এসে মিলিত হয়। 'দি রোমান্টিক কমেডিআন্স' (১৯২৬) উপন্যাসের নায়ক জজ ব্ল্যাণ্ড, স্ত্রীকে সমাধিস্থ করবার সময়ে, গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করে, দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের আদর্শ অনুযায়ী, সে-ও তার স্ত্রীকে গভীর ভালবাসতো। তাদের দাম্পত্যজীবন কতকগুলি চিরায়ত মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করে সুখী হয়েছিল। এই দাম্পত্য-জীবনকে আদর্শ বলা হচ্ছে কেন, তা বলতে গিয়ে প্রৌঢ় জজ ব্ল্যাণ্ড বলে—'We used to have polite conversation.' লেখিকা এখানে ব্যঙ্গচ্ছলে একটি ট্রাজিডীকেই উদ্‌ঘাটিত করেন। দুই আত্ম-প্রতারক স্বামী-স্ত্রী বিশ বছর ধরে কেতাদুরস্ত আলাপ করেছে এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে, তারা এক আদর্শ দাম্পত্যজীবনের নিদর্শন নির্মাণ করছে। পরিণামে জজ ব্ল্যাণ্ড একটি লঘুচিত্ত মেয়েকে সহসা ভালবেসে ফেলে। দক্ষিণের দেউলিয়া শ্বেতাঙ্গ-সমাজ পুরনো শিভ্যাল্‌রি ইত্যাদি আঁকড়ে ধরে চলবার চেষ্টা করে, নিজেদের অজান্তেই নিজেদের করুণভাবে হাস্যাস্পদ করে তুলছে,—তাদের সেই আচরণ দেখে

হয়তো হাসি পায়। কিন্তু তারা একটি বৃহৎ ট্রাজিডীকেও বহন করছে—কেননা তারা এত শূন্য, এত নিঃশেষিত যে শিভ্যাল্‌রি, বীরত্ব ও মহত্ব, ইত্যাদির ভাণ না করলে তাদের জীবনে বাঁচবার অর্থই হারিয়ে যাবে। অতএব জেনেশুনেই তারা তাসের দেশের তাস-মানুষদের মতো বাঁচবার ছল করছে। এই আত্মরতিকে সকরুণ ব্যংগের সংগে এলেন গ্লাসগো 'দে স্টুপ্‌ড টু ফোলি' (১৯২৯); 'ভার্জিনিয়া' (১৯১৩) ইত্যাদি উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অবশ্যই এলেন গ্লাসগো গোঁড়া ভার্জিনিয়ান। বাস্তবের কোন কোন রূঢ় সত্য থেকে জোর করেই তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেন। তাঁর উপন্যাসাবলী পাঠে এমন বিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক যে, দক্ষিণে যেন ভয়াবহ বর্ণবিদ্বেষ প্রথা নেই; নিগ্রোরা যেন কায়মনে শ্বেতাঙ্গ-প্ল্যান্টারদের প্রভুত্বের দিনেরই জয়গান গায় এবং অনুগত চাকর, রাঁধুনী বা ড্রাইভার হিসাবে মৃত্যুর সময়ে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দিকে চেয়ে থাকতে পারলেই যেন কৃতার্থ হয়। তাঁর 'ডেলিভারেন্স' (১৯০৪) উপন্যাসের নায়িকা এক অন্ধ বৃদ্ধা কুড়ি বছর ধরে এই মিথ্যা বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকেন যে, 'সাউথ কন্‌ফেডারেসি' যুদ্ধে জিতেছে এবং ক্রীতদাসপ্রথা বন্ধ হয় নি। হৃতদরিদ্র পরিবারটি এই 'আদর্শ ভ্রান্তি' বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শিশুদের বঞ্চিত করে তাঁকে মুরগী ও পোর্ট-মদ্য জোগায়। 'it has left economics out of account', তবু বইটি প্রশংসিত হয়। ক্রমে এলেন গ্লাসগো জীবনাশ্রিত হন এবং অতীতের হার্দ্য রূপায়ণ ত্যাগ করে তিনি দুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে উপন্যাসে স্থান দেন। 'দি শেল্‌টার্ড লাইফ' (১৯৩২) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে পরিচিত। এর নায়িকা বয়ঃসন্ধির আবেগে যে পুরুষকে ভালবাসে, তারই মৃত্যু ঘটায় এবং এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সে নারীত্বের পরিণতিতে উত্তীর্ণ হয়। শ্রীমতী গ্লাসগোর স্থান এডিথ হোআর্টন, উইলা ক্যাথার, এঁদের সংগে এবং তাঁর মার্জিত প্রকাশভঙ্গী, চিত্রময় ভাষা, পরবর্তী সাহিত্যিকদের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।

গার্ট্রুড স্টাইন (১৮৭৪-১৯৪৬) ফ্রান্সের ওরোর দুপ্যাঁ-র (জর্জ সাঁদ) মতো—সাহিত্য-কৃতির চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়েই অধিকতর সমুজ্জ্বল। ফ্রান্সের সেই বিদ্রোহিনী লেখিকা তাঁর ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ প্রেমের জন্য সমধিক বিখ্যাত। সেদিক থেকে গার্ট্রুড স্টাইনের খ্যাতি আরো স্থায়িত্ব দাবী করতে পারে। কেননা, তাঁর খ্যাতি কোন বিশেষ নাম বা বিশেষ ব্যক্তির সংগে সম্পর্ককে আশ্রয়

ক'রে নয়। তাঁর খ্যাতি তাঁর পারী নগরীর বিখ্যাত সালোঁর জন্য—যেখানে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষিরা যাতায়াত করতেন। পিকাসো ও মাতিসের সংগে শ্রীমতী স্টাইনের বন্ধুত্ব ছিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও পরে আমেরিকান তরুণদের জন্য গার্ট্রুড স্টাইনের দ্বার ছিল অবারিত। তরুণ প্রতিভাকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে তিনি সদাই প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে বিশ্বসাহিত্যে দুটি নাম সংযোজিত হতে পেরেছে—শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। গার্ট্রুড স্টাইন স্টাইল ভাষা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং কবিতা, আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণ লিখে উইণ্ড্যাম ল্যুইস, এজরা পাউণ্ড প্রভৃতি কর্তৃক প্রশংসিত হন। তাঁর উপন্যাস 'লুসি চার্চ অ্যামিয়েবলি' (১৯৩০) এবং ডাচেস অফ উইণ্ডসর-এর জীবনাশ্রিত 'আইডা' (১৯৪১) যদিও প্রশংসিত হয় তবু সেগুলি দুর্বল, অনুল্লেখ্য রচনা। তাঁর 'থ্রি লাইভ্‌স' (১৯০৯) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মেলাংকৃথা' গল্পটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটি জড়বুদ্ধি নিগ্রো মেয়ে আড়ষ্ট, বুদ্ধিহীন ভাষায় তার জীবনী বলছে। মনোযোগ বিশ্লেষণের এক আশ্চর্য 'ডকুমেণ্ট' বলা হয়েছে একে এবং পরে এ ধরনের অন্যান্য উপন্যাসের তিনিই পথিকৃৎ, এমন সসম্মান স্বীকৃতিও শ্রীমতী স্টাইন পেয়েছেন।

'আমার মনের বাড়ির দরজার সামনে অনেক গল্পের ভীড় জমে থাকে। তারা গুণগুণ করে, কাঁদে, তারা শীতে মরে, ক্ষুধায় মরে।' শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন (১৮৭৬-১৯৪১) একদা বলেছিলেন একথা। কারণ, প্রথমত এবং প্রধানত শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন মানুষে আগ্রহী। যে-মানুষ জীবনের উষর পথে বেঁচে থাকবার আবশ্যিক প্রয়োজনে পরিক্রমা সারতে সারতে বহুবার হোঁচট খায়, বাধাপ্রাপ্ত হয়, যে-মানুষের সত্তা প্রতিকূল শক্তিতে হয় পঙ্গু এবং পিষ্ট, তিনি তাদেরই বিশ্বস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করতে চান। তাই তাঁর মনে গল্প জমে, মানুষের গল্প। তিনি গভীর অনুকম্পায় এবং গম্ভীর সহানুভূতিতে তাদের চরিত্র উন্মোচন করেন। মানুষের বাইরের আচরণকে তিনি কোনদিন গুরুত্ব দেন নি, তার আপাতরম্যতাকে ভেদ ক'রে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি অন্তরমহল পর্যন্ত সুদূরপ্রসারী হতে চেয়েছে। সেই নিভৃত এবং তমসাচ্ছন্ন মানসলোকে তিনি আলো জ্বালাতে চেয়েছেন, উদ্‌ঘাটিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন মানুষের সত্যকার রূপ, সত্যকার প্রতিবেশ। কিন্তু তিনি বিচলিত হন নি। আবরণ উন্মোচনের পর যদি কোন

মালিন্য, কোন বীভৎসতা, প্রবৃত্তির কোন দীনতা আবিষ্কৃত হয়ে থাকে তা তিনি নিঃসংকোচে এবং স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন, নিরুদ্বিগ্ন প্রত্যয়ে। কেননা তিনি জানেন মানুষের স্বভাবধর্মই তাই, সম্পূর্ণ সমান্তরাল মানুষ বিরল। শরুড্ অ্যাণ্ডার্সনের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ঈর্ষাজনকভাবে ধনী। তিনি নানা পেশায় চংক্রমিত হয়েছেন। বহুকাজ ধরেছেন এবং ছেড়েছেন। তাঁর সেই বহুবিস্তৃত এবং বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর বহু রচনাতেই উপস্থিত আছে। ১৯১৬ থেকে ১৯২১ অবধি শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। স্বীকৃতি এবং পরিচিতির ভারবাহী হতে থাকেন তিনি তখন থেকেই ধীরে ধীরে। তবু, তাঁর অনেক নিপুণ গল্পই হয়ত অখ্যাত পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত অবস্থায় অগোচর থাকত, যদি না তাঁর পরম বান্ধব পল রোজেনফেল্ড সেগুলিকে একত্রিত করে পাঠকদের দৃষ্টি তলব (১৯৪৭) করতেন। 'উইণ্ডি ম্যাকফার্সন'স সন' (১৯১৬) শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন-এর প্রথম উপন্যাস। 'ডার্ক লাফটার' (১৯২৫) এবং 'পুওর হোআইট' (১৯২০) নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস দুটির তিনি গোড়াপত্তন করেছিলেন ভালই কিন্তু অতঃপর বিবিধ জটিলতার গ্রন্থিমোচনে উদ্যোগী হওয়ায় তিনি নিজেই যেন বিভ্রান্ত এবং অবিন্যস্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া যৌনকামকে অতিতর প্রাধান্য দান করতে গিয়ে এই রচনা এবং তাঁর অন্যান্য অনেক উৎকৃষ্ট রচনার আবহাওয়াকে তিনি ঘোলাটে করে তুলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন তাঁর স্মৃতিকথায় যৌনকামকে স্পষ্ট সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, 'We wanted the flesh back in our literature, wanted directly in our literature the fact of men and women in bed together, babies being born, we wanted the terrible importance of the flesh in human relations also revealed again.' উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পে তাঁর কৃতিত্ব অধিক। 'ওয়াইনস্‌বার্গ ওহিও' (১৯১৯) শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন-এর বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। উপন্যাসের রসাস্বাদ পাওয়া যায় এতে, কারণ জর্জ উইলার্ড নামক প্রধান চরিত্রটি অনেক গল্পতেই উপস্থিত থাকে এবং আশ্চর্যভাবে ঐক্য স্থাপন করে গল্পগুলির মধ্যে। যোগসূত্র রচনা করে। উইলার্ড-এর চোখ দিয়েই লেখক বহু মানুষের মিছিল দেখিয়েছেন। কিন্তু উইলার্ড স্বয়ং সেই পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়, কেননা, সে জানে পরিবেশই ওইসব ব্যর্থ, বিমূঢ় এবং বিষণ্ণ নর-নারী সৃষ্টি করেছে। আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতা ও সম্প্রসারণতার বিষময় ফল সাধারণ মানুষের জীবনকে কেমন

করে গ্রাস করে ফেলছে, সে বিষয়ে শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন বরাবরই সচেতন ছিলেন। 'আই অ্যাম এ ফুল' এবং 'আনলাইটেড ল্যাম্প' গল্প দুটিতে মনুষ্যধর্মের রহস্যকে আপন অনুভবের ঐশ্বর্যে তিনি সার্থকতার সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর অন্য তিনটি গল্পগ্রন্থের নাম 'দি ট্রাআম্‌ফ অফ দি এগ্' (১৯২১), 'হর্সেস অ্যাণ্ড দি মেন' (১৯২১) এবং 'ডেথ ইন দি উড্‌স্' (১৯৩৩)। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে যাঁরা আমেরিকার কথাসাহিত্যকে আপন উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবান্বিত করেছেন শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, তিনি গদ্য রচনার চেয়ে পদ্য রচনাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন। অনেকটা লোক-কবির মতো, যিনি জীবনের এবং মানুষের খণ্ড খণ্ড চিত্র এঁকেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছেন ফ্রয়েডে।

উইলা ক্যাথার (১৮৭৬-১৯৪৭) মুখ্যত নন্দনমূল্যে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সমাজনীতির অবস্থায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বরং অতীত চেতনা সম্পর্কে তিনি দুর্বলতা পোষণ করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, আধুনিক পৃথিবী অতীতের এক সস্তা সংস্করণ মাত্র। তাই, ইতিহাস তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে, তিনি অতীত জীবনেই যাবতীয় ইষ্ট খুঁজে পেয়েছেন। সেই হৃত সময় আর এই ধৃত কালের মধ্যে যে আদর্শের সংগ্রাম, তাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। ভার্জিনিআ স্টেট-এর নেব্রাস্কায় উইলা ক্যাথার-এর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। সেখানকার প্রতিবেশে ফরাসী, নরওয়েজীয় ও ড্যানিশ সভ্যতার প্রভাব ছড়ানো। সেখানকার মানুষ ফ্রাঞ্জ লিজ্ৎ-এর বাজনা বাজাতো, তার সুর বাতাসে বিস্তৃত হয়ে থাকত। সামান্য দূরে, একটি খামারে ন্যুট হামসুন কাজ করতেন। এই সব স্মৃতিরঞ্জিত মুগ্ধ অতীতকে, পুনরুত্থিত করাই তাঁর লেখার প্রধান প্রণালী…'simply the pleasure of recapturing in memory the people and places I had believed forgotten.' উইলা ক্যাথার বাস্তবতার ধার ধারতেন না বলে তাঁর লেখার ভংগীতে বিশেষার্জিত একটি পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান ছিল, সংক্ষিপ্তভাবে এবং অত্যন্ত চকচকে ভাষায় তিনি কাহিনীর বর্ণনা দিতেন। সেদিক থেকে হেনরী জেমস্-এর পাঠ নেওয়া তাঁর সার্থক হয়েছিল। ভার্জিনিআর অধিবাসীদের মধ্যে মানবহিতৈষণার কাজে অগ্রণী হবার যে আগ্রহ দেখা যেত, শ্রীমতী ক্যাথার তাঁর 'আলেকজাণ্ডার ব্রিজ' (১৯১২), 'ও পাইওনীআর্স'

(১৯১৩), ‘সংগ্ অফ দি লার্ক’ (১৯১৫) ইত্যাদি উপন্যাসে নানা ভাবে, নানা চরিত্রের মাধ্যমে সেই তথ্যটুকু জ্ঞাত করেছিলেন। তখনো পর্যন্ত তাঁর ভাবজগৎ ও বহির্জগতে কোনরকম অতৃপ্তি ও অস্থিরতা সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠে নি। তিনি তাঁর গৌরবময় অতীত স্মৃতিতেই সম্মোহিত হয়ে আছেন। কিন্তু অতঃপর তাঁর স্বপ্নভংগ হতে দেরি হল না। তিনি দেখলেন, শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের সংগে সংগে, যন্ত্রের কঠিন বেষ্টনীতে এবং অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে তাঁর পরিচিত পৃথিবীর চেহারা আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। বদলে গেছে মানুষ, সমাজনীতি। কোন কিছুতেই আর তিনি সংগতি খুঁজে পান না। তখন তাঁর মনে তিক্ততা এল, আশাভংগের অবসাদ তাঁকে বর্তমান সম্বন্ধে আতংকিত ও উন্নাসিক ক'রে তুলল। তিনি তাঁর সেই হতাশ এবং বিক্ষুব্ধ মনোভাবকে অগোপন করলেন ‘এ ভাগ্নার ম্যাটিনী’ ; ‘দি স্কাল্পটার্স ফিউনারাল’ ; ‘ওআন অফ আওয়ার্স’ ইত্যাদি কাহিনীতে। প্রথম গল্পটিতে নায়িকা সংগীতানুষ্ঠানের পর কনসার্ট হল থেকে বেরোতে চাইল না। ‘না, ক্লার্ক, আমি যাব না, যেতে চাই না।’ ক্লার্ক অবাক হয়ে হেতু জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটি জবাব দেয় ভাগ্নার-এর মহাসংগীত শোনবার পর সে রাস্তায় বেরিয়ে কুশ্রী শহরের রুগ্ন, খর্ব গাছের চারা আর আবর্জনা খুঁটে-খাওয়া টাকি দেখতে প্রস্তুত নয়। সেই নির্মম নগ্ন বাস্তবতাকে সে সহ্য করতে পারবে না। শ্রীমতী ক্যাথারের পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে বোধহয় ‘মাই আন্টোনিয়া’ (১৯১৮) উপন্যাসটিই নানা কারণে বিশিষ্ট। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের মধ্যে ‘এ লস্ট্ লেডী’ (১৯২৩) এবং ‘দি প্রফেসার্স হাউস’ (১৯২৫) শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে থাকে এবং উপন্যাস দুটি অতিমাত্রায় প্রতীকাশ্রয়ী। ‘এ লস্ট লেডী’তে তিনি পুরাতন বর্ণাঢ্য পশ্চিমকে সংমিশ্রিত করেছেন আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে। আধুনিক কাল অর্থাৎ স্বার্থসর্বস্ব হৃদয়বৃত্তি বর্জিত, অন্ধ উচ্চাভিলাষী মানুষের কাল। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, আগে, পাইওনীঅরদের সাহসের সংগে অর্জিত দেশগুলিতে এখন নতুন যুগের হৃদয়হীন, ব্যবসায়ী-মনোভাবাপন্ন, অসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মানুষেরা কেমন করে ছড়িয়ে পড়ছে, গ্রাস করছে। আইভি পিটার্স এই শেষোক্ত দলের প্রতিনিধি। মারিআন ফরেস্টার তাঁর স্বামীর প্রতি সকল বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আইভি পিটার্স-এর ভয়ংকর ছলনাজাল থেকে রেহাই পেল না। পিটার্স তার অপ্রতিরোধ্য ক্রূর ব্যক্তিত্বে একটু একটু ক'রে ফরেস্টারকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। ‘দি প্রফেসার্স হাউস’-এ সেই ছদ্মবেশী শয়তান আইভি

পিটার্স' আর বাইরে রইল না, এবার সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। একটা পরিবারের অনেকের মধ্যে সে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। অধ্যাপক গডক্রে সেণ্ট পিটার-এর স্ত্রী, মেয়ে, জামাই সবাই আধুনিক কালের স্থূল অর্থলোভ এবং সুনিশ্চিত দুর্নীতির মহাব্যাধিটিতে ভুগছে। আশু সর্বনাশকে করছে প্রকটিত। এই উপন্যাসে শ্রীমতী ক্যাথার তাঁর আপনকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বর্তমান থেকে এবার আর মুখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। যদিও ইতিহাসের কাছে তিনি সমর্পিত-চিত্ত তবু ক্রমেই তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, অতঃপর মাটিতে পা রেখে, কালের হাওয়ায় তাঁকে বাস করতে হবে, শুধুই অতীত বিহারে তাঁর সাহিত্যিক-সত্তাকে টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। যদিচ তাঁর অন্তিম এবং অযোগ্য রচনাগুলিতে ('লুসী গেহার্ট' ১৯৩৫ ; 'স্যাফাইরা অ্যাণ্ড দি স্লেভ গার্ল' ১৯৪০ ; 'ওল্ড বিউটি' ১৯৪৮) তিনি পুনর্বার অতীতে পলায়ন ক'রে স্বস্তি পেতে চেয়েছেন। উইলা ক্যাথার-এর মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন রচনাভংগী আমেরিকার কথাসাহিত্যে বেশি সুলভ নয়।

সাংবাদিকপ্রবণ বাস্তববাদে আমেরিকান উপন্যাসের আগ্রহ সাধারণত বেশি। গভীর ভাবস্পর্শী ও চিন্তাদিষ্ট রচনায় ঔপন্যাসিকদের বৈরাগ্য এবং অপক্ষপাত। আপ্‌টন বিআল সিন্‌ক্লেআর (১৮৭৮—) সেই রিপোর্টাজধর্মী বাস্তববাদিতায় বিশ্বাস করে এসেছেন বলে তাঁর রচনায় গোর্কির মতো একটা তীব্র শক্তি ও উদ্দীপনার স্পৃহা আবিষ্কৃত হয়ে থাকে যদিচ পরিশেষে বুঝতে বিলম্ব হয় না, তাতে শিল্পপ্রকরণ এবং রূপকারী মনের আয়োজন নেহাৎই কম। গোর্কির মতো তিনিও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যকাল সম্পর্কে আশা পোষণ ক'রে এসেছেন এবং এই বিশ্বাসটিকে বহন করতে তাঁর একটি মুখ্য চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছে যার সহায়তায় সিন্‌ক্লেআর তাঁর উপন্যাসে সোজাসুজি আপন উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে চেয়েছেন। আপটন সিন্‌ক্লেআর-এর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল ব্যাল্টিমোর ও ন্যুইঅর্কে। তারপর তিনি যখন কলম্বিআতে, যখন গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে বেরোন নি, তখনই প্রথম উপন্যাস লিখে তিনি মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। 'দি জাংগল' (১৯০৬) শিকাগোর ডক-গুদামকে কেন্দ্র ক'রে রচিত উপন্যাস। ডক-গুদামের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, মাংস প্যাক, বোঝাই আর রপ্তানী করার ব্যস্ত পরিবেশের তলায় তলায় যে কুৎসিত সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চলে, অন্ধকার গোপন রন্ধ্রে রন্ধ্রে গুণ্ডাবাজী আর দাঙ্গাবাজী যেভাবে

ব্যাপক হয়, সিন্‌ক্লেআর তাকেই নির্দ্বিধায় নগ্ন করেছিলেন। বইটিতে আর কিছু থাক বা না থাক, এর নৈতিক গভীরতাটুকু অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই উপন্যাসটি পড়ে পাঠকরা চমকিত হয়েছিলেন এবং সিন্‌ক্লেআর পেয়েছিলেন উত্তুঙ্গ পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা। ফলে, পরবর্তী রচনাধারায় তাঁকে আর অন্য কোন পন্থা অনুসরণ করতে হলো না, পূর্ব সাফল্যের নিয়ম-নির্দিষ্ট, ছককাটা পথকে আশ্রয় করাই তাঁর পক্ষে নিরাপদ ছিল। 'কিং কোল' (১৯১৭) উপন্যাসে উৎসাহের সংগে তিনি পুনর্বার বাস্তবকে প্রকট ক'রে পাঠকদের বিস্মিত করতে চাইলেন। এতে একটি ধনী খনি-মালিকের পুত্র সাধারণ শ্রমিকের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে কয়লাখনির হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। আসল অবস্থার অভিজ্ঞতা পায়। এমনি ক'রে আপটন সিন্‌ক্লেআর তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমেরিকার যা কিছু দুর্বলতা, যত কিছু গলদ, তার উপর নির্বিশংক আক্রমণ চালিয়েছেন। তাকিয়েও দেখেন নি, এই বাস্তববাদের অতি-উদ্যম শিল্পী হিসাবে তাঁকে কতখানি অধঃপতিত করেছে। তিনি দরিদ্র সর্বহারাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেছেন, প্রেম, ধর্ম ও রাজনীতির প্রচার-ধর্মিতার স্বরূপ তাঁর ক্ষমা পায় নি, সাক্কো ও ভ্যানজেত্তির প্রাণদণ্ডের পিছনে সরকারের স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচার কতটা প্রবল হয়েছে, এমন কি মোটরশিল্প ও সিনেমাশিল্পের ভিতরেও যে-চক্রান্ত রয়েছে তা-ও তাঁর দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়নি, সকল বিষয়েই তাঁর অভিমত অবগত হওয়া গেছে। কেবল শেষ দিকে 'ওআর্লডস্ য়েণ্ড' (১৯৪০); 'ড্রাগনস সীড' (১৯৪২; এই গ্রন্থে তাঁকে পুলিৎসার পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল), 'প্রেসিডেন্সিআল এজেণ্ট' (১৯৪৪) ইত্যাদি উপন্যাস-কর্মে তাঁর সাহিত্যিক-সততা এবং শিল্প-সত্তা আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রচারধর্ম আগের মতো ততটা উচ্চকিত হয় নি। তবু, আপটন সিন্‌ক্লেআর-এর সকল আন্তরিকতা সত্ত্বেও অনেক সময়েই তাঁর সাহিত্য যে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি, একথাও ঠিক। তাঁর বক্তৃতার চাপে শিল্পের দম বন্ধ হয়ে গেছে।

জেমস্ ব্র্যাঞ্চ ক্যাবেল (১৮৭৯-) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরিকতা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'জারগেন' (১৯১৯) এবং 'ফিগার্স অফ আর্থ' (১৯২১) উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হবার সংগে সংগে নিষিদ্ধ হবার উপক্রম হয়। কেননা ক্যাবেল স্বেচ্ছাচারী ভোগবাদিতা এবং যৌন-বিকারকে প্রচার করেছিলেন, যদিও বড় বড় কথা এবং তর্ক-বিতর্কের অভাব ছিল না বই দুটিতে। অশ্লীলতার

অপরাধে অভিযুক্ত হবার ফলে বই দুটির বহুল প্রচার হয়, বহু পাঠক জোটে। ক্যাবেলের অন্যান্য সাহিত্যপ্রয়াস অনুল্লেখ্য।

সিন্‌ক্লেআর ল্যুইস (১৮৮৫-১৯৫১) নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩০ সালে। তৎপূর্বে আমেরিকার অন্য কোন লেখক এই পুরস্কার পাননি। কিন্তু ১৯৩০ সালের অনেক আগেই তাঁর সম্পর্কে পাঠক সমাজে এসেছিল অনীহা। অজস্র অর্থ এবং খ্যাতি আমেরিকার অন্যান্য বহু লেখককেও বিড়ম্বিত করেছে। সিন্‌-ক্লেআর ল্যুইসও তার ব্যতিক্রম নন। সাহিত্যিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠ হবার পরও তিনি কখনো সাংবাদিকতা করতে গিয়েছেন, কখনো বা ব্রডওয়ে ও হলিউডে ছুটেছেন মোহাবিষ্ট হয়ে। পরিণামে, তাঁর লেখনী ক্রমেই শক্তি হারিয়েছে। অথচ প্রথম উপন্যাস 'মেইন স্ট্রীট'-তেই (১৯২০) ল্যুইস তাঁর ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ১৯০৫ সালেই তিনি উপন্যাসটির পরিকল্পনা করেন, পরিশেষে এক প্রকাশকের তাগিদে বইটি লেখা হয়। আমেরিকার ছোট-বড় সব শহরই যান্ত্রিক ছাঁচে ঢালা। তার বুক দিয়ে যে প্রধান রাস্তাটি থাকে, তাকে ঘিরে শহরের প্রতিপত্তিশালী মানুষরা বাস করেন। গফার প্রেয়রি এমনি এক ছোট শহর এবং ডাক্তার কেলিফর্ট ও তাঁর স্ত্রী ক্যারল সেই শহরের মেইন স্ট্রীট-এ বাস করে। তাদের জীবনযাত্রার যান্ত্রিকতাকে ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভাষায় বিদ্রূপ করেন ল্যুইস। ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপ ল্যুইস-এর লেখনীতে সহজে ধরা দিত। 'ব্যাবিট'-এর (১৯২২) নায়ক জর্জ ব্যাবিট মানুষ হিসাবে অতি সাধারণ। তার মানসিকতার দৈন্যকে উপহাস করেন ল্যুইস তবুও ব্যাবিটের চরিত্র লেখকের অজান্তেই শোচনীয় এক ট্রাজিডীর বাহক হয়। এবং 'ব্যাবিট'-এ তিনি যে প্রতিশ্রুতি দেখান, তা পুর্ণতা পায় 'অ্যারোস্মিথ'-এ। বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি ইহুদী ম্যাক্স গটলিয়ের এবং অ্যারোস্মিথের প্রথমা স্ত্রী লরার চরিত্র চিত্রণে ল্যুইস উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখান। লরা স্বভাবে জননী। স্বামীর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সে ক্ষমা করতে চায় এবং গটলিয়ের এক জীবনদর্শী ব্যক্তি, যে বলে 'compromise never helps, because it has no end.' কিন্তু জীবনের যান্ত্রিকতাকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে ল্যুইস নিজে জনপ্রিয় উপন্যাসের যান্ত্রিক ফর্মুলার দাস হয়ে পড়েন। তাই প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও যান্ত্রিকতা এবং সস্তা পরিণতি উপন্যাসটিকে ব্যর্থ করে। সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'অ্যারোস্মিথ'ই ল্যুইসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি ব'লে বিবেচিত হয়ে থাকে। বার বছর পরে ল্যুইসের

'ডড্স্বোআর্থ' (১৯২৯) প্রকাশিত হলো। এই উপন্যাসে ল্যুইসকে একেবারেই শূন্য এবং দেউলিয়া মনে হবে। ডড্স্বোআর্থ নামক ধনী আমেরিকান-এর স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক স্ত্রী ও তার প্রতি ডড্স্বোআর্থের নিষ্ফল আনুগত্য এই উপন্যাসের উপজীব্য। এই উপন্যাস পড়ে মনে হয় আমেরিকার পুরুষ ও রমনীরা যেন বয়ঃসন্ধির তরলতা কোনদিনই কাটাতে পারে না। সমগ্র উপন্যাসে লেখকের কোন গভীর চিন্তার স্বাক্ষর নেই। ল্যুইসের নিজস্ব কোন দর্শনও নেই, যে দর্শন ব্যতিরেকে কোন সাহিত্যিকই উপরিকতার অধিকারী হতে পারেন না। এবং ল্যুইসের সমগ্র সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করলে মনে হয়, কোনদিনই সৎ বা সুধী সাহিত্যিক হবার মানসিকতা তাঁর ছিল না, ছিল না তাঁর ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি দক্ষ গল্প-বলিয়ে, চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা রাখেন তিনি, এবং তাঁর ভাষাও প্রসাদ-বর্জিত নয়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে নেই গভীরতা, নেই দায়িত্ববোধ। আর এই সব বিচ্যুতির জন্য তাঁকে মস্ত দাম দিতে হয়েছে। পাঠকদের মন থেকে সরে গেছেন তিনি। এমন কি, তাঁর নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে তাঁর স্বদেশের সমালোচকই নির্দ্বিধায় রায় দিয়েছেন, 'His selection remains one of time's little ironies'.—Clarence Gohdes.

আমেরিকার সাহিত্যিকদের মধ্যে, সততার সংগে লেখক-জীবনযাপনের প্রতি অনীহা বিংশ শতকে বারবার দেখা যায়। তাঁরা বিচিত্র, রোমাঞ্চকর জীবনের ঘূর্ণাবর্তে নিজেদের হারান, এবং পরিণামে তাঁদের লেখনী হয় ক্ষতিগ্রস্ত। আমেরিকার জাতীয় হিউমরিস্ট রিং লার্ডনার (১৮৮৫-১৯৩৩) তার ব্যতিক্রম নন। রিং লার্ডনার এবং শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন তাঁদের সমসাময়িক সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং পাঠক সমাজ রিং লার্ডনারকে সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু লার্ডনার নিজে অস্থিরমতি এবং চঞ্চল ছিলেন। তাঁর চরিত্রে দ্বৈতসত্তা সর্বদাই পরস্পরকে আঘাত করেছে। লেখক রিং লার্ডনার সমাজ সচেতন, তীব্র বেদনাকে তিনি ঈষৎ শ্লেষের ভাষায় রূপ দিতে চান। অথচ তিনি স্নব নন। অতএব একেবারে নিচুমহলের মানুষদের নিয়েই তিনি গল্প রচনা করেন। ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি মানুষের মিথ্যাচার, অহংসর্বস্বতা, অর্থগৃধ্নুতাকে নির্মমভাবে কশাঘাত করেন। অপরদিকে তাঁর মধ্যে এক দায়িত্বহীন, সুখসর্বস্ব মানুষের বাস—যে সর্বদাই তাঁকে লেখকের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে জীবিকা

থেকে জীবিকান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। যে চাকচিক্য-সর্বস্ব, ফাঁপা আভিজাত্যকে তিনি 'ইউ নো মি অল' (১৯১৬); 'দি বিগ টাউন' (১৯২১) প্রভৃতি উপন্যাসে ব্যঙ্গ করেন, নিজে তারই পিছনে ধাবমান হন। 'চ্যাম্পিঅন'; 'হেআরকাট'; 'লাভনেস্ট'; 'দি গোলডেন হনিমুন'; 'ডে উইথ কোনরাড গ্রীন' ইত্যাদি লার্ডনারের বিখ্যাত গল্প-নিচয়। শেষের দিকে লার্ডনারের লেখা তিক্ততা ও হতাশা প্রকাশ করে। 'লাভনেস্ট' গল্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্ভবত নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বকে লার্ডনার আর বহন করতে পারছিলেন না। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আড়াল সরিয়ে তাঁর লেখনী ক্রমেই নির্মম হয়ে উঠছিল। লেখক রিং লার্ডনার হয়ত জীবনের দাবী প্রখরভাবে অনুভব করেছিলেন। বিবেকদষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত, 'চ্যাম্পিঅন', 'সাম লাইক ইট কোল্‌ড' ইত্যাদি কাহিনী কে আর লিখতে পারত, এমন প্রশ্ন স্বতই মনে হয়। এইচ. এল. মেংকেন বলেন 'Lardner concealed his new savagery of course, beneath his old humour.' পরিপূর্ণতায় হয়তো পৌঁছতে পারেননি লার্ডনার, কিন্তু তাঁর ছোটগল্প সমূহ আজও আমেরিকান সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আর এক ঔপন্যাসিক পার্ল বাক (১৮৯২-) সম্পর্কেও পাঠক ও সমালোচকরা অনীহা পোষণ করেন। চীনের পটভূমিতে লিখিত 'দি গুড আর্থ' (১৯৩১); 'সন্‌স' (১৯৩২); 'এ হাউস ডিভাইডেড' (১৯৩৫) তাঁর সুবিখ্যাত ট্রিঅলজি। এতদ্ব্যতীত 'ঈস্ট উইণ্ড,' 'ওয়েস্ট উইণ্ড', 'কিন্‌সফোক', 'ড্রাগন সীড', 'টু ডে অ্যাণ্ড ফরএভার' এই সকল উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের পটভূমিকাও চীন। চীন নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেছেন এবং এ কথা অনস্বীকার্য, প্রথম উপন্যাসে তিনি প্রাক্-বিপ্লব চীনের একটি সার্থক যুগচিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এই ক্ষমতাবান শিল্পীকে তাঁর কম্যুনিস্ট-বিরোধী মনোভাব এমন ভাবে অধিকার করেছে যে, রাজনীতির খাতিরে তিনি তাঁর শিল্পী সত্তাকে আবিল হতে দিতে দ্বিধা করেননি। কম্যুনিস্ট চীন আজ এক ঐতিহাসিক সত্য, অথচ পার্ল বাক তা স্বীকার করতে চান না, তাই তাঁকে সস্তা প্রচার-প্রবণতার দ্বারস্থ হতে হয়। তিনি কুশলী কথক, চিত্রময় ভাষা তাঁর অধিকারে আছে। কিন্তু তিনি সৎ-শিল্পীর দায়িত্ব পালন করতে নারাজ, এবং তাঁর 'কিন্‌সফোক' প্রমুখ উপন্যাস পড়লে বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়, এই বইয়ের রচয়িত্রীই একদিন 'ফার্স্ট ওআইফ', 'নিউ রোড', 'দি ক্রিল' প্রমুখ গল্প লিখেছেন।

ক্যাথারিন অ্যান পোর্টার (১৮৯৪-) আধুনিক ছোটগল্প-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। এই ক্ষমতাময়ী লেখিকা মনের অবচেতনের অন্ধকারে অবাধে গমনাগমন করেন। তাঁর ছোট গল্পগুলি মানুষের মনোলোককে উদ্‌ঘাটিত করে অস্ত্র-চিকিৎসকের ছুরির মতো নির্মমতায়। তিনি প্রধানত তিনটি হ্রস্ব উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত। 'ওল্‌ড মরট্যালিটি' ; 'পেল হর্স, পেল রাইডার'-এর সংগে গ্রন্থীভূত 'নুন ওআইন' (১৯৩৭) তার মধ্যে সমধিক বিখ্যাত। এর নায়ক আশ্রিতজনকে বাঁচাতে গিয়ে অনন্যোপায় হয়ে আততায়ীকে হত্যা করে। আইন তাকে নির্দোষী বলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার বন্ধু, স্ত্রী, পুত্রদ্বয় তাকে পরিহার করে চলে। তারা তাকে হত্যাকারী বলে ঘোষণা করে, অতএব তাকে আত্মহত্যা করতে হয়। পারিপার্শ্বিকতার ক্রীতদাস একটি অসহায় মানুষের জীবনের জটিলতার এক হার্দ্য, অনুকম্পায়ী, অথচ নির্মম বিবরণ উদ্‌ঘাটিত করেন ক্যাথারিন পোর্টার। জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখবার, বুঝবার এবং প্রকাশ করবার দক্ষতাতেই অ্যান পোর্টারের বিশিষ্টতা। 'হি' তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ গল্প। 'হাসিয়েন্দা' (১৯৩৪) এবং 'ফ্লাওআরিং জুডাস' (১৯৩৫) নামে তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ আছে।

'দি স্ট্রেঞ্জ কেস অফ অ্যানি স্প্র্যাগ' (১৯২৮) ও অন্যান্য উপন্যাসের স্রষ্টা লুই ব্রোম্‌ফিল্‌ড (১৮৯৬-) 'দি রেইন্‌স কেস' (১৯৩৭) এবং 'নাইট ইন বম্বে' (১৯৪০) নামক দুটি উপন্যাসে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু অবাস্তব তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। লেখক হিসাবে তাঁর কোন স্থান নেই।

ফ্রান্সিস্‌. জে. স্কট-ফিট্‌জেরাল্ড (১৮৯৬-১৯৪০) আটত্রিশ বছরের মধ্যেই 'গ্রেট গ্যাট্‌সবি' (১৯২৫), 'দিস সাইড অফ প্যারাডাইস' (১৯২০), 'ফ্ল্যাপার্স অ্যাণ্ড ফিলসফার্স' (১৯২০), 'টেল্‌স অফ দি জ্যাজ এজ' (১৯২২), 'অল দি স্যাড ইয়ং মেন' (১৯২৬) লেখেন এবং আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হবার সম্মান লাভ করেন। হেমিংওয়ের আগেই তিনি প্রতিষ্ঠা পান। কিন্তু তারপর ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য ও সমস্যায় যখন তিনি দীর্ণ বিদীর্ণ (তাঁর স্ত্রী উন্মাদ হয়ে যান এবং ফিট্‌জেরাল্ড নিজেও সুরাসক্তির ফলে রোগগ্রস্ত হন) তখন তাঁর জীবিতকালেই তিনি যশ ও পরিচিতি হারান। হৃতসর্বস্ব এই লেখক অতঃপর

হলিউডে জীবিকার্জনের জন্য যান। প্রযোজক ও পরিচালকদের খেয়ালখুশিমতো যৎসামান্য পারিশ্রমিকে চিত্রনাট্যকারের অসম্মানজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ফিট্‌জেরাল্ড। এবং তারপর নিজেকে নিজের মধ্যে পুনর্বাসিত করতে পেরে ফিট্‌জেরাল্ড যখন হলিউডের অন্তঃসারশূন্য জীবনের দৈন্যকে 'লাস্ট টাইফুন'-এ উদ্‌ঘাটিত করতে নিরত, তখন সে বই অসমাপ্ত রেখেই তাঁর মৃত্যু হলো। তাঁর মৃত্যুর কথা কেউ জানত না। অথচ তারপর ফিট্‌জেরাল্ডকে আমেরিকা আবার আবিষ্কার করল। তাঁর বই প্রকাশ করাকে প্রকাশকেরা আর অপচেষ্টা বলে বোধ করলেন না। আজ ফিট্‌জেরাল্ড আমেরিকার অবিসম্বাদী প্রতিভা রূপে চিহ্নিত এবং তাঁর প্রাপ্য স্থান তিনি পেয়েছেন। ফিট্‌জেরাল্ড-এর মনে আজীবন এক দ্বৈত সত্তার অবিরাম সংগ্রাম চলেছে। তাঁর শিল্পীসত্তা তাঁর প্রতিভার স্বরূপ চেনে এবং সেই প্রতিভাকে সে পরিণত, সত্যনিষ্ঠ শিল্পকার্যে রূপ দিতে চায়। অন্যদিকে তাঁর মধ্যে এক খেয়ালী বিদ্রোহী বাস করে। সেই বিদ্রোহী তাঁকে ক্ষুব্ধ করে, চূড়ান্ত সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়, তাঁকে তাঁর লেখার কাজে স্থির হতে দেয় না। প্যারিস ও রিভিয়েরার বিলাসকেন্দ্রে তিনি সুখ খোঁজেন। ন্যুইঅর্কের বড় হোটেলের সামনে জলাশয়ে ঝাঁপ দেন শীতের পোশাক পরে। ট্যাক্সির ছাদে চড়ে ঘুরে বেড়ান। জীবনের এই বেহিসাব, তাঁকে জীবিতকালেই অন্যান্য লেখক এবং বন্ধুদের কাছে বিরাগভাজন করেছিল। এমন কি, ধনী সম্প্রদায়কে তাঁর লেখার বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত করবার জন্য হেমিংওয়ে তাঁর ও ফিট্‌জেরাল্ডের কথোপকথনকে 'দি স্নোজ অফ কিলিমাঞ্জারো' গল্পে বিদ্রূপের সুরেই বিবৃত করেন। ফিট্‌জেরাল্ড বলেছিলেন 'The very rich are different from us.' হেমিংওয়ে বলেন, 'Yes, they have more money.' লায়োনেল ট্রিলিং বলেন—'It is usually supposed that Hemingway had the better of the encounter and quite settled the matter. But we ought not be too sure. The novelist of a certain kind, if he is to write about social life, may not brush away the reality of the differences of class,...The novel took its rise and its nature from the radical revision of the class structure in the eighteenth century, and the novelist must still live by his sense of class differences, and must be absorbed by them, as Fitzgerald was, even though he despises

them, as Fitzgerald did.' ফিট্জেরাল্ড-এর সাহিত্যে আমেরিকার ধনী সম্প্রদায়ের জীবনের অন্তঃসারশূন্য দীনতা যে অসামান্য দক্ষতায় উদ্ঘাটিত তা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই। ম্যাক্সওয়েল গেইজমার বলেছেন—'It is difficult to ignore, Fitzgerald's final stress on poverty as against wealth, on character as against charms, on energy and work as against grace and ease, and even on the alien toilers as against our native Princetonians.'—The last of the Provincials : Maxwell Geismer. আজ ফিট্জেরাল্ড-এর প্রাক্কলন করতে ব'সে যা প্রথমেই সমালোচককে শ্রদ্ধান্বিত করে, তা হলো ফিট্জেরাল্ড-এর সুগভীর নৈতিকতা বোধ এবং প্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণা, যা অতীব শুদ্ধ, অতি সুকুমার। বস্তুত, ফিট্জেরাল্ড বিশ্বাস করতেন, প্রেম এমনই এক শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি যা দৈনন্দিন সম্পর্কের, প্রাত্যহিক গ্লানিতে মলিন হতে বাধ্য, অতএব প্রেমকে পরিপূর্ণ সম্মান দিতে হলে প্রেমাস্পদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করাই বিধেয়। 'টেনডার ইজ দি নাইট' তাঁর প্রেম সম্পর্কে ধারণার এক প্রকৃষ্ট চিত্র। সুকুমার, সুন্দর গদ্যরীতিতে ঐশ্বর্যান্বিত। 'গ্রেট গ্যাট্সবি'তে ফিট্জেরাল্ড সুরাসক্তি বা অ্যাল্কোহলিজ্-এর ভয়াবহ ট্রাজিডিকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর গ্যাট্সবি সমগ্র উপন্যাসে এক নীরব ভূমিকার ভার বহন করে। ধনী, নিষ্ঠুর, উগ্রস্বভাব বুকানান, সমকামী জোর্ডান বেকার, উল্কনহেইম গ্যাট্সবির জীবনের পরিণতিকে ত্বরান্বিত করে তাদের আচরণে। গ্যাট্সবির সম্পর্কে আমরা জানতে পারি 'He was a son of God—a phease which, if it means anything, means just that—and he must be about His Father's business, the service of a vast, vulgar, and meretricious beauty.'—Great Gatsby : F. Scott. Fitzgerald. গ্যাট্সবির জীবন যখন বিকল হয়ে যায়, সে তার প্রেমিকা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে, এবং সসংকোচে বলে—'my comment is just personal.' কখনোই সে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশকে দায়ী করে না। এবং ফিট্জেরাল্ড নিজে বিশ্বাস করতেন মানুষ সার্থক হবে, কি ধ্বংস হয়ে যাবে, সেটা তার নিজের কর্মকৃতির উপরেই নির্ভর করে, পৃথিবী বা 'সমাজ ব্যবস্থা'র উপর নির্ভর করে না। কেননা মানুষ যদি শুদ্ধ চিত্তবৃত্তিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেষ্টা করে, এই ক্ষয়িষ্ণু, ব্যাধিগ্রস্ত 'সমাজ ব্যবস্থা'র মধ্যেও তা সম্ভব। তাঁর নিজের ভাগ্যবিবর্তন

সম্পর্কেও তিনি পৃথিবীকে দায়ী করেননি। সে ভার তিনি নিজেই বহন করেছেন, যদিও লায়োনেল ট্রিলিং-এর মতে—'even though, at the time when he was most aware of his destiny it was fashionable with minds more pretentious than his to lay all personal difficulty whatever at the door of the 'social order.' তিনি নিজেও 'ক্র্যাক্-আপ' প্রবন্ধগ্রন্থে বলেছেন—'The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind, at the sametime, and still retain the ability to function.' তাঁর সময়ে আমেরিকার লেখকরা 'আমেরিকান জীবনযাত্রার জালে জড়িয়ে পড়ছিলেন। এবং আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা দ্বিতীয় এক কর্মব্যস্ত জীবনের ভূমিকাকে বর্ম হিসাবে পরিধান করে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করেন। কেউ শিকারীর বহির্মুখী জীবন গ্রহণ করেন, শরুড্ অ্যাণ্ডার্সন রঙের ব্যবসা জাঁকিয়ে তোলেন, রিং লার্ডনার শেষ দিন অবধি বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেন তিনি অকস্মাৎ অন্য কাজ, অন্য জীবিকায় যাবেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে জীবনভোগী, সুরাসক্ত ফিট্জেরাল্ড শেষ অবধি কোন 'ভাণ' বা 'pretension' থেকে মুক্ত ছিলেন। এই প্রিটেন্‌শানের বর্ম দ্বারা নিজেকে তিনি সুরক্ষিত রাখলে হয়ত দীর্ঘ এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে পারতেন। কেননা, এই দ্বিতীয় জীবন গ্রহণ, আমেরিকান লেখকদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। নিজেকে বাঁচাবার কারণেই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ফিট্জেরাল্ড তাহলে হয়ত ফিট্জেরাল্ড হতেন না ; 'ব্যাবিলোন রিভিজিটেড' বা 'উইণ্টার ড্রীম্‌স'এর মতো করুণ গল্প লিখতেন না ; 'লাস্ট টাইফুন'-এ হলিউডে লেখকের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা প্রোজ্জ্বল হতো না। কোন বর্ম ব্যতিরেকে 'আমেরিকার জীবনযাত্রা'র সবটুকু প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে রক্তাক্ত হতে দিয়ে শেষ অবধি তিনি স্ববিশ্বাসে অক্ষুণ্ণ থেকেই মারা গেলেন। এবং আজ স্বীকার করতেই হয় সেদিন ফিট্জেরাল্ড-এর আচরণে যা যা ভুল মনে হয়েছিল, তাইই ঠিক। শিল্পীকে স্বধর্মে অক্ষুণ্ণ থেকেই চলতে হবে, পরিণামে যদি হলিউডে ছিন্নমূল, বিস্মৃত লেখকের অখ্যাত মৃত্যুবরণ করতে হয়, তা হলেও। 'F. Scott Fitzgerald was one of the few real artists in America'—Brewster & Barrell.

প্রাতিস্বিক মানুষের বিশ্বস্ত লিপিকার টমাস উল্ফ (১৯০০-১৯৩৮) জীবনের বেদনা এবং রমনীয় মুহূর্তকে আশ্চর্য সংবেদ্যতায় নিবিড় করে তুলতে পেরেছেন বলে আধুনিক আমেরিকার কথাসাহিত্যে তাঁর একটি সন্তোষজনক এবং সম্মানজনক স্থান আছে। যতদিন পর্যন্ত কর্মে সক্ষম ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি নিরলস ভাবে লিখেছেন। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল, ১৮৭১ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের পটভূমিতে শতাধিক চরিত্র নিয়ে লেখা 'অফ্ টাইম অ্যাণ্ড রিভার' নামক ছয়খণ্ডে-সম্পূর্ণ বৃহদাকার এপিকধর্মী উপন্যাসটি তিনি শেষ করে যেতে পারবেন না। উল্ফ-এর মধ্যে এক অদম্য প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত ছিল। সেই প্রাণশক্তিকে প্রায় নিঃশেষ করে তিনি তাঁর নায়ক ইউজীন গ্যাণ্ট-এর সকল প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছিলেন তিনি। লম্বাচওড়া শরীরটি নিয়ে ন্যুইঅর্কের সাহিত্যিক-মহলে চেআরে সভ্যভব্য হয়ে বসতে তাঁর রীতিমতো কষ্ট হতো। তখন তিনি ন্যুইঅর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপনা করেন। কথা বা পার্টির মাঝখানে হঠাৎ উঠে যেতেন তিনি। টুপি নিতে মনে থাকত না। রাস্তা দিয়ে প্রায় ছুটে চলতেন। চলাফেরার সময় টেবিল, গেলাস, বইয়ের শেল্ফ অমনোযোগিতায় উল্টে দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। আসলে, তাঁর এই বাহ্যিক অস্থিরতা ভেতরেও ভর করত, তার মধ্যেই জন্ম হতো লেখার। আর তখন তিনি এমন উত্তেজনায় লিখে চলতেন যেন কোন পাগলা ঝোড়ো হাওয়া তাঁর সত্তার মূলকে অবধি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উল্ফ-এর উদ্দেশ্য ছিল, একটি মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সহকারে গোটা আমেরিকাকে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ করানো, তারই চোখ দিয়ে দেশের সমগ্র রূপটিকে প্রতিফলিত করা। 'লুক হোমওআর্ড এঞ্জেল' (১৯২৯) থেকে তাঁর সেই ইচ্ছার গোড়াপত্তন হয়, এপিকধর্মী উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস-পর্ব। এরই পরবর্তী অংশ 'অফ্ টাইম অ্যাণ্ড রিভার' (১৯৩৫) তিনি শেষ করে যেতে পেরেছিলেন। এই দুটি গ্রন্থে নায়ক ইউজিন গ্যাণ্ট সবেমাত্র তারুণ্যের স্বাদ নিতে পেরেছে। তার বাবা এলিজা গ্যাণ্ট-এর শাসন এবং মা'র নিরবিচ্ছিন্ন বকবকানির হাত এড়িয়ে সে আপন জীবনে হয়েছে প্রবিষ্ট। প্রেম সম্পর্কে তখনও তার কোন ধারণা নেই। মেয়েদের সংগে সে মিশেছে খুব অল্পই। কিন্তু তার সবটুকু আকর্ষণ এবং ভালবাসা সে দিয়েছে বন্ধু স্টারউইককে। পরিশেষে জানা যায় স্টারউইক সমকামী। ইউজীন-এর

মোহভংগ ও ক্রোধে দ্বিতীয় উপন্যাসটির শেষ হয়। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'দি ওয়েব অ্যাণ্ড দি রক' (১৯৩৯) ও 'য়্যু কাণ্ট্ হোম এগেন' (১৯৪০) উপন্যাস দুটিতেও উল্ফ তাঁর উচ্চণ্ড ভাবনা ও জীবনের নানা অভিব্যক্তিকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। এক বৃদ্ধা ইহুদি, দুটি তরুণ-তরুণী, প্রহার-পাওয়া নেড়ী কুকুর, ভগ্ন-হৃদয় কবি, বদমায়েস মাতাল সৈনিক—জীবনের এইসব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, তুচ্ছ ও উচ্চ উপচয় ও উপকরণকে তিনি একটি ধারাবাহিকতা দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, চেয়েছিলেন স্পন্দন ও গতি দিতে। যেমন, প্রথম দুটি উপন্যাসে তিনি ইউজীন গ্যাণ্ট-এর মনোজগৎ ও বহির্জগৎকে সর্বতোভাবে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। উল্ফ-এর মধ্যে একটি অফুরন্ত ও ভয়ংকর উদ্যম নিহিত ছিল বলে তিনি অজস্র লিখেছেন এবং প্রায় সকল বিষয়ে তাঁর নির্বিচার-পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয়েছে। বিচার করার বয়স্কতা তিনি অনেক সময়ই পান নি। একটি উপন্যাসের নির্মানকার্যে প্রায়ই তাঁর শৈথিল্য ও অপটুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তিনি সর্বদা দুটি দ্বন্দ্বে মেতে থেকেছেন। 'His imagination was a perpetual tension between his devotion to himself and his devotion to his self's interests and symbolism, and he made his art out of the equation he drew.' তাঁর চারটি উপন্যাসই আপন ধারণা ও উক্তি। অথচ তাঁর আত্মজীবনী নয়। আত্মার ও মননের নিবিড় জিজ্ঞাসা বলতে পারা যায়। তাঁর রচনার চমৎকারিত্ব হচ্ছে যে, প্রথমবার পড়লে তা হৃদয়কে গভীর বিস্ময়ে অভিভূত করে, একটা চেতনায় উদ্রিক্ত করে হয়ত, কিন্তু একাধিকবার পাঠে মনের সেই বর্ণপ্রলেপটুকু ফিকে হয়ে যায়, তখন তাঁর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাগুলি ধৃত অপরাধীর মতো এক এক ক'রে বেরিয়ে আসে। তাদের হতাশা ও ব্যর্থতা প্রকাশ করে। তবু আধুনিক বিশ্ব কথাসাহিত্যে টমাস উল্ফ একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। তাঁর সকল চিন্তাকে যদিও তিনি সুস্থির পরিণতিতে বিন্যস্ত করতে পারেন নি, তবু স্বজ্ঞাজাত প্রতিভার আলোয় তিনি কখনো কখনো জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে উন্মীলিত বিরাট জিজ্ঞাসার অন্ধকারকে অবলোকন করেছিলেন। তাঁর শেষ গ্রন্থের শেষ চিঠিটিতে তিনি বলেছিলেন: 'Man was born to live, to suffer and to die, and what befalls him is a tragic lot. There is no denying this in the final end. But we must dear Fox, deny it all along the way.'

আরস্কাইন কল্ড্‌ওয়েল (১৯০৩-) সাহিত্যে এমন রূঢ় ও নগ্ন বাস্তবতাকে পরিবেশন করেন, যা প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। 'দি ব্যাস্টার্ড' (১৯৩০) এবং 'পুওর ফুল' (১৯৩০) পাঠকদের রুচিবোধের উপর আঘাত হেনেছিল। অতঃপর 'টোব্যাকো রোড'-এ কল্ড্‌ওয়েল তাঁর লেখনীকে সংযত করলেন। কল্ড্‌ওয়েল দরিদ্র দক্ষিণকে নিয়ে লেখেন। দারিদ্র্য যে মানুষকে মনুষ্যত্বের শেষ সীমায় টেনে নামায়, তাদের নিয়েই তাঁর সাহিত্যের বেসাতি। 'টোব্যাকো রোড' তাঁর ক্ষমতার পরিচয় বহন করে কিন্তু যৌনাচার সম্পর্কে কল্ড্‌ওয়েলের আসক্তিও এতে পরিস্ফুট হয়। 'গড'স লিট্‌ল একার' (১৯৩৩) এবং 'জার্নিম্যান' (১৯৩৫) কল্ড্‌ওয়েলের পরিণত রচনা। কল্ড্‌ওয়েল দক্ষিণাঞ্চলের অতীত রোমন্থনে বিশ্বাসী নন। বরং দক্ষিণ নামক ভূ-খণ্ডে আজ শ্বেতাঙ্গ মানুষের মনুষ্যত্বহীন, দীন জীবনের নগ্নতা ও কুশ্রীতাকে নির্মোহ লেখনীতে উদ্‌ঘাটনের দিকেই তাঁর প্রবণতা বেশি। তিনি সচেতন জীবনশিল্পী। তাই 'দি ব্যাস্টার্ড'; 'নীল টু দি রাইজিং সান'; 'দি ডটার' ইত্যাদি গল্পে তাঁকে সংযত পরিণত এবং দায়িত্বপূর্ণ এক সাহিত্যিক হিসাবে আবিষ্কার করতে হয়। ক্বচিৎ তিনি নিছক কৌতুকরস সৃষ্টি করে থাকেন। 'কান্ট্রি ফুল অফ সুঈড্‌স' তার নিদর্শন। কল্ড্‌ওয়েল সম্পর্কে গভীর আশা পোষণ করবার কারণ আছে, কেননা ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ না হতে পারলেও তিনি উত্তরোত্তর সম্ভাবনা দেখিয়েছেন।

আমেরিকায় নিগ্রো লেখকদের সংখ্যা একান্ত কম। যে দেশে বর্ণবিদ্বেষ এক ঐতিহাসিক সত্য এবং নিগ্রোরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যখন পুরোপুরি অধিকার পায়নি, তখন সাহিত্যিকদের সংখ্যাও যে কম হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। তবু, প্রবল প্রতিকূলতা এবং নানা জটিল প্রতিবন্ধক কাটিয়ে নিগ্রোরা সাহিত্যক্ষেত্রে একটু একটু করে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের সাফল্যের পরিমাণ সূচ্যগ্র হলেও তাকে স্বীকার করা প্রয়োজন। শ্বেতাঙ্গ সাহিত্যিকদের রচনায় নিগ্রো চরিত্রসমূহ প্রায়শ ধাত্রী, নার্স, লিফ্‌টম্যান, জুতো পালিশ-বয় কাগজবিক্রেতা, বার-এর গাইয়ে বাজিয়ে, ড্রাইভার, রাঁধুনী, ঝি, এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তাঁদের দোষ দেবার হয়ত কিছু নেই। হয়ত তাঁরা যা দেখেছেন, তাই লিখেছেন। বিশ্বাস করতে বেদনাবোধ হয়, কিন্তু শ্বেত-

আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ নেই বোধহয় একমাত্র—'Slumdweller'দের মধ্যে। সেই সমাজ-বিরোধী নামে কথিত নিচের তলার দরিদ্রদের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষ প্রথার সংস্কার তেমন করে রক্তে রক্তে প্রবেশ করেনি। 'কু-ক্লু ক্স-ক্ল্যান' নাম হারিয়ে সংস্কারে পরিণত হয়ে তা আমেরিকার মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনেরও শেষ নেই অথচ এই সংস্কারের দাসত্ব করেন, এমন মানুষেরও শেষ নেই। এই শতকের প্রথম দশকে চার্লস চেস্টনাট (১৮৫৮–১৯৩২) তাঁর প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ন্যুইঅর্কের এক বিখ্যাত প্রকাশকের কাছ থেকে এবম্বিধ মন্তব্যসহ ফেরৎ পান—যে কোন সাহিত্য 'by an American of acknowledged colour' তাঁরা প্রকাশ করবেন না—Literature of The American People : A. H. Quinn.

কিছু কিছু নিগ্রো লেখক বর্ণবিদ্বেষের কালিমাকে দূরে সরিয়ে রেখে বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃজনের প্রয়াস করেছেন, যেমন, উইলিআম ব্রেথওয়েট (১৮৭৮–)। কিন্তু জেম্‌স ওয়েল্‌ডন জন্‌সন (১৮৭১-১৯৩৮) একজন অভিনন্দনযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর 'অটোবায়োগ্রাফি অফ্‌ অ্যান এক্স্‌ কলার্ড ম্যান' (১৯১২) হচ্ছে প্রথম উপন্যাস, যা নিগ্রোসমাজের নিপীড়িত মর্মবেদনাকে উদ্‌ঘাটিত করল।

ল্যাংস্টন হিউজ (১৯০২-) ১৯২৫ সালে 'অপারচুনিটি' নামক নিগ্রো মাসিক-পত্র থেকে কবিতার জন্য পুরস্কৃত হন। তারপর তাঁর বহু কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 'ওআন ফ্রাইডে মর্নিং অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ' এবং 'দি আর্থ ইজ ব্ল্যাক' গল্প ও উপন্যাস-গ্রন্থ তাঁর স্বল্প গদ্যরচনার মধ্যে অন্যতম।

রিচার্ড রাইট (১৯০৯-) সর্বপ্রথম আমেরিকার সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা পেলেন—নিগ্রো লেখক হিসাবে নয়, সুসাহিত্যিক হিসাবে পাঠক ও সমালোচক তাঁকে সমাদৃত করল। 'আংকল টম'স চিল্‌ড্রেন' (১৯৩৮) তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়। 'নেটিভ সন' (১৯৪০) তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস এবং আত্মজীবনীমূলক 'ব্ল্যাকবয়' এক হৃদয়স্পর্শী বাস্তবতা। রিচার্ড রাইটের লেখা হৃদয়াবেগে উত্তপ্ত—তাঁর নিজের একটি স্বচ্ছ জীবন-দর্শন আছে এবং তিনি নিজস্ব ভাষা ও স্টাইলের অধিকারী। রিচার্ড রাইটের কাছে অনেক আশা করবার আছে, কেননা 'his is the only competent pen to explore the unexplored rich continent, that is, the Negro's mind'. ১৯৪৩ সালে ল্যাংস্টন

হিউজ তাঁর অধুনাবিখ্যাত 'হোআট দি নিগ্রো ওআনট্‌স' নিবন্ধে বলেছিলেন— 'প্রথমে আমরা ভদ্রভাবে বাঁচবার মতো রোজগার করতে চাই···কেরানী, ব্যাঙ্কের কর্মচারী, বাসের কণ্ডাক্‌টার ও ড্রাইভার এসব চাকরীতে একটি নিগ্রোকেও দেখা যায় না। আমরা শুধু লিফ্‌টম্যান, ঝাড়ুদার, চাকরাণী,··· কারখানাতেও সেই একই ইতিহাস।' বর্ণ-বৈষম্য প্রথা নিয়ে অনেক কথা বলা অর্থহীন। তবে এই বলাই সমীচিন যে, নিগ্রোদের পেশাদারী সাহিত্যিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবার পথে অনেক বাধা। সে সব বাধা অপনীত না হলে নিগ্রো সাহিত্যিকরা অগোচর থাকবেন।

আমেরিকান সাহিত্যে প্রোলেতারীয় সাহিত্যিকদের ভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস আছে। যাঁরা সমাজের শোষিতরূপের উন্মোচন চেয়ে আসছেন আপন সাহিত্যকর্মে কিংবা যাঁরা ব্যক্তিজীবনের নির্বেণ্ণতায় সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন—আমেরিকার রক্ষণশীল সমালোচকদের ধারণায় সম্ভবত তাঁরাই প্রোলেতারীয় রীতিনীতির উপযুক্ত প্রবক্তা, তাঁরাই উক্ত গোষ্ঠীভুক্ত। মার্কস্‌, অ্যাঙ্গেলস, লেনিন-এর নতুন সমাজব্যবস্থার মন্ত্র শিল্পের বিস্তীর্ণ পরিসরে ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় আলোচনার প্রভঞ্জন বয়েছিল আগেই। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কয়েকবার মার্কিন সাহিত্যিকদের যে-অধিবেশন বসেছিল তাতে এই নিয়ে তুমুল উত্তেজনাময় বাক্যবিনিময় হয়েছিল। মার্কস্‌বাদ যখন অল্পে অল্পে পল্লবিত হলো তখন কিছু বামপন্থী সমালোচক প্রোলেতারীয় সাহিত্যের খসড়া তৈরি করলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শ্রেণী-সংগ্রামের পরিণতিকে সাহিত্যের আধারে উন্মুখর রাখা এবং সেই জীবনের প্রতি সাহিত্যিকদের চেতনাকে উন্মুক্ত করা। যদিচ সাহিত্য-শিল্পকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার বাসনা সবিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি··· 'The desire to make of art a weapon in the class struggle nevertheless Persisted.' ড্রেজার, ডস পাসজ, স্টাইনবেক ধনতন্ত্রের অস্বস্তিকর অস্তিত্বকে প্রকট করে সমাজের কিছু অপ্রিয় অবস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন এবং তাঁরাই প্রোলেতারীয় গোষ্ঠীর একনিষ্ঠ সদস্য। কিন্তু বামপন্থী সাহিত্যের সমর্থক এবং বামপন্থী কাহিনীর সংকলয়িতা ম্যাক্সিম লিয়েরার, স্টাইনবেক প্রমুখকে প্রোলেতারীয় আখ্যা দেওয়ার বিরোধী। তিনি মনে করেন প্রোলেতারীয়রূপে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে স্টাইনবেকরা নাকি যথেষ্ট প্রশস্ত নন।

জন ডস পাসজ (১৮৯৬-) হারভার্ডে পড়া সাঙ্গ ক'রে প্রথম মহাযুদ্ধে পশ্চিম রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন অ্যাম্বুলেন্স চালাতে। কয়েক হাজার মাইল পথ পার হয়ে তিনি জীবনের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর মন এই জরিষ্ণু, রুগ্ন সভ্যতার দেহ থেকে মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। তিনি ভাবলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে একত্র ক'রে জীবনের ভাষ্যকার হবেন, নিখুঁত বিবরণে মানুষের দৈনন্দিনতার আঁকবেন ছবি। 'থ্রি সোলজার্স' (১৯২১) দিয়ে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য যাত্রারম্ভ হলো নতুন পথের। যুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, নিপীড়ন এবং নির্বোধ আচরণের সব চেহারা ফুটে উঠল এই উপন্যাসে এবং নানা টাইপ চরিত্রের সহায়তায় তিনি যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করলেন। 'থ্রি সোলজার্স'-এর আগে ডস পাসজ 'ওআন ম্যানস্ ইনিশিয়েসান' (১৯১৭) নামে যে গ্রন্থটিতে উপন্যাস-প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম স্বাক্ষর রেখেছিলেন, সে-বইটি তাঁর শিল্পত্বের কোন আভাসই দিতে পারে নি···বইটি ১৯৪৫ সালে 'ফার্স্ট এনকাউন্টার' নাম পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস "থ্রি সোলজার্স' পর্যন্ত ডস পাসজ আত্মস্থ হতে পারেন নি, অস্থির অসংলগ্নতায় বিচরণ করেছেন—একটি ক্ষমতাবান শিল্পীর অকৃত্রিম প্রতিশ্রুতিকে তেমন আন্তরিকতায় প্রতিষ্ঠিত করতে অপারগ হয়েছিলেন। আস্তে আস্তে তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছতা পেল এবং তাঁর সৃষ্টি মৌলিক ভাব ও কলারীতির সার্থকতাকে করল উন্মোচিত। ডস পাসজ-এর এই স্বকীয় শিল্পরূপ প্রকৃতপক্ষে 'ম্যানহাট্টান ট্রান্সফার' (১৯২৫) রচনা থেকেই সূচিত হয়েছে, বলা ভাল। এই প্রথম তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে গুছিয়ে একটি বিন্যস্ত রূপ দিতে পারলেন, তাতে প্রাপ্তমনস্কতা এল, রচনাটি পেল পরিণতি। ইতিপূর্বে শহরের অঙ্গবাস সরিয়ে তার নগ্নতাকে স্পষ্ট করেছিলেন হাওয়েল্‌স কিন্তু পাসজ এবার ভিন্ন কৌশল ও প্রযুক্তিকে আশ্রয় করলেন। চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি শহুরে জীবন-ব্যবস্থার রূপবর্ণনা করলেন না, ম্যানহাট্টান শহরই যেন সব চরিত্রের মধ্যমণি হয়ে রইল, সেই শহরই সংজ্ঞাকেন্দ্র। যে-শহরের মানুষরা দুর্বার অসহনীয়তায় নিজেদের জীবনকে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে। বহন করছে একটি চূড়ান্ত ক্ষয়ের আশ্রয়ে নিশ্চিতভাবে অবলুপ্ত হবে বলেই। এই সব নারী-পুরুষের চরিত্রে ব্যক্তিত্ব-হীনতার গ্লানি স্পর্শ করেছে, শহরের কুটিল আবর্তে তারা ভেসে যাচ্ছে শৈবাল-লতার মতো। কিন্তু ডস পাসজ-এর সাহিত্যিক সঞ্জননতা ক্রমিক সাফল্যের

মন্ত্রেই নিহিত। 'ম্যানহাট্টান ট্রান্সফার'-এ যে-শক্তি তিনি প্রচিত করলেন তা অধিকতর সার্থকতায় ব্যবহৃত হলো তাঁর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ উপন্যাস, যুগের অন্যতম রচনাকর্ম 'ইউ. এস. এ'-তে (১৯৩৮)। এতে তিনি উপন্যাস রচনার প্রচলিত ধারায় আপাদমস্তক পরিবর্তন আনলেন। অনেকটা চলচ্চিত্রের মতো ঘটনা-পরম্পরায় তিনি সমাজের বিভিন্ন মানুষকে এবং বিভিন্ন অবস্থাকে করলেন পরিস্ফুট আর এই ধারাবিবরণীর আড়ালে তাঁর সংবাদদাতার প্রখর দৃষ্টি ক্যামেরার শক্তিতে ব্যস্ত রইল মানুষ সম্পর্কিত সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর সংগ্রহে। এ উপন্যাসে তথাকথিত নায়ক এবং নায়িকা রইল না, বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের আমেরিকাই কাহিনীর নায়ক। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি ইম্‌প্রেশনিস্ট বর্ণনার এক একটি ক্ষুদ্র অণুবন্ধ জুড়ে দিলেন। এই তিনখণ্ডের পরীক্ষামূলক উপন্যাস ('দি ফর্টিসেকেণ্ড প্যারালেল' ১৮৩০ ; 'নাইনটিন নাইনটিন' ১৯৩২ ; 'দি বিগ্‌ মানি' ১৯৩৬) চেতনাপ্রবাহের রীতিতে রচিত সভ্যতার সংকটজনক অসুস্থতাকে ব্যক্ত করেছে। ভাবালুতায় মনোহরণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি ডস পাসজ সমগ্র রচনাটিতে। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালের মুদ্রাস্ফীতি ১৯৩০ সালের মধ্যে আমেরিকার চেহারায় কি রূপ-বদল ঘটিয়েছে তারই অবিচল বিবরণ দিতে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠ পাসজ সংবাদপত্রের ভাষায় জীবনের শেষ সংবাদগুলি আবশ্যকীয় নিপুণতায় পরিবেশন করেছেন। উইলসন, ডেবস্‌, ভেবলেন এবং অন্যান্য চরিত্ররা আমেরিকান সমাজের বিভিন্ন স্তরকে প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তিতে জীবনের একটি আশ্চর্য জগৎকে সৃষ্টি করতে চেষ্টা পান লেখক কিংবা তাদের নানা রঙের বিন্দুতে একটি রামধনু। কিন্তু 'ইউ. এস এ'-র সমালোচকরা এইসব ভাবনাবিহীন চরিত্রের আশানুরূপ বিকাশ দেখতে পান নি, তাদের মধ্যে ভাবসংঘাতের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সফলতা অথবা বিপর্যয়ের দিকে স্রোতের শ্যাওলার মতো অসহায়ভাবে ভেসে যাওয়াকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন নি…'some of them swim with the stream and some against it, but they all swim.' কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ডস পাসজ তাঁর আমেরিকায় স্কাই স্ক্র্যাপার, ন্যুইঅর্ক বন্দরের অজস্র জাহাজ, রেল, মোটর কারখানা, শ্রমিক, মালিক, রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাট, নিগ্রো, কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান, তামাক, কয়লা, ফোর্ডের কারখানা, গণিকালয়, গীর্জা, অনাথ শিশু, ধর্ষিতা জননী, উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ, ভয়াবহ খাদ্যাভাব এবং কোটি কোটি ডলারের লীলাখেলার যে-বিশাল পরিদৃশ্য রচনা

করেছেন তা প্রায় অনতুল এবং সেই জীবনকে জীবিত করতে গিয়ে ডস পাসজকে নিষ্ঠুরভাবেই নির্লিপ্ত থাকতে হয়েছে। এই সুবিপুল নির্লিপ্তিতে লেখক মানুষের যে জীবনবেদ রচিত করেছেন, সে সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন,…'মূর্তিগুলি মার্কিনী জীবনের বিভিন্ন ধারার বিগ্রহ, ধ্বংসোন্মুখ সময়স্রোতের বুদ্বুদ। তারা নানা কারণে, নানা স্থানে উদ্ভূত। আর সকলেই য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রলয় পয়োধিতে বিলুপ্ত। তারা এরকম অন্তঃসারশূন্য ও নৈমিত্তিক জীবনের এমন সব অখ্যাত স্তরে তাদের উৎপত্তি, এতই অপ্রতিষ্ঠ তাদের ব্যক্তিত্ব যে তাদের দিনগত পাপক্ষয়ের বিবরণে তত্ত্বদর্শন তো দূরের কথা কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার সুদ্ধ অবকাশ নেই। কিন্তু আখ্যানবস্তুর এই অকিঞ্চনতা বইখানির সারসংগ্রহে বাধা দিলেও তার ফলে গ্রন্থকারের বিশ্ববীক্ষা বরং সমধিক ঔজ্জল্য পেয়েছে…'। মান-এর 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর সংগে সাধারণত উপমা টানা হয়ে থাকে পাসজ-এর 'ইউ. এন. এ'র—তু'টির ভাবৈক্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য। যদিচ গঠনে প্রথমটি কেন্দ্রাভিগ্ এবং দ্বিতীয়টি কেন্দ্রাতিগ্। আপটন সিনক্লেআরের মতো পাসজ-ও এই পৃথিবীর, যে-পৃথিবীতে তিনি বাস করেন তার সমঝোতা খুঁজেছেন। সিন্‌ক্লেআরের মতো তাঁরও অদম্য আগ্রহ ব্যালোলিত হয়েছে কিন্তু প্রতিভা তদনুরূপ ব্যাপৃত হয়নি…'Like Sinclair too he is more earnest than gifted.'

ক্যালিফোর্নিআর স্যালিনাস ভ্যালি-তে ফল বাগিচায় প্রতি বছর দলে দলে লোক কাজ করে। তারা যাযাবর শ্রমিক। আজ এখানে, কাল সেখানে ক্লান্ত অস্তিত্ব টেনে টেনে নিয়ে বেড়ায় তারা। তাদের মধ্যে ১৯১০।১২ সালে একটি বালক কাজ করত। আঙুরলতা থেকে আঙুর ছিঁড়ে টুকরি ভরতে ভরতে ছেলেটি সাগ্রহে তার প্রতিবেশকে লক্ষ্য করত। পরে, জন স্টাইনবেক (১৯০২-) স্বীকার করেছেন, তাঁর উপন্যাসের উপকরণ সেইসব দিন থেকেই তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেছেন। যে ক্যালিফোর্নিআকে তিনি তাঁর জীবনে জেনেছেন তা তাঁর 'প্যাসচিওর্স অফ হেভ্‌ন' (১৯৩৩) ও 'টু এ গড আননোন'-এ (১৯৩৩) ধৃত হলো। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিঃশেষীকৃত, সরল, অনাড়ম্বর তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে সেই ক্যালিফোর্নিআ একটু একটু ক'রে হলো উন্মোচিত। এই সৎ ও ক্ষমতাবান শিল্পী, সমাজের মর্মবেদনার বাণীকেও বহন করলেন ফল বাগিচার যাযাবর শ্রমিকদের জীবনাশ্রিত 'ইন্‌ডুবিয়াস ব্যাট্‌ল' (১৯৩৬) নামক উপন্যাসে।

তাঁকে প্রচারমূলক সাহিত্যের প্রবক্তা নামে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্টাইনবেক কোন সংকীর্ণ পরিচয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন না, কেননা মুখ্যত তিনি জীবনের ভাষ্যকার, বিশুদ্ধ শিল্পী। তাই তাঁর 'টর্টিলা ফ্ল্যাট' (১৯৩৫) গল্প সংকলনে, 'ডন কুইক্সট' বা 'লিটল ফ্লাওআর্স অফ সেণ্ট ফ্রান্সিস' গল্পগুলিতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই সব নানা জাতের মানুষকে, যারা জীবনের গ্লানিতে পরাভূত হয়ে ব্যর্থতার অন্ধকার হয়ে যায় না। কৌতুক, আনন্দ ও অজেয় সংকল্পে বাঁচবার ব্রতকে উদ্‌যাপন করে। স্টাইনবেকের ভাষা ইস্পাতের অস্ত্রে শান দেওয়ার ঘর্ষণে জ্বলে ওঠা ফুল্‌কির মতো। সরল, নিরলংকার কৃত্রিমতা-বর্জিত অথচ বলিষ্ঠ ও ঋজু এই ভাষার কাব্যময়তা তাঁর 'অফ মাইস অ্যাণ্ড মেন' (১৯৩৭), 'দি মুন ইজ ডাউন' (১৯৪২) উপন্যাসে এবং 'দি লা-ভ্যালি' (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থে সুদূর প্রসারী হয়েছে। 'অফ মাইস অ্যাণ্ড মেন'-এ জর্জ তার বন্ধু লেনিকে যখন হত্যা করে তখন বলে দিতে হয় না, লেনিকে অবশ্যম্ভাবী 'লিঞ্চিং'-এর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই সে বন্দুক তুলল। জড়বুদ্ধি, শিশুর মতো অপরিণত লেনি ও জর্জের বন্ধুত্বের এই কাহিনী আয়তনে ছোট কিন্তু আবেদনে গভীর। পাঠকের মনে এর প্রতিক্রিয়া অতলস্পর্শী। 'লা-ভ্যালি'র 'রেড পনি' গল্পটির কথা ধরা যাক। একটি ঘোড়া ও একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে সাহিত্যে এমন অপরূপ তন্ময়তা অর্জন করা যেতে পারে, এর আগে বোঝা যায় নি। 'প্রকৃতি'র আইন অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তার অমোঘ নির্দেশে আহত ঘোড়াটিকে মরতেই হয়। অথচ তার পরেও ছেলেটির সামনে সেই উন্মুক্ত, নির্জন প্রান্তর, সেই খামারের জীবন বিদ্যমান থাকে; একটি নির্দয় হাহাকারের মতো। ছেলেটির পৃথিবী শূন্য হয়ে যায়, সে বোঝে যে, এমন কিছু হারিয়েছে যা আর সে কখনোই ফিরে পাবে না। এবং এই একটি বিচ্ছেদের কারণে সে এমন কিছু লাভ করেছে যা তার পুর্ব পরিচিত ছিল না। অর্থাৎ জীবনের সংগে পরিচয় তার নিবিড় হয়েছে। এই প্রসংগে একমাত্র তলস্তয়-এর 'ইআর্ডস্টিক' কাহিনীটির দৃষ্টান্ত স্মরণে আসতে পারে। কিন্তু সে পশুটির জবানীতে মানুষের নির্বোধিতা ও নির্মমতার কথা ব্যক্ত হয়েছিল। তৃতীয় দশকের শেষে অনাবৃষ্টির ফলে যখন প্রায় মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল এবং চাষীরা দলে দলে ঘর ছেড়ে অন্যত্র জমি ও রুজীর জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল তখন স্টাইনবেক তাদের সংগে গিয়েছিলেন। পায়ে পায়ে ঘুরে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। দারিদ্র্যাবস্থায় এইসব মানুষদের জন্য তিনি যে বেদনাবোধ করতেন, সেই অনুভব-

টুকু এবং বিশেষার্জিত বাস্তবকে একত্রিত ক'রে, নাটকীয় উপস্থাপনায় ঘটনাকে তীক্ষ্ণ ক'রে তিনি লিখলেন 'গ্রেপস অফ র‍্যাথ্' (১৯৩৯)। তাঁর সার্থকতম উপন্যাস এবং আমেরিকার কথাসাহিত্যে এক আশ্চর্য সংযোজন। প্রচারধর্মীতার অপবাদে উপন্যাসটির গুরুত্ব খর্ব করার আয়োজন হয়েছিল কিন্তু সেসব প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ। ঘরছাড়া জোড পরিবারের বারোটি মানুষ, তাদের সংগী কেসি একটি ধূলিধূসর জায়গা ছেড়ে ক্যালিফোর্নিআর আরো রুক্ষ, আরো অসহ পরিবেশে এসে দাঁড়াল—উপন্যাসের মূল আখ্যানবস্তু এইটুকুমাত্র। কিন্তু এরই মধ্যে স্টাইনবেক আশ্চর্য বর্ণনা-কৌশলে, তাঁর নিরাসক্ত প্রতীতিতে, জীবনের সর্বতোসঞ্চারী গরল এবং অমৃতকে পাশাপাশি দৃঢ়সন্নিদ্ধ ক'রে তুলেছেন। সেই কারণে বইটিতে মহান ভাবচ্ছবি সুপরিস্ফুট হয়েছে। মা-জোড এক বিরাট চরিত্র, তার অসীম ব্যাপ্তির কাছে অন্যরা যেন পুতুল-সদৃশ। কেসি এক ভবঘুরে দার্শনিক। এই গরীব প্রৌঢ় মানুষটি বহুলালিত জীবনের বিশ্বাসকে কাছছাড়া করে না। তাতেই আস্থা রেখে পথ চলে। তার ধারণা, শত আঘাতেও তাকে বা তাদের মতো মানুষকে ভেঙে, গুঁড়িয়ে পরিচয়হীন করে দেওয়া যাবে না। তবে গ্রন্থটিতে তুলনামূলকভাবে, ক্ষুদ্রতর অনুভূতিকে নাটকীয়তা দিতে গিয়ে স্টাইনবেক অনেক বড় জিনিসকে প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিত দিতে ভুলেছেন। এক উপবাসী ভিখারীকে বাঁচাতে গিয়ে রোজা তার বুকের দুধ দিচ্ছে, এইখানে বইটি সমাপ্ত হওয়ায় পাঠক কিছু নিরাশ হয়। গৃহহীন মানুষের মহাকাব্য পড়তে পাবার যে আশা সূচনায় ঘনিয়ে ওঠে মনে, উপসংহারে সেই প্রত্যাশাকে পরিতৃপ্ত করে না। তবু, সব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'গ্রেপস অফ র‍্যাথ' এক বিশিষ্ট সাহিত্যকীর্তি। অতঃপর স্টাইনবেক ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভার তীক্ষ্ণতাকে সহজবোধ্য, নাটকীয়, তরলতর গল্প বলার কাজে ব্যবহার করে নিজেকে সংকুচিত করেছেন। 'ওয়েওআর্ড বাস' বা 'ইআর্স অফ জনি বেয়ার' 'পার্ল' ইত্যাদি উপন্যাস ও গল্পের তিনি এখন কুশলী লিপিকারমাত্র। আত্মতৃপ্তি তাঁকে আজ অচেতন করেছে হয়ত। হয়ত অজস্র ডলারের অভিশাপ জীবন সন্ধানী স্টাইনবেককেও স্পর্শ করেছে।

ডস পাসজ-এর সমকালে এবং পরে কয়েকজন ক্ষমতাশালী কথাশিল্পী প্রোলেতারীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারকে ভরে তোলেন। জ্যাক কনরয় (১৮৯৯-) 'দি ডিস্ইনহেরিটেড' (১৯২১) উপন্যাসে আমেরিকার প্রথম মহাযুদ্ধকালীন

যুগ-বিক্ষোভকে লিপিবদ্ধ করেন। শ্রমিক জীবন নিয়ে তিনি অনেক বই লিখেছেন তার মধ্যে 'ওআর্লড টু উইন' উল্লেখযোগ্য। জোসেফাইন হার্বস্ট্ (১৮৯৭-) 'পিটি ইজ নট এনাফ' (১৯৩৩) প্রমুখ তিনটি উপন্যাসে একটি পরিবারের ধারা অনুসরণ করে আমেরিকার একশ' বছরের ইতিহাসকে উদ্ঘাটিত করেছেন। মাইকেল গোল্ড (১৮৯৬-) 'জু'স্ উইদাউট মানি' (১৯৩০) উপন্যাসে দরিদ্র ইহুদীদের জীবন-চিত্র এঁকেছেন। আলবার্ট হালপার (১৯০৪-) জীবনের বহু ক্ষেত্র থেকে তথ্য আহরণ করে ডকুমেণ্টারী উপন্যাস লিখেছেন। রবার্ট ক্যাণ্টওয়েল (১৯০৮-) কাঠের ব্যবসা নিয়ে 'দি ল্যাণ্ড অফ প্লেনটি' (১৯৩৪) লিখেছেন। মেরী হীটন ভার্স-এর 'স্ট্রাইক' এবং গ্রেস লাম্পকিনের 'টু মেক মাই ব্রেড' (১৯৩২) উল্লেখের দাবী রাখে।

জেমস্. টি. ফারেল (১৯০৪-) এক ছিন্নমূল আইরিশ পরিবারের সন্তান। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে থিওডোর ড্রেজার-এর মন্ত্রশিষ্য। 'ইয়ং লোনিগান' (১৯৩২) 'দি ইয়ং ম্যানহুড অফ স্টাড্ স লোনিগান' (১৯৩৪); এবং 'জাজমেণ্ট ডে' (১৯৩৫) এই তিনটি উপন্যাস একসংগে গ্রথিত করে তিনি 'স্টাড্ স লোনিগান' নামে প্রকাশিত করেন। এই বইটিকে সমালোচকরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। স্টাড্ স লোনিগানের জন্ম, তার জীবন, জীবনসংগ্রাম, প্রেম এবং মৃত্যুর ইতিহাস ফারেল অনুকম্পায়ী ভাষায় ও হার্দ্যকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। তিনি ডকুমেণ্টারী ঢং-এ উপন্যাস লিখবার পক্ষপাতী। ড্রেজার-এর মতো তাঁর কোন গভীর দর্শন নেই। নেই কোন আত্মজিজ্ঞাসা। অনাবশ্যক ভাবে কাহিনীকে বিলম্বিত করে তিনি ক্লান্তিকর করে তোলেন। তাঁর ভাষা প্রসাদগুণ বঞ্চিত। তবু ফারেল সৎ এবং জীবন-নিষ্ঠ। গভীর নিষ্ঠায় তিনি জীবনের সত্য-সংবাদ সন্নিবেশিত করেন। ফারেল অন্যান্য গল্প ও প্রবন্ধ গ্রন্থও রচনা করেছেন।

হাওআর্ড ফাস্ট (১৯১৪-) এই শতকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর রাজনীতিক মতবাদের জন্য সমালোচকরা তাঁর বইগুলিকে আলোচনায় স্থান দিতেন না। যদিচ হাওআর্ড ফাস্ট-এর সাহিত্যিক-প্রতিভা এমনই অবিসংবাদী সত্য যে তাকে অস্বীকার করতে পারেননি প্রকাশকরা এবং হাওআর্ড ফাস্টের বই বহু-প্রচারিত, বহুল-পঠিত হয়েছে। হাওআর্ড ফাস্ট যখন রাজনীতির দল বদল করলেন, তখন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে অনেকে

ব্যগ্র হলেন। কিন্তু তখন হাওআর্ড ফাস্ট এক নিঃশেষিত প্রতিভা। তখন তাঁর পক্ষে শুধু 'নেকেড গড্' লেখাই সম্ভব, এবং 'নেকেড গড্' নেহাৎই অনুল্লেখ্য, ক্লান্তিকর এক অভিজ্ঞতা। সিয়ুক্স ইণ্ডিআনদের জীবন সম্পর্কে (সম্ভবত হ্যামলিন গারল্যাণ্ড অনুসরণে) হাওআর্ড ফাস্ট উৎসাহিত হন। 'লাস্ট ফ্রান্টিয়ার' সেই উৎসাহের ফলশ্রুতি। আমেরিকার আদিম বাসিন্দারা ক্রমবর্ধমান শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার দাপটে কি ভাবে উৎসন্ন ও নির্মূল হয়ে গেল তারই এক মর্মস্পর্শী আলেখ্য 'লাস্ট ফ্রন্টিআর।' ফাস্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে জানেন। তিনি ইতিহাসের ঘটনা-পঞ্জীকে নিয়ে ব্যস্ত হন না। তিনি মানুষকে খোঁজেন। যারা ইতিহাস সৃষ্টি করে, ফাস্ট সেই মানুষদেরই পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, একটি যুগচিত্র, কখনো একটি মাত্র বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে সম্পূর্ণ হতে পারে না। যে সব অখ্যাত, নামহীন মানুষ ইতিহাস গড়ে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাদের স্থানই সর্বাগ্রে। গল্প, স্টাইল ও ভাষার জাদুকর ফাস্ট-এর প্রতিভার সম্যক পরিচয় 'ফ্রীডম রোড' (১৯৪৪); 'সিটিজেন টম পেইন' (১৯৪৩) প্রভৃতি উপন্যাসে বিদ্যমান। 'স্পার্টাকাস' (১৯৫২) অবশ্য খুব প্রশংসিত হয়ে থাকে। খ্রীস্টজন্মের পূর্বে রোমান শাসকদের বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের এই 'সাগা'-টি বহুল-খ্যাতি পেয়েছে। কিন্তু পড়লে মনে হয়, এই উপন্যাসে ফাস্ট যেমন সিদ্ধির শিখর ছুঁয়েছেন, তেমনি বহু বিচ্যুতিও একে ভারাক্রান্ত করেছে। রোমান শাসকদের চরিত্রকে সহসা মহৎ প্রেমের আদর্শে উজ্জীবিত করেছেন ফাস্ট, ভাবালুতা দোষে দুষ্ট হয়েছে তাঁর রচনা, প্রেম ও রমণী ঘন ঘন প্রবেশ করেছে সংকট মুহূর্তে। তবু 'স্পার্টাকাস'-এর একটি বিশেষ মূল্য থাকবে এবং মানুষের ইতিহাস-চিত্রণে পারঙ্গম ফাস্ট সুধী ও নিরপেক্ষ পাঠকের কাছ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাবেন।

আলেকজাণ্ডার স্যাক্স্টন (১৯১৯-) একজন ক্ষমতাবান প্রোলেতারীয় লেখক। তাঁর 'গ্রেড মিডল্যাণ্ড' (১৯৪৮) উপন্যাসের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শিকাগোর রেল ইআর্ড 'মিডল্যাণ্ড'-এর নিগ্রো, পোল, ইহুদী, জর্মান, আমেরিকান ফরাসী ও ইংরাজ শ্রমিকদের জীবন নিয়ে এই উপন্যাস। নিছক তথ্য ও তত্ত্ব-বহুলতা, বা দলিল-ধর্মিতা এ উপন্যাসে অনুপস্থিত। স্যাক্স্টনের একটি নিজস্ব দর্শন আছে। অ-মার্ক্সীয়দের সততা, সাহস, বিদ্যা-বত্তাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। চার্চ ও ধর্মকে তিনি স্বীকার করেন। তাঁর

দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ এবং উদার। তা সকল মানুষকেই আলিঙ্গন করে। প্লেজার ম্যাকঅ্যাডামস, স্টিফানী, ডেড, রুবি, রেড, কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে তিনি উপন্যাসটিকে উন্মোচিত করেন। তিনি ঘটনার বহিরঙ্গ দেখেন না। অন্তরাশ্রয়ী চোখে তিনি মানুষের মনের জটিল গ্রন্থিচ্ছেদ করেন। তাঁর উপন্যাসে বৃদ্ধ নিগ্রো গভীর হতাশায় বলে 'War can never be over with us. While we had been laying our lives fighting the Germans, the war had been waiting on our very doors. This leaves me baffled.' তাঁর উপন্যাসের কম্যুনিস্ট রেড প্রতিপক্ষের ইউনিয়ন লীডার-এর সাহসকে প্রশংসা করে—'He commands my respect, I respect him.' স্যাক্স্‌টন এমন একজন লেখক, যাঁর কাছে পাঠকের বহু প্রত্যাশা থেকে যায়।

কয়েকজন লেখকের একটি দু'টি ছোটগল্প ও উপন্যাস প্রোলেতারীয় রীতির সত্যকে ছুঁয়েছে। তাদের মধ্যে 'হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অন দি আর্থ'—আলবার্ট মাল্‌ৎজ (১৯০৮-); 'লয়্যাল মিস ফার্চ'—অ্যালান ম্যাক্স ; 'দি আয়রন সিটি' (উপন্যাস)—লয়েড ব্রাউন ; 'জনি কুকু'জ রেকর্ড'—ফিলিপ বোনেস্কি ; 'দি য়েগু অফ দি ওঅর'—জে. উইলিয়ামস্‌ উল্লেখযোগ্য। এই সব ছোটগল্প ও উপন্যাসে জীবনের তথ্যনিষ্ঠ অনুকম্পায়ী রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে।

আরনেস্ট মিলার হেমিংওয়ের (১৮৯৮-১৯৬১) মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে দ্বিধামুক্ত প্রাক্‌কলন করতে গিয়ে বারবার এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির উপর যতখানি বিশ্বাসারোপ করা হয়েছিল, হয়ত ততখানি শ্রদ্ধা বা আস্থা তাঁর প্রাপ্য নয়। তিনি যত না মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার অধিক জনপ্রিয়তা পাওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটেছে। তিনি নিজের সম্পর্কে আশ্চর্য একটি কৌতূহল পৃথিবীর জনমানসে ছড়িয়ে রেখেছিলেন কিন্তু সেই পরিমাণ প্রতিভূতি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। ভাগ্যক্রমে প্রচুর সংভার ছিল তাঁর, সাংবাদিকতার দৌলতে জীবনের উত্তেজনা, বৈচিত্র্যকে চাক্ষুষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি, হয়ত রচনার এক বিশেষ রীতি ও ভংগীকেও আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তাই ধীরে ধীরে তাঁকে ঘিরে একটি বৃহৎ ব্যক্তিত্বের বেষ্টনী গড়ে উঠেছিল যার বাইরে দাঁড়িয়ে মানুষ তাঁকে জনপ্রিয় সম্মান দিতেই শিখেছিল। যদিচ আজ সন্দেহ হয় তাঁর সেই গভীর প্রজ্ঞাবিজড়িত ব্যক্তিত্বের

বেষ্টনটুকু অনেকখানিই ফাঁকা, মিথ্যা। তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী জেনেও সেকথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। হেমিংওয়ে তাঁর সারা জীবনের কর্মধারার সংগে সংগতি রেখেই মৃত্যুকে বরণ করেছেন। সারাজীবন ধরে যে উত্তেজনা এবং কৌতূহলের সংগে খেলা করেছেন তিনি, শেষ দিনেও তার অমোঘ সংগ ও সাহচর্যকে এড়াতে পারেননি। তাঁর মৃত্যু খুব স্বাভাবিকভাবেই রহস্যময়তা জ্ঞাপন করেছে, যে রহস্যময়তা হেমিংওয়ের স্বভাব-সম্পৃক্ত নিত্যদিনের সাথী। কৈশোরে মিচিগান-এর অরণ্যে অরণ্যে তিনি শিকার ক'রে আর মাছ ধরে বেড়িয়েছেন। যৌবনাবস্থায় কানসাস সিটির সাংবাদিকতা করেছেন সফলভাবে। প্রথম মহাযুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হ'য়ে যখন রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন তিনি, তখন মৃত অনুমিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হন। বারংবার যুদ্ধে যোগদানের নেশা কখনোই কাটাতে পারেননি হেমিংওয়ে। আর, এইসব যুদ্ধে একাধিকবার জীবনসংশয় ঘটেছে তাঁর, সারা দেহে ন'বার গুলির আঘাত লেগেছে, গুরুতরভাবে জখম হয়েছে মাথা, আর আফ্রিকার জঙ্গলে বিমান দুর্ঘটনার রোমহর্ষক সংবাদ তো অতি অল্পকালেরই ঘটনা—তবু তিনি মৃত্যুর সংগে খেলা করতেই ভালবেসেছেন।

যদিও 'কীলার' (১৯২৭) গল্পটি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত হেমিংওয়ের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়নি তবু প্রথম গ্রন্থ দুটি 'দি স্টোরীজ অ্যাণ্ড টেন পোয়েমস' (১৯২৩) এবং 'ইন আওয়ার টাইম' (১৯২৪) তাঁর আগমনের আভাস জানিয়েছিল। এবং আরো চারটি উপন্যাস তাঁকে সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ দুটি প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং শোনা যায় 'ইন আওয়ার টাইম' গ্রন্থটি গার্ট্রুড স্টাইন এবং এজরা পাউণ্ড দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়। হেমিংওয়ে তাঁর এই প্রথম বইতে যে বিষয়মুখ প্রযুক্তি এবং দার্ঢ্য চরিত্রারোপের ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন, পরে সেই ক্ষমতা এবং সবিশেষ ভঙ্গীটুকুই তাঁর মধ্যে সুবিপুল আয়তনে প্রসারিত হয়। তাঁর অধিকাংশ চরিত্ররাই অনমনীয়, কঠিনচেতা—হয় তারা 'লস্ট জেনারেসন' সম্প্রদায়ের বিদগ্ধজন, নয়ত সৈনিক, সীমান্তরক্ষী, বুল ফাইটার কিংবা জল্লাদ। অন্যদিকে নিক অ্যাডামস্ চরিত্রটি হেমিংওয়ের ধারণা-রোপক। সে শান্তিকামী, সে জানে যুদ্ধক্ষেত্রের উন্মাদনা এবং মৃত্যুর ভয়ংকর স্বাদের সংগে গৃহের শান্ত, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কত পার্থক্য। তাই, ইতালীর যুদ্ধে এক মুমূর্ষু সৈনিকের সংগে সে গোপনে

সন্ধি রচনা করে, শান্তির সন্ধি, বলে, 'তুমি আর আমি, আমরা এক আলাদা শান্তি রচনা করলাম।' যুদ্ধোত্তর কালে যে জীবনে নিরাপত্তা রইল না, যে গভীর ক্ষত সমাজজীবনকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলল, হেমিংওয়ে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দি সান অলসো রাইজেস্'-এ (১৯২৬) নাইট ক্লাব আর কেতাদুরস্ত বার-এর সেই জীবনকে ব্যক্ত করলেন, কিন্তু একান্ত নৈরাশ্যের সুরে শেষ হলো না উপন্যাসটি। লেডি ব্রেট অ্যাসলে অত্যন্ত চটুল ও অশোভন জীবনযাপন করেও চৈতন্যে উদ্রিক্ত হয়। তরুণ বুলফাইটারটি তার মধ্যে মর্যাদাবোধের উপলব্ধিটুকু অংকুরিত করে। ব্রেট অনুভব করে যে, জীবনে হয়ত যন্ত্রণা পাওয়া এবং যন্ত্রণা দেওয়ার অধ্যায়টুকু এড়ানো যায় না, হয়ত শেষ পর্যন্ত মানুষকে পরাজয়ের অনিবার্য পরিণতিতে স্তিমিত হতে হয়ই তবু সম্মান ও মর্যাদাকে বজায় রেখে পরাজয়কে আলিঙ্গন করায় পরিতৃপ্তি আছে, স্বস্তি আছে। 'ফেআরওয়েল টু আর্মস্'-এর (১৯২৯) কেন্দ্রবিন্দু যদিও যুদ্ধ নয়, প্রেম-ই মুখ্যবস্তু, তবু যুদ্ধ তার পশ্চাদ্‌ভূমি। এক আমেরিকান লেফ্‌টেন্যাণ্ট এবং ইংরাজ নার্স যুদ্ধের প্রচণ্ড তাণ্ডবে অস্থির হ'য়ে প্রেমের শান্তিতে বিশ্রাম খুঁজল। উভয়েই তারা ক্লান্ত, তাদের স্নায়ু আর যুদ্ধের ভয়ংকরতাকে সহ্য করতে পরাঙ্মুখ। এই সময়োচিত মিলনে সাময়িক মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেল তারা এবং সুইজারল্যাণ্ডে স্বল্প অবকাশ রচনা করল, কিন্তু তাদের আশার সফল পরিসমাপ্তি ঘটল না। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে নার্সটি মারা গেল। বইটি শেষ হলো এক করুণ বিয়োগান্ত সুরে। 'ফেআরওয়েল টু আর্মস্' যে তেমন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি নয়, সেকথা বোধহয় হেমিংওয়ে স্বয়ং অবহিত ছিলেন। কারণ, বইটিকে তিনি নিজেই একদা রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনী ব'লে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। কিছু বর্ণনার কৌশল ছাড়া, উপন্যাসটি এক আদর্শীকৃত, আবেগসম্পৃক্ত প্রেমোপাখ্যান মাত্র, হেমিংওয়ের বৈশিষ্ট্যবিচ্যুত। এমন কি যে চরিত্র রচনা ও নিরাসক্ত সংলাপ সৃষ্টির জন্য তাঁর প্রসিদ্ধি, তা-ও এই গ্রন্থটিতে আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। হেমিংওয়ের বিরুদ্ধে বামপন্থী সমালোচকরা কিছুকাল ধ'রে অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, হেমিংওয়ে রাজনৈতিক ও সমাজজীবনের সমস্যাকে তাঁর রচনায় তেমন উচ্চাদর্শে স্পর্শ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও যেন ধীরে ধীরে মানুষের প্রতি, তাঁর চারপাশের প্রতি আর আগ্রহীর মনোভাব দেখাতে পারছিলেন না। 'It is as if he were throwing himself on African hunting as something to live

for and believe in, as something through which to realize himself ; and as if expecting of it too much, he had got out of it abnormally little, less than he is willing to admit.' তাই ১৯৩০ সালে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন ক'রে ফ্লোরিডায় এক বাড়ি কিনলেন এবং তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'টু হ্যাভ অ্যাণ্ড হ্যাভ নট' (১৯৩৭) রচিত হলো ফ্লোরিডার অবিন্যস্ত ও উদ্বেজক জীবনকে আশ্রয় ক'রে। আমেরিকা-কেন্দ্রিত উপন্যাস এই তাঁর প্রথম। চার্লস মর্গ্যান এক পুরনো জলদস্যু, তুখোড় চরিত্রের মানুষ। সে আপন পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য নানারকম লড়াই করেও যখন সফলকাম হলো না, তখন ধীরে ধীরে খুন, রাহাজানি, চোরাই-চালান ইত্যাদি অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে বেঁচে থাকার উপাদান খুঁজল। শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি ক'রে গেল যে, এই কঠিন পৃথিবীতে একক সংগ্রামের কোন মূল্য নেই, তা একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেই। উপন্যাসটি সম্পর্কে বহুজনই সন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন নি। অত্যন্ত অসংলগ্ন ভাবে গঠিত এই রচনাটিতে হেমিংওয়ের চিন্তা নতুন কোন ঐশ্বর্যে উজ্জীবিত হয়নি এবং প্রকাশিত অন্য উপন্যাস অপেক্ষা এতে কোন অগ্রসরের আভাস বিতীর্ণ ছিল না। এডমাণ্ড উইলসন, 'লিটারেচার ইন আমেরিকা' গ্রন্থের নিবন্ধে বলেছেন, seems to me the poorest of all his stories.' ১৯৩৬ সালে হেমিংওয়ে স্পেনের রক্তোন্মাদ গৃহযুদ্ধ দেখেছিলেন। স্পেন সম্পর্কে তিনি দুর্বলতা প্রকাশ করে এসেছেন বরাবর। তাই কম্যুনিস্ট এবং স্পেনীয় লয়্যালিস্টদের অসমসাহসিকতায় তিনি মুগ্ধ হ'য়ে একটি নাটক লিখলেন 'ফিফ্‌থ কলাম' নামে এবং নিজেও দলে যোগ দিলেন। মার্ক্সীয় দর্শন তখন আমেরিকার সাহিত্যশিল্পীদের উপর এবং পেশাদার শ্রেণীর উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছিল। হেমিংওয়ে অবশেষে সেই তত্ত্বের ভজনায় অবতীর্ণ হলেন, যদিচ 'ফর হুম দি বেল টোলস্' (১৯৪০) উপন্যাসে স্ট্যালিনবাদ থেকে অনেকাংশে মুক্ত হ'য়ে তিনি পুরনো বিশ্বাসে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিকূলতায় সংগ্রাম করার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করার বিশ্বাসে। রবার্ট জোর্ডান যুদ্ধের সময় লয়্যালিস্ট ফোর্স-এ যোগ দিয়েছিল। একটি সেতুকে ধ্বংস করার কালে, অপ্রত্যাশিতভাবে মারিয়া নামে একটি তরুণীর সংগে তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেতুটি উড়িয়ে দেবার পর জোর্ডান আহত হয়, তাঁর একটি পা যায় ভেঙে। শেষ পর্যন্ত তার এই বিশ্বাস জন্মে যে, পৃথিবীটা কিছু খারাপ জায়গা নয় এবং এখানে

সংগ্রাম ক'রে বেঁচে থাকারও মানে আছে। 'ফর হুম দি বেল টোলস্'কে হেমিংওয়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন কেউ কেউ। ন্যুইঅর্ক টাইমস্-এর জে. ডোনাল্ড অ্যাডামস বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'the fullest, the deepest, the truest' এবং তিনি আরও বলেছিলেন যে, উপন্যাসটি আমেরিকার অন্যতম প্রধান গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হবে একদিন। কিন্তু হেমিংওয়ে তাঁর সকল অভ্যস্ত কৌশলকে পরিত্যাগ ক'রে একটি স্থির প্রত্যয়কে সফল করতে পেরেছিলেন 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' (১৯৫২) উপন্যাসে। এতকাল ধ'রে তিনি যে সম্পূর্ণতার সন্ধান ক'রে এসেছেন তা এখানে সফল রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি নিজেও বলেছিলেন, 'সারাজীবন ধ'রে আমি যে চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলাম শেষ পর্যন্ত এতে বোধহয় তা সম্পূর্ণতা পেয়েছে'। যদিও প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে সমশক্তির এই সংগ্রামের পরিকল্পনা সাহিত্যে খুব মৌলিক নয়। আমেরিকারই আরেক ক্ষমতাসম্পন্ন ঔপন্যাসিক উইলিআম ফকনার এই পরীক্ষাকে তাঁর সাহিত্যের সত্য ক'রে তুলেছেন। 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'-তে মাছ এবং বৃদ্ধ দু'জনেই অস্তিত্বের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। গ্রেস আণ্ডার প্রেসার-এর নীতিকে যদি তারা না-মানে তাহলে একজনের বিনাশ ব্যতীত অপরজনের বাঁচা সম্ভব হয় না। কেননা, তারা দু'জনেই সমান শক্তির নায়ক। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের পরাজয় ঘটল। দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত মুহূর্তে মাছটি তার হস্তগত হয়েও পুরোপুরি পরাস্ত হলো না। মানুষেরও এই একই বেদনার ইতিহাস। কিন্তু যেহেতু গভীর নৈরাশ্যজনক উপসংহারে হেমিংওয়ে বিশ্বাসী হতে পারেন না, সেহেতু তিনি শেষে একটি সুন্দর আদর্শ জুড়ে দিয়েছেন : 'Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated.' হেমিংওয়ের কাহিনী ও উপন্যাসে নারীদের স্থান অল্প। বিশেষ কার্যকারণ ব্যতীত তাঁর ভ্রান্ত অহমিকা নারীর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে চায় নি। এমন কি, 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'র মাছটিও যে পুরুষ তা-ও তিনি জানাতে ভোলেন না। হেমিংওয়ে, জীবনের মহাদেশ থেকে বারংবার সরে গেছেন, যতই তিনি স্বতন্ত্র শান্তি এবং যুদ্ধবিরতির কথা বলুন না কেন, আসলে তিনি মানুষকে পূর্ণরূপে এবং প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পাননি শুধু এক উন্মত্ত নেশায় আরো হিংস্রতা এবং আরো মৃত্যুর অন্বেষণে ফিরেছেন। তাঁর অনন্য স্টাইল এবং রচনারীতি, যা তিনি বহু প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করেছিলেন এবং পরে যা

বহুজনের দ্বারা সানুরাগে অনুসৃত হয়েছে, পরিশেষে সেটিই তাঁর সাহিত্যিক সত্তায় অমোঘ কৌশলে কাজ করে, তিনি তার মায়ায় বশীভূত হন। ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে তাঁর ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর সফলতার সীমা প্রসারিত করে নি সেই সব গল্প। 'True, many of the short stories he wrote during these years have been highly praised, and of course they are written with great skill ; but not only do they fail to show any signs of a major novelist arriving at his maturity, they suggest that something false, false to life and to art, is creeping in, a touch of cynical swagger, a hint of bogus profundity, as if he is now unconsciously begining to parody himself.'

আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের আঞ্চলিক চেতনা বড় প্রখর। গৃহযুদ্ধের পর উত্তর বা পশ্চিমাঞ্চলের মতো দক্ষিণ শিল্পযোজনায় কিংবা লার্জ স্কেল ক্যাপিটালিজম্‌কে আশ্রয় ক'রে অগ্রসরিত হয়নি। অতীতের স্মৃতি রোমন্থনেই দক্ষিণাংশের কাল কেটেছে। এবং এই মুগ্ধ অতীত থেকেই দক্ষিণপ্রান্তের লেখকরা তাঁদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দক্ষিণের আঞ্চলিক চেতনার অবসান ঘটতে থাকে এবং তার লেখকরা একান্ত বাস্তবতায় দক্ষিণাঞ্চলের জৈবনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে কঠিন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হন। বিংশ শতাব্দীর বহুব্যাপ্ত জীবন হয়ত তাঁদের আগ্রহী করল না কিন্তু ফকনর, কল্ডওয়েল, র‍্যানসম, অ্যালানটেট, ওয়ারেন প্রমুখ সাহিত্যশিল্পীরা অতীতের মুগ্ধবোধকে কাটিয়ে বিংশ শতকী বাস্তবতায় দক্ষিণের বিপর্যস্ত গৃহ, স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ী-শোষিত সাধারণ মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্য এবং তাদের নগ্ন প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তিকে, তাদের হানাহানি, জীবনের অসহ গ্লানিকে রচনায় রূপ দিতে থাকলেন। একদা যে দক্ষিণাঞ্চল সমৃদ্ধির সোপানে অবস্থিত ছিল, শুধু তার সেই অতীত 'মিথ্'টুকু নিয়েই তাঁরা আর সাহিত্যচর্চা করলেন না, অতীত অতিকথা থেকে অতিক্রান্ত হ'য়ে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত, 'নেড়ী কুত্তাদের দেশ' বা পেরিআ কান্ট্রিকে নিয়ে নতুন 'মিথ্' রচনায় উদ্যত হলেন।

উইলিআম ফক্‌নর (১৮৯৮-) দক্ষিণাঞ্চলের সেই অতীত ঐতিহ্য, তার গৌরবময় স্মৃতি, সম্মান ও শিভ্যাল্‌রির 'মিথ্'কে অন্ধভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি কদাপি, বরং তিনি তা ভেঙে দিতেই সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি তাঁর সমগ্র

সাহিত্য-কর্মে এই কথাই প্রধানত বলে থাকেন যে, আজকের দক্ষিণের দরিদ্র মানুষও হয়ত তার সেই অতীত ঐতিহ্যকে বহন করছে, কিন্তু অন্য রীতিতে, পরিবর্তিত রূপে। 'He has investigated the myth itself; wondered about the relation between the southern tradition he admires and that memory of southern slavery to which he is compelled to return ; tested not only the present by the past, but also the past by the myth, and finally the myth by that morality which has slowly emerged from his entire process of work.' ফক্‌নর স্বয়ং দক্ষিণের বাসিন্দা। তিনি মিসিসিপির অক্সফোর্ডে এক দরিদ্র অথচ সম্মানিত পরিবারে বর্ধিত হন। এখানে সর্বসাকুল্যে ১৫,৬১১ জন বাসিন্দা আছে। ২৪০০০ স্কোয়্যার মাইল-বিশিষ্ট এই জায়গাটি মিসিসিপির পাহাড় ও কালো উর্বর জমির মাঝখানে অবস্থিত। যে-জায়গার দিন ও রাতের বর্ণনায় ফক্‌নর স্বয়ং বলেছেন, Piney, winey afternoons! ...nights with a thin sickle of moon like the heel print of a boot in wet sand,' দীর্ঘাকার নদী, বিকালবেলা ঘুমন্ত হয়ে থাকে এবং তার রঙ হলুদ দেখায়। ধ্বংসীকৃত খামারবাড়ি আর অরণ্যের অবশেষ দৃষ্টির দিগন্তকে ছুঁয়ে যায়। ফক্‌নর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কিছুকাল সাংবাদিকতা করেছিলেন তখন শরুড্‌ অ্যাণ্ডার্সন্‌-এর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ঘটে তাঁর। তিনিই ফক্‌নরকে কবিতার চেয়ে গদ্যকাহিনীতে মনোযোগী হ'তে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সোল্‌জর্স পে' (১৯২৬) প্রকাশিত হবার পর আর্নল্ড বেনেট যদিও বলেছিলেন ফক্‌নর হচ্ছেন 'কথাসাহিত্যের ভাবী সম্রাট' কিন্তু উইণ্ড্যাম ল্যুইস তাঁর রচনায় সভ্যতার অভাব ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করেন নি। 'সার্টোরিস' (১৯২৯) ফক্‌নর-এর তৃতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি একটি অর্ধোন্মাদ পরিবারের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কলা-কৈবল্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হননি বটে, কিন্তু সংবেদনশীলতার শুদ্ধ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন, "সার্টোরিস'-এ যে-গাম্ভীর্যের সাড়া শুনেছিলুম, যে-বিশ্ববীক্ষার সন্ধান পেয়েছিলুম, তার পরে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মন আর কোনও প্রশ্ন তোলে নি ; বুঝেছিলাম যে আজ না হোক, কাল না হোক, পাঁচ, সাত, দশ বৎসর বাদে তিনি একখানা স্মরণীয় উপন্যাস লিখবেনই লিখবেন"। তিনি আরো বলেছেন যে, "সার্টোরিস" পাঠান্তে বোঝা গিয়েছিল ফক্‌নর সিদ্ধির দিক দিয়ে খুব বড় ঔপন্যাসিক না হলেও সম্ভাবনার বিচারে তাঁর স্থান উচ্চে। প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাসের ('মসকুইটোস' ; ১৯২৭) আশানুরূপ

স্বীকৃতি দেখতে না-পেয়ে ফকনর অনুভব করেছিলেন যে, চিরাচরিত প্রথায় উপন্যাস রচনা করলে তাঁর চরিত্রদের আচরণ অতি-নাটকীয় বদনাম পাবার আশংকা আছে এবং লেখকের কপালে কষ্টকল্পনার প্রবর্ধক অখ্যাতিটি জুটে যাবার সম্ভাবনা। তাই, তিনি স্বতন্ত্র এবং স্বকপোলকল্পিত এক পথ সৃষ্টি করলেন। ইতিমধ্যে ১৯২২ সালে জয়েস-এর 'য়ুলিসিস' চেতনা প্রবাহের ধারাকে উন্মুক্ত করায় তিনি তাতে উৎসাহিত হন কিন্তু আকৃষ্ট হন না। নিরস সংবাদদাতার ভূমিকাও তিনি পরিহার করেন অথচ চেতনা অনুসরণেও অনাগ্রহী ফকনর নিজের জন্য অন্য রাস্তা অবলম্বন করেন। 'Intricate and torturing emotions, twisted and obscure, of obsessions and fixations and depravities, are most difficult to express and to explain in words, yet it is those very inexpressible that Falkner succeeds, at his best, in making the reader believe and understand.' 'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফ্যুরি' (১৯২৯) ফকনর-এর সাফল্যমণ্ডিত পরীক্ষামূলক উপন্যাস। এতে তিনি নানা উপায়ে, নানা কৌশলে সময়কে ব্যবহার করেছেন। এক একটি বিশিষ্ট তারিখ দিয়ে এই উপন্যাসটি চারটি অংশে বিভক্ত। সিনেমার ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতির মতো তিনি এতে অতীতকে উপস্থাপিত করেছেন, এবং একই সময়ে, একই চরিত্রের যুগপৎ অতীত ও বর্তমান আশ্চর্য কৌশলে লীলায়িত হয়েছে। ফকনর দেখিয়েছেন যে, তাঁর চরিত্ররা মুখে কথা বলছে বটে কিন্তু তাদের মন অতীত রোমন্থনে ব্যস্ত। 'স্যাংচুয়ারী' (১৯৩১) বইটি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে অবসর বিনোদনের জন্য যাঁরা পড়তে যাবেন, তাঁরা হতাশ হবেন। 'কিন্তু যাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তার ভক্ত, সাধনাকে যাঁরা সিদ্ধির চেয়ে বড় ক'রে দেখেন, উপন্যাসের ঊর্ণাতন্তুর অবলম্বন খোঁজেন জীবনসৌধের আনাচে-কানাচে, তাঁরা হয়তো মানবমনের অন্ধকার মহলে এই অস্থায়ী প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে ফকনর-কে ধন্যবাদ জানাবেন'। নৃশংসতা এবং ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা, যা ফকনর-এর সাহিত্যসৃষ্টির সংগে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, 'স্যাংচুয়ারী'-তে তা এত উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ফকনর নিজে পর্যন্ত সেটিকে নিন্দা করেছেন। ফকনর জানেন, বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতা যেখানে উত্তুঙ্গ হয় নি, সেখানকার মানুষ সরল, সম্পূর্ণ, তাদের প্রেম, জিঘাংসা, স্নেহ, লোভ সবই নগ্ন এবং স্পষ্ট। তাদের চিদ্‌বৃত্তি এবং আচরণ অনেক স্বাভাবিক। তাদের প্রক্ষোভ অতর্কিত এবং অরক্ষিত। জীবন সংগ্রামে তাদেরই কষ্টের শেষ থাকে না। কেননা, যেহেতু তাদের উপর

সভ্যতার প্রলেপ পড়ে নি, সেহেতু তারা ছলনা, কপটতার বর্মকে ব্যবহার করতে জানে না। তাই, 'স্যাংচুয়ারী'-তে বেনবো ও তার স্ত্রীর জীবনে যখন শহরজাত পোপিয়্যির আগমন হলো, তখনই ঘটল সেই নির্বোধ হত্যাকাণ্ডটি এবং টেম্পল ড্রেক, যে আরেক শহরের জীব এবং যার দেহের স্বাদ পেয়েছিল পোপিয়্যি, সে মূর্খের মতো নিরীহ ও নির্দোষ বেনবো-র বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বসে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন এক কঠিন জটিলতায় জড়িয়ে যায়। জেলে বেনবোদের 'লিঞ্চিং' (দক্ষিণ আমেরিকাই লিঞ্চিং-এর জন্মভূমি) সমাধা হয়। প্রকৃতি ফক্নর-এর সাহিত্যে আশ্চর্য তন্ময়তায় সাধিত হয়েছে। এটা তাঁর এক বিশেষ এবং ঐকান্তিক অধ্যয়ন ও অনুশীলন। 'স্যাংচুয়ারী'র পোপিয়্যি সমাজ-বিরোধী মানুষ। জীবনে সে খাঁচার পাখী ছাড়া আর পাখী দেখে নি। প্রকৃতির বিশাল, উন্মুক্ত নিঃসংগতা দেখে সে হতবাক হয়, অসহায় বোধ করে। নিজেকে খুব ক্ষুদ্র এবং নিরাপত্তাবিহীন মনে হয়। মনের সেই অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাতে তাই সে ঝর্ণার জলে থুথু ফেলে, প্যাঁচাকে গাল পেড়ে সহজ হতে চায়। আর, এই প্রকৃতি তাঁর 'দি হ্যামলেট', 'স্পটেড হর্স', 'দি ওআইল্ড পাম্‌স', 'ওল্ড ম্যান' ইত্যাদি উপন্যাস ও কাহিনীতে কোথাও কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে, কোথাও গৃহের শান্ত মাধুর্য বিকীরণ করেছে, কোথাও বা আবার ভয়ংকর গম্ভীরতায় স্তব্ধ থেকেছে। 'ডেল্টা অটাম' কাহিনীতে আইক ম্যাককাসলিন বলছে, 'দেবতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মানুষের বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। আমার বিবেচনায়, তিনি পৃথিবীটাকে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে, যদি তিনি মানুষ হতেন এবং যদি চাইতেন, তাহলে সেখানে বাস করতে পারতেন'। কিন্তু মানুষ দেবতা নয়। মানুষ ঈশ্বর হলে সে প্রকৃতিকে ভালবাসত, ভালবেসে তৃপ্ত হতো। তা নয় বলেই মানুষ প্রকৃতিকে নির্মূল করে, সংহার করে। কিন্তু ফক্নর-এর এই প্রকৃতি-সাধনারও একটি 'কোড' আছে। তিনি বলেছেন ভালুক, হরিণ, অরণ্য এ সবই প্রকৃতি ও ঈশ্বরের প্রতীক, প্রতিভূ। আদিম এবং অনাদি সৌন্দর্য। এই চিরাগত সৌন্দর্যের সংগেই মানুষের নিত্য সংগ্রাম চলে। মানুষ যখন খাদ্যের প্রয়োজনে কিংবা নির্মোহ মনে শিকার ও সংহারে মাতে তখন সেটা হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই সংগ্রাম, সংহার, মৃত্যু ও হত্যাতে মানুষ আপনাকে পরিশোধিত করে। কিন্তু যখনই তার মধ্যে লোভ ও লালসা কার্যকরী হয় তখনই মানুষকে কলংক স্পর্শ করে। তাঁর এই বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে 'দি

বিআর' কাহিনীতে সেই প্রাচীন, রূপকাশ্রিত ভল্লুক-হত্যায় এবং 'ডেল্টা অটাম'-এর হরিণ শিকারে। ফক্‌নর-এর 'লাইট ইন অগাস্ট' (১৯৩২) উপন্যাসকে সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, গ্রীক নাট্যসাহিত্যের বাইরে দুষ্প্রাপ্য এক ঈডিপাস জাতীয় উপন্যাস···অমৃতের পুত্র। এতেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বর্বরতা ও নৃশংসতা উচ্চকিত আছে কিন্তু জো-র ট্রাজিডিটুকু অসীম সংবেদ্যতায় পরিস্ফুট করেছেন লেখক। নায়ক জো. ক্রিসমাস আসলে নিগ্রো অথচ প্রতিপালিত হয়েছে অনুদার, সংকীর্ণচেতা শ্বেতাঙ্গ পিতা-মাতার কাছে। তার এই ঘরেরও না, পরেরও না অবস্থাটুকুর জন্য করুণা বহন করেছেন ফক্‌নর। 'ইনট্রুডার ইন দি ডাস্ট'-এ (১৯৪৮) নিপীড়িত ও অধঃপতিত মানুষের প্রতি সেই মমতা ও করুণা আরো ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যসন্ধিৎসা ফক্‌নর-এর সাহিত্যের ধর্ম, তাতে যতই বিচ্যুতি প্রকট হোক না কেন, তাঁর বিশ্বাসটুকু আন্তরিক, তাঁর মহৎ ভাবকেই প্রকাশ করে। তিনি বলেছেন, 'Truth is one. It doesn't change. It covers all things which touch the heart—honor and pride and pity and justice and courage and love.' ফক্‌নর ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

১৯২০ সালের গোড়ার দিক থেকেই আমেরিকান কথাসাহিত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য সারা বিশ্বে অনুভূত হতে আরম্ভ করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা আর স্বতন্ত্র দেশ ও জাতিরূপে দুরধ্যয়িত থাকে নি। সাম্রাজ্যঘটিত গোপনতার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়ে গেল এবং আমেরিকার বিপুল জনবল ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা জগতের স্বীকৃতি পেল। অবগত হওয়া গেল তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় বৈভব। প্রাতিস্বিক প্রতিভায় সজ্জিত হয়ে, বুদ্ধিগর্বে সচকিত ও জীবনাশ্রয়ী কথাশিল্পীরা এক এক করে ইওরোপের আলোকিত মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। দেখা গেল নবীন আমেরিকা পশ্চিম ইওরোপের অবক্ষয় দেখে সত্যই কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাদের জীবনবোধ এবং ঐকান্তিকতা অনেক বেশি মৃত্তিকাশ্রয়ী। এখনকার আমেরিকান কথাসাহিত্যে বাস্তববাদের প্রতি প্রবল আগ্রহ, যন্ত্রসভ্যতা-পরিবৃত জীবনের সর্বতোরূপ পরিদৃশ্যকে পরিস্ফুট করতে ঔপন্যাসিক ও কাহিনীকাররা অনেক বেশি তৎপর। ফলে যুদ্ধের বীভৎসতা থেকে ইন্দ্রিয়বেদ্য জীবনের ক্ষুধা, এবং খেলোয়াড়সুলভ সৌখিন শিল্প-প্রচেষ্টা সবই বিদ্যমান আছে বর্তমান আমেরিকান কথাসাহিত্যে ; শুধু যা নেই তা হলো চিন্তার গভীরতা, গূঢ় দর্শন বা আইডিয়া।

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ সংক্ষিপ্ত কাহিনী

॥ এক ॥

ড্যানিয়েল ডেফো ঃ মল্ ফ্ল্যাণ্ডার্স ঃ ১৬৬০—১৭৩১

[১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে ড্যানিয়েল ডেফোর জন্ম হয়। প্রথম ইংরাজী ঔপন্যাসিক এবং প্রথম ইংরাজ সাংবাদিক হবার গৌরব তিনি অর্জন করেছেন। জনৈক মাংস বিক্রেতার পুত্র তিনি। ধর্মযাজক হবার জন্য যে পড়াশোনা শুরু করেন ডেফো তা তাঁকে রাজনীতিতে টেনে নিয়ে যায়। তিনি রাজা তৃতীয় উইলিআম-এর বিশ্বাসভাজন হওয়া সত্ত্বেও সুতীব্র শ্লেষাত্মক রচনার অপরাধে কারাগারে নির্বাসিত হন। কিছুদিন তিনি নিজের কাগজও চালিয়েছিলেন। ডেফোর ঋণভারে জর্জরিত, দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের অবসান ঘটে ২৬শে এপ্রিল, ১৭৩১ সালে মুরফিল্ড-এ রোপ মেকারস্ অ্যালেতে।]

চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে মল্ ফ্ল্যাণ্ডার্সের মা শিশুকন্যাকে এক আত্মীয়ের কাছে রেখে আমেরিকায় নির্বাসনে যায়। একটি জিপসী দলের সঙ্গে কিছুদিন ও একটি স্ত্রীলোকের কাছে কিছুদিন কাটিয়ে চোদ্দবছর বয়সে মল্ একটি ভদ্র পরিবারে মেয়েদের সঙ্গিনী হিসাবে নিযুক্ত হয়। সেই পরিবারের বড় ছেলেটি মল্‌কে ভালবাসে। কিন্তু তার ছোট ভাই রবিন মল্‌কে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। পাঁচ বছর পরে রবিনের মৃত্যু হয়। দুটি সন্তানকে শ্বশুরের কাছে রেখে মল্ ১২০০ পাউণ্ড নিয়ে লণ্ডনে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আসে। একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী তাকে বিয়ে করে এবং আড়াই বছর বাদে মল্‌কে ত্যাগ করে। সম্মানিত জীবন যাপনের প্রলোভনে মল্ তৃতীয়বার বিয়ে করে ভার্জিনিআয় আসে। দুটি সন্তানের জননী হবার পর সে যখন জানে, তার শাশুড়ী তারই নিজের মা এবং তার স্বামী তার সৎ-ভাই, সে ভগ্নহৃদয়ে সন্তানদের ত্যাগ করে লণ্ডনে চলে আসে। জনৈক ভদ্রলোকের রক্ষিতা হয়ে ছয় বছর কাটে তার। একটি সন্তানের জননী হয় সে। তারপর ভদ্রলোক তাকে ত্যাগ করল। ল্যাঙ্কাশায়ারে জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার চতুর্থ বিবাহ হয়। এই স্বামীও তাকে ত্যাগ করেন। সন্তানকে নার্সের কাছে রেখে মল্ তেতাল্লিশ বছর বয়সে পঞ্চমবার বিয়ে করে। স্বামীর মৃত্যুর পর দুটি সন্তান নিয়ে বিপন্ন মল্ চুরি ও অন্যান্য অপরাধকেই

জীবিকা করে। শেষে, ধরা পড়ে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে তাকে যাবজ্জীবন নির্বাসনের আদেশ দেওয়া হয়। নিউগেট্-এর কারাগারে ল্যাঙ্কাশায়ারের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। দুজনে জেল থেকে পালিয়ে ভার্জিনিআয় চলে যায়। ৭৩ বছর বয়সে মল্ ও তার স্বামী ইংলণ্ডে ফিরে আসে। বাকি জীবনটুকু তারা তাদের কলঙ্কিত জীবনের জন্য অনুশোচনায় কাটায়।

॥ দুই ॥

ওয়াল্টার স্কট : আইভ্যান্ হো : ১৭৭১—১৮৩২

[১৭৭১ সালের ১৫ই আগস্ট এডিনবরায় স্কটের জন্ম হয়। পিতার অনুসরণে আইন ব্যবসায়ের অবসরে স্কট সাহিত্যচর্চায় মন দেন। ১৮১৪ সাল থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি পাঠক সমাজকে চমৎকৃত করে। ১৮২০ সালে তিনি 'সার্' সম্মানের অধিকারী হন। ১৮২৬ সালে প্রকাশনা ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিতে গিয়ে তিনি দেউলিয়া হন। ঋণ শোধ করবার সংকল্প নিয়ে কলম ধরে দুই বছরে তিনি মহাজনদের ৪০,০০০ পাউণ্ড দিতে সক্ষম হন। কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলে তাঁর পক্ষাঘাত হয়। তাঁর করুণ জীবনের উপর যবনিকা নামে ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩২ সালে, অ্যাবট্সফোর্ড-এ। স্কট্-এর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কেনিলওয়ার্থ', 'আইভ্যান্ হো' সমধিক প্রসিদ্ধ।]

তখন প্রথম রিচার্ড-এর রাজত্ব। রিচার্ড ক্রুশেড-এ গেছেন। বিজয়ী নর্ম্যান ও বিজেতা স্যাক্সনদের বিরোধে ইংলণ্ড দীর্ণ বিদীর্ণ। স্যাক্সন বীর সেড্রিক্ তাঁর ছেলে আইভ্যান্ হো-কে নর্ম্যানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। নর্ম্যান বীর ব্রায়ান্ ডি গিলবার্ট সঙ্গীসাথী নিয়ে সেড্রিকের বাড়ি রদারউডে এসে জোর করে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেড্রিকের ভাইঝি, আইভ্যান্ হো-র বাগ্‌দত্তা রাওয়েনাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন। পরদিন, একটি টুর্নামেণ্টে গিল্বার্টকে পরাজিত করে এক ছদ্মবেশী যোদ্ধা বিজয়ী হন। রাওয়েনাকে তিনি বিজেতার সম্মানের সবুজ শিরস্ত্রাণটি উপহার দেন। টুর্নামেণ্ট-এর দ্বিতীয় দিনে, ছদ্মবেশী যোদ্ধার সাহায্যে একজন কৃষ্ণবেশধারী যোদ্ধা এগিয়ে আসেন। রাওয়েনা আজ বোঝেন, ছদ্মবেশী যোদ্ধাই আইভ্যান্ হো। গিল্বার্ট রাওয়েনা ও সেড্রিককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তখন কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা, রবিনহুড ও অন্যান্য বীররা গিল্বার্টের দুর্গে হানা দিয়ে সেড্রিক ও রাওয়েনাকে উদ্ধার করেন। পরদিন কৃষ্ণবেশী যোদ্ধা আইভ্যান্ হো-কে নিয়ে সেড্রিকের কাছে উপস্থিত হন। তিনি প্রকাশ করেন, তিনি রিচার্ড প্ল্যাণ্টাজেনেট্,

ইংলণ্ডের সম্রাট। তাঁর আদেশে সেড্রিক আইভ্যান্‌ হো-কে ক্ষমা করেন আর এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্রায়ান্‌ গিলবার্টকে পরাজিত ও নিহত করে তবে আইভ্যান্‌ হো রাজা, নর্ম্যান ও স্যাক্সন অভিজাত সম্প্রদায় সকলের আশীর্বাদ নিয়ে রাওয়েনাকে বিয়ে করে। তখন ইংলণ্ডে শান্তি ফিরছে। নর্ম্যান ও স্যাক্সনদের মিলিত চেষ্টায় ইংলণ্ডে যে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ দেখা দেবে, রাওয়েনা ও আইভ্যান্‌ হো-র বিয়ে যেন তারই সূচনা করে।

॥ তিন ॥

জেন অস্টেন : প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস : ১৭৭৫—১৮১৭

[১৬ই ডিসেম্বর ১৭৭৫ সালে হ্যাম্পশায়ারে জেন অস্টেনের জন্ম। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। তাঁর নিস্তরঙ্গ জীবন কাটে গ্রামে। প্রথম জীবন থেকেই তিনি লিখেছেন। তবু, সেদিনের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের ভয়ে সে বই ছদ্ম নামে প্রকাশ করেছেন। জীবিতকালে তিনি প্রাপ্য সম্মান ও খ্যাতি পান নি। তবু তাঁর বইগুলি আজও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, স্নিগ্ধ কৌতুক ও বাস্তবানুগতার জন্য সমাদৃত। ১৮ই জুলাই ১৮১৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।]

লংবোর্ন-এর বেনেট পরিবার পাঁচটি অবিবাহিতা মেয়ে, জেন, এলিজাবেথ, মেরী, লিডিয়া ও কিটিকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। নেদারফিল্‌ড পার্কের মালিক ধনী অবিবাহিত চার্লস্‌ বিংলি একটি নাচের আসরে জেনকে দেখে মুগ্ধ হয়। তার বন্ধু ফিট্‌জেরাল্‌ড ডার্সি আভিজাত্যের উন্নাসিকতায় এলিজাবেথকে অবহেলা দেখাতে গিয়ে তার তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়ে প্রেমাসক্ত হয়। দর্পিতা এলিজাবেথ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। উইক্‌হ্যাম নামক অপরিণামদর্শী যুবক লিডিয়াকে নিয়ে পালায়। ডার্সি উইক্‌হ্যামকে ঋণমুক্ত করে। তাদের বিয়ে হয়। লিডিয়াকেও সে টাকা দেয়। তখন এলিজাবেথ তার অহংকারকে জয় করে ডার্সিকে গ্রহণ করে। চার্লস বিংলি ও জেন বাগ্‌দত্ত হয়। বেনেট পরিবার অতিসত্বর তিনটি মেয়ের বিয়ের সমস্যা সমাধান করে সুখী হন। মেরী ও কিটির বিষয়েও তাঁদের আশা জাগে।

॥ চার ॥

চাল স ডিকেন্স : এ টেল্‌ অফ টু সিটিজ : ১৮১২—১৮৭০

[৭ই ফেব্রুআরি ১৮১২ সালে ইংলণ্ডে এক নৌবিভাগের কেরানীর ঘরে জন্মে চার্লস জন হাফ্যাম ডিকেন্স শৈশব থেকে দারিদ্র্যের নিদারুণ যন্ত্রণাকে জেনেছিলেন। লণ্ডনে একটি কাগজে সাংবাদিকতা

করতে করতে তাঁর উপন্যাস রচনা ও অসামান্য সাফল্যের সূচনা। অসাধারণ আর্থিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং নিজের চরিত্রের জন্যে অশান্তিময় পারিবারিক জীবনের জ্বালা ৯ই জুন, ১৮৭০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেছিল। কঠোর পরিশ্রমে নিজেকে তিনি জীর্ণ করে মৃত্যুকে এগিয়ে আনেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ডেভিড কপারফিল্ড, এ টেল্ অফ টু সিটিজ, অলিভার টুইস্ট, পিকউইক পেপার্স ও ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ বিখ্যাত।]

১৭৭৫ সালের নভেম্বর মাসে প্যারিসে পৌঁছে লুসি ম্যানেট, ম্যাডাম ডেফার্জ-এর বাড়িতে তার বাবা ডাক্তার ম্যানেটের সঙ্গে আঠারো বছর বাদে পুনর্মিলিত হলো। লুসি মাতৃহীনা। ডাক্তার ম্যানেট আঠারো বছর কারাবাসের ফলে স্মৃতিভ্রষ্ট। তারা লণ্ডনে ফিরে এল। সেখানে চার্লস ডার্নে, ফ্রান্সের কুখ্যাত অত্যাচারী এভারমণ্ডদের বংশধর, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে দণ্ডিত হয়। আইনজীবি সিড্‌নী কার্টন-এর সঙ্গে চেহারার অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য তাকে বাঁচায়। কার্টন ও ডার্নে দুজনেই লুসিকে ভালবাসে। লুসি ডার্নেকে বিয়ে করে। কার্টন লুসিকে প্রতিশ্রুতি দেয় তার জন্য প্রয়োজনে সে প্রাণ পর্যন্ত দেবে। লুসি ও ডার্নের একটি মেয়ে হয়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হয়। ম্যাডাম ডেফার্জের সে বিপ্লবে এক ক্ষমাহীন ভূমিকা। এভারমণ্ড পরিবারের কীর্তির জন্য চার্লস ডার্নে ১৭৯২ সালে প্যারিসে বন্দী হয়। ডাক্তার ম্যানেট লুসি ও নাতনীকে নিয়ে প্যারিসে যান। তখন সিড্‌নী কার্টন প্যারিসে। সে উৎকোচে প্রহরীকে বশ করে ডার্নের ঘরে যায়। ডার্নেকে ওষুধ দিয়ে অচৈতন্য করে সে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। সিড্‌নী কার্টন ডার্নের পোশাক পরে গিলোটিনের জন্যে প্রস্তুত হয়।

ম্যাডাম ডেফার্জ লুসির নার্সের হাতে নিহত হয়। লুসি, চার্লস, ডাক্তার ম্যানেট ইংলণ্ডে পালিয়ে যান। সিড্‌নী কার্টন নির্ভয়ে, হাসিমুখে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে চলে। সে অন্যদের আশ্বাস দেবার মতো সাহসও খুঁজে পায়। সে যেন অনুভব করে, তার এই কীর্তি তার সমস্ত জীবনের সব কীর্তির চেয়ে অনেক মহৎ। আজ সে যে বিশ্রামের আশ্রয়ে চলেছে, তার বেদনার্ত বঞ্চিত জীবনের তার চেয়ে মহৎ শরণ আর মিলতে পারে না।

॥ পাঁচ ॥

শার্লোট ব্রন্টি : জেন আয়ার : ১৮১৬—১৮৫৫

[ইয়র্কশায়ারের সুদূর পল্লীর ব্রন্টি পরিবার, শার্লোট, এমিলি, অ্যান ও ব্র্যানওয়েল প্রতিভার চমৎকারিত্বে বিশ্বের কাছে আজও এক বিস্ময়। ৩১শে এপ্রিল, ১৮১৬ সালে থর্নটনে শার্লোটের জন্ম। তের বছর বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু। নিঃসঙ্গ ও নির্বাসিত জীবন শেষ হয়ে আসার এক বছর আগে তিনি বিয়ে করেন। ২১শে মার্চ, ১৮৫৫ সালে এই প্রতিভাময়ী লেখিকার মৃত্যু। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জেন আয়ার' তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা।]

শৈশব থেকে অনাথ ও দারিদ্র্যপীড়িত জেন আয়ার আঠারো বছর বয়সে থর্নফিল্ড ম্যানর-এ এডওআর্ড রচেস্টারের বাড়িতে এ্যাডেলা ভ্যারেন্স-এর গভর্নেস নিযুক্ত হয়। প্রাচীন দুর্গের মতো রহস্যময় সে বাড়িটিতে এক পরিত্যক্ত কক্ষে কার হাসি শোনা যায়। একদিন নাটকীয়ভাবে পথের ধারে এক অশ্বারোহীর সঙ্গে জেন্-এর দেখা হয়। তিনিই এডওআর্ড রচেস্টার। এই দুর্গের সেই অশরীরি উপস্থিতি রচেস্টারের পায়ে এক শৃঙ্খল। সে ও জেন দুজনে দুজনকে ভালবাসে। তারা বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ে সম্পূর্ণ হবার আগেই জনৈক মিঃ ম্যাসন বাধা দেন। বলেন—রচেস্টারের স্ত্রী এখনও জীবিত। এ বিয়ে হতে পারে না। রচেস্টার সকলকে নিয়ে তার বাড়িতে আসে। সেখানে জেন দেখে রচেস্টারের বদ্ধ উন্মাদ স্ত্রীকে। যার হাসি শুনে সে অনেক রাত ভয়ে জেগে কাটিয়েছে। জেন রচেস্টারকে ক্ষমা করে। কিন্তু ভগ্নহৃদয়ে থর্নফিল্ড ছেড়ে চলে যায়। সেখানে একরাতে, স্বপ্নে রচেস্টারের গলা শুনে সে সকাল হতেই ফিরে আসে। রচেস্টারের স্ত্রী দুর্গে আগুন লাগিয়ে নিজেও পুড়ে মরেছে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে রচেস্টার অন্ধ হয়েছে। একটি হাত তার কেটে ফেলতে হয়েছে। আজ জেন রচেস্টারের পাশে এসে দাঁড়ায়। আজ আর তাদের মিলনে কোন বাধা নেই।

॥ ছয় ॥

এমিলি ব্রন্টি : উদারিং হাইট্স : ১৮১৮—১৮৪৮

[৩০শে জুলাই, ১৮১৮ সালে এমিলি ব্রন্টির জন্ম। ক্ষয়রোগে, ১৮৪৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু। উত্তর ইংলণ্ডের জলাভূমির বন্যপ্রকৃতি তাঁকে এমন করে আবিষ্ট করে রেখেছিল যে

তিনি কোনদিন বাড়ি ছেড়ে থাকতে পারেন নি। একটি উপন্যাস ও কয়েকটি কবিতায় এমিলি যে আশ্চর্য প্রতিভায় স্বাক্ষর রেখেছেন তা আজও এক বিস্ময় হয়েই আছে। 'উদারিং হাইট্‌স' সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর ট্রাজিডি শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিডির সমতুল্য। এর তুল্য আশ্চর্য প্রেমের উপন্যাস কমই লেখা হয়েছে। একশো তেরো বছর ধরে 'উদারিং হাইট্‌স' পাঠকদের মুগ্ধ করেছে। লেখকদের প্রভাবান্বিত করেছে। এই উপন্যাস প্রকাশিত হবার এক বছর বাদে এমিলির মৃত্যু হয়। তাঁর বই বিশ্বসাহিত্যে কি আলোড়ন আনবে, তা না জেনেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। 'উদারিং হাইট্‌স'-এর তুল্য অন্য কোন উপন্যাস নেই বলেই, বিশ্বসাহিত্যে একে কোন জাত, গোষ্ঠি, দল বা ধারা দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।]

থ্রাশ্‌ক্রস গ্রেঞ্জ-এর নতুন ভাড়াটে মিঃ লকউড এক তুষারঝড়ের রাতে মালিক মিঃ হীথ্‌ক্লিফ্‌-এর বাড়ি উদারিং হাইট্‌স-এ রাত কাটাতে বাধ্য হন। তিনি যে ঘরে রাত কাটান, সে ঘর একদিন ক্যাথারিন আর্নশ-র ছিল। সেই রাতে, গৃহস্বামী হীথক্লিফ্‌-এর নিঃসঙ্গ, ক্ষুব্ধ এবং পীড়িত ব্যক্তিত্ব তাঁকে যেমন আশ্চর্য করে, তেমনি, তুষার-ঝড়ে পথ হারানো ক্যাথারিনের আত্মাকে দেখে তিনি ভয় পান। গ্রেঞ্জ-এ ফিরে এসে নেলী ডীন-এর মুখে তিনি উদারিং হাইট্‌স, হীথক্লিফ্‌ ও ক্যাথারিনের জীবন-কাহিনী শোনেন। নেলী ডীন একদিন উদারিং হাইট্‌সে মা-মরা ক্যাথারিন ও হিন্‌ড্‌লির ধাত্রী ছিল। ক্যাথারিনের বাবা মিঃ আর্নশ অনাথ হীথক্লিফ্‌কে নিয়ে আসেন। হিন্‌ড্‌লি তাকে ঘৃণা করে। ক্যাথারিনের বন্য স্বাধীন প্রকৃতি হীথক্লিফের মধ্যে দোসর খুঁজে পায়। এক আশ্চর্য প্রেম গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে। বন্য মূরল্যাণ্ডে, হীদার গাছের ছায়ায় তাদের সে প্রেম প্রাকৃতিক ঝড় ঝঞ্ঝার মতোই খেয়ালী, তেমনিই মুক্ত। বাবা মারা যান। হিন্‌ড্‌লি বিয়ে করে। ছেলে হেয়ারটন আর স্ত্রীকে নিয়ে হিন্‌ড্‌লি যে সুখী সুন্দর সংসারের ছবি রচনা করতে চায় তাতে হীথক্লিফের কোন জায়গা নেই। গ্রেঞ্জ-এর নবীন মালিক এড্‌গার লিণ্টন ক্যাথারিনকে বিয়ে করতে চায়। হীথক্লিফ নিঃশব্দে ক্যাথারিনকে ছেড়ে চলে যায়। ক্যাথারিন-এর বিয়ের পর হীথক্লিফ্‌ ফিরে আসে। সে ধনী হয়ে, নিজেকে শক্তি ও সমৃদ্ধিতে যোগ্য করে ফিরে এসেছে। ক্যাথারিনকে না পেয়ে তার যে দুঃখ, তাই সে প্রশমিত করতে চায় প্রতিহিংসায় দানবীয় হয়ে উঠে। মৃতদার হিন্‌ড্‌লিকে সে নিঃস্ব করে উদারিং হাইট্‌স কিনে নেয়। এড্‌গারের বোন ইজাবেলাকে বিয়ে করে শুধু যন্ত্রণা দেয়। ইজাবেলা তার রুগ্ন শিশুপুত্র লিণ্টনকে রেখে মারা যায়। ক্যাথারিন এই উপর্যুপরি আঘাত সইতে না পেরে, একটি মেয়ের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। মৃত্যুশয্যায় সে বলে—

হীথক্লিফ্ আর সে এমন এক বন্ধনে বাঁধা, যে বন্ধন জীবন-মৃত্যুর নিয়ম স্বীকার করে না। হীথক্লিফ্ বলে—যতদিন বেঁচে থাকব, তুমি আমার কাছে থেক। আমাকে যন্ত্রণা দিও। হীথক্লিফ্ ক্যাথারিনের মেয়ে ক্যাথীর সঙ্গে রুগ্ন লিণ্টনের বিয়ে দেয়। এই আঘাতে এড্গারও মারা যায়। লিণ্টনের মৃত্যুর পর ক্যাথী হীথক্লিফের কাছে বন্দী হয়ে দিন কাটায়। সে এবং হিন্ড্লির ছেলে হেআরটন দুজনে দুজনকে ভালবাসে। হীথক্লিফ্কে ক্যাথারিনের প্রেতাত্মা বারবার ছলনা করে। হীথক্লিফ্ তার ডাক শোনে, তার উপস্থিতি অনুভব করে। একদিন হীথক্লিফ্ উপবাসে ও অত্যাচারে স্বেচ্ছামৃত্যুকে ডেকে আনে। ক্যাথী ও হেআরটন বিয়ে করে। এখন আর গ্রামবাসীরা কোন নিঃসঙ্গ প্রেতাত্মার কান্না শুনতে পায় না। তারা দেখে তুষারঝড়ের রাতে মুরল্যাণ্ডে বন্যপ্রকৃতি যখন অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, হীথক্লিফ্ ও ক্যাথারিন পরস্পর প্রকৃতির সব নিয়মকে যেন তাদের প্রেমের বলে জয় করে পাশাপাশি ছুটে চলেছে। জীবনে যারা শুধু যন্ত্রণা পেয়েছে আর যন্ত্রণা দিয়েছে, মৃত্যু তাদের মিলিত করেছে।

॥ সাত ॥

টমাস হার্ডি : টেস্ অফ্ দ্য ডারবারভিল্স্ : ১৮৪০—১৯২৮

[ডরচেস্টারে টমাস হার্ডির জন্ম। স্কুল-কলেজে শিক্ষার সুযোগ তাঁর সামান্যই হয়েছিল। আর্কিটেকচার-এর কাজ তিনি করেছেন। ১৮৭১ থেকে ১৮৯৭-এর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি লিখিত। তার পরে তিনি শুধু কাব্যরচনায় বাকি জীবনটা উৎসর্গ করেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ডরচেস্টারেই তিনি বসবাস করেন। সেখানেই পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে সমধিক খ্যাত 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড', 'রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ্', 'জুড দ্য অবস্কিওর', 'উডল্যাণ্ডার্স', 'টেস্ অফ্ দ্য ডারবারভিল্স্,' 'টু অন্ এ টাওয়ার,' 'এ পেআর অফ্ ব্লু আইজ্'—ইত্যাদি।]

মার্লট গ্রামের দরিদ্র ডারবারভিল্সদের সঙ্গে বিজয়ী উইলিআমের সময়কার একটি বিখ্যাত অভিজাত পরিবারের কোন যোগ ছিল না। তবু, বৃদ্ধ জন্ আভিজাত্য ও রক্তকৌলীন্যের মোহে নিজের ডার্বিফিল্ড্ পদবী ত্যাগ করে ঐ নামে নিজেকে জাহির করে। আর, কাছেই ট্র্যানট্রিজ্ গ্রামে ধনী ও উচ্ছৃঙ্খল অ্যালেক্ ডারবারভিল্স্ ও তার বৃদ্ধা, অন্ধ মায়ের কাছে নিজের মেয়ে টেস্কে পাঠায় অর্থসাহায্য চেয়ে। টেস্ সেখানে কাজ পায়। কিছুদিন পরে, তার

সরলতার সুযোগ নেয় অ্যালেক্। কুমারী টেস্ হয় জননী। তার শিশুপুত্র মারা যায়। টেস্‌কে সবাই লাঞ্ছিত করে। জীবিকার সন্ধানে টেস্ ট্যাল্‌বোথে গ্রামে এক ডেয়ারীতে আসে। ধীরে ধীরে নতুন জীবন তাকে পুরনো দিনের বিভীষিকা ভুলিয়ে দেয়। ধর্মযাজক পিতার পুত্র তরুণ সুদর্শন এঞ্জেল ক্লেআর তাকে ভালবাসে। টেস্ সবকথা বলে এঞ্জেলের কাছে সহজ হতে চায়। কিন্তু এঞ্জেল তাকে ভুল বুঝবে এই ভয় তাকে বাধা দেয়। বিয়ে হয়। এঞ্জেলের পরিবার বা টেসের পরিবার অনুপস্থিত থাকেন। বিয়ের রাতে সব খুলে বলে টেস্। এঞ্জেল এমনই মর্মাহত হয় যে টেস্‌কে ক্ষমা না করে, সে ব্রেজিলে চলে যায় ভাগ্য অন্বেষণে। দুর্ভাগ্যের কশাঘাতে টেস্ এখানে ওখানে সামান্য কাজ করে করে বেড়ায়। তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের শোচনীয় অবস্থা দূর করবার সব ভার তারই উপরে। এঞ্জেলের পিতামাতার সঙ্গে সে দেখা করবার সাহস খুঁজে পায় না। এমন সময়ে অ্যালেক্ ডারবারভিল্‌স আবার তার জীবনে এসে দাঁড়ায়। এঞ্জেলের সঙ্গে বিয়েকে সে স্বীকার করে না। আজ সে টেস্‌কে বিয়ে করতে চায়। স্বীকৃতি দিতে চায়। অসহায় টেস্ এঞ্জেলকে চিঠি লেখে। তার পুরনো দিনের বন্ধু মারিআন্ এঞ্জেলকে চিঠি লেখে। এঞ্জেল যখন ফিরে আসে, তখন টেস্ ভাগ্যের স্রোতে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। তার পরিবার তাকে অ্যালেক্-এর সঙ্গে বাস করতে অজানিতেই বাধ্য করেছে। এঞ্জেলকে দেখে টেস্ চিরদিনের জন্যে অ্যালেক্-এর দুর্গ্রহকে সরিয়ে দিয়ে শেষবারের মতো প্রেমকে আস্বাদন করতে চায়। অ্যালেক্‌কে সে হত্যা করে। এঞ্জেল তাকে আজ তাড়িয়ে দেয় না। সে টেস্‌কে বুকে টেনে নেয়। এঞ্জেলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরে নিশ্চিন্ত টেস্ এঞ্জেলেরই বুকে ঘুমোয়। এবার ন্যায়ের উদ্যত হাত নেমে আসে চরম আঘাতে। টেস্‌কে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। একদিন প্রত্যুষে উইন্‌টন্ সেস্টার-এর কারাগারের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে হয় এঞ্জেলকে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি কালো নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়। টেসের মৃত্যুদণ্ডের সবটুকু আঘাত বুকে নিয়ে এঞ্জেল ফিরে আসে। ন্যায় তাকে দণ্ড দেয়নি, ভগবানের বিচারে তাকে বাকি জীবন অশেষ যন্ত্রণা নিয়ত অনুভব করে কাটাতে হবে।

॥ আট ॥

জন গল্‌সওআর্দি : দ্য ম্যান অফ্‌ প্রপ্রার্টি : ১৮৬৭—১৯৩৩

[কিংসটন হিল, সারেতে জন্ম। হ্যারো ও অক্সফোর্ড-এ শিক্ষালাভ। তুর্গেনিভ্‌-এর প্রভাবে লেখা শুরু। সম্পদশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ তাঁর সুবিখ্যাত। 'ফরসাইট্‌ সাগা' উপন্যাসের উপজীব্য। ১৯৩২ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পান।]

১৮৬৫ সালের ১৫ই জুন বৃদ্ধ জোলিঅন ফরসাইট্‌-এর বাড়িতে পরিবারের সকলে মিলিত হন, জোলিঅন-এর নাতনী জুন ফরসাইট্‌-এর বাক্‌দত্ত প্রণয়ী স্থপতি ফিলিপ বাসিনেকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য। এই ঘরোয়া আসরে জোলিঅন-এর ভাইপো সোম্‌স-এর স্ত্রী আইরিন ও ফিলিপ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। জুনের বাবা, জোলিঅনের উইলে পরিত্যক্ত। সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিল দ্বিতীয়বার। জোলিঅন তার সঙ্গে দেখা করে ও দেখে খুশি হয়। এরই ফলে সে উইল বদলে ফেলে। আগের কথা মতো জুনকে সব সম্পত্তি দেয় না। জুনকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দেয়। তার ছেলেকে বছরে এক হাজার পাউণ্ড দেয়। বাকি সব কিছুর উত্তরাধিকারী করে দেয় ছেলেকে। ইতিমধ্যে সোম্‌স ফরসাইটের নতুন পল্লী-আবাস নির্মাণের ভার পড়ে ফিলিপের উপর। ফিলিপ ও আইরিন দুজনে দুজনকে ভালবাসে। সোম্‌স, ফিলিপ বাড়িটি সোম্‌স-এর সাধ্যের অতিরিক্ত খরচে বানিয়েছে বলে আদালতে নালিশ করে। আদালতে ফিলিপ অনুপস্থিত। জুন দেখে ফিলিপের বাড়িতে আইরিন অপেক্ষা করছে। সে সোম্‌সকে ছেড়ে চলে এসেছে। জুনের অনুরোধে জোলিঅন নতুন বাড়িটি কিনে নিয়ে সোম্‌সকে ঋণমুক্ত করে। ফিলিপ লণ্ডনের কুয়াশায় গাড়ির নিচে প্রাণ হারায়। এ মৃত্যু কি আত্মহত্যা? আইরিন বৃদ্ধ জোলিঅনের কাছে চলে যায়।

॥ নয় ॥

ডি. এইচ. লরেন্স : সন্স্‌ অ্যাণ্ড লাভার্স : ১৮৮৫—১৯৩০

[এ যুগের অনন্য প্রতিভা ডেভিড্‌ হারবার্ট লরেন্সের জন্ম হয় নটিংহামশায়ারে ঈস্টউড -এ এক দরিদ্র কয়লাখনির শ্রমিকের ঘরে। স্কলারশিপ্‌ নিয়ে ন্যটিংহাম থেকে শিক্ষকতার বৃত্তিতে তিনি সর্বোচ্চ স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য তাঁকে নিয়মিত কর্মজীবন অনুসরণ করতে দেয়নি।

সাহিত্যক্ষেত্রে ১৯১১ সালে প্রথম উপন্যাসটি তাঁকে স্বীকৃতি দেয়। মনঃসমীক্ষণে আগ্রহ, এবং ইতালী, নিউ মেক্সিকো ও অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রভাবান্বিত করেছে। নীস্-এর কাছে ভেন্স-এ তিনি যক্ষ্মায় মারা যান। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত 'লেডি চ্যাটার্লিজ্‌ লাভার' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'সন্স্ অ্যাণ্ড লাভার্স' সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'উইমেন্ ইন্ লাভ', 'দ্য প্লুমড্ সার্পেন্ট্'; বড় গল্প 'দ্য ম্যান্ হু ডায়েড', 'ভার্জিন অ্যাণ্ড দ্য জিপসী'; গল্পের মধ্যে 'দ্য উওম্যান্ হু রোড্ অ্যাওয়ে', 'দ্য রকিং হর্স্ উইনার', 'দ্য সান্' ইত্যাদি বিখ্যাত।]

সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন, শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রসাদে উন্নীত-মন গার্ট্রুড্ কোপার্ড আর কয়লাখনি শ্রমিক ওআল্টার মোরেলের বিয়ের প্রথম ছয়মাস দেহ যৌবনের পারস্পরিক বিনিময়ে সুখে কেটেছিল। তারপরই গার্ট্রুড্-এর উন্নত রুচি ও শিক্ষা ওআল্টারের সামনে এক প্রাচীর তুলল। সে প্রাচীর চোখে দেখা যায় না। তার বাধা নিয়ত অনুভব ক'রে ওআল্টারের অবমানিত পৌরুষ অন্যান্য সম্ভোগের পথে মুক্তি খুঁজল। গার্ট্রুড্ তার সবটুকু ঢেলে দিল তার দ্বিতীয় পুত্র পল্-এর মধ্যে। গার্ট্রুড্-এর মধ্যে উন্নত জীবন যাপনের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তারই তাগিদে বড় ছেলে উইলিআম শর্টহ্যাণ্ড ক্লার্ক ও নাইট্স্কুল টিচার-এর কাজ নিয়ে লণ্ডন গেল। লিলি ওএস্টার্ন নামে একটি সুখসন্ধানী মেয়েকে বিয়ে করবার আগেই নিউমোনিআয় তার মৃত্যু হলো। মেয়ে অ্যানি শিক্ষয়িত্রী হবার জন্য পড়ছে। পল্ পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। ক্রমে অ্যানি বিয়ে করে। ছোটছেলে আর্থার যুদ্ধে নাম লেখায়, পরে বিয়ে করে। ওআল্টার এদের জীবন থেকে নির্বাসিত। পল্ই এ কাহিনীর নায়ক। তার ভাবপ্রবণ, সংবেদনশীল মন মা-র মধ্যে যেমন আশ্রয় পায়, আর কোথাও তা পায় না। দুজনে দুজনকে নিয়ে সম্পূর্ণ বোধ করে। মার প্রভাব পল্-এর উপর এমনই, যে প্রতিবেশী মিরিআম লেভার্স-এর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্কও কোন পরিণতিতে পৌছয় না। মিরিআম পল্কে ভালবাসে। কিন্তু তাদের পরিবারের ধর্মোন্মাদনা, মিরিআমকে পলের সঙ্গে দেহ বিনিময়ের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে স্বীকার করতে দেয় না। মিরিআম-এর চরিত্রের গভীরতা পল্কে আকৃষ্ট করছে জেনে পল্-এর মা সভয়ে সবেদনায় বলেন 'মিরিআম তোমাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলবে। আমি তোমায় হারাব।' মানব সম্পর্কের এই জটিলতা পল্কে বিষণ্ন করে। মিরিআম-এর কাছ থেকে নিজেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে রাখে সে। একদিন, অন্ধের মতো দুজনে দুজনকে নিঃশেষে ভালবাসে। কিন্তু তারপর

তারা বোঝে, দেহ তাদের এতটুকু কাছে এনে দেয়নি। নানা সংঘাতে জটিল মানসিকতার শিকার পল্ মিরিআম্-এর কাছে একেবারেই অচেনা। পল্কে সে চেনেনি। আট বছরের সম্পর্ক এক নিষ্ফল পরিণতিতে পৌঁছিয়েছে জেনে তারা বিদায় গ্রহণ করে। স্বামীর কাছ থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন ক্লারা ডস্ পল্-এর কাছে নিঃসঙ্গ এক নারীর যৌবনের ক্ষুধা নিয়ে উপস্থিত হয়। শুধু দেহ নিয়ে ক্লারা পল্এর মনকে অধিকার করতে পারবে না জেনে গার্ট্রুড্ আনন্দিত। পল্ তারই থাকবে। ক্লারার সঙ্গে কিছুদিন নির্বোধ এবং ক্লান্তিকর প্রেমের অধ্যায়ের পর ক্লারা ও তার স্বামী পুনর্মিলিত হয়। ডস্-এর হাতে পল্ বৃথাই মার খায়। সে অপমান পল্এর কাছে মানুষের নির্বোধিতার আর এক উদাহরণ। ইতিমধ্যে দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়েছে ওআল্টার। গার্ট্রুড্ অ্যানির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে ফিরে আসে। দারিদ্র্য এবং মনোসংঘাতে ক্ষয়িষ্ণু জীবন নিভে আসে গার্ট্রুডের। মাকে যন্ত্রণা থেকে থেকে মুক্তি দেবার জন্যে পল্ ও অ্যান্ মাত্রাতিরিক্ত আফিম দেয়। মা-র মৃত্যুর পর পল্ বোঝে মাকে ছাড়া আর কাউকে সে ভালবাসতে পারে নি। এই ভালবাসাই তাকে অন্য নারীর সঙ্গে সহজ হতে দেয়নি। অপর পক্ষে, এই ভালবাসাই তাকে সাধারণ জীবন সাধারণ সুখদুঃখকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর, গভীরতর সত্যের সম্পর্কে তৃষ্ণার্ত করেছে। মিরিআম্ আবার আসে। পল্-এর আজ মিরিআম্কে কোন প্রয়োজন নেই। সে বৃহত্তর জীবনের পথে পা বাড়ায়।

॥ দশ ॥

এডওআর্ড মরগ্যান ফর্স্টার : এ প্যাসেজ্ টু ইণ্ডিয়া : ১৮৭৯—

[অত্যন্ত অল্পসংখ্যক বই লিখে ই. এম. ফর্স্টার যে সম্মান ও খ্যাতি পেয়েছেন তা অনেকের পক্ষেই দুর্লভ। 'হোয়্যার এঞ্জেলস্ ফিআর টু ট্রেড -১৯০৫; 'দি লংগেস্ট জার্নি'-১৯০৭; 'এ রুম উইথ এ ভিউ'-১৯০৮; 'এবিংগার হারভেস্ট'; 'হাওয়ার্ডস্ এণ্ড'-১৯১০ এবং 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'-১৯২৪ এই ছয়টি উপন্যাস তিনি লিখেছেন। এতদ্ব্যতীত 'দি সিলেস্‌সিআল ওমনিবাস' এবং 'দি ইণ্টারন্যাল মোমেণ্ট'-১৯২৮ নামে দুটি গল্প সংগ্রহ ফর্স্টার-এর প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তাঁর 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' বই-এ ফর্স্টার যে সমবেদনা, শ্রদ্ধা ও সংবেদ্যতা নিয়ে ভারতের মানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, তার তুলনা সমগ্র পশ্চিমী সাহিত্যে বিরল।]

১৯২০ সালের কথা। মিসেস মূর তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে, চন্দ্রপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রনি হীস্‌লপ-এর কাছে এলেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে মেয়ে

র‍্যালফ ও স্টেলা রইল বিলেতে। মিসেস মূর-এর সঙ্গে এডেলা কুয়েস্টেডও এসেছে। সে ও রনি বিয়ে করতে চায়। মিসেস মূর সত্যিকারের ভারতকে দেখতে চান। যোগী, সাপ, বাঘ, মহারাজার তথাকথিত ভারতবর্ষ, অথবা চন্দ্রপুরের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যের সংকীর্ণতা, বর্ণগরিমা, নিজেদের বাঁচিয়ে চলবার নির্বোধ প্রচেষ্টা দুটোই তাঁকে ক্লান্ত করে। এই রক্তমাংস মায়ামমতার, ভদ্র ও শিক্ষিত মানস সম্পন্ন ইংরাজ মহিলাটির সঙ্গে অতি স্বল্পক্ষণের জন্যে ডাক্তার আজিজ-এর পরিচয় হয়। আজিজ বলে—'You understand me. You know what others feel. Oh, if others resembled you!' এই পরিচয় থেকে নানা জটিলতার সূত্রপাত। স্কুল শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফিল্‌ডিং আজিজ ও অন্যান্য ভারতীয়দের কাছে আসতে, বন্ধুত্ব পেতে উৎসুক। কিন্তু চন্দ্রপুরের শ্বেতাঙ্গ সমাজ মিসেস মূরকে পদে পদে স্মরণ করিয়ে দেয় যে শাদা ও কালো দুই জগতের মাঝখানের পাঁচিল ভাঙলে দুই পৃথিবীতেই সর্বনাশ ঘনাবে। মিসেস মূর ও এডেলাকে মারাবার-এর গুহা দেখাতে গিয়ে আজিজ এডেলার সম্মানহানির এক মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়ে। রনি ও এডেলার বিয়ে ভেঙে যায়। মর্মাহত মিসেস মূরকে তার আগেই ভারত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পথে তিনি মারা যান। আজিজ মুক্তি পায়। স্বদেশবাসীর কাছে সম্মান পেয়েও তার মনের বেদনা ভুলবার নয়। আর, সে ভাল করেই উপলব্ধি করে, মিসেস্ মূর তার মনে কি গভীর ছাপ রাখতে পেরেছেন। মিসেস্ মূর-এর মতো শ্রদ্ধা, ভদ্রতা ও সম্মান না দিতে পারলে ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হওয়া সম্ভব নয়। রাজনীতিক জয়লাভে মনের ক্ষত মিলোয় না। ফিলডিং স্টেলা মূরকে বিয়ে করে ভারতে ফিরে এসেছে। মৌয়ের জংগলে তার ও আজিজের আবার সাক্ষাৎ। ফিল্‌ডিং বলে—তুমি আমার বন্ধু। আমরা কি কাছে আসতে পারি না? ভারত যে স্বাধীন জাতির সম্মান পাবে বা পেতে পারে, ফিল্‌ডিং সে ধারণাকে উপহাস করে। তার মত—ভারত গুয়াটেমালা বা বেলজিয়ামের মতো নগণ্য হয়েই থাকবে। ভারতের স্বাধীন হবার প্রশ্ন ফিল্‌ডিং-এর কাছে অবাস্তর। সে আজিজের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব চায়। ক্রুদ্ধ আজিজ বলে—ইংরাজরা নিপাতে যাক। আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি? হিন্দুরা ও মুসলিমরাই সে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন। নিজেরাই মেটাব। তোমরা চলে যাও। আমি না হোক, আমার ছেলেরা তোমাদের চলে যেতে বাধ্য করবে। তোমরা সবাই চলে গেলে, ভারত ছেড়ে গেলে তবে আমরা বন্ধু হতে পারব। এবং আজিজ ও ফিল্‌ডিংয়ের ঘোড়া

তফাতে সরে যায়। মৌ-এর জংগল, কারাগার, মন্দির, প্রাসাদ, হ্রদ, পশু, পাখী, সবাই যেন হাজার কণ্ঠে বলে ওঠে—এখনো বন্ধুত্বের সময় আসেনি। এখনো দুই জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়।

॥ এগারো ॥

জেম্‌স জয়েস্ : ইউলিসিস : ১৮৮২—১৯৪১

[এই আইরিশ কবি ও ঔপন্যাসিকের জন্ম র‍্যাথ্‌গার, ডাবলিনে। ১৯০২ সালে গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই তিনি আধুনিক ভাষাসমূহ শিক্ষা করেন, সঙ্গীতে আগ্রহী হন এবং বিবিধ নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯০৪ সালে আয়র্ল্যাণ্ড ত্যাগ করে তিনি বাকি জীবন ট্রিয়েস্ত্, প্যারিস ও জুরিচ্-এ ভ্রমণ করেন। প্রকাশকদের সঙ্গে মতবিরোধ, দারিদ্র্য, ক্ষীয়মাণ দৃষ্টিশক্তি সত্ত্বেও তিনি লিখে চলেন। গল্প সংগ্রহ 'ডাব্‌লিনার্স' ১৯১৪ সালে বেরোয়। তারপর তিনি 'এ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিষ্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান'-১৯১৬; 'ইউলিসিস্'-১৯২২; 'অ্যানালিভিয়া প্লুরাবেল'-১৯৩০; 'হ্যাভেথ চাইল্ডারস্ এভরিহোয়্যার'-১৯৩১; 'ফিনিগান্‌স ওয়েক'-১৯৩৯ এই উপন্যাসগুলি রচনা করেন। ১৯৪১ সালে জুরিচ-এ তাঁর মৃত্যু হয়।]

ডাবলিন, আয়ার্ল্যাণ্ড, ১৬ই জুন, ১৯০৪ সাল। কয়েকটি চরিত্রের ষোল ঘণ্টার জীবন নিয়ে উপন্যাস। ডাক্তারী ছাত্র বাক্ মুলিগ্যান দাড়ি কামিয়ে শিক্ষক ষ্টিফেন দেদালাস্-এর সঙ্গে প্রাতরাশ খাচ্ছে। ষ্টিফেনের মনকে অশান্ত করে রেখেছে যে সব কারণ তার একটি হলো, চার্চ-এর আইনকানুনের প্রতি বিরাগবশতঃ সে তার মৃতা জননীকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করেনি। সুরাসক্ত তরুণ ইংরেজ হেইন্‌স এবং এই বাক্-এর সঙ্গে মিশে তার জীবন ক্রমেই উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাচ্ছে, এই আর একটি অশান্তির কাঁটা। স্কুল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রতীরে আপন মনে বেড়ানোই তার কাছে সবচেয়ে প্রীতিপ্রদ। প্রচার বিভাগের সেল্‌সম্যান, ইহুদী লিওপোল্ড ব্লুম নিজের অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর জন্যে প্রাতরাশ বানাচ্ছে। মেয়ে মিলির চিঠি পড়ে তার এগারো দিনের মৃত পুত্র রুডির কথা মনে হয়। সে দোকানে দোকানে ঘোরে। যে মেয়েটির সঙ্গে হাল্‌কা প্রেম করছে তার চিঠি পড়ে পোস্ট অফিসে বসে। এবং পুরনো বন্ধু প্যাডি ডিগনাম-এর শবযাত্রায় যোগ দিয়ে তার ছেলে রুডি এবং তার বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন। ব্লুম ও ষ্টিফেনের দু'বার দেখা হয়। খবরের কাগজ অফিস ও পাবলিক লাইব্রেরিতে। শেষোক্ত স্থানে ঈষৎ প্রমত্ত ষ্টিফেন শেক্সপীয়র সম্পর্কে নিজের থিওরী আওড়ায়। তাদের

মধ্যে কোন কথা হয় না। বিকেল ও সন্ধ্যায় নানা জায়গায় নানা পরিচিত জনের সংগে সাক্ষাতের পর ষ্টিফেন ও মুলিগ্যানের সংগে ব্লুম শুঁড়িখানায় যায়। অতঃপর ডাবলিনের বস্তি অঞ্চলে এক বেশ্যালয়ে। ব্লুম ভাবছে তার স্ত্রীর বিশ্বাসভংগের কথা, মাতাল ষ্টিফেন ভাবছে তার মা-র কথা। অবশেষে দুই গোরার সংগে ষ্টিফেনের হাতাহাতি। ব্লুম তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। দরজা খোলবার জন্যে চাবি খুঁজতে খুঁজতে ব্লুম ষ্টিফেনকে বলে, মাতাল মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের সংগ ছেড়ে তার সংগে এসে বাস করতে। ষ্টিফেন শোনে না। একলা ফিরে যায়। ব্লুম ঘরে ঢুকে তার নিদ্রিত, স্থুলাঙ্গী স্ত্রীকে দেখে। তার স্ত্রী ঘুমের মধ্যে তার প্রণয়ীদেরকে, প্রথম পরিচয়ের ব্লুমকে, স্পেনে মধুচন্দ্রিমার দিনগুলোকে স্বপ্ন দেখতে থাকে। ব্লুম পাশে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকায় তবু তার স্বপ্নের প্রবাহ বন্ধ হয় না।

॥ বারো ॥

অলডাস হাক্সলে : ব্রেভ নিউ ওয়াল´ড্ : ১৮৯৪—

[প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস্ হাক্সলে তাঁর পিতামহ। পিতা গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক, যার সঙ্গে ম্যাথু আর্নল্ডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের শুরু। ইউরোপে ইতস্ততঃ ব্যস্ত জীবন কাটাবার পর ১৯৩৯ সাল থেকে হাক্সলে হলিউডে পাকাপাকিভাবে বাস করছেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'ক্রোম ইয়েলো'-১৯২১ ; 'অ্যান্টিক হে'-১৯২৩ ; 'দোজ ব্যারেন লীভস্'-১৯২৫ ; 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'-১৯২৮ ; 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড'-১৯৩২ ; 'আইলেস্ ইন্ গাজা'-১৯৩৬ এইগুলিই প্রধান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাঁর অন্যান্য কয়েকটি গল্প সংগ্রহ এবং ছোট উপন্যাসও আছে।]

A. F. ৬৩২। অর্থাৎ ফোর্ডের পরে ছয়শো বত্রিশ বছর কেটে গেছে।

বিজ্ঞানকে মানুষ দাস বানিয়েছে। এবং মানুষকে সমাজের প্রয়োজনে যন্ত্র বানিয়ে ফেলবার সব আয়োজন সমাপ্ত। সেন্ট্রাল লণ্ডন হ্যাচারী অ্যাণ্ড কনডিশানিং সেন্টার-এর পরিচালক মহোদয় তাঁর কারখানায়, সমাজের অর্থনীতিক পরিকল্পনায় যে যে মানুষ দরকার, সেই প্রয়োজন মতো মানুষ উৎপাদন করেন। যৌন আকর্ষণ ও যৌন সম্বন্ধ আজ মানুষ সৃষ্টি করার কাজে লাগে না। সেটা প্রমোদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালবাসা ও পারিবারিক জীবন, এ সব কথাও মানে হারিয়েছে। এ সমাজে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্যে। এ সমাজে সবাই সুখী, কেননা যে যে-কাজ করবে, তাতে সুখী ও সন্তুষ্ট থাকবে,

সেইমতোই তাদের বানানো হয়েছে। ক্লান্তি বা অবসর বিনোদনের জন্যে 'সোম' পানীয়ের ব্যবস্থা আছে। 'সোম' পান করলে আশ্চর্য আনন্দের অনুভূতি হয়। এত সাবধানতা সত্ত্বেও যদি কারুর মধ্যে যান্ত্রিকতার বদলে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ছিটে ফোঁটা দেখা যায়, তবে ধরে নেওয়া হয় তাকে উৎপাদন করবার প্রক্রিয়ায় কোথাও ত্রুটি ছিল। এইসব বিদ্রোহীদের আইস্‌ল্যাণ্ড বা আলাস্কায় নির্বাসনে পাঠান হয়। আল্‌ফা-প্লাস বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেই এইসব খাপছাড়া চরিত্রের বেশি আনাগোনা। ভ্রূণ অবস্থায় মাদকদ্রব্যের মাত্রা বেশি দেবার ফলে বার্নার্ড ম্যাক্স-এর মধ্যে ফোর্ড্‌-এর সমসাময়িক আদিম মানুষের চরিত্রলক্ষণ বেশি দেখা যায়। সে এবং রূপসী লেনিনা ক্রাউন নিউ মেক্সিকোতে বেড়াতে যায়। সেখানে, আদিম মানব সংরক্ষণে, কিছু ভারতীয় ও অন্যান্য মানুষকে, অবলুপ্ত মানবজাতির মতোই স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে দেওয়া হয়েছে। তাদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়। বার্নার্ড ও লেনিনার সঙ্গে জন ও তার মা লিণ্ডার দেখা হয়। টোম্যাকিন নামে একজন, লিণ্ডাকে এই সংরক্ষণে পরিত্যাগ করে পালিয়েছিল। জন তারই সন্তান। সেই সময় থেকে ভারতীয়দের সঙ্গে বাস করেছে জন। এবং একটি প্রাচীন শেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী তার প্রিয় পাঠ্য। (A. F. ৬৩২-এ, শেক্সপীয়ার, বাইবেল ও অন্যান্য বই, পশ্চিমী সভ্যতার কণ্ট্রোলার মুস্তাফা মণ্ড্‌ মহাশয় মিউজিয়ামের দর্শনীয় বস্তু হিসেবে তালাচাবি দিয়ে রেখেছেন।) মণ্ড্‌-এর অনুমতি নিয়ে বিজ্ঞানের অনুশীলন করবার জন্যে বার্নার্ড ও লেনিনা, জন ও লিণ্ডাকে লণ্ডনে নিয়ে আসে। বার্নার্ড-এর ধারণা তার মনিব, হ্যাচারীর কর্মকর্তাটিই জনের বাবা টোম্যাকিন। তারা আসতেই ডিরেক্টর মহোদয় পদত্যাগ করেন লজ্জায়। লিণ্ডাকে জোর করে 'সোম' পান করবার প্রমোদকেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানেই সে মারা যায়। আদিম মানুষ জনকে নিয়ে সবাই মাতামাতি করে। লিনিনার সংস্কারমুক্ত যৌন কামনা দেখে জনের আদিম নীতিবোধ ব্যথিত। সে এই যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পেষণে হাঁপিয়ে উঠে নির্জনে পালাতে চায়। কিন্তু সেই নির্জনেও তার পেছনে এরা ধাওয়া করে। রেডিও, টেলিভিশন এবং হেলিকপ্টার তার প্রত্যেকটি গতিবিধিকে প্রচারিত করে। একটু নির্জনতা এবং স্বাভাবিক ভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যর্থ হয়ে জন আত্মহত্যা করে। এই দুঃসাহসী নতুন পৃথিবীতে পুরনো পৃথিবীর মানুষের বাঁচা সম্ভব নয়।

॥ তের ॥

ন্যাথানিয়েল হথোর্ন : দ্য স্কার্লেট লেটার : ১৮০৪—১৮৬৪

[বিধবা মা-র সংগে হথোর্ন-এর নিঃসঙ্গ শৈশব কাটে। বাওডয়েন কলেজে পড়া শেষ করে সাহিত্যবৃত্তিতে নিষ্ফলকাম হথোর্ন কাস্টমস্ অফিসে কাজ নেন। ১৮৫০ সালে সাহিত্যিক খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর জীবন বৈচিত্র্যহীন। পরে য়ুরোপ ভ্রমণ করেন তিনি। ম্যাসাচুসেট্স-এ কনকর্ড-এ তাঁর স্থায়ী বাসগৃহে তাঁর মৃত্যু হয়। হথোর্ন-এর উপন্যাসের মধ্যে 'দ্য স্কার্লেট লেটার', 'হাউস অফ্ দ্য সেভেন্ গেবল্স', 'দ্য মার্ব্ল' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।]

সপ্তদশ শতকে বোস্টন্-এ হেস্টার গ্রীন্, তার তিন মাসের শিশু পার্লকে নিয়ে গুপ্তপ্রণয় ও অবৈধ সন্তানের কলঙ্ক চিহ্ন লাল কাপড়ের 'A' জামায় নিয়ে কৌতূহলী জনতার সামনে এসে দাঁড়াল। কারাগারে তার স্বামী ডাক্তার রজার চিলিংওয়ার্থ্ তাকে এসে জানাল, হেস্টার যেন রজারের পরিচয় কারুকে না জানায়। দুই বছর হেস্টার স্বামীপরিত্যক্ত জীবন কাটিয়েছে, সে কথাও যেন প্রকাশ না হয়। হেস্টার পার্লকে নিয়ে দরিদ্রের মতো সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করে। পার্লকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার কথা হয়। সে রেভারেণ্ড আর্থার ডিম্সডেল ও খ্যাতিমান চিকিৎসক রজার চিলিংওআর্থকে সাক্ষী রেখে ক্ষুব্ধ জনতাকে বলে—পার্লকে সে দেবে না। অসুস্থ ডিম্সডেল ও চিলিংওআর্থ দুজনে একই বাড়িতে বাস করে। কিন্তু বন্ধুত্বের মুখোসের নিচে দুজনে দুজনকে ঘৃণা করে। হেস্টার ও ডিম্সডেল-এর মধ্যে এক অদ্ভুত সম্পর্ক। একদিন ডিম্সডেল সকলের সামনে বলে—আমি মৃত্যু পথযাত্রী। আমি স্বীকার করছি আমিই হেস্টারের প্রণয়ী। তার মৃত্যু হয়। সকলে সভয়ে দেখে তার গায়ে আগুনে পুড়িয়ে 'A' অক্ষরটি লেখা। সকলে হেস্টারকে আজ শ্রদ্ধা করে। কিছুদিন পরে রজার মারা যায়। তার সম্পত্তি পেয়ে হেস্টার ও পার্ল ধনী হয়। ইংলণ্ডে গিয়ে হেস্টার পার্লকে বিবাহিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে ফিরে আসে। শেষ জীবনটা পরের সেবায় ও প্রার্থনায় উৎসর্গ করে হেস্টার।

॥ চৌদ্দ ॥

মার্ক টোয়েন : দ্য প্রিন্স্ অ্যাণ্ড দ্য পপার : ১৮৮৫—১৯১০

[স্যামুএল লংহর্ন ক্লিমেন্স্ তাঁর ছদ্মনাম মার্ক টোয়েন-এই জগদ্বিখ্যাত। মিসৌরী নদী তীরে তাঁর শৈশব ও বাল্য কেটেছে। ভ্রাম্যমাণ প্রকাশক ও নৌ-চালক'এর কাজের পর তিনি ভার্জিনিয়ার 'এন্টারপ্রাইজ' কাগজে লিখতে শুরু করেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠ হয়। ১৮৭০ সালে অলিভিআ ল্যাংডন্‌কে বিয়ে করেন। ঋণের দায় কাটাতে পৃথিবীতে লেক্‌চার-ট্যুরে বেরোন। কনেক্‌টিকাট্‌-এ, স্বীয় গৃহ 'ষ্টর্মফিল্ড্'-এ তাঁর মৃত্যু হয়। 'হাক্‌লবেরি ফিন্', 'এ কনেক্‌টিকাট্ ইয়াংকি অ্যাট কিং আর্থারস্ কোর্ট', 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার্স্ অফ্ টম্ সইয়্যার' তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করেছে।]

সপ্তদশ শতকে, লণ্ডনে, একই দিনে দুটি শিশুর জন্ম হয়। রাজপ্রাসাদে এড্‌ওআর্ড টিউডর, সে অষ্টম হেনরীর পর রাজা হয়। রাজপ্রাসাদের বাধা-নিষেধে তার মন কাঁদে বাইরের দিকে চেয়ে। আর ওফাল কোর্ট-এর ঘিঞ্জি বস্তিতে জন্মায় টম ক্যান্টি। সে তার পরিবারের সংগে একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে অতি দরিদ্র, অতি নোংরা পরিবেশে দিন কাটায়। সে স্বপ্ন দেখে রাজ-প্রাসাদে এক সুখী জীবনের। একদিন, ওএস্ট মিনিস্টার প্রাসাদের দরজায় বালক টম ক্যান্টি গিয়ে দাঁড়ায়। প্রহরীদের অপমান থেকে উদ্ধার করে তাকে ভেতরে নিয়ে যায় যুবরাজ এড্‌ওআর্ড। শিশু সুলভ চাপল্যে দুজনে দুজনের পোশাক বদলায়। এড্‌ওআর্ডকে ভিখারী বালক মনে করে প্রহরীরা তাড়িয়ে দেয়। রাজপরিবারের এক বিশেষ সম্পদ একটি আংটি ছিল এড্‌ওআর্ডেরই কাছে। টম ক্যান্টি যখন তার নিজের পরিচয় দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়, রাজা হেনরী মনে করেন তার সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। তাই সে সেই আংটিটির খবর বলতে পারছে না। এড্‌ওআর্ড গিয়ে দাঁড়ায় ওফাল কোর্ট-এ। ক্যান্টি পরিবারে সকলেই বোঝে এ টম নয়। তবু তারা তাকে গ্রহণ করে। মাইল্‌স্ হেন্‌ডন নামে একটি সহজ সরল বলিষ্ঠ দেহ যুবক এড্‌ওআর্ডের বন্ধু হয়। সে এড্‌ওআর্ডের কথা বিশ্বাস করে। সে সুযোগ খোঁজে কেমন করে এড্‌ওআর্ডকে তার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অনেক বাধা আসে, অনেক বিপত্তি। বহু বছর এই ভাবে কাটবার পর, অষ্টম হেনরীর মৃত্যুতে এড্‌ওআর্ড হন রাজা। রাজার অভিষেকের দিন, ওএস্ট মিনিস্টার অ্যাবে-তে এক নাটকীয় পরিবেশে এড্‌ওআর্ড চেঁচিয়ে ওঠে, আমিই রাজা। সকলকে বিস্মিত করে টম ক্যান্টি

নেমে আসে সিংহাসন থেকে। সে স্বীকার করে সব। এডওআর্ড সেই লুক্কায়িত আংটিটি ফিরিয়ে দেবার পর তাকে সবাই স্বীকার করে নেয়। নতুন রাজার রাজত্বে ক্যান্টি পরিবার ও মাইল্‌স হেন্‌ডন বিশেষ সম্মান ও সম্পদে ভূষিত হয়ে সুখে জীবন কাটায়।

॥ পনেরো ॥

এডগার অ্যালেন পো : দ্য ব্ল্যাক ক্যাট : ১৮০৯—১৮৪৯

[বোষ্টনে ১৯শে জানুআরি ১৮০৯ সালে ভ্রাম্যমাণ অভিনেতা দম্পতির ঘরে জন্ম। শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে তিন বছর বয়সে জন অ্যালান কর্তৃক প্রতিপালিত হন। ১৮১৫ সালে ইংলণ্ডে স্কুলে যান। ১৮২০ সালে ফিরে আসেন। কলেজের শিক্ষা শেষ করতে পারেননি। ১৮২৬ সালে জুয়াখেলায় ধারে জড়িয়ে পড়ে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। পালক পিতা তাঁকে ত্যাগ করেন। ১৮২৭-এ প্রথম কবিতাসংগ্রহ 'ট্যামার লেন' বেরোয়। ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় 'এমএস্ ফাউণ্ড ইন্ এ বাটল'-এর জন্য পুরস্কার পেয়ে ১৮৩৫ সালে রিচমণ্ডে 'সাউদার্ন লিটারারি মেসেঞ্জার'-এর সংগে যুক্ত হন। ১৮৩৬ সালে চৌদ্দ বছরের বালিকা ভার্জিনিয়া ক্লেমকে বিয়ে করেন। তারপর চাকরী ছেড়ে নিউইয়র্ক। ১৮৩৮-এ ফিলাডেলফিয়া। আবার চাকরী হারান। অসহ্য অর্থকষ্টের পর ১৮৪৭-এ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর ভগ্নহৃদয় পো মানসিক যন্ত্রণা ও অর্থকষ্টে মর্মান্তিক অবস্থায় দুই বছর কাটিয়ে বাল্‌টিমোর-এ সাধারণ চিকিৎসালয়ে মারা যান। ৭ই অক্টোবর ১৮৪৯-এ তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮২৯-১৮৪৫-এর মধ্যে তাঁর সুবিখ্যাত গল্পগুলি লিখিত। 'গোল্ড বাগ'; 'দি মার্ডারস্ ইন দি রিউ মর্গ'; 'দি পারলয়েণ্ড লেটার' ও 'দি ব্ল্যাক ক্যাট' পো-র গল্পগুলির মধ্যে খ্যাততম।]

শৈশব থেকেই আমি কোমলচিত্ত এবং পশু পাখীর প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলাম। বড় হয়েও সে ভালবাসা আমার যায়নি। আমার স্ত্রীও আমারই মতো নরম স্বভাবের মানুষ। পশু পাখী তিনিও ভালবাসতেন। তাই আমাদের বাড়িতে পাখী, সোনালী মাছ, কুকুর, খরগোস, বাঁদর এবং একটি বেড়ালও ঠাঁই পেল। কুচকুচে কালো রঙের বেড়াল। নাম তার প্লুটো। যেমন বড়সড় তেমনই চমৎকার দেখতে। সবুজ জলজলে চোখ, আর ভারী বুদ্ধিমান। আমার এমনই অনুগত, যে পথ দিয়ে হাঁটতে গেলে সে নিঃশব্দে পেছনে পেছনে আসে। আমার স্ত্রী বলতেন, কালো বেড়ালের মধ্যে ডাইনীদের আত্মা থাকে। তারা চোখের নজর দিয়ে মানুষের ভেতর থেকে দয়ামায়া শুষে নেয়। বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস না করেই কয়েক বছর কাটল। কিন্তু ধীরে ধীরে নিয়তির পরিহাসে আমার স্বভাব হলো রুক্ষ, গম্ভীর ও নিষ্ঠুর। স্ত্রী-কে অপমান করি। জীবজন্তুগুলিকে

কষ্ট দিই। কেন দিই জানি না। শুধু প্লুটোর সবুজ চোখ দুটোর সামনে আমি মন্ত্র মোহিতের মতো শান্ত হয়ে যাই। একদিন রাত্রে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছি। সামনে প্লুটো ছিল। কি নিষ্ঠুরতা যে আমাকে পেয়ে বসলো! সহসা ছুরি দিয়ে তার একটা চোখ উপড়ে নিলাম। আমি কি মানুষ? এবং বিবেকের কশাঘাত এড়াবার জন্যে তারপর থেকে মদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। তবু প্লুটো আমার ছায়ার মতো আমাকে ভালবেসে সংগে সংগে ঘুরতে লাগল। ও কি বোঝেনি ওর এই ভালবাসা আমাকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? অবশেষে, সজ্ঞানে, ওকে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম গাছে। তারপর ভাগ্য আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। নইলে, শুঁড়িখানা থেকে ফেরবার সময়ে ঠিক প্লুটোর মতোই আর একটা কালো বেড়াল আমার সংগ নিল কেন? এর বুকের কাছে একটা শাদা দাগ। নইলে এর একটা কানা চোখ প্লুটোর কথাই মনে করিয়ে দেয়। আমার স্ত্রী একে ভালবাসলেন। আর এ আমাকে ঘেন্না করে এড়িয়ে চলতে লাগল। যখন তখন একে একটা সবুজ চোখে প্রতিহিংসা নিয়ে চেয়ে থাকতে দেখে আমার মধ্যের শয়তানটা ক্ষেপে উঠল। তারই ফলে, স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির নিচেকার গুদাম ঘরে গিয়ে, বেড়ালটাকে দেখে আমি কুড়োল তুললাম। বেড়ালটা অক্ষত রইল। কিন্তু স্ত্রীকে আমি খুন করে বসলাম। খুন করলাম। দেওয়াল খুঁড়ে তাতে কবর দিলাম। হত্যার সব চিহ্নই ঢেকে ফেললাম। তারপর থেকে দুঃসহ যন্ত্রণায় দিনরাত কাটতে লাগল। সর্বনেশে বেড়ালটা যদি আসে? যদি তাকায়? সে এল না। আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম। কিন্তু পুলিশ এল বারোদিন বাদে। সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে তারা হত্যার কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না। আমি একটা দানবীয় উল্লাস বোধ করলাম। আমি যেন আশ্চর্য বুদ্ধিমান। ওদের ঠকাতে পেরেছি। ওদের গুদাম ঘরে নিয়ে গিয়ে আমি আনন্দের সংগে চেঁচিয়ে বললাম—দেখুন, দেখুন। সবটা বাড়ি দেখুন। বলে দেওয়ালে যেই ছড়ি দিয়ে ঠুকেছি, অমনি সেই দেওয়ালের পেছন থেকে কে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল। বীভৎস, আর্ত কান্না। দেওয়াল ভাঙা হলো। আমার স্ত্রীর গলিত বিকৃত শবদেহটার ওপরে বসেছিল সেই কালো বেড়ালটা। লাল টকটকে জিভ, জ্বলন্ত একটা চোখ, আমি কি জানতাম আমি তাকে স্ত্রী-র সংগে কবর দিয়েছি? আমি কি জানতাম আমাকে ফাঁসীর দড়িতে ঝোলাবে বলে ও নিয়তির মতো অপেক্ষা করছিল?

॥ ষোল ॥

হেনরী জেম্‌স্ : দ্য পোর্টেইট্ অফ্ এ লেডী : ১৮৪৩—১৯১৬

[নিউইঅর্কে যাঁর জন্ম, ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় যাঁর শিক্ষা, সেই হেনরী জেম্‌স ভ্রাম্যমাণের জীবন কাটিয়ে গেছেন। ১৮৮০ সালের পর ইংলণ্ডে স্থিত হতে পেরে তিনি ছোটগল্প, উপন্যাস ও সমালোচনা লিখতে থাকেন। ১৯১৫ সালে ইংলণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ১৯১৬ সালে তিনি মারা যান। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'রোডারিক হাড্‌সন' (১৮৭৬), 'হোয়াট মেইজি নিউ' (১৮৯৮), 'দ্য গোল্ডেন বোল' (১৯১৪) এবং 'দ্য লেস্‌ন অফ্ দ্য মাষ্টার' প্রমুখ গল্প বিখ্যাত। এই শতকের প্রথম দুই দশকের পাঠকের উপেক্ষা, গত বিশ পঁচিশ বছর হলো হেনরী জেম্‌সের প্রতি হঠাৎ মনোযোগে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমালোচকরা, এজরা পাউণ্ড প্রমুখ মনস্বীরা হেনরী জেম্‌সকে গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।]

আমেরিকা থেকে সুন্দরী, ধনী, ইজাবেল আর্চার ইংলণ্ডে গার্ডেনকোর্ট-এ তাঁর কাকার কাছে আসবার সময়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বৃহত্তর ও বিচিত্র জীবনকে দেখতে চান তিনি। তাই ক্যাস্‌পার গুড্‌উড্-এর বিয়ের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কাকা শ্রীযুক্ত টৌচেট্-এর ছেলে, রুগ্ন রাল্‌ফ্-এর সংগে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। টৌচেট্ পরিবারের বন্ধু লর্ড ওআরবার্টন-ও তাঁকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু টৌচেট্ পরিবারে যেদিন ম্যাডাম মার্লে এলেন, তাঁর জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ইজাবেলকে উন্মনা করল। শ্রীমতী টৌচেট্-এর সংগে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে ম্যাডাম মার্লে-র মধ্যস্থতায় ইজাবেল বিয়ে করলেন গিলবার্ট অস্‌মণ্ড্‌কে। ফ্লোরেন্স প্রবাসী এই আমেরিকানটি, তাঁর কন্যা প্যান্‌জিকে নিয়ে শৌখীন ও স্বার্থপর জীবন কাটাবার জন্যে একটি ধনী স্ত্রী খুঁজছিলেন। ক্যাস্‌পর গুড্‌উড্ এই সংবাদে মর্মাহত হন। রাল্‌ফও বিচলিত। অস্‌মণ্ড্-এর জীবনে ম্যাডাম মার্লের এক অদ্ভুত ভূমিকা। রোমে ইজাবেল তিন বছর কাটাল। দরিদ্র তরুণ নেড্ রোজিআরকে বিয়ে করতে চায় প্যান্‌জি। এই সময় রাল্‌ফ ও লর্ড ওআরবার্টন রোমে আসেন। তাঁদের আশংকা সত্যি হয়েছে। স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা অসমণ্ড্‌কে নিয়ে স্বাধীন-চিত্ত তেজস্বী ইজাবেল সুখী হয়নি। ম্যাডাম মার্লে চান ওআরবার্টন প্যানজিকে বিয়ে করুক। ইজাবেল জানেন ওআরবার্টন তাকে ভালবাসেন। ইজাবেলের মধ্যস্থতায় ওআরবার্টন রোম ছেড়ে চলে যান।

রাল্‌ফ-এর রোগের খবর পেয়ে ইজাবেল যখন ইংলণ্ডে ফিরে যান, তখন

তিনি অসমণ্ড্-এর বোন কাউন্টেস জেমিনির কাছে জানেন ম্যাডাম মার্লেই প্যানজির মা। রাল্ফের মৃত্যুশয্যায় ইজাবেল উপলব্ধি করেন, তাঁরা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছেন। ক্যাস্পার গুড্উড্ ইজাবেলকে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ করে তাঁকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেন। এক নিষ্ফল জীবন থেকে মুক্তির এ আহ্বান ইজাবেল ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে পারেন না। রাল্ফ, ওআরবার্টন ও ক্যাস্পার, তিনটি পুরুষের প্রেম তাঁর জীবনকে জটিল করেছে। ইজাবেল ফিরে যান অস্মণ্ড্-এর কাছে। সেই বিফল জীবনের ক্রুশ বহন করাতেই তাঁর মুক্তি মিলবে।

॥ সতেরো ॥

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে : এ ফেআরওএল টু আর্মস : ১৮৯৯—১৯৬১

[ওক পার্ক ইলিনয়-এর এক ডাক্তারের ছেলে আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার পর 'কান্সাস সিটি ষ্টার'-এ সংবাদদাতা, প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালীতে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, ইতালীতে পদাতিক সেনা, 'টরণ্টোষ্টার'-এর নিকট প্রাচোর সংবাদদাতা, প্যারিসে ইণ্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস-এ সাংবাদিক, ১৯৩৬-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধে যুক্ত-সংবাদদাতা ও অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্যারিবিআন সমুদ্রে ইউ-বোট চেজার, ফ্রান্সের প্রতিরোধ সংগ্রামে এক সংগ্রামী সাংবাদিক এই সব কাজ করেন। আফ্রিকায় শিকার, মাছধরা, স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই দেখা তাঁর প্রিয় নেশা ছিল। বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনি আহত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা মনে করবার কারণ আছে। ১৯৫৪ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দ্য সান্ অল্‌সো রাইজেস্', 'টু হ্যাভ অর হ্যাভ নট' ; 'এ ফেআরওএল টু আর্মস', 'ফর হুম দ্য বেল্ টোল্‌স', 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' ইত্যাদি এবং তাঁর গল্পের মধ্যে 'দ্য স্নোজ্ অফ্ কিলিমাঞ্জারো', 'উইনার টেক নাথিং ; 'ফিফ্টি গ্র্যাণ্ড', 'দ্য কিলার্স' ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত।]

প্রথম মহাযুদ্ধ। ইতালীয়রা যখন যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত, হতাশ ও তিক্ত তখন ফ্রেডারিক হেনরী (আমেরিকান) ইতালীআন অ্যাম্বুলেন্স কোর এ লেফ্টেনান্ট হয়ে এল। অষ্ট্রিআনরা যখন আক্রমণ করে না, তখন গোরিজিয়া শহরে জীবন নিস্তরঙ্গ। হেনরীর ইতালীয় বন্ধু রিনল্ডি দক্ষ সার্জন, বন্ধুবৎসল, মদ্যপ ও নারীদের প্রতি দুর্বল। আর এক ইতালীয় ধর্মযাজক, আব্রুৎসিতে তার বাস, ধর্মপ্রবণতার জন্যে সৈন্যরা তাকে নিয়ে কৌতুক করে। রিনল্ডির হৃদয় তখন ক্যাথারিন বার্কলীর প্রতি আসক্ত। ক্যাথারিন দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী। সোনালী তার চুল, ধূসর তার চোখ। ইংরেজ হস্পিটালের শীতল করিডোরে

দাঁড়িয়ে হেনরী ও ক্যাথারিন প্রেম নিয়ে কৌতুক করে। যুদ্ধ তাদের হৃদয় থেকে রোমান্স মুছে নিয়েছে। তবু যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে হেনরীকে ক্যাথারিন শুভচিহ্ন স্বরূপ একটি সেণ্ট অ্যাণ্টনীর মেডেল দেয়। হেনরী আহত হয়। সে মিলানের হাসপাতালে আসে। সেখানে ক্যাথারিনও আসে। হেনরীর সুস্থ অবস্থা ফিরে আসবার দীর্ঘ সময়টুকুর মধ্যে দুজনে দুজনকে ভালবাসে। সুন্দর গ্রীষ্ম। মিলান-এর পরিবেশ প্রাচীন ও সুন্দর। বিয়ের কথা তারা বলে না। তবু একদিন জানা যায় ক্যাথারিন সন্তান সম্ভাবিতা। প্রেম আরো প্রগাঢ় হয়। দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তারা প্যালানজাতে যাবে। হেনরী ছুটি পায় না। যুদ্ধ। অবিশ্রান্ত বর্ষণ। পরাজিত সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করছে। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, মৃত্যু। ক্যাথারিনের প্রতি প্রেম হেনরীকে ছিঁড়ে নিয়ে যায় মিলানে। মিলান থেকে স্ত্রেসা। সেখান থেকে দুজনে সুইজারল্যাণ্ড। তারপর লসেন্। আসন্ন প্রসবের জন্যে তাদের বিয়ে হয় না। তারপর প্রথম প্রসববেদনা। সিজরিআন অপারেশান। মৃত সন্তান। আবার বর্ষণ। অপেক্ষা করতে করতেই যেন হেনরী জানতে পারে, ক্যাথারিনও বাঁচবে না। এই যুদ্ধ এই ক্লান্তি সত্য, এবং একে ছাড়িয়ে সুখী হবার সব প্রচেষ্টাই বিফল। মৃত্যুই অগ্রসরমান। মানুষের জীবনের কোন দাম মিলবে না। মিলান, বসন্ত, প্রেম, সে সব যেন কোনদিন ছিল না। ক্যাথারিনের মৃত্যু হয়। নির্জন ঘরে, একলা দাঁড়িয়ে থাকে হেনরী। তারপর বেরিয়ে এসে বর্ষার মধ্যে চলতে থাকে। সে বৃদ্ধ, ধূসর, ক্লান্ত এবং তার চোখে আর কোন আশা নেই।

॥ আঠারো ॥

উইলিয়াম ফক্‌নার : দি আনভ্যাংকুইশ্‌ড : ১৮৯৭—

[রিপ্‌লি মিসিসিপিতে জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে প্রথম মহাযুদ্ধে এআরফোর্সে লেফ্‌টেনাণ্ট হিসেবে যোগ দেন। চিত্রকর, ছুতোর, মৎস্যজীবি, সাংবাদিক, শ্রমিক—নানা জীবন কাটিয়ে তবে তিনি লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৯-এ তিনি নোবেল পুরস্কার পান। 'অ্যাজ আই লে ডাইং'; 'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফিউরি'; 'লাইট ইন্ অগাষ্ট'; 'দি ওয়াইল্ড পামস্'; 'দি আনভ্যাংকুইশ্‌ড্'; 'স্যাংচুয়ারি' প্রভৃতি ফক্‌নারকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।]

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়। দক্ষিণের প্ল্যাণ্টাররা উত্তরকে প্রতিরোধ

করেছিল। আর ড্রুসিলা সারটোরিস, পুরুষের পোশাক পরে, কন্‌ফেডারেট সৈন্য সেজে, তার নিহত প্রেমিকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বেরিয়ে পড়ে। দক্ষিণের কন্‌ফেডারেটরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত। বুড়ি ঠাকুরমা সারটোরিস তার ছেলে মেয়েকে সততা, সাধুতা এই সব শেখায়। কিন্তু নিজের বিধ্বস্ত উপবাসী দেশবাসীকে সাহায্য করবার জন্যে ইয়াংকি সৈন্যদের লুঠ করতে তার বিবেকে বাধে না। জন সারটোরিস, তার দুঃসাহসিকতার জন্যে তার নিজের ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের কাছে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। সে হত্যার অভ্যাস ছাড়তে পারে না। আর বেয়ার্ড সারটোরিস, এই নিরন্তর হত্যা দেখে দেখে বীতশ্রদ্ধ, ঘৃণায় বিমুখ। এদের জীবনের নাটককে এরাই শেষ অঙ্কে পৌছিয়ে দেয়। এরা প্রমাণ করে, পরাজিত হয়েও এরা পরাজয় স্বীকার করেনি। এদের আত্মার স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

॥ উনিশ ॥

ফিডর দস্তয়ভস্কি : ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট : ১৮২১—১৮৮১

[মস্কোর সন্নিকটে এক ডাক্তারের ঘরে জন্ম। ষোল বছর বয়সে মা-কে হারান। আঠার বছর বয়সে পিতা খুন হন। মিলিটারী এঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময়ই মৃগীরোগের লক্ষণ দেখা দেয়। ১৮৪৯ সালে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে মৃত্যুদণ্ড পান। বধ্যভূমিতে উদ্যত বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে জারের ক্ষমাপত্র পান। পাঁচ বছর সাইবেরিয়ায় কাটে। ১৮৫৭ সালে মারিয়া ডিমিট্রিয়েভ্‌না ইসায়েভা-কে বিয়ে করেন। রুগ্ন স্ত্রী, অসুখী জীবন। ১৮৫৯ সালে নাগরিক জীবন যাপনের অধিকার পান। সেই বছর থেকেই লিখতে শুরু করেন। ১৮৬৪ সালে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ সালে সেক্রেটারী অ্যানা গ্রিগরিয়েভ্‌না স্নিট্‌কিনা-কে বিয়ে করেন। ড্রেসডেন ও জর্মানীতে ভ্রমণ করেন। প্রবল জুয়ার নেশা ছিল। ১৮৮১ সালে মৃত্যু হয়। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত 'দ্য ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট', 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ্', 'দ্য ইডিয়ট', 'দ্য পজেজ্‌ড' ইত্যাদি।]

রোডিয়ন রোমানোভিচ্ র‍্যাস্‌কোল্‌নিকভ্ সেণ্ট পিটার্সবার্গ-এ ছাত্র। তাকে অধ্যয়নের খরচ জোগাবার জন্যে তার বোন ডুনিয়া পিওটর লুজিনকে বিয়ে করতে চায়। মা ও বোন সেজন্যে শহরে আসতে চান। র‍্যাস্‌কোল্‌নিকভ্ দরিদ্র বেকার মার্মেলাডভ্, তার উপবাসী পরিবার, তার কন্যা সোনিয়াকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতা তার মনকে বিক্ষুব্ধ

করে। এর হাত থেকে, নিজের মন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে র‍্যাস্‌কোল্‌নিকভ্‌, তেজারতি কারবারী ষাট বছরের অ্যালিওনা ইভানোভ্‌না ও তার বোনকে খুন করে। লব্ধ অর্থের বিপুল সঞ্চয় সে লুকিয়ে রাখে। তারপর তার এই আচরণ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পুলিশ তাকে বাকি ভাড়ার জন্যে তাগাদা জানালে সে সন্ত্রস্ত হয়। সে তার বন্ধু দিমিত্রির বাড়িতে জ্বরবিকারে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে জানে, নিকোলে নামক একজন রং-কারিগর এই হত্যার জন্যে গ্রেফ্‌তার হয়েছে। মার্মেলাডভ্‌-এর মৃত্যু হয়। র‍্যাস্‌কোল্‌নিকভ--এর মা ও বোন শহরে আসে। পুলিশ ততদিনে এর খাপছাড়া আচরণে একে সন্দেহ করছে। এর কাছে আসে সিভিদ্রি গেইলভ, ডুনিয়ার পূর্বতন পানিপ্রার্থী। তার স্ত্রী মারা গেছে। সে ডুনিয়াকে তেরো হাজার রুব্‌ল উপহার দিতে চায়। ডুনিয়ার বাক্‌দত্ত লুজিন বিদায় নেয়। তার বন্ধু দিমিত্রি ডুনিয়াকে ভালবাসে। র‍্যাস্‌কোল্‌নিকভ্‌কে তার জঘন্য কাজের স্মৃতি যন্ত্রণায় ছিঁড়ে ফেলে। নিকোলে ওদিকে পুলিশের অত্যাচারে হত্যাপরাধ স্বীকার করে বসে আছে। সে সোনিয়াকে বলে সব কথা। সোনিয়ার তার জন্যে অনুকম্পা হয়, যখন সে বলে—আমি নিজেকেই হত্যা করেছি। সিভিদ্রি গেইলভ্‌ এই কথা শুনে ফেলে। র‍্যাস্‌কোল্‌নিকভ যে আসলে খুনী, সে কথা চারিপাশে ভাসাভাসা উড়ে বেড়ায়। সিভিদ্রি গেইলভ্‌ ডুনিয়ার ভালবাসা ফিরিয়ে আনতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। সে সোনিয়াকে তিন হাজার রুব্‌ল দেয়। ডুনিয়াকে অনেক টাকা উপহার দেয়। তারপর আত্মহত্যা করে। র‍্যাস্‌কোল্‌-নিকভের যন্ত্রণাদীর্ণ, পথভ্রান্ত হৃদয়কে সোনিয়া ধর্মের প্রলেপে শান্ত করতে চায়। পথে আনতে চায়। সব স্বীকারের পর আট বছরের জন্যে সে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়। তার যন্ত্রণার সঙ্গী হবার জন্যে সোনিয়াও তার সঙ্গী হয়েছে। ডুনিয়া ও দিমিত্রি বিয়ে করে। ডুনিয়ার মা মারা যান। সোনিয়ার শান্ত, কোমল প্রেম, ধীরে ধীরে র‍্যাস্‌কোল্‌নিকভ্‌-এর দীর্ণবিদীর্ণ হৃদয়কে শান্ত করে। পাপের জন্যে অনুশোচনা করার মধ্যে সে মুক্তির পথ দেখতে পায়।

॥ কুড়ি ॥

লিও তলস্তয় : অ্যানা কারেনিনা : ১৮২৮—১৯১০

[ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ধর্ম ও সমাজ-দার্শনিক ধনী জমিদার তলস্তয় শিক্ষার পর সেনা-বাহিনীতে যোগ দেন। দীর্ঘদিন লেখবার পর তিনি স্বীয় আদর্শে কৃষকদের উন্নতির জন্যে স্কুল

খোলেন। সরকার সেটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা জানান। তাঁর আদর্শবাদিতা, জীবনে সেই সহজ, শুদ্ধ আদর্শের অনুসরণ তাঁর সামনে অনেক বাধা এনে দেয়। অবশেষে নিজের আদর্শের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্যে তলস্তয় বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। অ্যাসটাপোভায় ছোট্ট রেলস্টেশনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর উপন্যাস সমূহের মধ্যে 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস্', 'অ্যানা কারেনিনা', 'ক্রুইট্‌ৎসার সোনাটা', 'দ্য রেজারেক্‌শান' ইত্যাদি বিখ্যাত।]

স্টিফান ও তার স্ত্রী ডারিয়ার সম্পর্কে যখন ফাটল ধরে, তাদের শান্তি ফিরিয়ে আনবার ভার নিয়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে অ্যানা কারেনিনা, স্টিফানের বোন আসে। স্টেশনে স্টিফান অ্যানাকে পরিচয় করিয়ে দেয় কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে। দুজনের এই সাক্ষাৎকারে এক অশুভ সংকেতের ছায়া ফেলে এক অনামা ব্যক্তির ট্রেনের চাকার নিচে মৃত্যু। ডারিয়ার ছোট বোন কিটি ভ্রন্‌স্কিকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়। সহজ মানুষ কোন্‌স্টানটিন লেভিনকে তার মনে থাকে না। ভ্রন্‌স্কি কিন্তু অ্যানাকে ভালবেসেছে। অ্যানা তার হৃদয়ের এই অনুভূতিকে স্বীকার করতে চায় না। সে মস্কো থেকে পিটার্সবার্গে ফেরে। তার স্বামী কারেনিন, তার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়। স্ত্রীকে সে ভালবাসেনা। অ্যানা ফিরে যেতে চায় তার বালকপুত্র সেরিওঝার কাছে। হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে অ্যানা। অবশেষে সে ও ভ্রন্‌স্কি পরস্পরকে ভালবাসে। কারেনিন সমাজ ও নিজের প্রতিষ্ঠার দিকে চেয়ে অ্যানাকে ডিভোর্স দেবে না। অ্যানা তখন ভ্রন্‌স্কির কন্যার জননী হয়েছে। ডিভোর্স হলে সেরিওঝাকে চিরতরে হারাতে হবে, এই ভয়ে অ্যানা ডিভোর্স নেয় না। লজ্জা ও কলংকের হাত থেকে সে ও ভ্রন্‌স্কি শিশু অ্যানিকে নিয়ে ইয়োরোপে চলে যায়। কিছুদিন কাটে প্রেমের পরিপূর্ণতার স্বাদ নিয়ে। কিন্তু কর্মহীন ভ্রন্‌স্কি অস্থির হয়ে ওঠে। তারা রাশিয়ায় ফিরে আসে। কিটি লেভিনকে বিয়ে করেছে। রাশিয়ার সমাজ ভ্রন্‌স্কিকে সাদরে আহ্বান জানায়। কিন্তু অ্যানাকে সবাই ঘৃণা করে। ডারিয়া ছাড়া কেউ অ্যানার সঙ্গে কথা বলে না। সমাজের কাছে অ্যানার ক্ষমা নেই। অ্যানার মন যন্ত্রণায় দীর্ণ হতে থাকে। নীতিবাদী কারেনিন তার নৈতিক উপদেষ্টা কাউণ্টেস লিভিয়া ইভানোভনার হাতের পুতুল হয়েছে। তারা অ্যানাকে সেরিওঝাকে দেখতে দেয় না। একবার চুরি করে শুধু অ্যানা সেরিওঝাকে দেখতে পায়। ভ্রন্‌স্কি, তার জমিজমা ও পল্লী আবাসের মধ্যে নতুন কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। তার ভালবাসায় খাদ নেই। তবু অ্যানার মনে সন্দেহ। এই সম্পর্ককে সম্মানিত করবার জন্যে সে কারেনিনের কাছে চরম মূল্যে

ডিভোর্স চায়। সে কোনদিন সেরিওঝাকে দেখবে না। কারেনিন রাজী হয় না। অ্যানা নিজের যন্ত্রণায় ভ্রনস্কিকে বৃথাই আঘাত করে। ভ্রনস্কি তার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। তারপর অ্যানা ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করে। মর্মাহত, ভগ্নহৃদয় ভ্রনস্কি সার্বিআন যুদ্ধে যোগ দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে চায়। অ্যানিকে নিয়ে যায় কারেনিন। এই মর্মান্তিক ট্রাজিডি স্পর্শ করে না শুধু কিটি ও লেভিনকে। তারা পরস্পরের মধ্যে এক আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে।

॥ একুশ ॥

আইভান তুর্গেনিভ : ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্‌স : ১৮১৮—১৮৮৩

[ওরেল-এ এক মফঃস্বল পরিবারে জন্ম। মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ ও বার্লিনে ছাত্রজীবন কেটেছে। কবিতা ও নাটকে চেষ্টা করলেও উপন্যাস ও গল্প লেখার মধ্যেই নিজের পথ খুঁজে পান। ১৮৫০-এর পর অনেকদিন প্যারিসে কাটান। গঁকুর, ফ্লবের, জোলা, মোপাসাঁ প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ইয়োরোপ এই রাশিয়ান লেখককেই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল। প্যারিসের সমীপে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্‌স্', 'রুদিন', 'অন্ দি ইভ্', 'দ্য টরেন্টস্ অফ্ স্প্রীং', 'ফার্স্ট লাভ' ইত্যাদি বিখ্যাত।]

১৮৫৯ সালের বসন্তকালের এক সকালে নিকোলাই পেত্রোভিচ্ কিরসানভ তাঁর ছেলের জন্যে স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ছেলে আসছে সেন্ট পিটর্সবার্গ থেকে পড়াশোনা শেষ করে। কিরসানভ সম্প্রতি তাঁর জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তির জন্যে বিশেষ চিন্তিত। কারণ নতুন ভূমিদাসদের সমস্যা এখন খুব গুরুতর হয়েছে। ট্রেন পৌছতেই কিরসানভ তাঁর ছেলে আরকাডি ও তার বন্ধু বাজারভকে স্বাগত জানালেন। তারপর বাড়ির পথে যেতে যেতে খুব অপ্রস্তুত হয়ে ছেলেকে জানালেন যে ফিনিচকা নামে একটি তরুণীকে তিনি বাড়িতে স্থান দিয়েছেন এবং তার গর্ভে একটি সন্তানও জন্মেছে। আরকাডি কিন্তু এ খবর প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করল। আরকাডি একদিন চা খেতে খেতে খুব সগর্বে বলল যে, সে আর বাজারভ হচ্ছে নিহিলিস্ট। আরকাডির কাকা প্যাভেল জানতে চাইলেন, সে তত্ত্বটির তাৎপর্য কি? তাই নিয়ে বাজারভ আর প্যাভেলের মধ্যে খুব উত্তেজিত আলোচনা হলো। বাজারভের এই স্পষ্টবাদিতায় এবং সপ্রতিভতায় সবাই খুশি হয়েছিল। তাছাড়া চাকরবাকরদের প্রতি তার সদয় ব্যবহার এবং বিশেষ করে ফেনিচকা ও ছোট্ট মিতাইয়ার

প্রতি তার যত্ন কিরসানভ্বকে খুব খুশি করে। দিনকয়েক পরে কিরসানভ্বদের এক হোমরাচোমরা আত্মীয়ের সাহায্যে আরকাডি ও বাজারভ গভর্নরের বল পার্টিতে যোগ দিল। সেখানে মাদাম ওদিনিৎসভ্ব-এর সংগে তাদের পরিচয় ঘটতে তিনি তাদের কথাবার্তায় এত চমৎকৃত হলেন যে একদিন নেমন্তন্ন করলেন তাঁর হোটেলে। ওদিনিৎসভ্ব-এর জন্য স্বামী অনেক বিষয়সম্পত্তি রেখে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর একটি বোন ছিল, কাতায়া। আরকাডি তাকে দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। আর, বাজারভ-এর সংগে মাদাম ওদিনিৎসভ্ব-এরও একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। একদিন একটি গভীর আলিঙ্গনে বাজারভ স্পষ্টাস্পষ্টি তার বাসনাকে জানতে দিল। ওদিনিৎসভ্ব বাজারভ-এর এই প্রগতিতে ভয় পেয়ে প্রত্যাখ্যান করল। ফিরে আসার পর বাজারভ আবার ফেনিচকার সঙ্গ পেল। সব ভুলে সে তার অন্তরঙ্গ হতে চাইল। কিন্তু এর মধ্যে প্যাভেল এসে বাধা দিল তাকে। ফেনিচকাকে দেখে তার পুরনো প্রেমের ব্যথাটা আবার চাড়িয়ে উঠেছে। দুজনের হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ। তাতে প্যাভেল হেরে গেলেও বাজারভ-এর হাত একটু ছড়ে গিয়েছিল। সে চিরতরে কিরসানভ্বদের আশ্রয় ছেড়ে নিজের বাড়ি গেল। পথে মাদাম ওদিনিৎসভ্ব-এর বাড়িতে আরকাডির সংগে দেখা হলো তার। সে জানাল সব কথা। তাছাড়া তার সন্দেহ হয়েছিল আরকাডি বোধহয় মাদাম ওদিনিৎসভ্ব-এর সংগে প্রেম করছে। কিন্তু আরকাডি আর কাতায়া সত্যিসত্যিই পরস্পরকে ভালবাসে। বাজারভ-এর হাতের আঘাত গুরুতর হয়েছিল। সে খবর পাঠায় মাদাম ওদিনিৎসভ্বকে। পরদিন ওদিনিৎসভ্ব ডাক্তার নিয়ে আসতেই বাজারভ গাঢ় গলায় তার ভালবাসা নিবেদন করে। কাতায়া আর আরকাডির মিলন হয়। এবং প্যাভেলের সনির্বন্ধতায় ফেনিচকা আর নিকোলাই তাদের সম্পর্ককে ভদ্রস্থ করে।

॥ বাইশ ॥

ম্যাক্সিম গোর্কি : মাদার : ১৮৬৮—১৯৩৬

[আসল নাম অ্যালেক্সি ম্যাক্সিমভিচ পেশকভ। রাশিয়ার নিজনি-তে জন্ম। সাত বছর বয়সে অনাথ। নানারকম পেশায় চেষ্টা করে বারো বছর বয়সে ভবঘুরে হয়ে যান। দারিদ্র্য তাঁকে কখনো কাছছাড়া করে না। ১৮৯৮ সালের পর থেকে তিনি ইয়োরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ায় অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেন। ১৯১৩ সালে তিনি

রাশিয়ায় ফিরে আসেন। বহু সম্মানে বিভূষিত হয়ে, বহুল কর্মময় জীবন কাটিয়ে ১৯৩৬ সালে তিনি মারা যান। তাঁর জন্মস্থান নিজনি নিভ গোরদ-কে গোর্কি নাম দেওয়া হয়েছে।]

প্যাভেল ভ্লাসভ-এর বাবা কারখানা শ্রমিক মিখায়েল। অন্যান্য শ্রমিক পরিবারের সংগেই ভ্লাসভ পরিবারেও দারিদ্র্য, মত্ততা, দুঃখের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। মিখায়েলের মৃত্যুর পর প্যাভেলও মদ খেয়ে মনের জ্বালা ভুলতে চেষ্টা করে। তার মায়ের অনুরোধে সে নিবৃত্ত হয়। প্যাভেল নিষিদ্ধ বই পড়ে। তার বাড়িতে বিপ্লবীরা আসে। তার বন্ধু আন্দ্রে, বান্ধবী নাতাশা, প্যাভেল নিজে মা-কে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখায়, মজুর ঘরনী প্যাভেলের মা মানুষ হিসেবে সে স্বীকৃতি কোনদিনই পায় নি। ধীরে ধীরে এই সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। সন্দিগ্ধ চিত্তে পুলিশ যখন খানাতল্লাসী করতে আসে, তখন প্যাভেলের মা পুলিশের বর্বর স্বরূপের প্রথম পরিচয় পায়। প্যাভেল ও আন্দ্রে যখন জেলে যায়, আন্দ্রে খালাস পায়। বিপ্লবের ইস্তাহার কারখানায় ছড়িয়ে দেবার ভার নেয় প্যাভেলের মা। সে-ও কাজে লাগে। তার জীবন ধারণেরও মানে আছে। জেল থেকে প্যাভেল মুক্তি পায়। ১লা মে-র শোভাযাত্রায় তারা আবার বন্দী হয়। প্যাভেলের মা শহরে চলে আসে। গ্রামে, প্যাভেলের সহকর্মী রাইকিন যখন জেলে বন্দী হয়, তাকে সুকৌশলে প্যাভেলের মা পালাতে সাহায্য করে। পুলিশ তার ওপর নজর রাখে। প্যাভেল সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়। তার জবানবন্দীর সে দৃপ্ত ভাষণ, ইস্তাহারে ছাপিয়ে নিয়ে প্যাভেলের মা মস্কোর দিকে রওনা হয়। স্টেশনে তাকে যখন পুলিশ ধরে, সে ইস্তাহারগুলি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে, কিন্তু তার টুঁটি টিপে ধরেছে পুলিশ।

॥ তেইশ ॥

আন্তন চেখভ : দ্য ডার্লিং : ১৮৬০—১৯০৪

[মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান চেখভ যদিও ডাক্তারী পাশ করেছিলেন ১৮৮৬ সালে, তাঁর বই Motley Series-এর সাফল্য তাঁকে সাহিত্যিক জীবনে ব্রতী করে। নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি অতি উচ্চে। তাঁর গল্পের মধ্যে 'ওয়ার্ড নং ৬', 'দি ব্ল্যাক মঙ্ক', 'দি ড্রিয়ারী স্টোরী' 'লেডী উইথ এ ডগ' 'দি গ্রাসহপার', 'দি ডার্লিং' সুবিখ্যাত]

প্রেমিয়ানিকভের মেয়ে ওলেংকাকে সবাই ভালবাসত। আর ওলেংকা ভালবাসতে ভালবাসত। তার সরল সুন্দর মুখ দেখে সবাই বলতো—ডার্লিং।

টিভোলি থিয়েটারের ম্যানেজার কুকিন, যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে করতেও ওলেংকার কাছে তার থিয়েটার চালাবার দুঃখকষ্টের কথা বলতো। ওলেংকার হৃদয় এমনই দ্রব হলো যে সে কুকিনের দুঃখকে নিজের ব্যক্তিগত শোক মেনে নিয়ে সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত হলো। সবাই বললো কি কোমল হৃদয়! কুকিনকে বিয়ে করলো ওলেংকা। থিয়েটারের সুবিধে অসুবিধে ছাড়া তার মুখে অন্য কথা নেই। হঠাৎ কুকিন মারা গেল। ভালবাসার মতো কিছু না পেয়ে কিছুদিন ওলেংকার সে কি শূন্যতা। তারপর কাঠগোলার ম্যানেজার ভ্যাসিলিকে বিয়ে করবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠ, কড়ি, বরগা, তক্তা, চেরাই, ফাড়াই, করাত, তার সমস্ত জীবন ভরে ফেলল। তার মুখে অন্য কথা নেই। সবাই বললো—ডার্লিং! ভ্যাসিলি মারা গেল। আবার শূন্যতা। পশুচিকিৎসক ভলোদিয়া কিছু দিন তার চিন্তাকে গরুর মড়ক, ঘোড়ার অসুখ, কুকুরের পাগলামি, এইসব তথ্য দিয়ে ভরে রাখল বটে, কিন্তু সে-ও চলে গেল। দীর্ঘদিন ধরে শূন্য জীবন ওলেংকার। হঠাৎ ভলোদিয়া ফিরে এল। তার স্ত্রী ও ছেলে সাশাকে নিয়ে। তারা ওলেংকার বাড়িতেই উঠল। স্ত্রী পালিয়ে গেছে। পশুচিকিৎসক নিজের কাজে বাইরে। ওলেংকার মুখে আজকাল স্কুলের পাঠ্যবিষয়, অঙ্কের দুরূহতা, দ্বীপের সংজ্ঞা, এইসব ছাড়া কথা শোনা যায় না। আবার সে সুন্দর হয়েছে। আবার লোকে তাকে বলে—ডার্লিং! হ্যাঁ। সকলের ধারণা সত্যি। ছোট্ট সাশাকে ভালবেসে তার চিন্তাকে নিজের চিন্তা করে ওলেংকা যে আনন্দ পেয়েছে, তার মতো গভীর আনন্দ তাকে তিনটি পুরুষ দিতে পারে নি।

॥ চব্বিশ ॥

মিখায়েল শোলোখভ্ : দ্য কোয়ায়েট্ ডন : ১৯০৫—

[১৯০৫ সালে ডন নদীর তীরে ভোশেন্স্কাইয়া স্তানিৎসা গ্রামে জন্ম। সামান্য ও অনুল্লেখ্য স্কুলজীবনের পর গৃহযুদ্ধে যোগদান করেন। ১৯২২ সাল অবধি হোয়াইট কস্যাকদের ডনভূমি থেকে বিতাড়িত করতে কেটে যায়। তারপর ইয়ং কম্যুনিষ্ট ম্যাগাজিনে গল্প লিখতে শুরু করেন। Quiet Don বা And Quiet Flows the Don ও Don Flows Home to Sea উপন্যাস দুটির রচনাকাল ১৯২৬—১৯৪০। এই জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস ব্যতীত তাঁর গল্প উপন্যাস হলো Azure Steppes—১৯২৬; Tales of the Don—১৯৩০; Seeds of Tomorrow বা Virgin Soil Upturned—১৯৩৩। শোলোখভ্ স্বীয় গ্রামেই আজীবন বসবাস করছেন।]

ধীর প্রবাহিনী ডন নদীর তীরে তাতারাস্ক্ গ্রাম। প্যান্টেলেমন মেলেখভ্ তার স্ত্রী ইলিনিচ্না, ছেলে পিওট্রা ও গ্রেগর, পুত্রবধূ ডারিয়া, মেয়ে ডুনিয়াকে নিয়ে বাস করে। এই দর্পিত, বীর, দুঃসাহসী, কস্যাক গ্রামে মেলেখভ্ পরিবার শৌর্যের জন্য খ্যাত। মেলেখভ্ পরিবারের প্রতিবেশী স্টিফান অ্যাস্টাকোভ্-এর স্ত্রী আকসিনিয়া নিজের কামুক পিতার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে, স্বামী তার জীবন অত্যাচারে উষর করেছে। গ্রেগর ও আকসিনিয়ার প্রণয় হয়। গ্রেগরকে ধনী কোশুনভ্ পরিবারের সুন্দরী, কোমলস্বভাবা নাতালিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। স্বামীর প্রেম না পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় নাতালিয়া। গ্রেগর আকসিনিয়াকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে এক জমিদার গৃহে বাস করে। সে যুদ্ধে চলে যায়। আকসিনিয়া জমিদারপুত্রের সঙ্গে বসবাস করছে দেখে ক্রুদ্ধ, প্রত্যাগত গ্রেগর নাতালিয়াকে নিয়ে গ্রামে ফেরে। তার ছেলে ও মেয়ে হয়। স্টিফানের কাছে ফিরে আসে আকসিনিয়া। লাল ডন্ না শাদা? হোয়াইটদের দলে যোগ দিয়ে পিওট্রা মারা যায়। দক্ষিণের ডনকস্যাকরা আতামান বা কস্যাক মুখ্য শাসিত স্বাধীন কস্যাক সাম্রাজ্য চায়। উত্তরের ভূমিহীন গরীব কস্যাকরা বলশেভিক। উচ্ছৃংখল জীবনযাপন ক'রে যৌন রোগাক্রান্ত বিধবা ডারিয়া আত্মহত্যা করে। গ্রেগরের বাবা মারা যায়। বলশেভিক নেতা পড্টিয়েলকোভ, কম্যুনিস্ট ইলিয়া বান্চাক ও বহু বলশেভিক হোয়াইটদের হাতে নিহত হয়। তবু অনিবার্য ভাবে যুদ্ধের মোড় ঘোরে। যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে দ্বিধাবিদীর্ণ হৃদয় গ্রেগর প্রথমে রেড ও পরে হোয়াইটদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরই মধ্যে তার ও আকসিনিয়ার প্রেম নদীর মতো দুর্বার গতিতে এক অমোঘ পরিণতির দিকে ধাবমান। স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত নাতালিয়া গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে গিয়ে আগেই মারা গেছে। গ্রেগরের বোন ডুনিয়া কম্যুনিস্ট মিট্কা কোশেভয়কে বিয়ে করে। গ্রেগরের মা মারা যায়। হোয়াইটরা যখন পরাজিত, রক্তস্নাত ডনভূমিতে যখন লালপতাকার জয় সুনিশ্চিত, গ্রেগর আকসিনিয়াকে নিয়ে পালাতে চায়। কিন্তু আকসিনিয়া প্রহরীর গুলিতে মারা যায়। স্তেপ্ভূমিতে তার জীবনের সবটুকু আশা আকাঙ্ক্ষাকেই সমাধি দেয় গ্রেগর। তারপর দলত্যাগী পলাতকের জীবন। তার মেয়ে মারা গেছে। ছেলের হাত ধরে মেলেখভ্ খামারের দরজায় দাঁড়িয়ে গ্রেগরের মনে হয় ডননদীর তীরে তার প্রিয় জন্মভূমিতে নিজের বাড়িতে ছেলের হাত ধরে সে দাঁড়াতে পারবে, এ যেন ভাগ্যের মস্ত আশীর্বাদ।

এর পরে আর এক স্তেপ্‌ভূমিতে তাকে যেতে হবে তার প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। তাতে তার দুঃখ নেই। জীবনের কাছে সে আর কিছু চায় না।

॥ পঁচিশ ॥

ওনোর দ্য বালজাক : ইউজেনী গ্রাঁদে : ১৭৯৯—১৮৫০

[দীর্ঘদিন দারিদ্র্যে কাটাবার পর ১৮২৯ সালে তাঁর লেখার স্বীকৃতি ও মূল্য পেতে থাকেন। ঋণশোধ করবার জন্য দুর্বার গতিতে লিখে চলেন। পোলিশ কাউন্টেস ইভেলিন হান্স্কার সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রণয়ের পর বিয়ে করবার কয়েকমাস বাদেই প্যারিসে মারা যান। তাঁর জন্ম ২০শে মে ১৭৯৯ ও মৃত্যু ১৮ই অগাষ্ট ১৮৫০। তাঁর বহু উপন্যাসের মধ্যে লা কাম্‌ দ্য ব্রাত্‌ আঁ; ল্য পেয়ার গোরিও; ইউজেনী গ্রাঁদে; উরস্যুল মিরুয়ে ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।]

১৮১৭ সালে এই মফঃস্বল শহরে মঁশিয়ে গ্রাঁদে কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা নোটারী ক্রুশো এবং ব্যাংকার গ্রাসঁ্যাস্‌ ছাড়া আর কেউ জানত না। তবু গ্রাঁদের একমাত্র সন্তান ইউজেনী গ্রাঁদে ও তার মা-কে অতীব অর্থকৃচ্ছ্রতায় দিন কাটাতে হতো। কেননা, গ্রাঁদে ছিলেন অসাধারণ কৃপণ। মাদাম গ্রাঁদে যদিও তিনলক্ষ ফ্রাঁ যৌতুক এনেছিলেন, স্বামীর কাছ থেকে ছয় ফ্রাঁর বেশি হাত খরচা পেতেন না। ক্রুশোদের ভাইপো, আর গ্রাসঁ্যাস্‌-এর ছেলে ইউজেনীর পাণিপ্রার্থী। গ্রাঁদে দুজনকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেন, কেন না মনে মনে তিনি স্থির করেছেন, যেহেতু ইউজেনীর অগাধ অর্থই তাদের কাম্য, তাদের কারুর সঙ্গে মেয়েকে তিনি বিয়ে দেবেন না। এমনি সময়ে এল শার্ল গ্রাঁদে, গ্রাঁদের ভাইপো। এই চালসর্বস্ব শৌখীন ছেলেটিকে দেখে ইউজেনী প্রেমে পড়ল। দেনার দায়ে শার্লএর বাবা আত্মহত্যা করেছেন। শার্ল এ পরিবারে আশ্রয় পেল। শহরের প্রণয়িনী আনেৎকে শার্ল ভোলে না, অথচ ইউজেনীর সকল সঞ্চয় ছয় হাজার ফ্রাঁ নিতেও তার বাধে না। শার্ল ভাগ্য অন্বেষণে আমেরিকা যায়। ইউজেনীর টাকার কথা জানতে পেরে গ্রাঁদে তাকে ঘরে কয়েদ করে রাখে। তার মা ইউজেনীকে সাহস দেয়। মা-র মৃত্যু হয়। সাত বছর বাদে গ্রাঁদে মারা যায়। মৃত্যুকালে পুরোহিতের হাতে রুপোর পবিত্র জলাধার দেখে তার চোখ চক্‌চক্‌ করে। ইউজেনী আজ এককোটি সত্তর লক্ষ ফ্রাঁর মালিক। শার্লএর প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ দিন কাটে তার। অথচ শার্ল, কার্ল শেফার্ত নাম নিয়ে উনিশ লক্ষ ফ্রাঁ রোজগার ক'রে

১৮২৭-এ প্যারিসে ফেরে। সে যখন ইউজেনীর সেই টাকা পাঠায়, নিজের আসন্ন বিয়ের কথাও লেখে। ইউজেনী তার টাকা থেকে শার্লের মৃত পিতার সব ধার শোধ ক'রে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বঁ ফোঁ-কে বিয়ে করে। তার জীবন এক শীতল নিঃসঙ্গতায়ই কেটে যাবে। স্বামী তার মন পাবে না।

॥ ছাব্বিশ ॥

এমিল জোলা : লা সোমোয়ার : ১৮৪০—১৯০২

[এমিল এদুয়ার্দ শার্ল আঁতোয়াঁ জোলার ২রা এপ্রিল, ১৮৪০ সালে প্যারিসে জন্ম। প্রভেন্সে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে ও শিল্পী সেজাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। পুস্তক বিক্রেতা হ্যাচেটের সঙ্গে কাজ করার সময়েই তিনি সাংবাদিকতা ও চিত্র সমালোচনা সুরু করেন। ইমপ্রেশানিষ্ট চিত্রশিল্পী মানে-র তিনি সমর্থক ছিলেন। ড্রেফুস-এর সমর্থক ও জ্যাকুস-এর লেখক জোলা তাঁর জীবনে বহু বই লিখেছেন—জার্মিনাল, নানা, লা সোমোয়ার, ল্য দি ব্যাকল, ল্য তেরা প্রভৃতি তার অন্যতম। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।]

জেরভেস যখন চোদ্দবছরের মেয়ে তখনই তাকে লান্তিয়ের নিয়ে পালিয়ে যায়। বাইশবছর বয়সে জেরভেস দুটি অবৈধ ছেলে, দারিদ্র্য, এবং লান্তিয়ের-এর 'লা সোমোয়ার' শুঁড়িখানায় সময় কাটাবার অভ্যাস, এই নিয়ে অকূল পাথারে পড়ে। 'লা সোমোয়ার'-এ গণিকা আদেলের কাছে চলে যায় লান্তিয়ের। আদেলের বোন ভির্জিনি ও জেরভেস-এর মধ্যে কলহ। ভির্জিনি প্রতিহিংসা নেবার পথ খোঁজে। টিনমিস্ত্রী কুপো জেরভেসকে বিয়ে করে। ছোট্ট নানা জন্মায়। কিছুদিন সুখশান্তিতে কাটে। কিন্তু দুর্ঘটনায় আহত হবার পর কুপো কাজকর্ম করা ছেড়ে দেয়। সে-ও 'লা সোমোয়ার'-এ যাতায়াত শুরু করে। জেরভেস কামার গুজের কাছ থেকে পাঁচশো ফ্রাঁ ধার নিয়ে দোকান খোলে। কিন্তু কুপোর মা এসে তার সংসারে বাস করছে। কুপোর মত্ততা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ধারের পর ধার জেরভেসের সম্মানিত জীবন যাপনের সমস্ত আশা নষ্ট করে দেয়। লান্তিয়ের এই সময়ে কুপোর বন্ধু হয়। সে জেরভেসের বাড়িতে বাস করতে আসে। সে টাকাপয়সা দেয় না। তার ভরণপোষণের ভারও জেরভেসের। ভির্জিনি ঋণজর্জরিত জেরভেসের দোকান কিনে নেয়। জেরভেস দেখে লান্তিয়েরও ভির্জিনির সঙ্গে চলে গেল। আশাহত ভাগ্যলাঞ্ছিত জেরভেস এবার শেষ আশ্রয় খোঁজে 'লা সোমোয়ার'-এ। উপবাসে উপবাসে শীর্ণ দেহ নিয়ে দেহ বিক্রী করে সন্তানদের মানুষ করবার

চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। শোচনীয় মৃত্যুতে জেরভেস-এর মর্মান্তিক জীবনের শেষ হয়।

॥ সাতাশ ॥

গী দ্য মোপাঁসা : দ্য ভেন্দেত্তা : ১৮৫০—১৮৯৩

[ত্যুরভিলে-স্যুর-আরক্যুয়ে-তে জন্ম। মায়ের যত্নে ফ্লবের-এর কাছে সাহিত্য শিক্ষা শুরু। অবশেষে মনোবিকারের অন্ধকার পরিণতিতে শোচনীয় মৃত্যু। 'বেল আমি', 'উনে ভিয়ে' এই দুটি উপন্যাস ব্যতীত তিনি যে সব অসংখ্য ছোট গল্প লিখেছেন, তার মধ্যে 'বুলল দ্য স্যুইফ', 'মাদমোয়াজেল ফিফি', 'দি ডায়ামণ্ড নেকলেস' প্রমুখ প্রায় সবগুলিই জগদ্বিখ্যাত।]

বোনিফাসিও শহরের একপ্রান্তে পাওলো সার্ভেরিনির বিধবা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করে। ছেলে আন্তন ও কুকুর সেমিলান্তে তার একমাত্র সঙ্গী। একদিন নিকোলাস রাভোলাতি তার ছেলেকে হত্যা করল। এবং ছেলের মৃতদেহের দিকে চেয়ে বৃদ্ধা মা প্রতিশোধ নেবার শপথ করল। রাভোলাতি তখন সমুদ্র খাঁড়ির ওপারে সার্দিনিয়ায় পালিয়ে গেছে। মা জানলা খুলে, সমুদ্রতীরে ছোট্ট গ্রামটির দিকে চেয়ে রইল। আইন-পলাতক কর্সিকান দস্যুদের মতো রাভোলাতিও ওখানেই আশ্রয় নিয়েছে। সেমি-লান্তে-কে শক্ত শেকলে বেঁধে রেখে সে উপোস করতে শুরু করল। দুদিনের উপোসে সে যখন উগ্র হয়ে উঠেছে, তখন মা তার স্বামীর পুরোন জামাকাপড়ে খড় পুরে, একটা মানুষ বানিয়ে, তার গলায় একটুকরো রান্নামাংস ঝুলিয়ে দিয়ে কুকুরটাকে খুলে দিল। কুকুরটা গলা থেকে মাংসটা ছিঁড়ে নিল। তারপর খড়ের মানুষের টুঁটি ঘিরে সসেজ জড়িয়ে দেওয়া ও ছিঁড়ে নেওয়া এই চললো কিছুদিন। তারপর হাতে মাংস নিয়ে ইশারা করলে কুকুরটা এমনিই গলাটা ছিঁড়তে শিখল। এরপরে মা, পুরুষের পোশাক পরে বৃদ্ধ, শীর্ণ লোক সেজে সেমিলান্তে-কে নিয়ে পলাতকদের গ্রামে গেল। নিকোলাসকে খুঁজে পেতে তার বেশি সময় লাগেনি। পরে প্রতিবেশীরা বলেছিল, হ্যাঁ, একটি বৃদ্ধকে কুকুর নিয়ে তারা যেতে দেখেছে। কুকুরটি শান্তভাবে মাংস চিবোচ্ছিল। সেই রাতে নিহত ছেলেটির মা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছিল।

॥ আটাশ ॥

মার্সেল প্রুস্ত : সোয়ান্‌স্ ওয়ে : ১৮৭১—১৯২২

[ফরাসী ও ইহুদী পিতামাতার সন্তান মার্সেল প্রুস্ত, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে কোন কাজকর্মই দীর্ঘদিন করতে পারেন নি। অবসর ও বিশ্রামেই দিন কেটেছে তাঁর। এবং সেই অবসরকে তিনি এক সুবৃহৎ উপন্যাসে রূপ দেন—'রিমেমব্রেন্স অফ থিংস পাস্ট'। 'সোয়ানস ওয়ে' এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বা বই। 'রিমেমব্রেন্স অফ থিংস পাস্ট' কয়েকটি উপন্যাসের সমষ্টি।]

ঘুম ও জাগরণের অন্তর্লীন গোধূলিতে এই গল্পের বক্তা অতীতকে মনে করতে পারে। আলো, ছায়া, গন্ধ, স্পর্শ, এই সব নিয়ে যেন অতীত তাকে ঘিরে ধরে। শৈশবে সে রুগ্ন ছিল। আর ভঙ্গুর স্বাস্থ্য তাকে করেছিল অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। কঁব্রে-তে, একদিনের কথা তার মনে পড়ে। মঁসিয়ে সোয়ান মা-র সঙ্গে কথা বলছেন। মা শুভরাত্রি জানাতে আসছেন না। কি সে উদ্বেগ, কি সে চিন্তা। সোয়ান তাদের বাড়িতে আসেন। তাঁর স্ত্রীকে আনেন না। বক্তার মাসী লিয়নি কেন যেন মাদাম সোয়ানকে পছন্দ করেন না। সোয়ানের খুব ইচ্ছে তার ছোট্ট মেয়ে জিল্‌বের্তে এই ছেলেটির সঙ্গী হয়। কঁব্রের প্রতিবেশ অন্তিম বসন্তে বড় সুন্দর। এরা যখন বেড়াতে যায় সোয়ানদের পথ অর্থাৎ তাদের বাগান চেরা পথ দিয়ে যায়। সেই পথে একদিন ছোট্ট জিল্‌বের্তে আর ছোট ছেলেটির আলাপ। ছোট ছেলেটি জিল্‌বের্তেকে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু পারী-তে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কঁব্রের স্মৃতি যায় মিলিয়ে।

পারী-তে, মাদাম ভের্দ্যুর্‌র‍্যার সালোঁতে ওদেৎকে সোয়ান ভালবেসেছিল। সোয়ানের ভালবাসা যখন যন্ত্রণা হয়ে ছিঁড়ে ফেলছে তাকে, তখন ওদেৎ-এর ভালবাসা স্তিমিত হয়ে বিরাগে পৌছেছে এবং এই যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সোয়ানের দীর্ঘদিন লেগেছিল।

বক্তার মনে পড়ে, তার ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে যাবার কথা ছিল। কিন্তু যাবার উত্তেজনাতেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। যাওয়া হলো না। বাড়ির পুরনো চাকরানী ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে সে রোজ বেড়াতে যায়। ছোট্ট জিলবের্তের সঙ্গে সে খেলা করে। শরীর দুর্বল, মন ভাবপ্রবণ, বয়সের তুলনায় পরিণত মানস এই ছেলেটি কল্পনার জগতেই মুক্তি পায়। জিল্‌বের্তেকে সে কতই ভালবেসেছে।

আগে তার বাবা, তার মা, সকলকেই ভাল লাগত। আজ সব ভালবাসা ঝরে গিয়ে, সরে গিয়ে, জিল্‌বের্তেকে পথ করে দিয়েছে। একদিন জিল্‌বের্তে বলে সে আর পার্কে আসবে না। সামনে বড়দিন। তারপর হয়তো তারা বাইরে ভ্রমণ করতে যাবে। ছোট ছেলেটির মন ভেঙ্গে যায়। মাদাম সোয়ান, জিল্‌বের্তে এদের সে দেখে কিন্তু দূর থেকে ঘাড় নেড়েই সরে আসতে হয়। তাদের জীবনে আরো আকর্ষণ আছে। রুগ্ন ছেলেটির জন্যে সময় কি এমন বে-হিসাবে দেওয়া চলে? কিন্তু জিল্‌বের্তে আসে না বলে ছেলেটির হৃদয় শূন্য। বক্তা বলে—'Houses, roads, avenue, are as fugitive, alas as the years.'

॥ ঊনত্রিশ ॥

জাঁ পল্ সার্ত্রে : দ্য ওআল : ১৯০৫—

[এই ফরাসী লেখক ও চিন্তানায়ক প্যারিসে, লা এভ্‌র্ ও লাওঁ-তে শিক্ষা সমাপ্ত করে বার্লিনে আধুনিক দর্শন পড়েন। প্যারিসে শিক্ষকতার কাজ করতে করতে যুদ্ধের সময়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে ভূমিকা নেন। লেখাই বর্তমানে এঁর একমাত্র কাজ। এই মার্কসবাদী লেখকই ফরাসী অস্তিত্ব-বাদের জনক। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'লা নসী' (১৯৩৮) এবং চার খণ্ডে সমাপ্ত 'দি এজ অফ রীজ্‌ন' প্রমুখ উপন্যাস চতুষ্টয় (১৯৪৮) বিখ্যাত।]

আমাকে, টমকে ও জুয়ানকে ধরে এনে ওরা প্রশ্নে প্রশ্নে উৎপীড়িত করছে। জুয়ান যতই বলে—'আমার ভাই জোসে বিপ্লবী। আমি কোন পার্টির সদস্য নই।'—ওরা সে কথা কানে নেয় না। আমি যে প্যাবলো ইবিয়েটা তা ওরা জানে। বিপ্লবী র‍্যামন গ্রিস-এর কথা ওরা জানতে চায়। আমি বলি না। প্রশ্নোত্তরের পর, দণ্ডাদেশ জানবার আগেই আমরা আবার সেলে ঢুকি। অসহ্য শীত। জুয়ান ছোট্টছেলে। ওকেও কি ওরা মেরে ফেলবে? টম, সারাগোসাতে বন্দীদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের কথা বলে। না। তাদের মতো আমরা হাত বাঁধা অবস্থায় ট্রাকের নিচে মরতে চাই না। ওরা আমাদের গুলী করুক। সন্ধ্যেবেলা মেজর আসেন। পরদিন সকালে টম স্টাইনবক, জুয়ান মিরবল, প্যাবলো ইবিয়েটাকে মরতে হবে। জুয়ান এখনো বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর সমস্ত রাত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অসহ। বেলজিয়ান ডাক্তারটি আমাদের সঙ্গে রাত কাটান। কিন্তু কি বা সাহায্য করতে পারেন তিনি? জুয়ান মৃতদেহের মত বিবর্ণ। টম তার প্যাণ্ট ভিজিয়ে ফেলছে। ডাক্তারটির দিকে

আমরা চেয়ে আছি। ও বেঁচে থাকবে। আমরা মরে যাব। ও বেঁচে থাকবে। আমরা মরে যাব। জুয়ান কেঁদে, দৌড়ে, অর্থহীন অঙ্গভঙ্গী করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সকাল। টম গেছে, জুয়ানকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। আমি আবার অফিসঘরে। আবার সওয়াল। র‍্যামন গ্রিস কোথায়? র‍্যামন গ্রিস তার আত্মীয়দের সঙ্গে। আমি জানি। আমি বলি না। হঠাৎ অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, মজা করার ভঙ্গীতে বলি—'র‍্যামন গ্রিস কবরখানায়। যারা কবর খোঁড়ে তাদের ঘরে লুকিয়ে আছে।'

ওরা চলে যায়।

আমি মরলাম না। আমাকে ওরা বোধহয় মুক্তি দেবে। অন্য বন্দীদের মধ্যে আমায় জিইয়ে রাখল। আমি আর বিস্মিত হতে পারি না। তবু যখন গার্সিয়ার কাছে শুনি, র‍্যামন গ্রিস্ তার আত্মীয়দের বিপদে ফেলতে চায়নি বলে কবরখানায়, সমাধি-খনকদের কুঁড়েতে লুকিয়েছিল, সেখানেই সে ধরা পড়েছে, তখন আর আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। আমি হাসছি। হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলেছি। আমি থামতে পারছি না।

নির্ঘণ্ট

আ

ই

ক

খ

গ

ঝ

প

ভ

ম

য

র

ল

য়

ৎ

গ্রন্থপঞ্জী

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

সাহিত্যের স্বরূপ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বগত — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বই পড়া — সরোজ আচার্য

বরিস পাস্তেরনাক (প্রবন্ধ) — বুদ্ধদেব বসু

Brooke, Stopford. A and Sampson—English Literature.
Burgum, E. B—The Novel and the World's Dilemma.
Blunden, Edmund—Englishmen of Letters.
Brereton, Geoffrey—A Short History of French Literature.
Basu, Buddhadeva—Preface to Notes from Underground and The Double: F. Dostoevsky (Rupa Edition).
Barnes and Noble—American Literature.
Brewster and Burrell—Modern World Fiction
Cross, W. L—The Modern English Novel
Caudwell, Christopher—Studies in a Dying Culture.
Daiches, David—The Novel and the Modern World.
Dostoevsky, Feodor—'The Pushkin Speech' from The Dream of a Queer Fellow and The Pushkin Speech (Rupa Edition).
De Quincey, Thomas—Literary Criticism.
Evans, Prof Ifor—English Literature Between the Wars.
Frazer, G. S—The Modern Writer and His World.
Forster, E. M—Aspects of Novel.
Fowlie, Wallace—A Guide to Contemporary French Literature From Vallery to Sartre.
Ford, Boris—From Dickens to Hardy.
Gorky, Maxim—Reminiscences.
" —Literary Portraits.
Geisman, Maxwell—Writers in Crisis: The American Novel Between Two Wars.
Hammerton, J. A—World's Thousand Best Short Stories, Vol-III.
James," Henry—Notes on Novelists.
—Partial Portraits.
Krutch, J. W—Mrs, Dalloway : a Review (Nation 1925).

Kauffman, Walter—Existentialism from Dostoevsky to Sartre.
Kun tz, Joshua—Russian Literature Since the Revolution.
Kazin, Alfred—On Native Grounds : A Study of American Prose Literature from 1890 to the Present.
Leguois, Emile and Louis Cazamian—A History of English Literature.
„ —A History of French Literature.
Maison, Germaine—A Concise Survey of French Literature.
Maugham, Somerset—The Greatest Stories of All Times.
Motyleva, Tamara—Soviet Literature and the World Culture.
Mirsky, D—A History of Russian Literature From Earliest Times to the Death of Dostoevsky.
Macy, John—The Story of the World's Literature.
Neill, S. D—A Short History of the English Novel.
Priestley, J. B—Literature and Western Man.
Peyre, Henri—The Contemporay French Novel.
Quinn, A. H—The Literature of the American People.
„ „ —American Fiction : An Historical and Critical Survey.
Routh, H. V—English Literature and Ideas in the Twentieth Century.
Rahv, Philip—Literature in America.
„ —Image and Idea : Fourteen Essays on Literary Themes.
Smith, Guy. E—English Literature After Neoclassicism Vol II.
Santayana, George—The Sense of Beauty.
Slonim, Marc—Modern Russian Literature from Chekhov to the Present.
„ —An Outline of Russian Literature.
Struve, G—Soviet Russian Literature.
Trilling, Lionel—The Liberal Imagination.
Warfel, Harey. R—American Novelists of To-day.
Woolf, Virginia—The Common Reader.
Wagenknecht, E—Cavalcade of the English Novel.
Wells, H. G—A Short History of the World.